तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

০৫

[illegible]

ছোটগল্প
সাপ্তাহিক

১ম বর্ষ—২য় খণ্ড

পৌষ ১৩৩৯—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যা /০ বার্ষিক মূল্য ৩।০

কথক সঙ্ঘ, ২ লায়ন্স্ রেঞ্জ, কলিকাতা

ছোট গল্প

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—১৩৩৯-৪০

২৬শ—৪৮শ সংখ্যা, পৌষ—জ্যৈষ্ঠ, ষান্মাসিক

সূচি-পত্র

গল্প

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অব্যবহিতা	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৩৭৫
আতঙ্ক	শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১০৬১
গল্প	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৪১৫
জল	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ	৮৯১
জ্ঞানাঙ্কুর	শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত	১১২১
ডুব-সাঁতার	শ্রীসুবোধ রায়	১২০৩
দুস্তর	শ্রীহাসিরাশি দেবী	১১৬৩
নিচ্চয় মাত্ বোলো	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০১৩
নীললোহিতের আদিপ্রেম	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	১০০৫
নৃত্য-কলা	খ্যাতনামা চিকিৎসক সাহিত্যিক	১০১৯
পত্নী-ঋণ	শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত	৯৭৯
পাগল	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	১৪৪৭
পারিবারিক ব্যাপার	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	৮৫৫
বাষ্প	শ্রীসুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৩৭
বেঙ্গলী ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র গুপ্ত	১৫৫১
বৌ-ভাত	শ্রীমতী অনুরূপা দেবী	১০৮৭
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল	শ্রীমতী আশালতা দেবী	১২৭৭
ভৈরবী নদী	শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫১৯
মাটির প্রদীপ	শ্রীসীতা দেবী	৯৪৭
শঠে শাঠ্যং	শ্রীসুধাংশুকুমার দাশ গুপ্ত	১৪৮৫

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শেষ পৃষ্ঠা	শ্রীপ্রবোধকুমার সান্ন্যাল	১০২৯
সীতা-তীর্থ	শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু	৮২৩
সুমতি	শ্রীননীমাধব চৌধুরী	১৩৪৫
হারানো স্মৃতি	শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী	৭৮৩

চিত্র ও চরিত্র

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

অক্ষয়কুমার দত্ত	১২৩৩
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৮৮৫
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৯৯
কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৬০৫
কৃষ্ণদাস পাল	১৫৪৪
কেশবচন্দ্র সেন	১২৭১
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১১৫২
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৪১
চিত্তরঞ্জন দাস	১৪০৫
দীনবন্ধু মিত্র	১৩০৭
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৮০
নবীনচন্দ্র সেন	১১৯১
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৮১৭
বিবেকানন্দ	১০২৩
ভূদেব মুখোপাধ্যায়	১১১৬
মধুসূদন দত্ত	৯৪৩
মহেন্দ্রলাল সরকার	১৩৬৮
রাজেন্দ্রলাল মিত্র	১৪৭৮
রামকৃষ্ণ পরমহংস	১৩৩৫
রামগোপাল ঘোষ	১৫১৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	
রামমোহন রায়		৮৪৮
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		৯৭২
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		১০৫৫

দিন-পঞ্জী

শ্রীদিব্যেন্দু লাহা ৮২১, ৮৫৩, ৮৮৮
৯৪৫, ৯৭৭, ১০০২, ১০২৭, ১০৫৯
১০৮৪, ১১২০, ১১৬০, ১২০১
১২৩৬, ১২৭৫, ১৩১০, ১৩৪১
১৩৭৩, ১৪১২, ১৪৪৪, ১৪৮৩
১৫১৭, ১৫৬৮, ১৬০৭

প্রসঙ্গ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গম	শ্রীমনোমোহন সিংহরায়	১৪০৪,১৪৭১
ছুটি রোগ	রায় বাহাদুর শ্রীসতীশচন্দ্র দে, এম-এ, এম-বি	১০৭৭
পুরাণ ও ইতিহাস	শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র	৮১২
ঐ	কৃপাশরণ	৮৮০
বাঙ্গলা নাটকের কথা	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়	১৫০৮
বাবু নাটকের কথা	,,	১৪৩৬
ঐ আলোচনা	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৭৭
বিবিধ	শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ	৯৩৯
ভারতের রত্ন	শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এস্‌সি (লণ্ডন) এ-আর সি-এস	১৩৫২
যাত্রা	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়	১১৩১
রবীন্দ্রনাথের পত্র	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫৩৯
রবীন্দ্রনাথের বাল্য-ঘটনা	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শিশু-সাহিত্যের বানান	শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার	১৩০১
সাহিত্য	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়	৮৪৪
সাহিত্য ও মনোবিদ্যা	ডক্টর শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম-এ, ডি-ফিল	৮৭৭
স্থাপত্য ও যন্ত্রবিদ্যা	শ্রীউপেন্দ্রনাথ কর, এম-এ, বি-ই, এফ-আর-এস-এ	৮১৪
হার্ট-ফেল	রায় বাহাদুর শ্রীসতীশচন্দ্র দে, এম-এ, এম-বি	১২৬৬
হিপনটিজম্	শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু	১১১১, ১২২৮

সমালোচনা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ভাদুড়ীমশাই, নীল-লোহিত, করকোষ্ঠীর চাবিকাঠি, একটি কথা ও আমারা ৯৯৭, ১১১৪, ১১৫৫, ১১৯৬

সাময়িকী ও অসাময়িকী

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ৮১৯, ৮৫১, ৮৮৭, ৯৪৪, ৯৭৪, ১০০১, ১০২৫, ১০৫৭, ১০৮২, ১১১৮, ১১৫৭, ১১৯৮, ১২৩৩, ১২৭৩, ১৩০৯, ১৩৩৮, ১৩৭০, ১৪০৯, ১৪৪৩, ১৪৮১, ১৫১৫, ১৫৪৬, ১৬০৬

চিত্র

শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য্য অঙ্কিত প্রতি সংখ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছোট গল্প

১ম বর্ষ] ২৩শে পৌষ ১৩৩৯ [২৬শ সংখ্যা

হারানো স্মৃতি

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী

মেয়েটি যেদিন জন্মিল, সেইদিনের সে-সময়টা যে নেহাতই খারাপ ছিল তাহা তাহার জীবনের কার্য্যপ্রণালী দেখিলেই বুঝা যায়।

বেচারী ইতি—

পিতা মাতা এবং আত্মীয়স্বজন সকলেই নিশ্চিত জানিতেন এবার নিশ্চয়ই পুত্রসন্তান জন্মিবে, কেন না অত বড় জ্যোতিষী মহেশ আচার্য্যের কথা কখনই মিথ্যা হইবার নহে। মহেশ আচার্য্য কাশীর বিখ্যাত জ্যোতিষী, তিনি নাকি মানুষ দেখিয়াই তাহার অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন।

গত পূজার সময় কাশীতে বেড়াইতে গিয়া হঠাৎ এই জ্যোতিষী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা। তিনি হাত গণিয়া দেখেন নাই, কোষ্ঠী দেখেন নাই, একবার মাত্র ইতির মাকে দেখিয়াই নিশ্চিত করিয়া বলিয়াছিলেন, পুত্র আসিতেছে।

আর সকলের কথা মিথ্যা হইতে পারে, মহেশ আচার্য্যের কথা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না, গ্রামের প্রাচীনা রায়-গৃহিণী দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন, "ওগো, ওঁর কথা বেদবাক্য, কোনদিন কেউ মিথ্যে বলতে পারে নি। তোমরা হাতে হাতে প্রমাণ পাবে, সত্যি ছেলে আসছে কি না।"

ভবিষ্যদ্বংশীয় যে মহাত্মা আসিবেন তাঁহার নামকরণ পর্য্যন্ত হইয়া রহিল এবং ইহা লইয়া পিতামাতার মধ্যে বেশ একটু মনান্তরও হইয়া গেল। পিতা নাম রাখিতে চান ইন্দ্রজিত, মাতা বলেন সুষীম; শেষ পর্য্যন্ত মায়ের জিদই বজায় রহিয়া গেল।

এত উদ্যোগ, এত আশা, এত ব্যাকুলতা সব এই মেয়েটা আসিয়া ব্যর্থ করিয়া দিল। জ্যোতিষীর গণনা মিথ্যা হইয়া গেল, তথাপি তিনি কাশী হইতে পত্র দিলেন কেমন করিয়া যে মেয়েটা আসিল তাহা তিনি ভাবিয়া পান না, যেহেতু পুত্র আসিবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ ছিল এবং মেয়েটা কোন মুহূর্ত্তে এতটুকু ফাঁক পাইয়া যদি তাহার যাত্রাপথে আসিয়া না দাঁড়াইত—সে আসিতই। তাঁহার গণনা এ পর্য্যন্ত মিথ্যা হয় নাই, এই ক্ষুদে মেয়েটা কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাকেও

রীতিমত ফাঁকি দিয়াছে, কেবল তাহার পিতামাতা ও অন্যান্য স্বজনকেই ফাঁকি দেয় নাই।

পিতা মহিম মুখোপাধ্যায় কন্যার মুখদর্শনও করিলেন না, মা লক্ষ্মীমণি প্রথমটায় অবহেলা দেখাইলেও শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটাকে কোলে লইয়া দুধ দিতেই হইল। পিতামাতার মনে প্রকাণ্ড একটা ধারণা জন্মিয়া রহিল, সত্যই এই ক্ষুদে মেয়েটা ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, ভাবী বংশধর ক্ষুণ্ণ মনে আবার কোথায় স্থান অন্বেষণ করিতে গিয়াছে কে জানে।

ইতি কিছুই বুঝিল না, শিশু যেমন কাঁদে হাসে খেলা করে, তেমনি হাসিয়া কাঁদিয়া খেলিয়া সে বড় হইতে লাগিল।

অপরাধ কাহারও নহে, মেয়েটির অদৃষ্টের।

মহিম মেয়েজাতটাকে দুইচক্ষু দিয়ে দেখিতে পারিতেন না। নেহাৎ সংসার করিতে হয় বলিয়াই বিবাহ করা এবং একটি মেয়েকে ঘরের গৃহিণী পদ দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীকে হয় তো ভালোও বাসেন, কিন্তু তাঁহার মনের সেই নিদারুণ বিদ্বেষটা সে ভাব বাহিরে প্রকাশ হইতে দেয় নাই।

স্ত্রী লক্ষ্মীমণি নেহাৎ গোবেচারা ছিলেন না, জোর করিয়া বিবাদ করিয়া তিনি মহিমকে পর্য্যন্ত সময় সময় সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেন। তবু ইহাও মহিম সহ্য করিতেন কারণ মেয়েদের এ প্রকৃতি দেখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। কলিকাতায় কার্য্যোপলক্ষে মাসে মাসে তাঁহাকে যাইতে হইত, সেখানে

বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ের অবাধ চলাফেরা দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তাহার উপর তাঁহার জনৈক বন্ধু যখন শুনাইয়াছিলেন, একদিন এইরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতা বাংলার ঘরে ঘরে আসিবে, পল্লীর মেয়েরাও এইরূপ নিঃশঙ্কচিত্তে অবাধে চলাফেরা করিবে. আবশ্যক হইলে মারামারিও, করিবে এবং সেদিনের যে আর বিলম্ব নাই তাহাই দেখাইবার জন্য একখানি বই পড়িতে ছিলেন তাহাতে মহিম একেবারে স্তম্ভিত. রাগত, চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

ঠিক এই সময়েই জন্মিল ইতি।

মহিমের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সাত জন্মের পাপ সঞ্চিত না থাকিলে যে কন্যা হয় না. এবং এই কন্যা জন্মিতেই যে তাঁহার মাথা নত হইয়া পড়িল ইহা তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন। এই কন্যা বড় হইবে, শিক্ষা না হয় নাই দিলেন তবু বিবাহ তো দিতে হইবে, তখন তাঁহার উচ্চ মহিমা ধূলিসাৎ হইবেই, কৌলিন্যের গর্ব্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

লক্ষ্মীমণির হইল বড় মুস্কিল।

হাজার হোক তিনি মা, সন্তানের উপর অজ্ঞাতে মাতৃ-হৃদয়ে স্নেহ সঞ্চিত থাকিবেই। মেয়ে হাসিলে মুখ বিকৃত করিয়া বলেন, "পোড়া কপাল, পোড়ার মুখে হাসি দেখ, মরণ আর কি—"

কিন্তু তবু দেখিতে ভালো লাগে, তবু তিনি অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখেন, মুখের বিরক্তিভাব কখন আস্তে আস্তে মিলাইয়া গিয়া জাগিয়া উঠে স্মিত কোমল এতটুকু হাসির রেখা।

এক একদিন এমনও হয়, ছোট্ট মেয়েটি বেশ খেলা করে, মা তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহার পানে তাকাইয়া থাকেন, সে হাসিলে হাসেন, কাঁদিলে তাড়াতাড়ি বুকে তুলিয়া লইয়া সান্ত্বনা দেন, ঠিক সেই সময়েই হুড়মুড় করিয়া মহিম ঘরে ঢুকিয়া পড়েন।

সামনের দৃশ্যটা কিছুতেই তাঁহার মনোরঞ্জন করে না, তাঁহার সারা চিত্ত দারুণ বিরক্তিতে ভরিয়া উঠে, মুখখানার উপর সে চিহ্ন ফুটিয়া উঠে। বিকৃত মুখে তিনি বলিয়া উঠেন, "অ্যাঃ, মাটির ঢিপিকে আবার আদর হচ্ছে-"

জননী অত্যন্ত সন্ত্রস্তা হইয়া উঠেন।

এইভাবেই লুকোচুরি চলে।

লক্ষ্মীমণি আস্তে আস্তে নরম হইয়া পড়িলেন, আর মহিম সেই পরিমাণেই উগ্র হইয়া উঠিলেন। মা তখন কন্যাকে তাঁহার চোখের আড়ালে অতি যত্নে লুকাইয়া রাখেন।

তিনটি ছেলে

তাহারাও ঠিক পিতার মনের ভাবটি পাইয়াছে। ভ্রূভঙ্গী করিয়া পরেশ বলে, "এঃ, একটা মেয়ে হয়েছে! দেখ, দিন রাত খালি চেঁচাচ্ছে।"

নরেশ বলে, “ইচ্ছে করে, গলাটা টিপে দিই।”

রমেশ চুপ করিয়া থাকে, অথচ হিংসা করিবার কথা তাহারই, কারণ মেয়েটা আসিয়া তাহাকেই মায়ের কাছ ছাড়া করিয়াছে। বড় দুই ভাই অনেক আগেই মায়ের সংস্পর্শ এড়াইয়া পিসিমার কাছে আশ্রয় লইয়াছে, একদা রমেশই মায়ের আদরের গোপাল ছিল। এই মেয়েটা আসিবামাত্র রমেশ তফাৎ হইয়া গিয়াছে, দূর হইতে আড়চোখে সে কেবল তাকাইয়া দেখে।

অবহেলা ঘৃণার মধ্যেও মানুষ বাড়ে।

ইতিও বাড়িল, বাড়িলও একটু অস্বাভাবিক রকমে। যখন তাহার বয়স তের বৎসর তখন কেহ দেখিয়া বিশ্বাস করে না।

আর কিছু না থাক্, কৌলিন্যের গর্ব্ব মহিমের অন্তরে খুব বেশী রকমই ছিল; পাছে এই নিখুঁত বংশে এতটুকু কলঙ্ক পড়ে এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদা অস্থির হইতেন।

যত ক্রোধ সব পড়িল ইতির উপর।

মেয়েটা তালগাছের মত বাড়িয়া উঠিতেছে। উহার দিকে তাকাইলে চক্ষু স্থির হইয়া যায়, মনে হয় কি করিয়া জাত মান রক্ষা হইবে, স্ব-ঘরে কন্যা দান করা যাইবে?

উপযুক্ত বরও মিলে না। আজকাল সব ছেলেই অল্প বিস্তর শিক্ষিত, তাহাদের টাকাও চাই তেমনি। মেয়ের

সৌন্দর্য্যের পানে কেহ চাহিবে না, চাহিবে তাহার পিতার সিন্দুকের পানে।

পত্নীকে ডাকিয়া বলিল "মেয়েটাকে বসিয়ে খাইয়ো না, দিন দিন মোটা হাতী হয়ে উঠছে।"

বেচারা ইতি যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়, তাহার বড় বড় দুইটি চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিয়া পড়ে, কোনমতে সে নিজেকে গোপন করিয়া রাখে।

সে সেই বাল্যে যা খেলা করিয়াছে। জ্ঞান হইয়া অবধি আর খেলা করে নাই। সে বুঝিয়াছে সংসারে সে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, তাহার অধিকার এখানে নাই।

মহেশ আচার্য্যের গণনার কথা শুনিয়াছে, তাই নিজেকে সে ধিক্কার দিত।

দিনরাত সে সংসারের কাজ করে, অসুখ হওয়া মহাপাপ বলিয়া ভাবে।

রমেশ সম্প্রতি গ্রাম্য স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়া সহরে আই-এ পড়িতে গিয়াছে। শরীরে তাহার নিত্য অসুখ, কোনক্রমে যেন সে বাঁচিয়া আছে। সেইজন্য প্রায়ই সে বাড়ী চলিয়া আসে।

পিতা ইতির পানে চান, দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া বলেন, "মেয়ে কিনা, কেমন শরীরটি দেখ, আর রমেশ যে ছেলে, ওর ওপর নির্ভর করতে হবে কি না, সেইজন্যেই ওর শরীর ওই রকম।"

ইতি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে যেন সে রুগ্ন হয়, তাহার ছোড়দা যেন ভালো হইয়া উঠে। কিন্তু ভগবান তাহার প্রার্থনায় কাণ দেন না, সে দিন দিন বড় হইতেই থাকে, গায়ের রং দিন দিন উজ্জ্বল হইতে থাকে।

অনেক পাত্রের পিতা দেখিতে আসেন। মেয়ে দেখিয়া পছন্দ হয় কিন্তু পাওনা শুনিয়া পিছাইয়া যান, একবার দেখিয়া গিয়া আর আসেন না, কোনও সংবাদও দেন না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসরও চলিতে লাগিল। পরেশ ও নরেশ কলিকাতায় কাজ করিতে লাগিল, রমেশ পড়িতে লাগিল, ইতি ঘরের কোণে পড়িয়া রহিল।

অবশেষে বিবাহ হইল।

বয়স তখন ঠিক ষোল বৎসর।

পাত্রের বাড়ী রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে, জমি জমা আছে, কোনক্রমে সংসার প্রতিপালন করিতে পারিবে, চাকরী না করিলেও দিন চলিবে।

বয়স চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে। প্রথম পক্ষের স্ত্রী সম্প্রতি গতায়ু হইয়াছে, সন্তানাদি কিছু নাই। হয় তো তাহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না নেহাৎ বাধ্য হইয়া বিবাহ করিতে হইয়াছে; কেন না ঘরে সব থাকিলেও রাঁধিয়া দিবার অভাবে বেচারাকে উপবাসে প্রায় দিন কাটাইতে হইত।

বাংলা দেশের মেয়ে—বিশেষ এ রকম রক্ষণশীল ঘরের মেয়েকে বিবাহ করিতেই হইবে তা সে যাহাকেই হোক। কানা, খোঁড়া, অন্ধ, বোবা—এ নির্ব্বাচনের ভার মেয়ের নাই, নির্ব্বাচন করিবে মেয়ের অভিভাবক। যে কেহই আসুক—তাহার হাতে মেয়েকে হাত রাখিতেই হইবে, সে চরিত্রহীন হোক, মাতাল হোক—তাহাকে নাকি দেবতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেই হইবে।

শুভদৃষ্টির সময় ইতি পূর্ণভাবেই তাকাইল। স্বামীর কুৎসিত আকৃতির পানে তাকাইয়া একটুও ভাবান্তর তাহার হইল না, নিতান্ত নির্ব্বিকার ভাবেই সে নিজেকে সেই লোকটির হাতে সমর্পণ করিল।

লোকে বলিল, "মাগো, মেয়েটাকে হাত পা ধবে জলে ফেলে দিলে গা। অমন সুন্দরী মেয়ে—ওকে রাজার ঘরে মানাত—"

ইতি কিছুই ভাবিল না, বলিল না, শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় একটি ফোঁটা চোখের জলও ফেলিল না।

মা গোপনে চোখের জল মুছিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য অন্তরে একটা বেদনা অনুভব করিলেন, তখনই জোর করিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলেন—যাক, সেখানে গিয়া সুখী হোক। এখানে যা কষ্ট, যা লাঞ্ছনা

পিতা আশ্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হুঁকায় টান দিয়ে বলিলেন, "বাঁচা গেল, ঘাড় হতে একটা বিরাট বোঝা নামল।"

কন্যাদায় বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ দায়, পিতৃ মাতৃ দায় হইতেও বড়।

গৃহস্থ মেয়ের শ্বশুর বাড়ী সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে, ইতির শ্বশুরবাড়ীও সেইরূপ।

দুখানি খড়ের ঘর, মাটির দেয়াল, মেঝেও মাটির। প্রতিদিন লেপিতে হয়, তিন চারবার করিয়া ঝাঁট দিলেও পরিষ্কার থাকে না। যেখানে সেখানে বসিবার যো নাই, কাপড় অতি শীঘ্রই ময়লা হইয়া যায়। পায়ে সযত্নে আলতা পরিলে খানিক বাদেই ময়লা হইয়া যায়, পাঁচ ছয় দিন অন্তর কাপড় সিদ্ধ করিয়া ঘাটে লইয়া গিয়া কাচিতে হয়।

দিন বেশই কাটে।

দয়াল সারাদিন মাঠে ঘোরে, অনেক সময় নিজের হাতে লাঙ্গল দেয়, গরুর সেবা করে, কোমরে গামছা জড়াইয়া বিচালি কাটে। সন্ধ্যার সময় তারণ মণ্ডলের বাড়ীতে আড্ডা বসে, সেখানে সকল জাতের মধ্যে একই হুঁকা চলে, ব্রাহ্মণ কেবল একটা কলাপাতার নল বসাইয়া লয় মাত্র।

রাত্রে স্ত্রী তাহার পদসেবা করে, ফাটা পায়ে তৈল মালিশ করে, গরমকালে বাতাস দেয়। বাংলার প্রতি গৃহে মেয়েরা এমনই ভাবে স্বামীর সেবা করিয়া যায়; ইহাকেই সুখের সংসার বলে।

সাধারণ সকল মেয়েই জানে তাহাদের ঠিক এই ভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ধনীর সংখ্যা এদেশে অতি কম। ধনীকন্যা শিক্ষা পায় সহরে বাস করে, দরিদ্র পল্লী-

বালা অতি দুরে পড়িয়া থাকে, সহরের আবহাওয়া তাহাদের চিরাচরিত সংস্কার নষ্ট করিতে পারে না।

সাহাদের ঘাটে গ্রামের মেয়েদের দুবেলা বৈঠক বসে।

সারাদিন মেয়েরা ভূতের মত সংসারে খাটে, সকাল ও বৈকালে ঘাট জুড়িয়া বসে। কাহার ঘরে কি হইল, কাহার স্বামী পুত্র কিরূপ, কাহার শ্বাশুড়ী দুষ্ট ইত্যাদি আলোচনা চলে এবং এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ঘাটে থাকিয়া যে যাহার বাড়ী ফিরিয়া যায়। ক্ষুদ্র গ্রামটুকুর বাহিরে যে বিশাল জগৎ আছে সে সংবাদ ইহারা রাখে না, কত আসে কত যায় কে তাহার হিসাব করে ?

ইতিও এই দলে বেশ যোগ দেয়, আর পাঁচ জনের মতই আসে, গল্প করে।

সে ধান ভানে, চিঁড়া তৈয়ার করে, বৎসরের জন্য জালা ভরিয়া তুলিয়া রাখে। সংসারের খুঁটিনাটি কত কাজ করে—

ইহারই মধ্যে এতটুকু কাজের ত্রুটি পাইলে দয়াল বড় কম লাঞ্ছিত করে না। কত দিন উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়াছে, বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, আবার যখন রাগ পড়িয়াছে তখন ডাকিয়া আনিয়াছে।

এমনি ভাবে বাংলা মেয়ের দিন কাটে।

পথে চলিতে অপরূপ সুন্দরী মেয়েটীকে এরূপ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপূর্ব্ব বিস্মিত হইয়া গেল।

এ মেয়েটিকে সে কোন দিনই দেখে নাই। অনেক প্রশ্ন করিল, কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

আশ্চর্য্যভাবে অপূর্ব্ব চলিতে চলিতে বার বার চাহিয়া দেখিল।

পরিচয় শীঘ্রই পাওয়া গেল।

এ মেয়েটী দয়ালের স্ত্রী। ইহার সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতিই অপূর্ব্বের কাণে আসিয়া পৌঁছাইল। হাকিম সাহেবের মনের গতি কোন্‌দিকে তাহা লোকে চট করিয়া ধরিয়া লইল এবং তাহার মনস্তুষ্টির জন্য অনেক কথা বলিল।

জরীপ করা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, অপূর্ব্বকে শীঘ্রই এ দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। মেয়েটির যে পরিচয় সে পাইল তাহাতে তাহার অন্তর দ্রব হইয়া গেল, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কেবল একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিল—আহা! কিন্তু এই ক্ষুদ্র সহানুভূতির ভাবটুকুই তাহার সমস্ত অন্তর শীঘ্রই ছাইয়া ফেলিল, ক্ষুদ্র যে-কীট কোন অতর্কিত ফাঁকে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সে ভিতরটা কুরিয়া কুরিয়া খাইয়া ক্রমেই মোটা হইয়া উঠিল।

সে চিন্তার শেষ নাই, সে চলিয়াছেই।

সেদিন নদীর ধার হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় অপূর্ব্ব আবার সেই মেয়েটিকেই দেখিতে পাইল। যে দারুণ রৌদ্রে লোকে বাহির হইতে পারে না, সেই রৌদ্রে সে চুপ করিয়া

তপ্ত বালুর উপর দাঁড়াইয়া উদাসনেত্রে কোন্‌দিকে চাহিয়া আছে কে জানে!

অপূর্ব্ব থমকিয়া দাঁড়াইল।

হাতে আজ শাঁখা দুগাছিও নাই, কাপড়ের লাল দুইটী পাড় নাই, সীঁথায় সিঁদুরও দেখা যায় না।

নিষ্ঠুর স্বামীর অত্যাচার আজ চরমে পৌঁছাইয়াছে। জোর করিয়া সে ইহার শাঁখা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। লাল দুইটি পাড় ছিঁড়িয়া কাপড়খানিকে বীভৎস করিয়া দিয়াছে, ললাটের সিঁদুর মুছিয়া শেষটায় তাহাকে টানিতে টানিতে পথে বাহির করিয়া দিয়াছে।

ডেপুটী সাহেবের মনের ভাব নাকি সে জানে, সেই জন্যই নির্দ্দোষী স্ত্রীর এই শাস্তি।

হয়তো দূরের পানে তাকাইয়া সে সম্মুখেই চলিতেছে, এমনই অন্যমনস্ক ভাবে কখন ঝুপ করিয়া জলের মধ্যে পড়িবে —এই-ই তাহার বাসনা।

অপূর্ব্বর পদশব্দ পাইয়া সে চোখ নামাইল।

আজ সে চোখের উপর ঘোমটা টানিল না।

অপূর্ব্ব ডাকিল, "আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমায় তোমার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

ইতি একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, হাত তুলিয়া নদীর জল দেখাইয়া বলিল, "বাপের বাড়ী নয়, ওইখানে যাব।"

অপূর্ব্ব শুধু হাসিল. "পাগল ! মরবার কল্পনা ক'রো না। জগতে তোমার জায়গা আছে, শুনেছি তোমার বাপ মা তিন ভাই আছে, তারা তোমায় জায়গা দেবে. আমার সঙ্গে এসো।"

সংসার আবার ডাকে।

ইতি মরণের কথা ভুলিয়া গেল ; মনে হইল তাহার স্থান আছে, তাহার মা আছে।

সে শিহরিল।

অন্য ঘরে ইতি থাকে।

কদাচিত বাহির হয়,—অপূর্ব্ব তাহাকে দেখিতে পায়। দিনের বেলায় কাজের চাপে নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় থাকে না, ইতি তখন কোথায় ডুবিয়া থাকে।

যত ভাবনা আসে রাত্রে

বিছানায় শুইয়া পড়িয়া অপূর্ব্ব জানালার মধ্য দিয়া তাকাইয়া থাকে ইতির ঘরের রুদ্ধ দরজার পানে।

ও-ঘরে কে আছে সে কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, না জাগিয়া আছে ? সম্ভব ঘুমায় নাই, তাহারই মত জাগিয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে, কত কি ভাবিতেছে।

সে কি ভাবিতেছে কে জানে ? সেই চাষার মত লোকটার কথা, না পিত্রালয়ের কথা ? এ ঘরে যে রহিয়াছে, যাহার জন্য স্বামী তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছে, তাহার কথা কি একটিবার ভাবে না ?

মাথার মধ্যে সব অগোছালো হইয়া যায় চোখে ঘুম আসে না, অপূর্ব্ব ঘরে পায়চারী করে।

দয়াল কাল আসিয়াছিল, অপূর্ব্ব হাঁকাইয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। স্ত্রী তো দিবেই না, উপরন্তু সে যে স্ত্রীর উপর এত অত্যাচার করিয়াছে, সে জন্য নালিশ করিবে ভয় দেখাইয়াছে।

অশিক্ষিত গ্রাম্যপ্রকৃতি লোকটি হাকিমের তাড়া খাইয়া ক্ষুদ্র শিশুর মতই কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, বার বার হাত দুখানা জোড় করিয়া বলিয়াছিল, "মাপ করুন হুজুর, আর কখনই অমন করব না, ওকে বরং জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।"

অপূর্ব্ব গম্ভীর ভাবে কেবল মাথা নাড়িয়াছিল।

অসহায় লোকটি তখন বলিয়াছিল, "আচ্ছা হুজুর, আমার পরিবারকে বরং একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন, সে আমায় ভালবাসে কিনা। আজ পাঁচ বছর তো বিয়ে হয়েছে হুজুর, এমন কত ব্যাপার কতদিন ঘটেছে, তবুও তো আমায় ছেড়ে কোথাও যায় নি। আপনি তাকে আমার সামনে একটিবার আসতে দিন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করে দেখি ; যদি সে না যেতে চায় আমি চলে যাব, তাকে আমি আর বিরক্ত করব না।"

হয় তো তাহার মনে আশাটুকু ছিল—পাঁচ বৎসর ধরিয়া এ রকম নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও যে তাহার ঘরে টিঁকিয়া ছিল, সে আজও তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না। একবার সামনে আসিয়া স্বামীর মুখখানা দেখিলেই বিচলিত

হইয়া পড়িবে, হাকিম বাবুর তর্জ্জন গর্জ্জন তখন সবই মিথ্যা হইয়া যাইবে।

অপূর্ব্ব একটু ভাবিয়া বলিল, "রোস, তাকে আমি তোমার কথা বলে দেখি।"

নারীচরিত্র নাকি সে বুঝিতে পারে না। এখন নিতান্ত মিথ্যা লইয়া কারবার চলিতেছে, আশা এখনও আছে, কিন্তু লোকটাকে তাড়াইয়া দিলে যদি বিপরীত ফল হয়, এই একটা ভাবনা ছিল।

ইতি শুনিল দয়াল তাহাকে লইতে আসিয়াছে।

ঘৃণায় দুঃখে ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি ওখানে আর যাব না, মার কাছে যাব।"

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, "সে একবার দেখা করতে চাচ্ছে।"

ইতি এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আমি দেখা করব না, হাকিম সাহেব।"

আসল কথা, প্রত্যহ এই পাঁচ বৎসর নির্য্যাতন সহ্য করিয়া লোকের ঠাট্টা পরিহাস শুনিয়া সে এমন কঠিন হইয়াছে। তবু সে তাহার সেই স্বামীকেই একটু ভালো বাসিত, স্নেহ করিত,—অপূর্ব্ব তাহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া মুখের ধন্যবাদ লাভ করিয়াছিল, অন্তরের কৃতজ্ঞতা পায় নাই। ইতি এখন স্বামীকে দেখাইতে চায়,

সে রাগ করিতে জানে, সেও ফিরাইয়া আঘাত দিতে পারে।

অপূর্ব্ব বাহিরে আসিয়া দয়ালকে জানাইয়া দিল, ইতি দেখা করিবে না, সে চলিয়া যাইতে পারে।

দয়াল আবার কাঁদিবার উপক্রম করিতে অপূর্ব্ব তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া কম্পাউণ্ডের বাহির করিয়া দিতে জনৈক কনষ্টবলকে আদেশ করিল।

আদেশ অবিলম্বে প্রতিপালিত হইল।

বৎসর দুই হইল পিতা মহিম মন্ত্র লইয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন। গেরুয়া বস্ত্র পরিয়া কমণ্ডলু চিমটা লইয়া সকালের দিকে নদীর ধারে একটা গাছের তলায় সমাধিতে বসেন, গ্রামের সকল লোক ভক্তিপ্লুত অন্তরে প্রণাম করে। বাড়ীতে ত্রিতলের ছোট ঘরটিতে প্রাণায়াম করেন, সারাদিন গীতা বেদ উপনিষদ পাঠ করেন।

লোকে ধন্য ধন্য করে।

সকলেই বলে, মহিম কোনও পাপে ধরায় আসিয়া দিনকত সংসারে জড়াইয়াছিলেন, ভগবান তাঁহার ভক্তকে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।

দলে দলে কত লোক আসে, প্রণাম করিয়া পাদোদক লইয়া নিজেদের ধন্য মনে করে।

দুই পুত্র কাজ করে, দুই পুত্রবধূ সংসারের গৃহিণী। লক্ষ্মীমণি কর্ত্তার সেবা করেন, সংসারের কিছুই দেখেন না। রমেশ দুইবার বি-এ ফেল করিয়া কাজের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

জামাতার আঁকা বাঁকা লেখা পত্র খানা আসিয়া যেন বারুদের স্তূপে আগুণ ধরাইয়া দিল।

কর্ত্তা সগর্জ্জনে বলিলেন, 'আমি তখনই বলেছিলুম না গিন্নি, আঁতুড়েই মেয়ের গলায় পা দাও কিম্বা খানিকটা নুন খাইয়ে মার? অ্যাঁ, বংশে একেবারে কালি দিলে, মুখ দেখাবার পথ রাখলে না?"

লক্ষ্মীমণি পাথর হইয়া গেলেন।

কথাটা বিশ্বাস হয় না যে তাঁহারই কন্যা, সে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

কন্যার লাঞ্ছনার কথা মায়ের কাছে অজ্ঞাত নাই। পাঁচ বৎসর বিবাহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে একটিবার সে এখানে আসে নাই। ছেলেরা বাড়ী আসে, বউয়েরা থাকে, বাড়ী আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে; মা সকলের সামনে হাসেন, কিন্তু গোপনে সমস্ত বুকটা জুড়িয়া হাহাকার জাগে, গোপনে তিনি দুটি ফোটা চোখের জল ফেলেন।

স্বামীকে একটিবার মাত্র ইতির কথা বলিতে গিয়া ধমক খাইয়াছিলেন, সে কথা মনে আছে।

দুই ভাই বিকৃত মুখে বলিল, "হতভাগিটা মুখ দেখানো বন্ধ করলে, লোকে বলবে কি ?"

কথা গোপন করিবার চেষ্টা করিবার সত্ত্বেও সমস্ত গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল ইতি কুলত্যাগ করিয়াছে। ভাইয়েরা লজ্জায় গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।

ইহারই দুদিন পরে গরুর গাড়ীখানা দরজায় আসিয়া থামিল এবং তাহারই মধ্য হইতে নামিল ইতি··

লক্ষ্মীমণি তরকারী কুটিতেছিলেন. কানে আসিল ইতি আসিয়াছে, তিনি একেবারে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পিতার কানে কথাটা যাইতেই তিনি ছুটিয়া আসিলেন।

কুলত্যাগিনী কন্যা বাড়ী আসিয়াছে।

হুঙ্কার ছাড়িয়া তিনি মারেন আর কি—

হিন্দী বাংলা ইংরেজী মিশাইয়া তিনি অজস্র চীৎকার করিতে লাগিলেন—মোট কথা, "আবি নিকালো, এক সেকেণ্ড এ বাড়ীতে থাকা চলবে না।"

ইতি স্তম্ভিত।

সে বুঝাইয়া বলিতে চায়—তাহার স্বামী তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে. সে তাই এখানে আসিয়াছে,—কিন্তু তাহার কথা শুনিবে কে ?

পিতা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমি সব শুনেছি, সব জানি। দয়ালের কাছে আবার যদি জায়গা পাস, আমি নিজে গিয়ে তোকে নিয়ে আসব। আর যদি না পাস,

জলে ডুবে মরিস, বেঁচে থেকে আমার মুখ যেন হাসাস নে, তোকে এই শেষ কথা বলে রাখলুম, মনে রাখিস।”

ইতি স্থির হইয়া দাঁড়াইল পিতার কথা শুনিল।

মাকে দুর হইতে একটা প্রণাম করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, ‘যদি সেখানে আশ্রয় পাই আমায় আনবে তো মা ?”

গোপনে চোখের জল মুছিয়া জননী বলিলেন, “আনব, তখন তোর সব কথা শুনব, আজ কিছু শুনব না, শুনতেও পারব না।”

ইতি গাড়ীতে উঠিল।

আশ্রয় ? কোথায় আশ্রয়, কে দিবে আশ্রয় ?

এখানে নাই, সেখানেও হইবে না, তবে—?

ইতি চক্ষু বুজিল।

মুখভঙ্গী করিয়া দয়াল বলিল, “কেন—হাকিম বাবু জায়গা দিলে না, তাড়িয়ে দিলে বুঝি ?”

গম্ভীর কণ্ঠে ইতি বলিল, “না তিনি তাড়িয়ে দেন নি, তাড়িয়ে দেবেনও না, আমি নিজেই চলে এসেছি।”

দয়াল হুঁকা টানিতে টানিতে বলিল, “অর্থাৎ—?”

ইতি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাথা দুলাইয়া দয়াল বলিল, “এখানে আর জায়গা নেই—হবে না, তুমি যেখানে ছিলে সেইখানেই যাও; কেন আমায় ত্যক্ত কর।”

দৃপ্ত নেত্রে ইতি খানিক তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর ধীর পদে বাহির হইল।

অফিস-রুমে একা বসিয়া অপূর্ব্ব নিজের কাজ করিতেছিল।

ইতিকে কাল সে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছে।

অন্তরের প্রবৃত্তিকে সে বিজিত হইতে দেয় নাই, এই তাহার প্রধানতম অহঙ্কার। কয়টা দিন সেই প্রবৃত্তিটার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে সমস্ত অন্তরটাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি তাহার বশ হয় নাই. তাহাকে সে বাধা দিয়াছে।

কাল ইতিকে পাঠাইবার সময় সে যথেষ্ঠ বেদনা পাইয়াছিল, তথাপি সে পাঠাইয়াছে। কাল সমস্ত রাত্রি সে জাগিয়া কাটাইয়াছে, নিজেকে শতসহস্রবার ধিক্কার দিয়াছে, সকালের আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনও আলো পাইয়াছে,—সে গত রাত্রের কথা ভাবিয়া বিবর্ণ বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে।

খোলা দরজার পথে ইতি যখন প্রবেশ করিয়া তাহার পায়ের তলায় আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, “আমায় কেউ জায়গা দিলে না. সবাই তাড়িয়ে দিলে—”

তখন অপূর্ব্ব চমকাইয়া উঠিয়া তাহার পানে চাহিল।

অশ্রুসিক্ত কি সুন্দর মুখখানি—

মানুষের মন দুর্ব্বল হয়, লুব্ধ হইয়া উঠে।

ছিটকাইয়া পড়া পেনটিকে কুড়াইয়া লইয়া সে ভাবিতে আরম্ভ করে।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করে, "তাইতো কি করা যায়? তা হলে কি করবে ইতি, কোথায় যাবে?

ইতি একটু নামিয়া বলে, "আপনার বাড়ী নেই হাকিম বাবু সেখানে আমার জায়গা হবে না? আমি তাঁদের ঝি হয়ে থেকে, সব কাজ করব, আপনার ছেলেপুলে মানুষ করব।"

অপূর্ব্বর মুখে একটু হাসি ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া যায়।

বাড়ী তাহার আছে, সকলেই সেখানে আছে, কিন্তু ইহাকে কেহ স্থান দিবে কি?

সংসার যে কি তাহা ইতি জানেনা, অপূর্ব্ব জানে, অনেক সংবাদই সে রাখে।

খানিক ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, সাতদিন পরে আমার কাজ হয়ে যাবে, আমি বাড়ী যাব। তখন না হয় দেখা যাবে, এখন এই সাতদিন তুমি এখানে থাকো।"

দুদিন মাত্র গেল, তৃতীয় দিন ইতিকে আর দেখা গেল না। উৎকণ্ঠিত অপূর্ব্ব চারদিকে লোক পাঠাইল, দয়ালকে ধরিয়া আনিয়া অনেক নির্য্যাতনও করিল, ইতির সন্ধান মিলিল না।

অপূর্ব্ব অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

তাড়াতাড়ি জরীপ শেষ করিয়া সে একদিন বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

অনেক দিন পরের কথা।

অপূর্ব্ব আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

সাত বৎসর পূর্ব্বে জরীপ করিতে গিয়া কোথায় একটী সুন্দরী মেয়ে বিপদগ্রস্ত হইয়া তাহার আশ্রয়ে দিনকতক বাস করিয়াছিল এবং কয়টা দিন তাহাকেই লইয়া চিন্তায় গোপনে সে কত খেলা করিয়াছে আজ তাহা মনে পড়ে না।

অপূর্ব্ব ভারি কড়াপ্রকৃতির হাকিম, বাড়ীতেও তেমনি উগ্রপ্রকৃতি।

অথচ সাত বৎসর পূর্ব্বে এই লোকটিই ছিল দিব্য অমায়িক, অত্যন্ত মধুরপ্রকৃতি। পরিবর্ত্তনটা কবে কেমন করিয়া ঘটিল, সে সংবাদ পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব ভুলিয়া গেছে।

হয় তো অতীতের কথা ভাবিলে মনে হয়, কিন্তু সে অতীতকে ভুলিয়া গেছে, পূর্ব্বে যাহাদের সহিত বন্ধুত্ব ছিল, আজ তাহাদেরই সে চিনিতে পারে না।

সে দিন ছিল রবিবার—

বন্ধুদের নিতান্ত আগ্রহে তাহাদের সঙ্গে পড়িয়া অপূর্ব্বকেও লেকে যাইতে হইয়াছিল।

লেকের কালো জলে নানা আকারের বোট ছুটিতেছিল, দলে দলে লোক লেকের চারিধারে বেড়াইতেছিল।

একটী গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল একটি মেয়ে, তাহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটী শিশু।

চলিতে চলিতে যেন হঠাৎ ধাক্কা খাইয়া অপূর্ব্ব দাঁড়াইয়া গেল, বিস্মিত দুটি চোখে সে মেয়েটির পানে তাকাইয়া রহিল।

অনেকদিনের হারানো একটি দিনের স্মৃতি তাহার মনটাকে দোলা দিয়া যায়।

কবে—কোন দিন সে এই মুখখানাই দেখিয়া ছিল ?

তাহার পর কতদিনই আসিয়াছে, কতদিনই চলিয়া গেছে, সে হিসাব অপূর্ব্ব রাখে নাই, রাখিবার চেষ্টাও করে নাই।

দুনিয়া অনেক জিনিষই তাহাকে দিয়াছে, সে পায় নাই কি ? বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্পদ,—তাহার পর স্ত্রী পুত্র কন্যা, সবই সে পাইয়াছে, চাহিবার জন্য তাহার আর কিছুই নাই।

কিন্তু না চাহিতে যাহা আসিয়াছিল—

তাহা সে হারাইয়া ফেলিয়াছে,—তাহার জন্য সে অভাব অনুভব আজও বোধ হয় করে। অন্তরের অন্তরালে আজও সে স্মৃতি আছে, নহিলে তাহারই মত কাহাকেও দেখিয়া অপূর্ব্ব আত্মবিস্মৃত হইয়া যায় কেন ?

সে দিনে আসামীর ডকে আসিয়া যে মেয়েটি দাঁড়াইল তাহার পানে তাকাইয়া অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এ সেই মেয়েটি যাহাকে কাল সে লেকের ধারে দেখিয়াছিল।

সেও তাকাইয়াছিল। অপূর্ব্ব তাহার পানে তাকাইতেই সে হাসিয়া ফেলিল। অপূর্ব্ব লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইল।

মেয়েটী নাকি চুরি করিয়াছে। শুনা গেল ইহার পূর্ব্বেও সে অনেকবার এই কাজ করিয়াছে এবং প্রায় প্রতিবার শ্রীঘর দর্শন করিয়া আসিয়াছে।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে সে নির্ভীকভাবেই জানাইল চুরি না করা ছাড়া উপায় কি? যেমন করিয়াই হোক তাহাকে দিন যাপন করিতে হইবে তো; একটি মেয়ে আছে, তাহাকে আহার্য্য দিতে হইবে, স্বামীর দুখানা পা কবে ট্রেণে কাটা গিয়াছে, তাহাকে আহার্য্য দিতে হইবে, ভিক্ষা চাহিলে পাওয়া যায় না দেখিয়াই সে চুরি করে, এবং ইহার পরও সে আরও চুরি করিতে পারে কারণ তাহাদের তিনটি প্রাণীর জীবিকার্জ্জনের কোনও উপায় নাই।

"তোমার স্বামী -?"

মেয়েটী মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল "হ্যাঁ, আমার স্বামী।"

বিচার ঠিকমতই হইল এবং ছয়মাসের জন্য তাহার জেলের আদেশ হইল।

হাসিতে হাসিতে সে নামিয়া চলিল, "বাঁচলুম বাবা, ছ'মাসের আহার যোগানোর ভাবনা আমায় ভাবতে হবে না। যার যা হবে হোক গিয়ে, আমি তো ছ'মাস আরাম করে থাকি গিয়ে। হাকিমবাবু যদি চিরকালের মতই জেলে থাকতে দিতে গো তা হলে সত্যি তোমায় মন খুলে আশীর্ব্বাদ করতুম।"

অপূর্ব্ব বিস্মিত চোখে মেয়েটির পানে চাহিয়া রহিল। ইহার কথাবার্ত্তা চলাফেরা সবই সেই মেয়েটির মত।

কিন্তু সে যে ছিল গৃহস্থঘরের মেয়ে, গৃহস্থঘরের বধূ। ইহার মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে তাহা তো ছিল না। সেই শান্ত সংযত ভাব, সে তো ইহার মধ্যে নাই।

অন্ধকার গলি ··

দূরে দূরে এক-একটি আলো জ্বলিতেছে, তাহাতে অন্ধকার দূর হয় নাই।

অপূর্ব্ব মোটর হইতে নামিয়া ড্রাইভারকে বলিল, "দশ মিনিট অপেক্ষা কর, আমি আসছি।"

সাত নম্বরের বাড়ী, মেয়েটি বলিয়াছিল এখানেই সে থাকে।

মনের উৎকণ্ঠা যায় নাই, তাহার সম্বন্ধে সে সবিশেষ জানিতে চায়, কোর্টে জানার সুযোগ হয় নাই।

একখানি খোলার ঘর—অন্ধকারে ছাওয়া।

দরজায় বসিয়া একটা লোক—

অপূর্ব্ব থমকিয়া দাঁড়াইল, কি বলিয়া কথাটা তুলিবে সে তাহাই ভাবিতেছিল।

যে মেয়ে চুরি করিয়া আট দশবার জেল খাটে তাহাকে উপলক্ষ করিয়া কথা তুলিতে দোষ কি, সকলেই তো তাহাকে জানে।

একবার কাশিয়া সে অগ্রসর হইল। লোকটি হ্যারিকেনের আলোটা বাড়াইয়া দিয়া একবার তীক্ষ্ণ নেত্রে তাকাইল, জিজ্ঞাসা করিল "কি চান বাবু?"

অপূর্ব্ব জানাইল এই বাড়ীতে যে মেয়েটি থাকে তাহাকেই তাহার দরকার।

লোকটি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে কাল থেকে বাসায় ফেরেনি বাবু। ভারি বদমায়েস, আমায় জ্বালিয়ে খেলে।"

ইহার পর কথা কহিবার সুযোগ পাওয়া গেল।

লোকটা সবিনয়ে জানাইল—উহার পরিচয় সে কিছুই জানে না। পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত, অনেক রকম পাপকাজ করিত। একবার চুরি করিয়া দুইজনেই দণ্ডিত হইয়াছিল, সে খালাস পাইয়া আসিয়াছিল, ইতি আসে নাই। তাহার পরেই রাণাঘাট ষ্টেশনে চুরি করিয়া সে পলাইতে গিয়া ট্রেণে দুখানা পা কাটা যায়।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে—

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করে, "ওর নাম কি ?"

লোকটি উত্তর দিল, "ইতি।"

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়ে কার, তোমার না তার।"

সে উত্তর দিল, "মেয়ে তার বাবু। সে মেয়েটা কাল চলে গেছে, আর আসে নি।"

সেই ইতি

গৃহস্থ কন্যা, গৃহস্থ বধূ—

যে মানুষ হইয়াছিল পুণ্যের আবহাওয়ার মধ্যে। এ জীবন তাহার কল্পনার বাহিরে ছিল, কোন দিন যে সে এ পথে আসিবে তাহা কেহ ভাবে নাই।

কিন্তু তখন যদি সে আশ্রয় পাইত—

যদি অপূর্ব্বও তাহাকে আশ্রয় দিতে রাজি হইত—

সে মরিতে পারিত, একদিন সে মরিতে গিয়াছিল, অপূর্ব্ব তাহাকে মরিতে দেয় নাই। সেদিন যে সাহস তাহার মধ্যে ছিল, সে সাহস তাহার মধ্যে আর ছিল না।

মানুষ কোথা হইতে কোথায় আসিতে পারে, সন্দেহ মানুষকে ধ্বংস করিয়া দেয়, অপূর্ব্ব সে প্রমাণ হাতে হাতে পাইল।

সে কাল রাত্রেও ঘুমাইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জানিত, ইতি পৃথিবীতে নাই সে সকলের ঘৃণা সহিয়া জগতে থাকিতে পারে না।

টলিতে টলিতে অপূর্ব্ব মোটরে উঠিল, তখন তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

প্রসঙ্গ

পুরাণ ও ইতিহাস

হিন্দু বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে, বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা জানা আবশ্যক। ১৯৩১ সালের লোক গণনায় বাঙ্গলার ৪৭,৫৯৯,২৩৩ জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ২১,৫৭০,৩০৭। মুসলমান ২৭,৪৯৭,৬২৪। সংখ্যাধিক্য নানা কারণে বল দান করে। হিন্দুজাতি বা সমাজ চতুর্বর্ণে বিভক্ত। শূদ্র শব্দে যাহাদের বুঝায় তাহাদের লক্ষণ বিবিধ হইলেও, তাহারা দ্বিজদের আদর্শ অবলম্বন করে। সমাজে গুণকর্ম্মগত চতুর্ব্বর্ণ। জন্মগত বর্ণ থাকিলেও, তাহা যে সমাজে পরিবর্ত্তনীয়, তাহার দৃষ্টান্ত সুবহু আছে। বিস্তৃত হিন্দু রাজ্যে জল বায়ু ও দূরাগম্যতা নিবন্ধন আচারের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আমরা হিন্দু সমাজে সকলের অধিকার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত জীবিত আছি। মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা জীবননাশের কারণ হইবে। সমুদ্র বা নদী তাহার জলোচ্ছ্বাসের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে না। মর্য্যাদা রক্ষা করা প্রকৃতিজ কর্ম্ম। শব্দ বা বেদের নিত্যতায় বিশ্বাস থাকিলে আমরা যে অতি প্রাচীন হইয়াও জীবিত আছি কেন বুঝিতে পারি। আমরা বঙ্গ শব্দ বেদ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রে দেখিতে পাই। অতি প্রাচীন জাতি আজ নানা কারণে বিধর্ম্মীর সংখ্যাধিক্যে ক্ষুণ্ণ হইলেও, নিরাশ হই না। এই

জাতি সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পুনর্জাগ্রত হইবে। বঙ্গের বা বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়া হৃদয়ে বল ও বাহুতে শক্তি আসিবে। বঙ্গগৌরবগাথা 'ছোট গল্পে' গীত হইলে ছোট বহুত্ব লাভ করিয়া 'বড়' হইবে।

* * *

চন্দ্রবংশে বলির ক্ষেত্রে সুদেষ্ণার গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও ওড্র নামক পুত্রগণ উৎপন্ন হন। তাহাদের নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতির নামকরণ হইয়াছিল।

বঙ্গরাজ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গরাজেরা সংস্কৃত সাহিত্যে ঐতিহাসিকতার প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন।

তাঞ্জোরে একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ প্রশস্তিতে বঙ্গলম্ শব্দ পাওয়া যায়। আরবী ও ফারসী ভাষাতে "বঙ্গলম্" শব্দ "বাঙ্গলা" হইয়াছে। আবুল ফজল লিখিয়া গিয়াছেন ঃ বঙ্গ দেশের অনেক নিম্নস্থান দশ হস্ত উচ্চ বিশ হস্ত প্রশস্ত এক একটি বাঁধ বা আল দিয়া ঘেরা হইত। এই কারণে "বঙ্গ" ও "আল" এই দুই শব্দের যোগে "বাঙ্গাল" এবং তাহা হইতে "বাঙ্গলা" নাম হইয়াছে।

শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র

স্থাপত্য ও যন্ত্রবিদ্যা

ছাদ দিয়া জল পড়া লইয়া অধিকাংশ গৃহস্থকেই বিব্রত হইতে হয়। এমনকি নূতন ছাদেও অনেক সময় জল পড়ে এবং তাহা মেরামত করিতে ছাদ খুড়িয়া দাগরাজি করিতে গিয়া উহা আরও খারাপ হইয়া যায়। ফলে জল পড়া বন্ধ না হইয়া উত্তরোত্তর ছাদের দাগরাজি বাড়িতে থাকে এবং পরিশেষে ছাদটি রংবেরংএর দাগে পরিপূর্ণ হইয়া বহুরূপী সাজিয়া পড়ে। অথচ গৃহস্থকে প্রত্যেক বর্ষায় শান্তি স্বস্তি বিসর্জ্জন দিয়া ছাদের ভাবনা ভাবিতে হয়।

* * *

অনেকে জানেন না যে অতি সহজে কেবল মাত্র চূণের জল দ্বারা ছোট ছোট ফাটল সুন্দররূপে বন্ধ করা যাইতে পারে। ছোট ফাটলের দুই পার্শ্বে লম্বা লম্বা দুইটি বাঁধাল এটেল মাটী বা চূণ সুরকি দিয়া তৈয়ার করিতে হয়; এবং খুব পাতলা তাজা চূণের জল ঢালিয়া ঐ বাঁধালের মধ্যে ফাটলের উপর ঢালিতে হয়। চূণের জল ঐ ফাটলের সংসৃষ্ট সমস্ত ছিদ্র দ্বারা চুঁয়াইয়া ছাদের তলা দিয়া পড়িতে থাকে। এবং উহার কিছু কিছু চূণ ছিদ্রগুলির মধ্যে জমিতে থাকে। প্রথম প্রথম ঐ জল চূণগোলা জল দেখায় ক্রমশঃ উহাতে আর চূণ থাকে না, খাঁটী জলই চুয়ায় ও পরে জল পড়া বন্ধ হইয়া যায়। যতক্ষণ জল পড়া বন্ধ না হয় ততক্ষণ ফাটলের উপর

চূণের জল দিতে থাকিতে হয়, যেন উহা একদম না শুকাইয়া যায়, পরে বাঁধাল ভাঙ্গিয়া দিলেই হইল। এইরূপে চুল পরিমাণ হইতে সিকি ইঞ্চি পর্য্যন্ত ফাটল পরিষ্কাররূপে মেরামত করা যায়।

* * *

অপেক্ষাকৃত বড় ফাটলের পক্ষে গোবরমিশ্রিত সিমেণ্টের জলই প্রশস্ত। তিনভাগ গোবর ও একভাগ সিমেণ্ট মিশাইয়া অল্প পাতলা করিয়া জলে গুলিয়া ঢালিয়া দিতে হয়। ইহাতে বাঁধালের আবশ্যক নাই। খামার গোবর দেওয়ার মত ঝাঁটা দ্বারা লেপিয়া দিলেই চলে। অবশ্য ঢালিবার পূর্ব্বে ফাটল ও তাহার পার্শ্বে অনেকখানি স্থান ভাল করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখা দরকার।

* * *

অনেক সময় ছাদ কম পেটা হইলে বা সুরমি মারার দোষে সমস্ত ছাদময় সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে ও বৃষ্টি হইলেই সমস্ত ছাদ রসিয়া ছাদের তলায় টপ টপ করিয়া অল্প অল্প জল পড়ে, অথচ কোন ফাটল দেখা যায় না। সেরূপ স্থলে সমস্ত ছাদের উপর পূর্ব্বোক্তরূপে গোবর ও সিমেণ্ট মিশ্রণের পাতলা গোলা ঝাঁটা দ্বারা লাগাইলে জল পড়া বন্ধ হয়।

ফাটল খুব বড় হইলে চূণ সুরকী দ্বারাই মেরামত করিতে হয়। ফাটলের দুই পাশে একটু বেশী দূর পর্য্যন্ত ধাপে ধাপে হেলান ভাবে কাটিয়া লওয়া উচিত এবং উত্তম রূপে অনেক দূর পর্য্যন্ত অনেকক্ষণ ধরিয়া ভিজাইয়া লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। নতুবা নূতন পুরাতনে জোড় লাগে না, মশলার সহিত একটু চিনির বা গুড়ের জল দিলে খুব ভাল হয়।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ কর, এম-এ, বি-ই, এফ-আর-এস-এ

চিত্র ও চরিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান বিশেষত্ব তাঁহার প্রতিভার পৌরুষ।

জ্ঞানে ছিলেন তিনি ব্রাহ্মণ, তেজে গর্ব্বে মহিমায় তিনি ছিলেন রাজা, ক্ষত্রিয়।

পাতলা চাপা ঠোঁট, উচ্চ কপাল, উজ্জ্বল চক্ষু, দৃঢ় চিবুক, দীর্ঘ দেহ, দৃপ্ত ভঙ্গী—তিনি ছিলেন পুরুষপ্রধান।

কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন, সেদিন তাঁহার অন্তরে যে গভীর রেখাপাত হইয়াছিল তাহার ছবি এইরূপ। "সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটী ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুকপ্রফুল্ল-মুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ়পুরুষ চাপকান পরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন।"

দেশের কর্ম্মপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করে কর্ম্মী, কিন্তু ভাবধারা নিয়ন্ত্রিত করে কবি। বঙ্কিমচন্দ্র সেই কবি।

১২৪৫ সালের আষাঢ় মাসে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩০০ সালের চৈত্রাবসানে পঞ্চান্ন বৎসর মাত্র বয়সে তিনি লোকান্তরে যাত্রা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র অমর, তাঁহার মৃত্যু নাই। তাঁহার দেশপ্রীতি জাতিকে উদ্বুদ্ধ এবং সকল জিনিষ বিচার করিয়া গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীকে বিচারশীল করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্কিম-যুগ আজো শেষ হয় নাই। তিনি শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই, সাহিত্যিক সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ইয়োরোপের দাম্ভিকতা সহ্য করিতে পারিতেন না। তর্কযুদ্ধে হেষ্টি সাহেবকে যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন তাহাতে বজ্রাগ্নি ছিল।

"Mr. Hastie's attempt to storm the inner citadels of the Hindoo religion forcibly reminds us of another heroic achievement—that of the redoubted Knight of La Mancha before the windmill."

হেষ্টি হিন্দুধর্ম্মকে আঘাত করিয়াছিল।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

মানুষ সকল জিনিষ জানিতে চায়। প্রকৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়া সে বিজ্ঞান রচনা করে, জীবনের রহস্য ভেদ করিয়া সে দর্শন রচনা করে। তাহার চিরকৌতূহলী মন যখন অতীতের প্রতি নিবদ্ধ হয় তখন ইতিহাসের অন্বেষণ সুরু হয়। মন যখন প্রশ্নমুখর হইয়া উঠে আমরা তাহার যথাসাধ্য উত্তর যোগাই, নহিলে অপরিতৃপ্ত জিজ্ঞাসা আমাদের অন্তরকে উৎপীড়িত করে, অস্থির করে, আকুল করে।

* * *

আমরা দূরের দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি, যাহা বহুদিন বিগত হইয়াছে তাহার পরিচয় গ্রহণে অধীর হইয়া উঠি। সুদূর অতীত আমাদের কল্পনাকে উদ্রিক্ত করে। যাহা সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, তাহার কাহিনী আমাদের কৌতূহলী চিত্তকে একান্তভাবে আকর্ষণ করে। মহেঞ্জোদাড়োর কথা, প্রাচীন মিশরের কথা সুমেরিয়ার কথা শুনিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই।

* * *

ভারতবাসী বাহিরের ইতিহাস রচনায় চিরকাল উদাসীন। অন্তরের কথা জানা হইয়া গেলেই হইল, বাহ্য ব্যাপার তাহার কাছে কৌতূহলের বস্তু নয়।

* * *

পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্ঘাতে এই বিমুখতা কাটিয়াছে। আজ বাহ্য ইতিহাসের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। মহেঞ্জোদাড়ো ভারতবাসীর আবিষ্কার। প্রকৃত ইতিহাস-রচনার উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে।

* * *

দূর অতীতের কথা ভাবিয়া আমরা যেন নিকট অতীতকে ভুলিয়া না যাই। গত একশত বৎসরের কথা আমরা কতটুক জানি? আমাদের কাছে একশত বৎসরের পুরাতন কথা সহস্রবর্ষ পূর্ব্বের কাহিনীর ন্যায় রহস্যাবৃত হইয়া গেছে। সে কথা জানিবার জন্য যে প্রচেষ্টা, যে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহার অভাব ছিল। সম্প্রতি সেই চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদ পত্রের পুরাতন ফাইল ঘাঁটিয়া এই একশত বৎসরের ইতিহাসের উপকরণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাঁহার 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রকাশ করিয়াছেন। এখানি প্রথম খণ্ড। বারান্তরে ইহার পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিব।

—আগামী সংখ্যায়—

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষের

'জল'

দিনপঞ্জী

২৯শে ডিসেম্বর—গত বুধবার পাঁচ ঘণ্টাকাল আলোচনার পর বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিগণ বিপুল সংখ্যাধিক্যের ভোটে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে "আর আলোচনা চালাইয়া কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।" কারণ পূর্ব্বে মুসলমানদিগকে সাময়িক ভাবে ব্যবস্থাপক সভায় কতকগুলি সর্ত্তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দানের প্রস্তাব তাঁহারা সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু বুধবারের সভায় তাঁহারা সে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন।

২৯শে, পুনা—ডাঃ সুব্বানারায়ণের বিল সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষায় মহাত্মা গান্ধী অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তাঁহার অনশনব্রতগ্রহণের সঙ্কল্প স্থগিত রাখিয়াছেন।

৩১শে—শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কর্ণেল বীকনে জানাইয়াছেন যে রঞ্জন রশ্মি পরীক্ষার ফলে তাঁহার অন্ত্রে কিছুই খারাপ দেখিতে পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার ফুসফুসে প্রদাহ দেখা গিয়াছে।

৩১শে—গ্রেট ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিহার করিবার পর এ পর্য্যন্ত ভারত হইতে ১,০৫২,৭৬০,১৯০ টাকার স্বর্ণ বোম্বাই হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

১লা জানুয়ারী—ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষে স্যার প্রভাস চন্দ্র মিত্র, কে-সি-এস-আই ও স্যার অতুল চাটুজ্যে, জি-সি-আই-ই উপাধি লাভ করিয়াছেন।

২রা জানুয়ারী—জিওলজিকেল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডাইরেক্টর ডাঃ এল-ফারমোয়ের সভাপতিত্বে পাটনায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

সকল প্রকার সদ্য অথবা দূষিত বেদনা
এবং ক্ষতাদির জন্য
অমৃত প্রলেপ
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

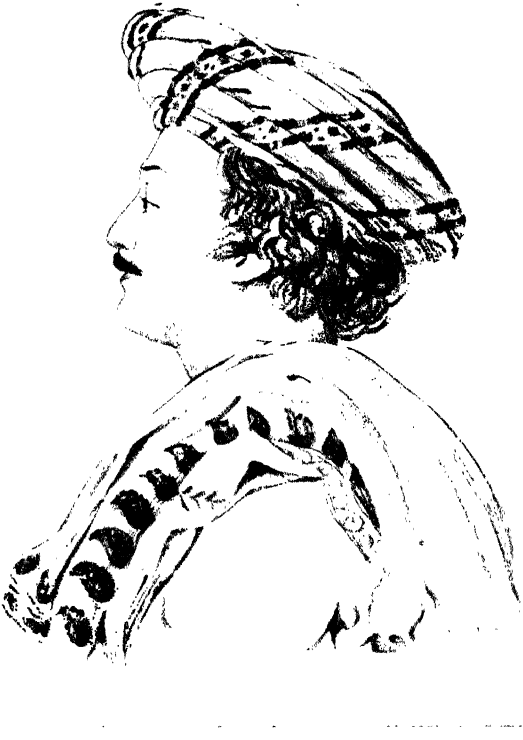

রাজা রামমোহন রায়

ছোট গল্প

১ম বর্ষ] ১লা মাঘ ১৩৩৯ [২৭শ সংখ্যা

সীতা-তীর্থ

শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু

মাসটা যদি শ্রাবণ হয়, সময়টা যদি হয় রাত্রিকাল, আকাশ যদি অবিরাম বর্ষণধারায় ক্লান্তি মানিতে না থাকে এবং ইহাদের সকলের সঙ্গে যদি যুক্ত হয় এমন একটি মানব-মন যে প্রিয়াকণ্ঠলগ্ন হইয়া গভীর নিদ্রামগ্ন থাকার চেয়ে কান পাতিয়া বৃষ্টিমুখর স্তব্ধতাকে হৃদয়ের অতি কাছাকাছি অনুভব করাকেই কাম্যতর মনে করে, তবে জীবনধারা বোধ করি সহজেই ব্যাহত হইতে পারে, দিনের বেলাকার জগতের তাৎপর্য্য মনে হয় অতি সহজেই বদ্‌লাইয়া যায়। এটাই যে খুব ভালো, মনের এই অবস্থাই যে সব চেয়ে লোভনীয় সে

কথা বলি না। কাল সকালবেলা যখন চায়ের বাটি ও খবরের কাগজ লইয়া বসিব তখন আমেরিকা ও ইয়োরোপ রণ-ঋণ লইয়া যে গোলকধাঁধা পাকাইয়া তুলিয়াছে সেই কাহিনীই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া পড়িব জানি ; বন্দীগৃহে অখ্যাত কোন্ হতভাগ্যের মৃত্যু-সংবাদ পড়িয়া মন ক্ষণকালের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিবে তাহাও সত্য, এবং আজিকার এই শ্রাবণ-নিশীথের জলসিক্ত অন্ধকারগুলি অপরিচয়ের লজ্জায় কোথায় তলাইয়া যাইবে তাহাতেও সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু তবু তাই বলিয়া আজিকার এই অনুভূতিগুলাকে মিথ্যা বলিয়া দূরে ঠেলিয়া দিতে পারিতেছি না ;—কলেজের এক-ঘেয়ে অধ্যাপনার বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি হইতে, প্রত্যহের ছোট বড় হাস্যকর দাবী হইতে আমার আপনার আমিকে যে ক্ষণকালের জন্য এই অপরিচিত আত্মীয়ের দিকে সম্প্রসারণ করিয়া দিতে পারিতেছি, ইহাকে আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়াই মানিয়া লইতেছি।

এমন সময়—তেমন কিছু আশ্চর্য্যজনক ঘটনা নয়—এমন সময় শুক্লা আসিয়া আমাকে একরকম ঘেঁসিয়াই জানালার ধারে দাঁড়াইল।

এমন সময় কোনো কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকার মতো বিশ্রী অবস্থা অতি অল্পই আছে। কহিলাম, "এত রাত্রে বিছানা ছেড়ে এলে যে ?"

"তুমি এত রাত্রে জান্‌লায় দাঁড়িয়ে যে?"—এই প্রতিপ্রশ্নই স্বাভাবিক অবস্থায় আশা করিতে পারা যাইত। কিন্তু স্বাভাবিক হইয়া থাকার প্রতি শুক্লার আস্থা নাই, প্রতিদিনই তা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। যাহা ঘটে নাই বা ঘটিতে পারে না তাহাই সে ঘটিতে দেখিতেছে, যাহা সে প্রতিদিনকার জীবনে পাইতেছে তাহাতে কোনো স্বাদ পায় না, তাহা সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে না।

শুক্লা বলিল, "আমি ঘুমুতে পারছি না, আমার দম আটকে আসছে।"

বলিলাম, "পাখাটা খুলে দেব?"

শুক্লা বলিল, "না, তার চেয়ে বরং শাঁখাটা খুলে দাও।"

কহিলাম, "বলতো ভেঙ্গে দিতে পারি। রাত বেশি নেই, এত অল্প সময়ের মধ্যে হিন্দু-বিবাহের শাঁখা খোলা সহজ নয়।"

শুক্লা গ্র্যাজুয়েট—তার ব্যথা অশেষ, কথা অনেক। সুতরাং মুহূর্ত্ত চিন্তা না-করিয়াও সে অতি সহজে কহিতে পারিল, "যে-শাঁখা পরতে লাগে এক মিনিট তা খোলা এমন প্রাণান্তকর ব্যাপার—সমাজের এই ব্যবস্থাকে তুমি ভালো বলে মানতে চাও!"

শ্রাবণের ধারা আর গানের মতো আসিয়া কাণে লাগিতেছে না। কহিলাম, "শুক্লা, এর উত্তর কি আমার দেবার, এবং এত রাত্রে?"

শুক্লা কোনো উত্তর দিতে পারিল না ; জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওর দুইহাত ধরিয়া টানিয়া কহিলাম, “পাগলামি কোরো না শুক্লা, শোবে চল।”

শুক্লা বসিয়া পড়িল, আমাকেও বসিতে হইল। তারপর যা ভাবিয়াছিলাম তাই। “আমি আর পারছি না, আমাকে বাঁচাও” বলিয়া মাথা নত করিল। চুলগুলি আমার পায়ে লোটায়। যে-চুল সমস্ত বালিশ ঢাকিয়া শয্যাতল সুগন্ধাকুল করিবার কামনা লইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেই চুলের স্থান আমার পদপ্রান্তে নহে। মাথাটা তুলিয়া কহিলাম, “দেখ শুক্লা, তোমরা দুটি জিনিষ জান,—হয় মাথার উপরে চড়া নতুবা পায়ের তলায় পড়া। কিন্তু আমি এর কিছুই চাইনি। আমি চেয়েছিলুম—অনেক দিন বলেছি, আবার বলি—আমি চেয়েছিলুম কাঁধের পাশে কাঁধ রেখে সমান হয়ে তোমাকে দাঁড়াতে। শুধু তুমি নয়, বাংলা দেশের প্রত্যেক বিবাহিত মেয়েকেই এই রকম সোজা দাঁড়াতে দেখতে ইচ্ছে করে।”

যে এত কথা জানে, সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে পারে, সেই শুক্লা সহসা একেবারে বোবা হইয়া গেল ; এমন একটা অদ্ভুত অস্পষ্ট রোদনতুল্য ধ্বনি করিতে লাগিল যাহাকে ঠিক কান্না বলা চলে না। একবার একটি বোবা ভিক্ষুণীকে ঘোড়ার গাড়ীর নীচে পড়িয়া আহত হইতে দেখিয়াছিলাম, তাহার কথা মনে পড়িল।

সেই শুক্লা !

পরদিন চায়ের টেবিলে দেখিলাম শুক্লার কী সুন্দর সহজ কর্ম্মালোকিত মূর্ত্তি! কে বলিবে সে কয়েক ঘণ্টা আগেই শাঁখা খুলিবার জন্য শুদ্ধতা-সুন্দর আমার চিত্তকে আঘাত করিয়াছিল? কোন্ ভোরে সে উঠিয়া গিয়াছে টেরই পাই নাই—রোজই সে এমনি ভোরে উঠে। এই সবেমাত্র দিনের আরম্ভ, কিন্তু ইহারি মধ্যে সমস্ত বাড়ীটা স্নানান্তের শুক্লাসুন্দরীর মতো নির্ম্মলোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—কোথাও এতটুকু অপরিচ্ছন্নতা নাই, প্রত্যেকটি জিনিষ নিজ নিজ জায়গায় গৃহস্বামিনীর আদেশ মাথায় লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে,—প্রত্যেকই নির্ব্বাক অথচ প্রত্যেকেই শুক্লার উতপ্ত স্পর্শে প্রাণপূর্ণ। শুক্লার চিত্তটি ডাকঘরের মতো খোপ-কাটা। সর্টার যেমন দিল্লীর থলিতে ঢাকার চিঠি ঢুকিতে দেয় না, শুক্লাও তেমনি এ-ঘরের জিনিষ ও-ঘরে, এ-জায়গার জিনিষ ও-জায়গায় যাওয়াকে গৃহিণীপণার কলঙ্ক বলিয়াই জানিয়া রাখিয়াছে। আমরা ধনী নই, জিনিষও আমাদের প্রচুর নয়, কিন্তু ঘরকন্নার সামান্য যে-কয়টি সামগ্রীকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সামান্য সংসার-নীড়টুকু রচিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিরই থাকিবার একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে। কাহারো অমনোযোগিতা বা ইচ্ছাকৃত ত্রুটিতে তাহাদের স্থানচ্যুতি ঘটিলে শুক্লার তিরস্কার অনিবার্য্য ধারায় বর্ষিত হইতে থাকে—অপরাধী পরিচারকই হোক আর গৃহস্বামীই হোক। বাহির হইতে ক্লান্তি-পীড়িত হইয়া ঈজি-চেয়ারে বসিয়া-বসিয়াই

জামাটা খুলিয়া হাতলে রাখিয়া দিলে শুক্লা তাড়াতাড়ি সেটিকে আলনায় লট্‌কাইয়া দেয়,—এই সতর্ক ক্ষিপ্রতা আমাকে যেন কঠিন ভাষায় তিরস্কার করিতে থাকে। এতটা আমার এলোমেলো মন বরদাস্ত করিতে পারে না, বলি, "ঘরগুলো বড়ো বেশী গোছানো, বড়ো বেশী পরিচ্ছন্ন, শুক্লা।"

শুক্লা বলে, "কেন, তোমার কি চোখ টাটাচ্ছে ?"

আমি বলি, "চোখ ঠিক টাটায় না, তবে অনেকখানি আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ'তে হয়।"

"কিসের আনন্দ ?"

"জিনিষ খুঁজে না-পাবার আনন্দ।"

চোখের তারা দুটাকে অদ্ভুতভাবে ঘুরাইয়া শুক্লা বলে, "বটে ! এগারোটা যখন বাজো-বাজো হয়েছে, পাঁতলুন্ পরেছ, সার্ট গায়ে দিয়েছ, টাইটা আঁটতে যাবে, এমন সময় যদি হাতের কাছে ফ্রণ্ট-ষ্টাড্‌টা না পাও তখন কেমন লাগে শুনি।"

আমি বলি, "দু-একটা দৃষ্টান্ত আমিও দিতে জানি।"

"যথা ?"

"এই ধরো, ঘুম থেকে উঠেছি, মেঘলা দিনের আলো-ভাঙা অন্ধকার মনটাকে সজল ক'রে তুলেছে ; হঠাৎ মনে হোলো এই মুহূর্ত্তে কবিতা লেখা ছাড়া অন্য কিছুই আর করা চলে না ; এ-ঘর ও-ঘর, এ-জামার পকেট সে-জামার পকেট হাতড়ে বেড়াচ্ছি কিছুতেই কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না ; অবশেষে তুমি সেখানে বঁটি পেতে জোড়-আসনে বসে

বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে কুমড়ো কাটছ, সেখানে আমি কলমের খোঁজে উপস্থিত হলুম, তোমার নিটোল ঘাড়ের উপরকার চুলগুলি সরিয়ে আমার কলম খুঁজতে লাগলুম; তুমি মিথ্যা রাগ ক'রে বললে, এইখানে বুঝি তোমার কলম রাখবার জায়গা? সকালবেলাই দুষ্টুমি সুরু করলে? আমি বললুম, দাও শিগ্‌গির কলম, কবিতায় পেয়েছে; তুমি বললে, কলম নেই; আমি বললুম, কলম না থাকে আর কিছু দাও; তুমি আর কিছু দিলে, এই হোলো আমার কবিতা লেখার শেষ।"

শুক্লা শিশুর মতো খল্‌-খল্‌ করিয়া হাসিয়া ওঠে, বলে, "অতএব?"

"অতএব, কলমটা যে-জায়গায় থাকে ঠিক সে-জায়গায় মাঝে-মাঝে না থাকলে তেমন কোনো ক্ষতি হয় না।"

শুক্লার জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে বসি নাই; সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বে পিত্রালয়ে তাহার দিন কেমন করিয়া কাটিয়াছে সে-কথা অলিখিতই থাকুক। শুধু এইমাত্র বোধ করি বলা চলে যে এই ছয় বছরের বিবাহিত জীবনে শুক্লাকে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, নিজের মনের মতো করিয়া একটি ঘর বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার পিতৃগৃহে বহু পূর্ব্বেই জন্মলাভ করিয়াছিল। সব মেয়েরই অল্প-বিস্তর

এ-আকাঙ্ক্ষা জন্মে জানি, কিন্তু শুক্লার যে-বয়সে হইয়াছিল গিরীন্দ্র বসু নিশ্চয়ই তাহাকে 'নর্ম্ম্যাল' বলিবেন না। শুক্লার পুরাণো ডায়ারি-খাতায়ও এর পরিচয় আছে চুরি করিয়া মাঝে মাঝে খাতাগুলি আমি পাড়য়া থাকি। বি-এ পড়িবার সময় শুক্লা মেয়েদের হোষ্টেলে থাকিত। সেই সময়কার ডায়ারিতে অনেক খবর পাওয়া যায়। এই মুহূর্ত্তে হঠাৎ একটা খাতা খুলিলাম, লেখা আছে "পূজো ঘনিয়ে আসছে, ছুটির আর বেশি বাকি নেই। রমা ও সুকৃতি এরি মধ্যে চলে গেছে—বাবা-মা'র সঙ্গে পশ্চিমে বেড়াতে যাবে। ওদের ফূর্ত্তি আর ধরে না। প্রভা, শান্তা, সুনীলা—ওদের আর পায় কে! ওরা যার যার স্বামীর কাছে যাবে। প্রত্যেক ছুটিতেই যায়। ওদের প্রত্যেকেরই একটি একটি ঘর আছে যেখানে ওরা দেহ মন ছড়িয়ে দিতে পারে। সে-ঘরে যখন তারা থাকে না তখনো তারা সেখানে থাকে; সেই স্বর্গের চারদিক ঘিরে তাদের মন দূর থেকেও গুঞ্জন করতে থাকে। সেখানে সবার জন্যে তাদের অনেক দিনের প্রস্তুতি—তাদের নিস্তেজ অবকাশগুলি সেখানকার চিন্তাদ্বারা রঙ্গীন ও মুখরিত হয়ে ওঠে। ওরা লেখাপড়া করে একজন বিশেষ লোকে খুসি হবে ব'লে, আমি করি আমার নিজের খুসির জন্যে। কিন্তু নিজের জন্যে কিছু ক'রে সত্যি সত্যিই কি সুখী হওয়া যায়?"

সুতরাং শুক্লা যেদিন আমাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি গৃহকে একান্ত আপনার বলিয়া জানিতে পারিল, সেদিন

তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ এবং সমস্ত দেহ তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল, এ অনুমান নিঃসন্দেহে করিতে পারা যায়। প্রথম পাঁচ-ছয় মাস তাহার কাটিল নূতন জীবনের সঙ্গে খাপ্ খাওয়াইতে, নববধূকে সংসারের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য বিবাহের পরও যাঁরা বিবাহ-বাড়ী ত্যাগ করিলেন না তাঁদের মন যোগাইয়া চলিতে। যে-হেতু একটি নর ও একটি নারীর মিলনের মধ্যে সমস্ত সমাজের শুভাশুভ প্রচ্ছন্ন আছে. যেহেতু নর-নারীর প্রেমের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া পরসুখ-অসহিষ্ণু নামহীন সমষ্টিগত একটা মূঢ় মঙ্গলবুদ্ধি অনাহূত কাঙ্গালের মতো হাত পাতিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে, সেই-হেতু আমাদের জীবন-যাত্রার নিয়ন্ত্রণ-ভার আমাদের হাতে নাই, সেই-হেতু আমাদের বিবাহিত জীবনের সুখ-দুঃখের পাখা কতদূর পর্য্যন্ত মেলিতে পারিবে তাহা নির্দ্দেশে করিবার লোকের অভাব ঘটে না। তবে সান্ত্বনার কথা এই, পৃথিবীর কোনো ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী হয় না; সুতরাং দুর্য্যোগ আমাদের কাটিল এবং স্বাধীনতার সূর্য্যলোকে শুক্লা একদা পরম উল্লাসে ডানা সাপ্টাইবার প্রচুর অবকাশ পাইল। শুক্লার ডায়ারিটা আবার খোলা যাক্ঃ

"মাসি-শ্বাশুড়ী চলে গেছেন কদিন হোলো। এখন আমি একা। এ-কদিন বেশ ভালো করে অনুভব করতে পারছি এ বাড়ী আমার। স্বামীকে পাচ্ছি আরো নিবিড় ক'রে এখন তিনি শুধু রাত্রিবেলাকার স্বামী নন, শতকর্ম্মমুখরিত

দিনের বেলাকারও সঙ্গী। তাঁর মন ও সময়ের উপর এখন আমার যে অধিকার তা অখণ্ড, মনে হচ্ছে যেন অপরিমেয়। মাসি-শাশুড়ি নেই, সংসারের নানা খুঁটিনাটি কাজে অনেক ক্রটি আমার হয়, স্বামীর কাছে তার জন্য মৃদু বকুনিও খাই, কিন্তু এ আমার বড় ভাল লাগে। একটানা আদর ভালো লাগে না। এ কয়দিন বেশ অনুভব করতে পারছি ভালোয় মন্দে মিশিয়ে মানুষের জীবন, এবং মানুষের সমগ্র জীবনকে যে গ্রহণ করতে পেরেছে সেই সত্যিকার পাওয়া পেয়েছে।”

আরো ছ-মাস পরের ডায়ারিতে ঃ

“লেকের কাছে একটা নতুন দোতলা বাড়ীতে আমরা উঠে এসেছি। স্বামীর কলেজ খুব দূর হোলো, যেতে আসৃতে অনেকটা সময় যায়। তা যাকৃ। তিনি যখন কলেজের কাজ শেষ ক'রে দক্ষিণের খোলা বারাণ্ডায় ঈজি-চেয়ারটায় পা ছড়িয়ে দেন, দক্ষিণের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাঁর দেহ-মন জুড়োতে থাকে, আর আমি ছোট একটা টেবিলে আমাদের চায়ের জোগাড় করতে থাকি, তখন—স্বামী বলেন—জীবনের অন্য সব অভাব অসুবিধের কথা একেবারে ভুলে যাই। বাড়ীটার দিকে আমি অনেক সময় মুগ্ধের মতো চেয়ে থাকি। এটা যেন আমাদের দুজনের জন্যেই তৈরি হয়েছিলো। কোন্ এঞ্জিনিয়ারের মাথা থেকে এ বাড়ীটা বেরিয়ে এসেছে ? সন্ধান পেলে একদিন নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াব। ...অনেকগুলি

নতুন আস্‌বাব-পত্র এসেছে, স্বামীর এখন ঐদিকে মন। আমি খুব যত্ন ক'রে ঘষি, মাজি, সাজাই। ওরা আমার অবসরের সাথী। ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ আমার প্রিয়, আমার সত্ত্বার অঙ্গ। তারা আমার কাছে মূল্যবান, খুব মূল্যবান, কেন না এদেরকে একান্তই আমার ক'রে পেয়েছি, একটি সুগোপন সুখ-নীড় রচনার অপরিহার্য্য উপকরণ এরা। মধুর, মধুর! অল্প একটু জায়গার মধ্যে আমার চিত্তকে প্রসারিত ক'রে দিতে পারছি অন্তহীন পরিসরের মধ্যে, কোনো বাধা নেই ভুবনে।

মোটর চলে, তেল ফুরাইয়া যায়। আবার তেল লইতে হয়, আবার চলিতে থাকে। শক্তি ফুরাইবার আগে এঞ্জিনের নিতে হয় কয়লা এবং জল। কিন্তু আনন্দের গাড়ীতে তেল ফুরাইয়া গেলে কোথায় পাওয়া যাইবে তেল ? পাঁচ বছরের অশ্রান্ত গতিবেগ আজ শান্ত হইতে চাহিতেছে—কি উপায়ে তাহাতে গতি সঞ্চারিত করিব তার কৌশল তো জানি না, না আমি. না শুক্লা। স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি একেবারে থামিয়া যাইবার আর বেশি দেরি নাই। জীবনের বেগ যখন কমে তখন পিছনের দিকে চাহিতে ইচ্ছা করে। আজ পিছনে তাকাইয়া দেখিতেছি পাঁচ বছরে যেন পাঁচ যুগের পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। আনন্দের খর-স্রোতে প্রত্যহের কী পরিপূর্ণ

অবগাহন! অপর্য্যাপ্ত অনুভব. নীরন্ধ্র পরিতৃপ্তি, নিখিল-বিস্মৃত উপভোগ, নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গীতস্রোত—এসবের আয়ু, আজ ভাবিতেছি, যদি পাঁচটি বৎসর মাত্রই হয় তাহাতেই বা ক্ষতি কি?

* * *

রবিবারের অলস মধ্যাহ্ন—গরম পড়ি পড়ি করিতেছে। এমন দিনের এমন সময় মনের গ্রন্থিগুলা আল্‌গা হইতে চায়। ঠিক এই দিনেরই উপযুক্ত একখানা বই হাতে আসিয়া পড়িয়াছে, ডাঃ ক্যাল্‌ভার্টনের The Bankruptcy of Marriage, ঠিক দিনে ঠিক বই।

বিছানার ধারে শুক্লা আসিয়া বসিল, একটানে বইটা বিছানায় ফেলিয়া দিয়া কহিল, "কী খালি রাত্‌ দিন বই! ভালো লাগেনা বাপু!"

"বইটা তোমারো পড়া উচিত, শুক্লা," কথাটা বলিয়া ফেলিয়া মনে হইল, না বলিলেও পারিতাম।

"কেন কেন, শুনি?"—চট্‌ করিয়া জবাব আসিল।

"সোনার খাঁচা থেকে মনের বনে উড়ে যাবার সন্ধান হয় তো বা বইটার মধ্যে পেতে পার।"—জবাব দিতে আমার দেরি হইল না।

সকালবেলা আমাকে একটা কড়া কথা শুনাইয়াছিল, শুক্লা বুঝিল এ তাহারই প্রত্যুত্তর। একটা বিপুল অসরল

অট্টহাসি দিয়া এই অস্বস্তিকর ঘটনা-সংস্থানটাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া শুক্লা কহিল, "ও-সব বিলিতি ঢং ছাড়। দেউলে! দেউলে হওয়া অসম্ভব। তুমিও পার না, আমিও পারি না।"

"কী পারি তবে আমরা?"

"বিবাহের ব্যাঙ্করাপ্টসি অপ্রমাণ ক'রে দিতে পারি।"

"কি ক'রে?"

"ভালোবেসে।"

"বড়ই নাটুকে শোনাচ্ছে, শুক্লা। আর একটা শব্দ ব্যবহার কর।"

"আচ্ছা, কচ্ছি। হেসো না।"

মুখে হাসি টানিয়া এবং কিছুক্ষণ থামিয়া, "ব-ব-ব-ব'লব? হাঁসপাতালে যেয়ে।"

এইবার আমার হাসিবার পালা। একটা বিপুল অসরল অট্টহাসি।

শুক্লা গম্ভীর হইয়া কহিল, "না সত্যি সত্যি বলছি, দোহাই তোমার। আজও কথাটাকে রোজকার মতো হেসে উড়িয়ে দেবে?"

বাধ্য হইয়া গম্ভীর হইতে হইল। "কী হবে অপারেশন ক'রে? ছেলে নাই বা হোলো।"

শুক্লা গায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল, আমার চিবুকে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিল, "রাগ ক'রোনা যদি সত্যি কথা বলি! বাড়ীটা বড় খালি খালি লাগে।"

"তুমিও রাগ ক'রোনা যদি সত্যি কথা বলি।"

"করব না। কী? বল?"

"এতে একটা কথা প্রমাণ হয়ে গেল।"

"কী?"

"Bankruptcy of Marriage."

* * *

শুক্লার জন্য আজকাল অনেকটা নিশ্চিন্ত। অবসর এখন আর তাহার চিত্তের উপর পাথরের মতো চাপিয়া থাকে না, অন্তত থাকা উচিত নয়। দিনরাত্রিগুলি এখন যেমন খুসি কাটাইতে থাকুক তাহার নূতন সঙ্গীকে লইয়া।

কয়েকদিন যাবৎ মাসীমা আসিয়াছেন, আমার সংসারে কায়েম হইয়া থাকিবার জন্য। সম্প্রতি তিনি বিধবা হইয়াছেন। মেসমহাশয় তাঁহার পত্নীর জন্য পবিত্র বৈধব্য এবং আন্তরিক অশ্রুজল ভিন্ন অন্য কিছুই জীবনের এপারে রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সে যে আমারি অপরাধ তা স্বীকার করিতেছি। বলিতে ভুলিয়াছি, আরো কিছু আমার স্বর্গগত মেশমহাশয় রাখিয়া গিয়াছেন। সতেরো বছরের একটি অশিক্ষিতা অনূঢ়া গ্রাম্য মেয়ে।

দেখাইবার মতো নয়, কিন্তু দেখিবার মতো মেয়ে এই সতেরো বছরের গ্রাম্য টগর। বেশ ডাগর, দেখিয়া কেহ ভাবিতে পারিবে না যে এর বয়স সতেরো নয়—অকৃত্রিম গ্রাম্যতা সতেজ অবিমিশ্র পেগানিজম্। নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিম বাধ্য-বাধকতাকে সে থোড়াই কেয়ার করে। নিজের যথেষ্ট-বিকশিত দেহ সম্বন্ধে তাহার কোনো সঙ্কোচ নাই। ঘড়ি ধরিয়া বিশেষ বিশেষ সময়ে আহার করার মধ্যে কী যে এমন তাৎপর্য্য আছে তাহা তার বোধের অতীত। নোংরা আর ফর্সা কাপড়ে শুধু রং-এর পার্থক্য ছাড়া আর কি যে আছে সে তা' জানে না। স্নানের সময় প্রতিদিন সাবান ব্যবহার করিতে বলিলে সে শুক্লাকে অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করে আর স্নানের ঘর হাসিতে কাঁপাইয়া তোলে। আমার বিদেশী ছবির অ্যালবামগুলি আলমারি হইতে বাহির করে, আমারি বিছানায় শুইয়া শুইয়া সেগুলি দেখে, কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখি নগ্ন নারীমূর্ত্তির পাতা খুলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত আরামে আমারি বালিশে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। অনেক অনুনয় করিয়াছি, "টগর, এ-সব আলমারি জিজ্ঞেস না ক'রে খুলোনা।" টগর বোবার মতো চুপ করিয়া থাকে, উত্তরের কোনো চেষ্টাই করে না। শুক্লা বারণ করিয়াছে, উত্তরে বলে, "আমার দাদার জিনিষ, আমি ঘাঁটবনা তো তুমি পরের ঘরের মেয়ে তুমি ঘাঁটবে?" মাসিমা অনেক ভৎ'সনা করিয়াছেন, টগর তা আমলের মধ্যেই আনে না। দৌড়

ধাপ, ছুটাছুটি, উপর-নীচ—টগরের অবাধ অকুণ্ঠিত ব্রীড়াবিহীন উলঙ্গ গ্রাম্যতা আমার তো বেশ ভালোই লাগে। ও যেন বিশেষ-যত্ন-ক'রে-তৈরি-করা চাট্‌নীর মতো কৃত্রিম নাগর জীবন যাত্রার বিস্বাদকে দূর করিয়া দিতে পারে।

প্রথম প্রথম শুক্লারও খুব ভালো লাগিয়াছিল। শিশু-বিহীন গৃহের বর্ণহীন রিক্ততা মাতৃত্বকামনাপীড়িত শুক্লার হৃদয়কে শুষিতেছিল। টগরকে পাইয়া সে যেন বাঁচিল। নিজেই গরজ করিয়া তাহার শিক্ষার ভার লইল। সেলাই শিখাইবে—একরাশ পশম, রেশম, সূতা আর প্যাটার্ণের বই আসিয়া হাজির। শিঙ্গারে অনেকদিন পর নূতন করিয়া আবার হাত পড়িল। বই খাতা পেন্সিলও যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত। টগরের জন্য আলাদা করিয়া একসেট মাথার তেল, সাবান, পাউডার ক্রীম, এসেন্স—শুক্লা নিজেই মার্কেট হইতে আনিল। ইস্কুল-যাত্রীর মতো একটা রুটিনও তৈরী হইল, টগরের দিন-রাত্রি তাহাতে ছক্ করিয়া কাটা।

শুক্লার উৎসাহ দেখিয়া আমার মস্তবড় একটা দুর্ভাবনা দূর হইল। মনের শূন্যতার মতো ভারি বোধ করি আর কিছুই নাই। শুক্লা এইবার হাল্কা বোধ করিবে। মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার মতো বড় কাজ আর কী আছে আমার জানা নাই। শুক্লা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কাজে হাত দিয়াছে।

কিন্তু টগর যে জন্ম-অমানুষ। বছর প্রায় ঘুরিয়া আসিয়াছে। মাসিমার চোখের জলে ভাঁটা পড়িয়াছে। তাঁর

শাশুড়ীপণার ঝাঁঝ কথায় ও কাজে শুক্লার মারফৎ মধ্যে মধ্যে আমার কাণেও আসিয়া লাগে। টগর তার বইগুলি কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে, সেলাইয়ের উপকরণগুলি কোন্ ঘরের কোন্ কোণে পড়িয়া আছে কে জানে?

থিয়েটার হইতে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে রাত্রি প্রায় একটা। মাসীমা মেয়েকে সঙ্গে লইয়া ঘুমাইতেছেন। শুইবার ঘরে ঢুকিয়া দেখি শুক্লা মেঝেয় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে জিনিষপত্র সব ছড়ানো। শুক্লাকে ডাকিলাম, সাড়া নাই। কতকক্ষণ ফিট্ হইয়াছে কে জানে। জল, হাওয়া, স্মেলিং সল্ট শুক্লা চোখ মেলে না। একটা প্রাণায়ামিক প্রক্রিয়া জানিতাম, এইবার তা কাজে লাগিল।

ভোর হইতে বেশী বাকি নাই। শুক্লার ঘুম ভাঙ্গিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাল রাত্রে কী হয়েছিল?"

শুক্লা বলিল, "টগর না করে লেখা পড়া, না করে সংসারের কোনো কাজ। সেই-কথা তোমার মাসীকে বলছিলাম। বলছিলাম, আমার শরীরটা আজ বড় খারাপ লাগছে। আপনার মেয়েকে বলুন না আপনার রাত্রের জল-খাবারটা তৈরি করুক। উত্তরে তোমার মাসি যা বললেন তা নাই বা শুন্‌লে।"

"বল না?"

খানিক চুপ করিয়া শুক্লা বলিল, "মার কথা শুনে মেয়ে এলো ধেয়ে। এসেই তোমার বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমি

বললুম, টগর বিছানা থেকে ওঠ। চট্‌কালে তোমার দাদা শুতে পারেন না। টগর বললে, তোমার পাতা বিছানায় শুতে দাদার ব'য়ে গেছে। তুমি ভাব তাঁর আর শোবার জায়গা নেই? ব'লে কি বিশ্রী কতকগুলো কথা বললে। আমি হাত ধরে টেনে ঘরের বার করে দিলুম, ও ফের ছুটে এসে জিনিষপত্র ফেলে ছুঁড়ে—যাক কি হবে আর বলে!... ওগো তুমি ওদের এখান থেকে পাঠিয়ে দাও, ঐ বুড়ী আর ঐ ডাইনী মেয়ে...”—উচ্ছ্বসিত আবেগ, বাধাহীন কান্না।

একটু শান্ত হইলে কহিলাম, “তুমিও যদি অবুঝ হও, তবে আমি কোথায় যাই বলতো! নিরাশ্রয় অসহায় মাসী, কোথায় তাঁকে রাখতে পারি? আমার মা থাকলে তাঁকে আজ ফেলতে পারতুম? আর টগর যদি আমার নিজের বোন হ'ত?”

“এমনি করে বিঁধলে তাঁদের সম্বন্ধেও আজ এই কথাই বলতুম। কিন্তু অত শত আমার ভাববার শক্তি নেই আজ।”

“অধীর হোয়োনা শুক্লা; তুমিই ভেবে দেখ এত বড় নিষ্ঠুর পৃথিবীতে এই দুটি আশ্রয়হীনাকে ভাসিয়ে দিতে কোনো পুরুষে পারে?”

“না পার বল, আমিই ভেসে যাই।”

এ-কথার কি কোন উত্তর আছে?

*　　*　　*

কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, মাসীমা দরজায় দাঁড়াইলেন। আরম্ভ হইল, "বাবা অতুল, অনেকদিন থেকে একটা কথা বলব বলব কচ্ছি কিন্তু মুখে আর আনতে পারিনি। বড় দুঃখে এসেছিলাম তোর আশ্রয়ে, খুব শিক্ষা হোলো। কি বউ ঘরে এনেছিলি! বিবিয়ানা করবি কর্, কোনো রকমে চোখ বুজে এককোণে পড়ে থাকি, কিন্তু কাণে তো আর তুলো দিতে পারিনে।"

মাসীমা বলিয়া চলিলেন, "চুপ ক'রে সব সহ্য ক'রে যাচ্ছি—তোমাদের পরি, খাই, সহ্য করতে হবে বৈকি। কিন্তু আমার সোমত্ত মেয়ের নামে বদ্‌নাম রটালে কি করে আর তোমার বাড়ীতে তিষ্ঠাই বল? আমাকে বাবা কাশী পার করে দাও—" মাসীমা হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

শুক্লা ছুটিয়া আসিল, "বটে, বদনাম রটাই! বলব সত্যি কথাটা, ডাকব চাকরকে, দেখাব তবে চিঠিগুলো?"

"মুখ সামলে কথা বোলো, বৌমা!"

"মুখ আপনার নিজেরই সামলান্, আর তার আগে নিজের ধিঙ্গি মেয়েকে সামলান্। লজ্জা করে না চেঁচাতে? নিজের মেয়েকে দিয়ে—"

"শুক্লা, ছোটো লোকের মতো চেঁচিয়ো না। শুধু বই-ই পড়েছ, মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে শেখনি। যাও

এখান থেকে।”--অনেক কাল এমন করিয়া ধৈর্য্য হারাই নাই।

বাড়ী ফিরিতে অনেক রাত হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়াই দেরী করিয়াছি। এখনো কি বাড়ীর ভেতরকার আবহাওয়া বিষকৃষ্ণ কোলাহল উদ্গীরণ করিতেছে? স্বার্থ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সংঘর্ষ কি এত রাত্রেও স্তিমিত হইয়া আসে নাই?

মাসীমা ঘুমাইতেছেন। টগর আমার খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে. আমারি বিছানায় শুইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিষ্পাপ শিশুর মতো কি সুন্দর সর্ব্বস্ব-সমর্পিত ঘুম! “টগর”—ঘুম ভাঙ্গে না। আরো জোরে “টগর”--কি নিবিড় নিদ্রা। গা ঠেলিতে হইল।

“তোমার বৌদি কোথায়?”

“চলে গেছে, ঐ চিঠি রেখে গেছে।”

“আচ্ছা, তুমি ঘরে যাও।”

“আপনার খাবার।”

“সে আমি ঠিক দেখে নেব, তুমি যাও।”

“আমি সব ঠিক করে দিয়ে যাই না?”

“তুমি যাও টগর, আমি দরজায় খিল দেব। লক্ষ্মীটি, তোমার দুটি হাতে ধরি, অবাধ্য হ’য়ো না।”

ছোট চিঠি। বেশী দূর তো যায় নাই—গড়পার ভাইয়ের বাড়ীতে। মাসীকে বাড়ী হইতে বিদায় না করিলে সে আর আসিবে না। অতিশয় স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল প্রস্তাব।

ভাবিতেছি কাল একবার শিশির ভাদুড়ীর 'সীতা' দেখিতে যাইব।

প্রসঙ্গ

সাহিত্য

দেশের ইতিহাসের সহিত সাহিত্যের ইতিহাসকে সচরাচর একই সূত্রে গাঁথিবার চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু তাহার ফলে, সাহিত্যের প্রতি সুবিচারের পরিবর্ত্তে অনেক সময় অবিচারই করা হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। উদাহরণ-স্বরূপ এখানে আমাদের দেশের কবির গানের উল্লেখ করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—ইঁহারা উভয়েই কবির গানের প্রতি বিরূপ। যে সহানুভূতি দিয়া রবীন্দ্রনাথ 'ছেলে ভুলানো ছড়া'র সমালোচনা করিয়াছেন, সে সহানুভূতির বিন্দুমাত্রও তাঁহার 'কবি-সঙ্গীত'-আলোচনায় ব্যয়িত হয় নাই। যে সময় 'কবি-সঙ্গীতে'র সৃষ্টি হয়, সে সময়ে দেশের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব অসম্ভব মনে করিয়াই যেন রবীন্দ্রনাথ ও হরপ্রসাদ কবির গানের নিন্দা করিয়াছেন! এখানে বলিয়া রাখা ভাল, বাঙ্গালা নাটকও এইরূপ বিচার-বিভ্রাটে পড়িয়া এখনও অনেকের কাছে হেয় হইয়া আছে। ইঁহাদের ধারণা, ইংলণ্ডের যে অবস্থায় সেক্সপীয়র আবির্ভূত হন, সে অবস্থা না আসিলে কোনও দেশেই প্রকৃত নাটক জন্মায় না। কাজেই '**প্রফুল্ল**' ও '**বিল্বমঙ্গল**' প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর

নাটক হইয়াও ইঁহাদের নিকট এখনও 'যাত্রা' আখ্যা পাইয়া ধন্য হইতেছে !

* * *

দেশের ইতিহাসের সহিত সাহিত্যের ইতিহাসের যে কোনও সম্পর্ক নাই. অবশ্য এমন কথা বলি না। তবে দেশের সাময়িক অবস্থার উপরেই যে সেই দেশের সাহিত্যের উন্নতি অবনতি শুধু নির্ভর করে, এমন কথাও স্বীকার করিতে পারি না। ১৮৫৭ অব্দের ভয়াবহ সিপাহী যুদ্ধে সমগ্র দেশ যখন আন্দোলিত, তখনই বাঙ্গালা দেশে নাট্যাভিনয়ের জোর আয়োজন চলিয়াছিল, সেই বৎসরেই কলিকাতার ৪৬টি বাঙ্গালা ছাপাখানা হইতে ৫, ৭১, ৬৭০ খণ্ড পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই কথারই উল্লেখ করিয়া ৺রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় বলেন, "আমাদের দেশের গ্রন্থকারগণ ভয়াবহ বিপ্লবের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধনে যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন।" সিপাহী যুদ্ধের সময়ের কথা ছাড়িয়া দিই, বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমাদের উক্তি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। দলে দলে কর্ম্মী জেলে আবদ্ধ হইতেছে, গোলটেবিলের উপর গোলটেবিল বসিতেছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতেছে, দারিদ্র্যের পেষণে দেশবাসী দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, অথচ সহরের বুকে নিত্য-নূতন থিয়েটার ও বায়স্কোপের মন্দির

মাথা তুলিয়া উঠিতেছে. মাসিক ও সাপ্তাহিকে দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে. 'জয়ন্তী'র জের উত্তরোত্তর বাড়িতেছে !

* * *

আসল কথা, সাহিত্যের রাজত্ব স্বতন্ত্র। দেশের ইতিহাসের মাপকাঠি দিয়া ইহার ইতিহাস মাপা চলে না। রসের ইহা ভাণ্ডার। রসিকের সঙ্গেই ইহার কারবার। রাজা-রাজড়ার মরণ-বাঁচনের সঙ্গে ইহার উৎকর্ষ-অপকর্ষের যোগ নাই। চরকসংহিতার এক স্থানে আছে.—

"প্রকৃতি ছয় প্রকার—জাতিগত, বংশগত. দেশগত, কালগত, বয়ঃক্রমগত ও প্রত্যেকের আত্মগত। এইরূপে প্রত্যেক পুরুষের বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহ, তাহাদের জাতি, বংশ, দেশ, কাল. বয়স ও আত্মগুণানুসারে তদনুরূপ হইয়া থাকে।"

—"তত্র প্রকৃতির্জাতিপ্রসক্তা কুলপ্রসক্তা চ দেশানুপাতিনী চ কালানুপাতিনী চ বয়োঽনুপাতিনী চ প্রত্যাত্মনিয়তা চেতি। এতাবজ্জাতিকুলদেশকালবয়ঃপ্রত্যাত্মনিয়তা হি তেষাং তেষাং পুরুষাণাং তে তে ভাববিশেষা ভবন্তি।"

এই ছয় প্রকৃতিই হইতেছে রস বা আর্টের উৎস। সুতরাং সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে হইলে ঐ ছয়টা প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উহা লিখিতে হইবে।

মাইকেল, বঙ্কিম, ও গিরিশের জীবন-কথা বাদ দিয়া যদি কেহ তাঁহাদের রচনা-সৌন্দর্য্যের উৎস খুঁজিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি বিফলমনোরথই হইবেন। সকল সাহিত্যের বা আর্টেরই দুইটা দিক আছে, একটা তাহার ভাবের দিক ও আর একটা তাহার রচনা-কৌশল। এই দুইটা দিকের কথা বলিতে হইলে শুধু সাহিত্যের রচনার পারম্পর্য্যটুকু দেখাইলে চলিবে না। ক্রমবিকাশের হিসাব-অনুযায়ী বঙ্গসাহিত্যে 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের অঙ্কুরের সন্ধান করিতে গেলে, ঈশ্বর গুপ্তের বা রঙ্গলালের রচনার মধ্যে তাহা পাওয়া যাইবে না। তাহার রহস্য জানিতে হইলে মাইকেলের ঐ ছয় প্রকৃতির শরণ লইতে হইবে। কথাটা পরে আরও ফুটাইয়া বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

চিত্র ও চরিত্র

রামমোহন

প্রাচ্য ও পুরাতন যুগ অবসান লাভ করিয়াছে, নূতন যুগ তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নব্যভারতের সেই আসন্নপ্রায় যুগ মূর্ত্ত হইয়া রামমোহন-রূপে আবির্ভূত হইল। যাহা আছে নির্ব্বিচারে তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। যাহা নাই তাহা আনিবার জন্য তিনি আত্মশক্তি নিয়োজিত করিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহার নিকট ভয়ের কারণ হইল না। অনেক পরে লোক যাহা হইবে, নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া তিনি তাহা পরখ করিয়া দেখিলেন। প্রচলিত আচার সংস্কার এবং বিশ্বাসে তিনি আঘাত করিলেন, ইংরেজিতে সুশিক্ষিত হইলেন, বিলাতযাত্রী হইলেন। আর একদিকে তিনি শ্রদ্ধা-সহকারে শাস্ত্র ও ধর্ম্ম চর্চ্চা ও আলোচনা করিলেন, বাংলা ভাষায় গ্রন্থ লিখিলেন, পাদ্রীদের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ স্মরণীয় বৎসর। এই যুগসন্ধিকালে মহাত্মা রামমোহনের জন্ম। ঠিক একশত বর্ষ পূর্ব্বে একষট্টি বৎসরের কর্ম্মময় জীবন যাপন করিয়া ১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিলাতের ব্রিষ্টলে তিনি দেহত্যাগ করেন।

রাজা রামমোহন ছিলেন—সুশ্রী, দীর্ঘকায়, বলবান্ পুরুষ। তাঁহার অসাধারণ শারীরিক শক্তি, তাঁহার অপূর্ব্ব মনীষার পরিপোষক ছিল।

'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—

শতাব্দী-পূর্ব্বে নবযুগের যে ভাব রাজার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, শতবর্ষ পরে কাব্যের ছন্দে প্রকাশিত কবির সেই ভাব আমাদের সুপরিচিত হইয়া গেছে।

তাঁহার ধর্ম্ম জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় এবং হৃদয়ের ঔদার্য্যে সেকালে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল·না। সকল ধর্ম্মাবলম্বীই তাঁহাকে আপনার জন মনে করে।

তাঁহার প্রশান্ত, গভীর এবং বিশাল ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার পরিচয়ে একদা প্রতীচ্য মনীষারাও বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছিল।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়, এ কথা আজ অনেকের নিকট অজ্ঞাত।

রামমোহন রায়ের "একজন অনুগত শিষ্য" প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখিয়া গিয়াছেন,

"তাঁহার শরীরে যেমন বল, মনেও তেমনি বীর্য্য ছিল। তাঁহার উজ্জ্বল জ্ঞানে যাহা কিছু প্রকাশ পাইত, তিনি স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা তাহা তন্ন তন্ন করিয়া লোকদিগকে বুঝাইয়া

দিতেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও পাণ্ডিত্য-বলে লোকে যেমন তাঁহাকে সম্মান করিতে বাধ্য হইত. তিনি তেমনি আপনার সুশীলতা, নম্রতা ও বিনয়গুণে তাঁহাদের মনের প্রণয়ভাব আকর্ষণ করিতেন। তিনি বলবিক্রমে, বিদ্যাবিনয়ে, জ্ঞানবুদ্ধিতে একজন অসামান্য পুরুষ ছিলেন।... তিনি যেমন ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিতে উৎসাহী ছিলেন, তেমনি লোকের উপকার সাধনে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি একদিকে যেমন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন, আর একদিকে তেমনি সহমরণ নিবারণ করিয়াছেন।”

সাময়িকী ও অসাময়িকী

ভাবি, বাংলার গৌরব গান করি। ভয় হয়, এই ভারতীয়তার দিনে পাছে কেহ প্রাদেশিক মনে করে। মনে করে জাতীয়তার নিবিড়তায় এ বুঝি একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারে নাই। বুঝি চোখের কাছের জিনিষকে বড় দেখায় বলিয়া এ ভুলিয়া গিয়াছে যাহা ছোট বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার বৃহত্বে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

* * *

শুনি না কি বাঙালী ভাবপ্রবণ। সে ভাবে না, ভাবের স্রোতে ভাসিয়া যায়। হৃদয়াবেগের দ্বারা পরিচালিত না হয়, ইতিহাসে এমন জাতি দেখি নাই, পৃথিবীতে এমন মানুষ দেখি নাই। জানি না, নব মনোবিদ্যা এমন অমানুষ কল্পনা করিতে পারিয়াছে কি না।

* * *

বাঙালী প্রবল হৃদয়াবেগের অধিকারী। ইহাতে লজ্জার কথা নাই। কিন্তু তাহার ধীশক্তি হৃদয়ের নিতান্ত পিছনে পড়িয়া থাকে না। স্রোতকেও সে নিয়ন্ত্রিত করে। সকল আন্দোলনকে সে আপনার মত করিয়া গড়িয়া লয়।

* * *

স্বদেশী আন্দোলনের কথা মনে পড়ে। সেদিন বাংলা যাহা ভাবিয়াছিল, তাহার পরদিন এবং তাহার পরের পরদিন অবশিষ্ট ভারত তাহা ভাবিবার অবসর পাইয়াছিল। দশ বৎসর পূর্ব্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মহাত্মাজীর নির্দ্দেশকেও নবরূপ দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

* * *

বাংলায় বৈদিকধর্ম্ম আসিয়াছে, বৌদ্ধধর্ম্ম আসিয়াছে, জৈনধর্ম্ম আসিয়াছে। কোন ধর্ম্মই তাহাকে বিজিত করিতে পারে নাই। সকল ধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে সে ত্রুটি করে নাই—কিন্তু বিশ্বাস রাখিয়াছে আত্মধর্ম্মে। এই সকল ধর্ম্মের হিংসা অহিংসার নীতি তাহার মনকে হয়ত কখনও কখনও সাময়িক ভাবে বিচলিত করিয়াছে, কিন্তু অখণ্ড মানবধর্ম্মের প্রত্যয় হইতে সে বিচ্যুত হয় নাই।

* * *

বাংলার কপিল প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরকেও অসিদ্ধ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। চিন্তার জগতে বাঙালীর মত স্বাধীন কেহ নাই।

দিন-পঞ্জী

৬ই জানুয়ারী, পাটনা—অদ্য বৈকাল ৪টার সময় বাঁকিপুর জেল ফটকের সম্মুখে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তিনি আচার্য্য কৃপালনীর মামলার শুনানী শুনিবার জন্য তথায় গিয়াছিলেন।

৮ই জানুয়ারী, বোম্বাই—বিশ্ববিশ্রুত মনিষী জর্জ্জ বার্নাড শ' তদীয় পত্নী সহ বিশ্ব ভ্রমণে বাহির হইয়া 'এম্প্রেস্ অব ব্রিটেন' নামক জাহাজযোগে অদ্য প্রাতে বোম্বাইয়ে পৌঁছিয়াছেন। তিনি সংবাদপত্রপ্রতিনিধিদের নিকট কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে ইউরোপে মাত্র একজন রাজনৈতিক আছেন, তাঁহার নাম মুসোলিনী, ইটালীতে যদি কোন গোলযোগ হয়, লোকে তাঁহার শরণ লইতে পারে। আপনাদিগকে হয়তো ছয় জন মুসোলিনী বাহির করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে অভিমত কি—জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন, বহুযুগ পরে একটী গান্ধীর আবির্ভাব হয়; তাঁহার মত লোক যে বর্ত্তমান যুগেও আছেন, তাহা জানিতে পারা একটা আনন্দের কথা।

৯ই জানুয়ারী, বোম্বাই—নর্থব্রুক গার্ডেনে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গার ফলে ২ জন মুসলমান ও ১ জন হিন্দু নিহত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ২৬ জন জখম হইয়াছে। এই নর্থব্রুক গার্ডেনেই ৬ মাস পূর্ব্বেকার দাঙ্গার প্রধান কেন্দ্র ছিল।

১০ই জানুয়ারী, লাহোর—লাহোর মুক্তি ফৌজের সদর আফিসে মুক্তি ফৌজের অধিনায়ক জেনারেল হিগিন্স ও তাঁহার পত্নীকে অভিনন্দিত করা হয়। উত্তরে তিনি বলেন, ভারতে এমন একদিন আসিবে যেদিন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবে এবং এদেশের নির্য্যাতিত জনগণের উন্নয়ন ঘটিবে আমি সেইদিনে বিশ্বাসী।

৯ই জানুয়ারী, মিলান—মিঃ মাৎসুয়োকা জনৈক সংবাদিকের নিকট বলেন যে খোলাখুলি সকল কথা জাতিসঙ্ঘে প্রকাশ করাই তাঁহার অভিপ্রায়, জাতিসঙ্ঘকে তিনি বলিয়া দিবেন, "সুদূর প্রাচ্যে শান্তি স্থাপন করিতে চাহিলে আপনারা জাপানের দাবী সমর্থন করুন, কিন্তু বিশৃঙ্খলা ও জগদ্ব্যাপী অগ্নিকাণ্ডই যদি আপনাদের কামনা হয়, তাহা হইলে চীনকে সমর্থন করিবেন।"

সকল প্রকার সদ্য অথবা দূষিত বেদনা
এবং ক্ষতাদির জন্য
অমৃত প্রলেপ
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

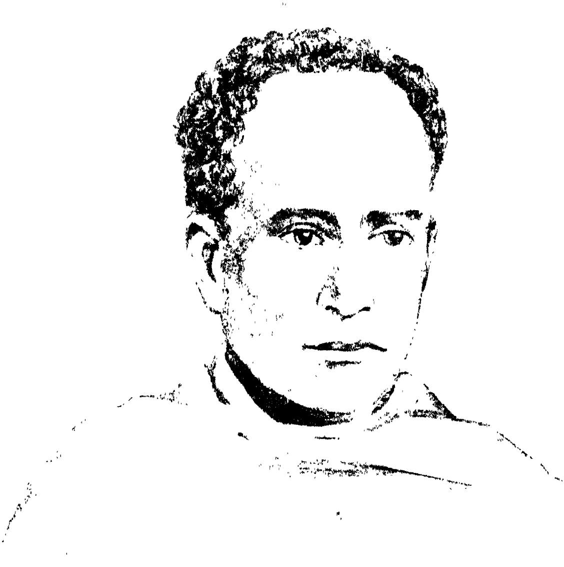

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ছোট গল্প

১ম বর্ষ]   ৮ই মাঘ ১৩৩৯   [২৮শ সংখ্যা

পারিবারিক ব্যাপার

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

তীর্থে যাইতেছিলাম,—বেশী দূরে নয়, বাংলার বাহিরেও না, নবদ্বীপে।

সঙ্গে মোট-ঘাট অল্প। কিন্তু শীতকাল বলিয়া লেপ-তোষক-বালিশে বিছানার বোঝা বিপুল হইয়া উঠিয়াছে।

কুলীর সহিত বচসা সারিয়া হাওড়া ষ্টেশনের গেট পার হইয়া প্ল্যাটফরমে পড়িতেই দেখি সম্মুখে রমণীকান্ত একমুখ হাসি লইয়া দাঁড়াইয়া। আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদের অবসর না দিয়াই সে আগাইয়া আসিয়া আমার হাত হইতে সুটকেশ একরূপ ছিনাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, "কোথায় চলেছেন, দাদা?"

"নবদ্বীপ।"

"ওখানে যে আমার মামার বাড়ী—"

"তুমিও যাচ্ছ বুঝি?"

"না; এসেছিলাম ষ্টেশনেই একটা বিশেষ কাজে।"

ভাবিলাম, শিক্ষিত বাঙালী যুবকের চাকরীর সন্ধান ছাড়া আর কি বিশেষ কাজ থাকিতে পারে? হেঁয়ালীর সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম,

"সুবিধে হ'ল কিছু?"

"না, সে যাক—কিন্তু আপনারা গিয়ে উঠবেন কোথায়?"

"কেন, আশ্রমে?"

"আশ্রমে? ওঁদের নিয়ে?"

কার্য্যটির মধ্যে অসঙ্গতির কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। বলিলাম, "কতলোক যাচ্ছে—"

"তাদের কথা ছেড়ে দিন—" বলিয়াই সে সম্মুখে একখানি আধখানি কামরা দেখিয়া আমার অনুমতি না লইয়াই তাহাতে মোট-ঘাট তুলিতে সুরু করিল।

পিছনে তাকাইয়া দেখি, আমার স্ত্রী ও শ্যালিকা প্ল্যাটফরমের উপর দিয়া শত আঁখির নির্লজ্জ শরাঘাতে জর্জ্জরিত দেহে ধীরপদক্ষেপে চলিয়া আসিতেছেন। গাড়ী ছাড়িতে তখনও বিলম্ব ছিল। কাজেই বিচলিত হইলাম না। এবং তাঁহারা আসিয়া পড়িলে খালি বেঞ্চিখানি দখল করিয়া তিনজনে বসিয়া পড়িলাম। রমণীকান্তও আর দাঁড়াইল না,

আমার শ্যালিকাটির দিকে এক ঝলক দৃষ্টি হানিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কোথায় গেল, একথা জানিবারও অবসর দিল না। হয়ত তাহার সেই 'বিশেষ কাজ' সহসা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে ভাবিয়া আমি তীর্থের চিন্তায় তলাইয়া গেলাম।

'ঠিক কতক্ষণ পরে মনে পড়িতেছে না, সঠিক সময়টা না বলিতে পারিলেও গল্পটির কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই, গাড়ী ছাড়িবার দ্বিতীয় ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে রমণীকান্ত ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির। মুখে সেই হাসি। ভিতরে উঠিয়া আসিয়া বলিল, "চলুন --"

"কোথায় ?"

"নবদ্বীপ।"

"তাই ত যাচ্ছি। কিন্তু তুমিও যাবে ?"

"এই যে টিকিট কিনে নিয়ে এলুম—"

বলিয়াই আমার স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "বৌদি, জানলাটা বন্ধ করে দেব।"

গাড়ী তখন চলিতে সুরু করিয়াছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বুকের ভিতরটা অবাধ কাঁপিতেছিল। কিন্তু হাওয়ার ঠিক মুখে বসিয়াছিল, আমার শ্যালিকা। জ্যেঠার হইয়া সে-ই ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল— হাঁ। পাড়ার ছেলে সে ; তাহাকে আবার লজ্জার কি থাকিতে পারে ? স্কুলে যাইবার পথে আমাদের রোয়াকে অথবা গলির মোড়ে তাহার সহিত দিনে অন্ততঃ দুইবার দেখা হয়।

রমণীকান্ত ক্ষিপ্রহাতে জানালাটি বন্ধ করিয়া আমার পাশে আসিয়া বসিল।

কিন্তু পাড়ার হইলেও তাহার সহিত এতকাল কথাবার্ত্তা যাহা বলিয়াছি খুব অল্প। তাই বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে খারাপ ধারণা মনে পোষণ করি নাই। এখন দেখিলাম বেশ ছেলে—ভদ্র, মিশুক ও পরোপকারী। নবদ্বীপে গিয়া তাহারই আগ্রহে ও অনুরোধে তাহার মামার বাড়ী উঠিলাম। তাঁহারও সৎলোক। বাড়ীখানিও বেশ। গঙ্গার ধারে, সহরের একপ্রান্তে। খাতির-যত্ন ও আদরে এরূপ আপ্যায়িত করিলেন যে তিনদিনের অধিক কাটাইতে পারিলাম না। তিনদিন পরেই ফিরিয়া আসিলাম, রমণীকান্তও আসিল। এই তিনদিনে সে যেন আমাদেরই একজন হইয়া গেছে।

তাহার পর হইতে সে আর গলির মোড়ে দাঁড়ায় না, রোয়াকেও বসে না, একেবারে অন্দরে যাতায়াত সুরু করিল। আমার শ্যালিকা কুমারী নীলার সহিত তাহার আলাপ একটু বেশী। তাহার পাঠে সাহায্য করে। আমার স্ত্রীও তাহাকে স্নেহ করেন। সেও তাঁহার ছোট-খাট ফরমাজ খাটে, খুসী-মনে দু'একটী সওদাদি করিয়া দেয়। আবার ভদ্র ঘরের ছেলে। চেহারা সুন্দর না হইলেও কোন মেয়ে খারাপ বলিবে না। তবে সম্প্রতি বি-এ পাশ করিয়া বেকার।

* * *

যাহা হউক, তীর্থে ঘুরিয়া আসিবার পর তিনটি মাস চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে আমার গৃহের কোথাও কোনরূপ পরিবর্ত্তন চোখে পড়ে নাই। পূর্ব্বের নিয়মেই যেন সব চলা-ফেরা করিতেছে। আমিও যথানিয়মে অফিস যাতায়াত করি, আহারে বসি ও নির্দ্দিষ্টস্থানে নিদ্রা যাই। এমন সময়ে আমার এক দূর সম্পর্কের ভ্রাতা পুনা হইতে কলিকাতায় বদ্‌লী হইয়া আসিল। রক্তের সম্পর্ক দূর হইলেও তাহার প্রতি আন্তরিক টান অল্প ছিল না। সে আমাদেরই পরিবারে মানুষ। খুব চালাক-চতুর চট্‌পটে ছেলেটি। পুরুষোচিত বলিষ্ঠ চেহারা, সরল দৃষ্টি। সে সৈন্যবিভাগে চাকরী করিতেছিল। কর্ম্মসূত্রে পঞ্জাবের সুদূর সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্তানের মরুপর্ব্বতবেষ্টিত ছাউনীগুলিতে কয়েক বৎসর কাটাইয়াছে। এ-কারণ, তাহার গল্পের থলিটি ছিল পরিপূর্ণ। আর সেগুলি যেমন নূতন, তেমনি মনোহারী। তাহাকে আর কোথায়ও যাইতে দিলাম না, অন্দরের একখানি ঘরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। গৃহিণী তাহাকে পাইয়া খুসী হইয়া উঠিলেন। নালার সহিত আলাপ জমিতেও দেরী হইল না। রমণীকান্তের সহিত আলাপ হইয়া গেল। সকলেই যেন সুখে কাল কাটাইতে লাগিল।

কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, ঐ দুই যুবকের মন কোথায় যেন চোট খাইয়া মারমুখী হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কাহাকেও সহ্য করিতে পারে না।

গৃহিণীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, নীলার মুখের ভাব গোপনে লক্ষ্য করিলাম, সন্তোষকেও একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম, তথাপি এরূপ হইবার কারণটি অনুধাবন করিতে পারিলাম না। পরিশেষে স্থির করিলাম, ইহা লইয়া আর মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই। এবং সেইরূপ নির্ব্বিকারও ছিলাম, কিন্তু একদিন উভয়ের তর্কযুদ্ধ ও নীলার আচরণ তাল-গোল পাকাইয়া এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করিল, যাহাতে আর উপেক্ষা করা চলিল না।

সেইদিন সন্ধ্যায় নীলার ঘরে তর্ক-শব্দে উৎকর্ণ হইয়া থাকিতে থাকিতে শুনিলাম রমণীকান্ত বলিতেছে, "তুমি একটা solid idiot—"

সন্তোষ উত্তর করিল, "জ্ঞানে তুমি একটা কুলীরও ছোট—"

ইহাতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। শোনা ছিল, নিঃসম্পর্কীয়া অনূঢ়া কিশোরীর সম্মুখে যুবকদের দেহে ও মনে মত্তহস্তীর বলের সঞ্চার হয়। ফলে একটা হাতাহাতি হইতে পারে। ত্রস্তে শয্যাত্যাগ করিয়া ঘরের বাহির হইতে দেখি, নীলা মুখে আঁচালচাপা দিয়া হাসিতে হাসিতে বারন্দা দিয়া পাকশালার দিকে যাইতেছে। সম্ভবতঃ উভয়ের জন্য দুই পেয়ালা তপ্ত চায়ের জোগাড়ে। তাহাকে দাঁড় করাইয়া চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঝগড়া কিসের ?"

সে বলিল, "সন্তোষদার গল্প—"

"একটা গল্পের জন্য বাড়ী মাথায় ? এ যে ডুয়েল লড়বার পূর্ব্বাবস্থা—"

সে আর দাঁড়াইল না। তাহার ঘরে যোদ্ধাদ্বয়ও নীরব। কিন্তু পদশব্দে বুঝিলাম মিনিটখানেক পরে রমণীকান্ত একটু বেগেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। চা বোধ হয় প্রস্তুত ছিল। দেখিলাম, দুই হাতে সুধা-পাত্রের মত দুটি পেয়ালা লইয়া নীলা তাহার ঘরের দিকে যাইতেছে। এবং ক্ষণিক পরেই কাণে আসিল, "কান্তদা ? কান্তদা কোথায় ?"

"জানি না—"

"কি লোক বাবা ; মুখের চা নষ্ট হ'ল ?" বলিতে বলিতে নীলা একটী পেয়ালা হাতে করিয়া পাকশালার দিকে ফিরিয়া গেল। সেখান হইতে আর তাহাকে নিজের ঘরের দিকে যাইতে দেখিলাম না।

ইহার পর দুই দিন রমণীকান্তকে আমরা গৃহে দেখি নাই। এই কয় মাসের মধ্যে ঘটিকাযন্ত্রটি চলার পথে বার কয়েক শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু রমণীকান্তের আসা-যাওয়ায় কোন প্রকার শৈথিল্য বা ভ্রম ঘটিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা ছিল না। এ কারণ, কিঞ্চিৎ কৌতুহলী হইয়া পড়িলাম। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা দমন করিয়া সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইবার জন্য বহির্দ্বারে পা দিতেই

পিয়ন একখানি পত্র দিল। উল্টাইয়া দেখি নীলার। কে লিখিয়াছে, কোথা হইতে আসিয়াছে, জানিবার কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিল। কেননা জানা ছিল আমার শ্যালিকাটির আত্মীয়-স্বজন কেহ কোথায় নাই, সে একান্ত আমারই। এমনি সুদৃশ্য নীল লেফাফায় গুরুভার পত্র তাহার নামে কোন দিন আসিতে দেখি নাই।

নীলারই নিকট হইতে সন্ধানে জানিলাম, লিখিয়াছে রমণীকান্ত। আমাদেরই রমণীকান্ত, সাতখানি বাড়ী ছাড়াইয়া গলির মধ্যেরই একখানি দ্বিতল বাড়ী হইতে এই গুরুভার পত্রখানি লিখিয়াছে। আর ইহাতে তাহার হৃদয়ের সকল ভার ন্যস্ত করিতেও সঙ্কোচ বোধ করে নাই। ইহাও নিশ্চিত, ঠিক দিব্য না হইলেও সহসা আমার দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। দেখিতে পাইলাম, শ্রীমান্ সন্তোষকুমারের মনোযোগও নীলার প্রতি গভীর—এত গভীর যে তাহাকে ব্যাকুলতা বলা যাইতে পারে। এধার বুঝিলাম, দুইটি তরুণ হৃদয় যে পাষাণগাত্রে চোট খাইয়াছে, তাহা আমার শ্যালিকা নীলা।

কেতাবী প্রেমে আমি ভীত হই না, তাহা আমার পরিচিত। কিন্তু ঘরোয়া প্রেম কখনও দেখি নাই। ইহার সম্বন্ধে নানারূপ ভয়ের কথা শোনা ছিল। ভীত ও চঞ্চল

হইয়া উঠিলাম। কি উপায়ে ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব, ঐ দুইটি আহত তরুণ হৃদয়কে কি করিয়া সাম্‌লাই!

ব্যস্ত হইয়া গৃহিণীর শয্যাপ্রান্তে গিয়া বসিলাম। কিছুদিন হইতে তিনি শয্যাশায়ী। ব্যাপারটি বুঝিয়া সহজ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি জানি।"

জানে! অথচ আমায় জানায় নাই।

"জানালে তুমি কি করতে?"

"তুমিই বা কি করেছ?"

"নীলাকে একদিন বলেছিলাম—"

"তারপর?"

"মেয়ে কেঁদে-কেটে অস্থির!"

অফিসের সাহেবের রক্তচক্ষু অপেক্ষা নারীর চক্ষুজলকে আমি অধিকতর ভয় করি। উহার মাত্র কয়েক বিন্দুতে হৃদয় গলিয়া, সাম্রাজ্য ভাসিয়া যাইতে পারে।

"তাহলে ব্যাপারটা কিছু নয়? কি বল?"

"বল্‌ব কি? তুমিই বোঝ—"

আমাকে তিনি বিষম বিপাকে ঠেকাইলেন। এ বিষয়ে আমার জ্ঞান নিতান্ত অল্প। রমণীর মন আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কেবল একটিমাত্র নারীকে আমি কয়েক বৎসর যাবৎ নানা ভাবে দেখিয়া আসিতেছি—তিনি আমার স্ত্রী। এ সত্য স্বীকারে আমার বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তি ও পৌরুষ যদি

ক্ষুণ্ণ হয়, তবুও বলিতেছি, তাঁহার সমগ্র মনটিকে আমি বুঝিতে পারি নাই। আবার এক নারী-হৃদয় বুঝিবার অনুরোধ!

চট করিয়া মাথায় একটি উপায় আসিল; বলিলাম, "ওকে বোর্ডিংয়ে পাঠানো যাক্—"

"তাহলে আমার যেটুকু সাহায্য হয় তাও আর হবে না—"

পুরুষের সাংসারিক জ্ঞান কত সামান্য। মনে মনে লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। অতঃপর কি করিব? একবার ভাবিলাম, তাহার বিবাহ দিয়া এ-দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি।

গৃহিণী বলিলেন, "যদি ওদের কারুকে ওর পছন্দ হ'য়ে থাকে? বড় মেয়ে—"

সত্যই ত! পরিণামে কি একটা আত্মহত্যা দেখিতে হইবে?

বলিলাম, "কাকে পছন্দ সে কথাটাই বলুক্—"

"সে বল্‌বে না—"

"তবে কে বল্‌বে?"

গৃহিণী এ-কথার কোন জবাব না দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। আমিও সেখানে বসিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। আর মাস কতক পরেই উহার ম্যাট্রিক পরীক্ষা। অন্ততঃ সেই অবধি কোনরূপে যদি টাল সামলাইয়া চলা যায়! একটা সুবিধার কথা এই দেখা যাইতেছে যে

রমণীকান্ত আর আসে না এবং হয়ত আসিবেও না, হৃদয়-বোঝা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। একা সন্তোষ। তাহাকে চোখে চোখে রাখিলেই চলিবে। নীলাকে আমি স্বয়ং পড়া বলিয়া দিব। এই সতর্কতার কঠিন নিষ্পেষণে প্রেম যদি কোথাও গজাইয়া থাকে, আপনিই মরিয়া যাইবে। তাহার শুষ্ক ডাল-পাতা কয়টি একটু মানসিক অসুবিধার কারণ হইলেও তাহার পাশে আবার নূতন চারা গজাইলেও ভয় নাই। ততদিনে একটা সুরাহা করিতে পারিব।

এইরূপ চিন্তা করিয়া মন শান্ত হইল। পরিতোষ পূর্ব্বক আহারাদি সারিয়া নিদ্রা গেলাম।

পরদিন শনিবার। সকাল সকাল অফিসের ছুটি। বেলা তিনটার মধ্যে বাড়ী পৌঁছিতেছি, সন্তোষও আমার সঙ্গে আসিতেছে। কিন্তু প্রবেশপথেই এ কি? রমণীকান্ত ও নীলা! কোথায় যাইতেছে।

বায়স্কোপে!

সন্তোষের মুখের দিকে এক পলক তাকাইয়া দেখিলাম, একেবারে রক্তহীন। আমার রক্ত উষ্ণ হইয়া মাথায় চড়িল। আমার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া, আমার গৃহ হইতে, আমারই শ্যালিকাকে লইয়া যাইতেছে। হউক না রমণীকান্ত পাড়ার ছেলে; নবদ্বীপে তাহার মামার বাড়ীতে তিনদিন

কাটাইয়া আসিয়াছি বলিয়া তাহাকে ঐ অধিকার দিতে হইবে? মনে মনে "খবরদার" বলিয়া গৃহিণীর নিকট ছুটিয়া গেলাম।

তিনি স্নেহগদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, "কোথাও যায় না, যাক্ না একটা দিন—"

হতাশ হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িলাম। হায় মূঢ় গৃহবাসী! কেতাবের পাতা হইতে প্রেম নামিয়া আসিয়া সংসারময় ছড়াইয়া পড়ে না, ঘর হইতেই তাহা কেতাবের পাতায় উঠে। যাক্, আমি আর কিছু বলিব না। সে আমার ভগ্নী নয়, কন্যা নয়, শ্যালিকা মাত্র। যাহা হয় হউক।

মনে মনে ফুলিয়া ঘণ্টাখানিক পরে সন্তোষকে ডাকিতে গিয়া দেখিলাম, ঘর শূন্য! ভৃত্য বলিল, অফিস হইতে আসিয়াই বাবু বাহিরে গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, সে বলিতে পারে না।

সে বলিতে না পারিলেও আমি বুঝিতে পারিলাম। তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প করিলাম, হউক গৃহিণীর অসুবিধা, নীলাকে বোর্ডিংয়েই পাঠাইব, ম্যাট্রিক পাশ করাইব, তাহার পর আই-সি-এসের সহিত উদ্বাহ দিয়া ঐ দুই হস্তীমূর্খকে কাঁদাইয়া ছাড়িব।

কিন্তু সাতদিনে তাহারাই আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তখন গরমের ছুটি। সন্তোষও ছুটি লইয়াছে।

কলিকাতায় যত বেড়াইবার জায়গা, বাগান, সিনেমা ছড়ানো আছে, সবগুলি তিনজনে একত্রে বেড়াইতে সুরু করিল।

গলি-বৃদ্ধ যতীন খুড়োও আমাকে গোপনে ডাকিয়া গুটিকয়েক হিতোপদেশ দান করিলেন, যাহা শুনিয়া, মুখে ঈষৎ কৃতজ্ঞতার হাসি ধরিয়া রাখিলাম বটে কিন্তু কাণ দুটি জ্বালা করিতে লাগিল। বলিলাম, "শীগ্‌গিরই ব্যবস্থা করছি।"

এবং আর অপেক্ষাও করিতে হইল না. সপ্তাহখানেকের মধ্যেই গরমের ছুটি ফুরাইয়া গেল। নীলাকে বোর্ডিংয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম। কিন্তু তাহাতেও রমণীকান্তের আসা-যাওয়া কমিল না। নীলার শূন্য ঘরে আসিয়া সে চুপচাপ বসিয়া থাকে ; তাহার টেবিলের উপর অব্যবহার্য্য খাতাপত্র ও বইগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করে। সন্তোষের মুখও ম্লান। সে একটি পিতলের বাঁশী কিনিয়া আনিয়া একা ঘরে শয্যায় শুইয়া দিনরাত্রি বাজাইতে সুরু করিল।

ঠিক এ অবস্থায় কোনদিন না পড়িলেও উদ্বাহের কিছুদিন পরেই আমিও আমার স্ত্রীর প্রেমে পতিত হইয়াছিলাম। এ কারণ, এই দুই বিরহী হৃদয়ের বেদনার পরিমাণ আন্দাজে অনুমান করিয়া, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। বেচারী রমণীকান্ত! বেচারী সন্তোষ!

আর নীলা? তাহার মর্ম্মকথা আমার গৃহিণী বলিতে পারেন। আমার শ্যালিকা হইলেও তাহার হৃদয়-বেদনা আমার হৃদয় দিয়া অনুভব করিবার শক্তি আমার নাই।

এই ভাবে মাসখানেক কাটিয়া গেল। বেশ নিশ্চিন্ত আছি। হঠাৎ একদিন বোর্ডিংয়ের লেডী সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের পত্র পাইলাম—সেখানেও উপদ্রব সুরু হইয়াছে। কেক্, ফুল, সুগন্ধি, রুমাল প্রভৃতি যাবতীয় প্রণয়-সূচক সামগ্রী ও রঙিন লেফাফায় নীলার নামে হৃদয়ের আবেগপূর্ণ পত্র আসে। হোষ্টেলের চারিপাশে, ইস্কুলের সম্মুখে দুইটি যুবক অনর্থক ঘুরিয়া বেড়ায়। নীলার সহিত তাহাদের ইসারা চলে। এ সকল বিষয়ে নীলাকে সাবধান করিবার ফলে, সে আহার ত্যাগ করিয়াছিল। তাহার সমঘরণীর মুখে শোনা গিয়াছে, রাত্রেও সে নিদ্রা যায় না, কাহার জন্য যেন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদে।

স্তম্ভিত হইলাম। হৃদয় যাহা চায়, তাহার বিরুদ্ধে অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া কি ফল। কিন্তু কি চায়? কাহাকে চায়? রমণীকান্তকে? সন্তোষকে? কখনই না, কিছুতেই তাহা হইতে দিব না। ঘৃণায়, ক্রোধে, বিরক্তিতে উভয়ের প্রতি মন বিরূপ হইয়া উঠিল। আমার গৃহিণীর ভগ্নী, আমার

শ্যালিকা, আমারই পছন্দমত পাত্রে উহার বিবাহ দিব। পড়াশুনার আর দরকার নাই।

স্ত্রীকে এ সংবাদ জানাইলাম। সন্তোষকেও প্রকারান্তরে সে কথা জানাইয়া দিলাম। এবং স্থির করিলাম, রমণীকান্তকেও তাহা জানাইয়া তাহার বেয়াদপির সমুচিত শাস্তি দিব। মনে মনে পাত্রও একরূপ নির্ব্বাচিত করিলাম, পুলিশ কোর্টের উদীয়মান সেই ছোকরা উকীলটি যাহার সহিত পূর্ব্ব বৎসর পুরীতে আলাপ হইয়াছিল।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টকে তৎক্ষণাৎ পত্র লিখিলাম, 'দয়া করিয়া আর মাত্র সাতটা দিন নীলাকে রাখুন। আগামী রবিবারের মধ্যে যে কোন একদিন তাহাকে লইয়া আসিব।'

গৃহিণী আমার সঙ্কল্প শুনিয়া, নীরবে একটু হাসিলেন মাত্র। ক্লিষ্ট মুখে হাসি, খুসীরই প্রতীক বলিয়া ধরিয়া লইয়া অফিস চলিয়া গেলাম।

বিকালে জলযোগান্তে বৈঠকখানায় বসিয়া গড়গড়ার নলটি সবেমাত্র হাতে তুলিয়াছি, দেখি রমণীকান্ত ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে। সন্তোষ তখনও অফিস হইতে ফিরে নাই। রমণীকান্ত ঘরে আসিয়া ফরাসের উপর নীরবে বসিয়া পড়িল। আমি তাহার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া ধূমসংযোগে

মনের কথাগুলি মনের মধ্যে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া বলিয়া ফেলিবার সূত্র খুঁজিতে লাগিলাম।

কিন্তু সে-ই সহসা সুরু করিল, "দাদা!"

তাকাইয়া দেখি, তাহার নাক, চোখ, মুখ নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বলিলাম, "কি ?"

"এতদিন মনের মধ্যে যে কথাটা চেপে রেখেছি. আজ তা প্রকাশ না করে পারছি না—"

সতর্ক হইয়া উঠিয়া বসিলাম। উল্টা চাপ না কি ?

"আমি নীলাকে ভালবাসি। কতখানি তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। তাকে আমি বিয়ে করতে চাই। বাবা আমার বিয়ের এক জায়গায় সব ঠিক করেছিলেন, আমি ভেঙে দিয়েছি। নীলাকে না হলে আমি আর কারুকে বিয়ে করব না। তাতে যদি সারা জীবন কুমার থাকতে হয়, তার জন্য আমি প্রস্তুত।"

সমাজের এত বড় একটি ক্ষতির সম্ভাবনায় আমি শিহরিয়া উঠিলাম। হাত হইতে গড়গড়ার নল খসিয়া পড়িল। কিন্তু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে আবার বলিল, "জানেন দাদা, তাকে না পাবার কল্পনা মনে উঠলেই আমার আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রবল হ'য়ে ওঠে। তাকে না পেলে হয়ত তা করবও। নীলা সে' কথা জানে, সেও আমাকে ভালবাসে। দুটি জীবনকে—"

তাহাকে হাত নাড়িয়া থামাইয়া দিয়া ধীরে বলিলাম, "ভায়া, লেখা-পড়া শিখেছ, জান বোধ হয়, সব কিছুতেই নাম কেনবার—স্থায়ী নাম কেনবার—একটা দিক আছে। প্রেমেও আছে ; সেটা হচ্ছে ত্যাগে। দেখনা কেন. সে যে পেলে না এই কথাটা কত রকম করে কাব্যে, উপন্যাসে, গল্পে, ছবিতে, ভাস্কর্য্যে ফুটে উঠছে। তোমার ধরবার ব্যাকুলতায় আমি অস্থির। সত্যি বলছি ভায়া রাত্রে আজকাল সুনিদ্রাও হচ্ছে না, যদি ত্যাগের পথে চল, পাড়ায় একটা স্থায়ী সুনাম থাকবে, আর তোমার ওপর আমাদেরও ভালবাসাটা বাড়বে বৈ এমন কমবে না—"

স্প্রীংয়ের মত তাহার নাক, চোখ, মুখ যথাস্থানে উঠিয়া পড়িল। বুঝিলাম, সে আমাদের ভালবাসা লাভ করিতে ব্যাকুল নয়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে আমার পায়ের ধূলা লইল। বলিল, "জীবনে এই শেষ দেখা—"

ওকি ! তাহার চোখে জল। মনটা সত্যই কাতর হইয়া পড়িল। কিন্তু সান্ত্বনা দিবার পূর্ব্বেই দেখি সে চলিয়া গেছে।

তাহার পর দুইদিন চলিয়া গেল, রমণীকান্ত আর আসিল না। এবং আরও একটি এই সুবিধা হইয়া গেল, শুনিলাম সন্তোষ বদলী হইয়াছে, একেবারে সেই মীরাটে। রবিবারের

মধ্যেই সে চলিয়া যাইবে; সুবিধা হইলে শুক্র শনিবারে যাওয়াও অসম্ভব নয়। তাহার বিচ্ছেদ ভাবিয়া আমার মন কাতর হইয়া পড়িল। কিন্তু দেখিলাম, তাহার মুখে ম্লানিমার ছায়ামাত্র নাই। যাহা হউক, স্থির করিলাম, সে চলিয়া গেলেই নীলাকে বাড়ীতে আনিব। এবং তাহার যাইতে বিলম্বও হইল না, সুবিধা হওয়ায় সে শুক্রবার তিনটার গাড়ীতে চলিয়া গেল। তখন আমি অফিসে।

গৃহে আসিয়া তাহার শূন্য ঘরখানির দিকে তাকাইয়া আমার মন বেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। আহা! দুনিয়ায় সে নিতান্ত একা। গৃহিণীও তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তাহার বিচ্ছেদে তিনি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

ভারাক্রান্ত মনে আমি পরদিনই অফিস হইতে ফিরিয়া নীলাকে বোর্ডিং হইতে আনিতে গেলাম। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সহাস্য মুখে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলা বাড়ী গিয়ে কেমন আছে?"

বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাড়তাড়ি বলিলাম, "কি বলছেন? নীলা বাড়ী গিয়ে?"

"হাঁ, কাল আপনার ভাইকে দুপুরে চিঠি দিয়ে পাঠালেন যে!"

সর্ব্বনাশ হইয়াছে! লজ্জা, ঘৃণা, ক্রোধ, অপমান, ভয় সবগুলি একসঙ্গে মনের মধ্যে ভীড় জমাইয়া রক্তকে উষ্ণ

করিয়া, দেহকে সঙ্কুচিত করিয়া আমাকে এক অননুভূত অসুখকর অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া দিল।

তিনি বলিলেন "তবে কি সে যায় নি?"

ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম—না।

"ওমা! কি ভয়ানক মেয়ে!"

সেখানে আর দাঁড়াইবার স্পৃহা রহিল না। তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কোন রকমে বাড়ী ফিরিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলাম।

ঐ ছোঁড়াটা আমাদের খাইয়া মানুষ! আমারই শ্যালিকাকে লইয়া পলাইল? জীবনে আর কখনও উহার মুখ দর্শন করিব না—কখনই না।

গৃহিণীও এই নিদারুণ সংবাদে একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন। বাপ-মা মরা বোন্; খাওয়াইয়া, পরাইয়া তাহাকে তিনি মানুষ করিতেছিলেন। এমনি অকৃতজ্ঞ, তাঁহার কথা একবারও ভাবিল না!

কিন্তু এত বড় ব্যাপার চাপিয়া যাইতে হইল।

ইহার পর সাতটা দিন কাটিয়াছে। অফিস হইতে বাহির হইতেছি এমন সময় একখানি পত্র পাইলাম। উপরে লাল লেফাফা, হলুদের চিহ্ন। বিবাহের নিমন্ত্রণ। খুলিয়া দেখি, পাঠাইছে সন্তোষ। তাহারই বিবাহ, পাত্রী নীলা। সে আমাদের আশীর্ব্বাদ চায়। নীলাকে লইয়া পলায়নের কারণ দেখাইয়াছে, তাহাকে আমার অন্য পাত্রে দানের সঙ্কল্প।

হতভাগা! তাহাকে আশীর্ব্বাদ? আমার শ্যালিকা-চোরকে আশীর্ব্বাদ করিব? কখনই না।

এবার গৃহিণী সংবাদটি শুনিয়া হাসিলেন না, একটি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মনে হইল যেন তাঁহার হৃদয়ের সকল বেদনা-চিন্তা তাহাতে ভর করিয়া বাহির হইয়া গেল। রমণীর মন!

তারপর একদিন শুনিলাম, রমণীকান্তকেও পাওয়া যাইতেছে না, সহসা সে নিরুদ্দেশ হইয়া পড়িয়াছে।

এইখানেই যবনিকা টানিয়া শেষ করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা হইলে সব কথা বলা হয় না, গল্পটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই বলি—

ইহার প্রায় দেড় বৎসর পরে আবার একখানি পত্র পাইলাম। খুলিতেই দেখি, তাহার মধ্যে একখানি ছোট ফটো যেন হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিল। নধর, পুষ্ট, সুন্দর একটি শিশু ছোট ছোট হাত দু'খানি প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছে। মুখে তাহার হাসি ধরে না, চোখ দুটি সেই স্রোতে টল্ টল্ করিয়া ভাসিতেছে। নীচে লেখা—

“মাছি, চুমু দাও—খোকন।”

অবিলম্বে গৃহিনীর হাতে তাহাকে তুলিয়া দিলাম।

তাঁহার বুভুক্ষু হৃদয় স্নেহে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি সেই ছবি-শিশুর মুখেই ব্যাকুলভাবে বার বার চুমা দিয়া ছবিখানি চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, "সুন্দর—সুন্দর—চল না গো একবার দেখে আসি। যাবে?"

মুখে কিছু বলিলাম না। কিন্তু মনে হইতে লাগিল, তাহার কচি কচি হাত দু'খানি আমাকেও প্রবলভাবে টানিতেছে। সে আকর্ষণ কিছুতেই এড়ানো যাইবে না। অগত্যা যাইতেই হইল। দীর্ঘকালের ছুটি লইয়া মীরাট চলিয়া গেলাম। এবং দীর্ঘকাল পরে আবার একদিন দেশে ফিরিলাম।

সন্ধ্যা তখন উৎরাইয়া গেছে। ঘোড়ার গাড়ীখানি আমাদের গলিতে প্রবেশ করিবার মুখে সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখি, আলো জ্বালাইয়া, বাজানা বাজাইয়া, উল্লাস-চীৎকারে সান্ধ্য আকাশকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া গলির মধ্য হইতে একটি বিবাহের শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া আসিতেছে। অবিলম্বে তাহাকে পথ ছাড়িয়া অন্ধকারে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইলাম। চোখে পড়িল, গালে চন্দন, ফুলের মালা গলায়, গায়ে সিল্কের জামা, বরবেশে আমাদের রমণীকান্ত! সে যেন ব্যর্থ প্রেমের বৈজয়ন্তী উড়াইয়া সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

পুনরায় গলিতে প্রবেশ করিতে করিতে বাহ্যিক বা মানসিক কোন্ কারণে জানি না, ইচ্ছা হইল আমার স্ত্রীর নধর গালে তৎক্ষণাৎ একটি চুমা দি। কিন্তু নিজের স্ত্রী হইলেও সেখানে তাহা পারিয়া উঠিলাম না। গৃহ-দ্বারে গাড়ীখানি আসিয়া থামিতেই মনক্ষোভ চাপিয়া মোট-ঘাট নামাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। তিনিও দ্রুতপায়ে উপরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রসঙ্গ

সাহিত্য ও মনোবিদ্যা

সাহিত্য যে দেশের ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আপনাকে গড়িয়া তোলে এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মতভাবে প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির বৈচিত্র্য যে মানব-মনেরই বিচিত্রতার প্রকাশক এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। অস্বীকার না করিলেও কথাটা শুধু মোটামুটি ভাবেই সাধারণে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া রচনার বিষয়, ভাষা, ছন্দ, প্রণালী প্রভৃতির ভিতর দিয়া রচয়িতার মনের কোন্ ভাবধারা, কোন্ চিন্তাধারা আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করিতে হইলে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়, মনোবিদ্যার সাহায্য লইতে হয়।

* * *

মনোজগতের নিগূঢ় রহস্যের খবর সম্প্রতি সাধারণেও পাইতেছে। এই রহস্য উদ্ঘাটন করেন প্রথম ডাক্তার সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড। তাঁহার নবাবিষ্কৃত মন-সমীক্ষণ প্রণালীর দ্বারা একদিকে মানসিক বিকারের যেমন প্রতিকার করা যায়, অন্যদিকে স্বাভাবিক মনোবৃত্তিগুলির কার্য্যধারারও

একটি সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। স্বপ্ন যে নিরর্থক নয়, আকাশকুসুমেরও শিকড় যে মাটিতেই নামিয়াছে, ফ্রয়েড তাহা দেখাইয়াছেন।

* * *

কিন্তু স্বপ্নের অর্থ, কল্পনার ভিত্তি—মনের উপর ভাসিয়া বেড়ায় না, তাহাদের বাসস্থান মনের গভীরতম প্রদেশে, তাই তাহাদের অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়। মনের এমন একটি স্তর আছে যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সজ্ঞান নহি। আমাদের অনেক কার্য্যধারার, অনেক ভাবরাশির, অনেক চিন্তাস্রোতের প্রেরণা আসে মনের সেই নির্জ্জন স্তর হইতে।

* * *

যেখানেই মন সৃষ্টির আনন্দে বিভোর, কাব্যে, গল্পে, গানে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, সেখানেই এই নির্জ্জন মন ব্যক্ত করে আপনাকে, বিষয় নির্ব্বাচনের ভিতর দিয়া, ভাষার ভঙ্গিমায়, বর্ণের সমাবেশে, স্থাপত্যের কৌশলে। স্বপ্ন যেমন অবদমিত ইচ্ছার পরিপূর্ত্তিমাত্র, কল্পনাও তেমনি দৈনন্দিন ঘটনার অবদমিত-ইচ্ছানুযায়ী বিকারমাত্র।

* * *

মন চায় আপনার মধ্যে আপনি লুকাইয়া শান্তিতে থাকিতে, জগৎ সে সুখ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করে। আপনাকে মনের উপর প্রতিফলিত করিয়া তাহার নিকট হইতে প্রতিক্রিয়া চায়—জগৎ। তাই এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। সেই দ্বন্দ্ব হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য মনের নানাবিধ চেষ্টা হইতেই নানাবিধ মানসিক সৃষ্টির লীলা। সাহিত্য সেই সৃষ্টিলীলারই একরূপ বিকাশ।

* * *

আবার মন চায় আপনাকে অনন্তে বিস্তার করিয়া আকাশ, ভুবন, চরাচর ছাইয়া ফেলিতে, জগৎ দেয় বাধা। তাই এই দ্বন্দ্ব। এই বাধা অতিক্রম করিয়া আপনাকে বিস্তার করিবার মনের নানাবিধ চেষ্টাই নানাবিধ মানসিক সৃষ্টির লীলা।

* * *

মনের ও জগতের এই ঘাতপ্রতিঘাতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন ফ্রয়েড। সাহিত্য প্রভৃতিতে এই ঘাতপ্রতিঘাতের তরঙ্গ দেখিতে পাই—ব্যাখ্যা পাই না। ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের কাজ। ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক ব্যাখার মূলসূত্রগুলি এখন সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত। তাই আশা করি শীঘ্রই

কোনও মনোবিজ্ঞান-অভিজ্ঞ সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যের ধারা আলোচনা করিয়া দেখাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন যে তাহার ক্রমোন্নতি মনোবিকাশের নবাবিষ্কৃত ধারা অনুযায়ীই হইয়া আসিয়াছে।

ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম-এ, ডি-ফিল্ (বার্লিন)

পুরাণ ও ইতিহাস

হিন্দু শব্দের নিরুক্তি। পারসীকদের "জেন্দ-আভেস্তা" গ্রন্থে "হিন্দন" শব্দ হইতে "হন্দ্" শব্দ উৎপন্ন। হিব্রু ভাষায় "হন্দ্" শব্দের অর্থ বিক্রম, তেজ, গৌরব ইত্যাদি। ভারতবর্ষকে হিব্রুভাষায় "হন্দ্" অর্থাৎ গৌরবান্বিত রাজ্য বলিয়া অভিহিত করা হইত। "হন্দ্" শব্দ গ্রীক ভাষায় "হন্দকোশ" (Handkosh), "ইন্দিকোস" (Indikos), "ইন্দিওস" (Indios) প্রভৃতি শব্দে পরিণত হয়। এই শব্দ রূপান্তরিত হইয়া ইংরেজী ইণ্ডিয়া (India) শব্দের উৎপত্তি। পস্তু ভাষায় "হিন্দ্" ও "হন্দ্" শব্দ আছে। পারসীক, হিব্রু, গ্রীক, ইংরেজী ও পস্তু ভাষায় "হিন্দু" ও "ইণ্ডিয়া" শব্দ পাওয়া যায়। উভয় শব্দের অর্থ শাক্তিমতী জাতি। এই ভারতীয় আর্য্যজাতি সুদূর অতীত কাল হইতেই গৌরবমণ্ডিত।

পারসীকদের "জেন্দ-আভেস্তা" তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত রাজ্য বলিয়া অভিহিত। এই প্রাচীনতার উল্লেখ পুনঃপুনঃ করিলে ইহার প্রতি শ্রদ্ধার আকর্ষণ হইবে। কালে জাতির হ্রাস বৃদ্ধি ও লোপ হয়। ভারতীয় আর্য্য জাতি লুপ্ত হয় নাই। সনাতনধর্ম্মীর হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, মৃত্যু নাই। বৃদ্ধ জগদ্গুরুর এই কথা আমরা ভুলিয়া না যাই। হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তাহার বেদ।

মনু বলিয়াছেন। ২।১৫৪ঃ

ন হায়নৈ র্ন পলিতৈ র্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্।

* * *

বেদ হিন্দুর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, হিন্দুত্ব। বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া হিন্দুলক্ষণাক্রান্ত হইতে হয়। বেদ মান্য করার অর্থ বর্ণাশ্রম, জন্মবাদ, মন্ত্রশক্তি, ঈশ্বরবাদ স্বীকার করা। ইহাই হিন্দুত্বের লক্ষণ। যাহা সার, নিত্য ও বিধিদত্ত, তাহাই ইতিহাস তত্ত্ব ও সৃষ্টির হিতকর, তাহাই বেদের প্রতিপাদ্য। ইতিহাস শব্দে যাহাতে পরম্পরাগত উপদেশ আছে, তাহা বুঝায়। ইতিহ+অস্+ঘঞ্। ইতিহ=পরম্পরাগত উপদেশ, অস্=হওয়া, ঘঞ্ প্রত্যয় অধিকরণ বাচ্যে। বেদের

ইতিহাসত্ব বেদের একাংশ মাত্র। বেদের অধিকারী অনধিকারী বিচারান্তে বেদ কাহাকে বলে জানিতে হয়। বেদ এক। প্রয়োজন-ভেদে একাধিক। দেব-দৈবত্ব ঋগ্বেদে, অর্থাৎ ইহা দেবস্তুতিপ্রধান। মনুষ্য যজুর্বেদের দেবতা ; মনুষ্যের কর্ম্মকাণ্ড যজুর্বেদের মুখ্য বিষয়। সামবেদে পিতৃদেবতা, ইহা পিতৃলোকের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনপ্রধান। রোগাদিপ্রশমন, শত্রু-দমন, অভিচারাদি, আয়ুর্বৃদ্ধি -প্রধান ক্রিয়াকাণ্ড অথর্ববেদে।

* * *

বেদকে কখন তিনভাগে কখন চারভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। উভয় স্থলেই ভিন্ন কারণ বশতঃ। দ্বাপরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ান বেদকে চারভাগে বিভাগ করেন। বেদ-বিভাজককে ব্যাস বলে। প্রতি কল্পের প্রতি দ্বাপর যুগে স্বয়ং বিষ্ণু বেদব্যাসরূপে আবির্ভূত হন ও পুরাণ-সংহিতা প্রচার করেন। অষ্টাবিংশ দ্বাপরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। অপর সপ্তবিংশ দ্বাপরের বেদব্যাস ঃ—

১ স্বয়ম্ভু ২ মনু ৩ উশনা (শুক্র) ৪ বৃহস্পতি ৫ সবিতা (সূর্য্য) ৬ মৃত্যু (যম) ৭ ইন্দ্র ৮ বশিষ্ঠ ৯ সারস্বত ১০ ত্রিধামা ১১ ত্রিবৃষা (ত্রিবৃতা) ১২ ভরদ্বাজ ১৩ অন্তরীক্ষ ১৪ বপ্রী (মতান্তরে ধর্ম্ম বা সুরক্ষণ) ১৫ দ্রটারুণ (আরুণি) ১৬ধনঞ্জয় (যোসঞ্জ) ১৭ কৃতঞ্জয় (মেধাতিথি) ১৮ ঋণক্য

(ঋতঞ্জয় বা ব্রতী) ১৯ ভরদ্বাজ (অত্রি) ২০ গৌতম (বাচঃশ্রবা) ২১ হর্য্যাত্মা (বাচস্পতি) ২২ বাচঃশ্রবা বেণ (শুক্লায়ণ) ২৩ তৃণবিন্দু (সোম) ২৪ ঋক্ষ বাল্মিকী (তৃণবিন্দু) ২৫ শক্তি (ভার্গব) ২৬ পরাশর (মতান্তরে শক্তি) ২৭ জাতুকর্ণ।

ব্রহ্মার এক অহোরাত্রকে কল্প বলে। মানুষের ৪৩২ কোটী বৎসরে একদিন ও ঐ পরিমাণ মানুষ-বৎসরে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। দিনে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় ও বিদ্যমান থাকে। রাত্রিতে তাহার লয় হয়। মন্বন্তর ও যুগাদি এক এক কল্পের অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ ৩০ কল্পে ব্রহ্মার একমাস। বার মাসে এক বৎসর। লৌকিক মাসের মধ্যে যেরূপ অমাবস্যা-পূর্ণিমা আছে ব্রহ্মার ৩০টি কল্পেও অমাবস্যা-পূর্ণিমা আছে। ব্রহ্মার ৩০টি কল্প বা দিন রাত্রির নাম ঃ—

শ্বেতবরাহ, নীললোহিত, বামদেব, গাথান্তর, রৌরব, প্রাণ, বৃহৎ, কন্দর্প, সত্য, ঈষাণ, ধ্যান, সারস্বত, উদান, গরুড়, কৌর্ম্ম, নরসিংহ, সমাধি, আগ্নেয়, বিষ্ণুজ, সৌর, সোম, ভবন, সুশুমালী, বৈকুণ্ঠ, আর্চ্চিষ, বল্মী, বৈরাজ, গৌরী, মহেশ্বর, পিতৃ। ইহার প্রথম ১৫ কল্প শুক্ল, দ্বিতীয়ার্দ্ধ কৃষ্ণপক্ষ।

ব্রহ্মার আয়ু শত বৎসর। তন্মধ্যে ৫০ বৎসর বা ১৮ সহস্র কল্প অতীত হইয়াছে। এখন ৫১ বৎসরের প্রথম শ্বেত বারাহ কল্প চলিতেছে।

বেদ পুরাণের অনন্ত কথা অনন্ত জীবনে শেষ হয় না। অনন্তদেবের কৃপায় এই মানব-জীবনের সার্থকতার বাধা নাই। ছোট কি তাঁর কৃপারাজ্যের বাহিরে? তিনি কৃপা করুন কিছুই অজ্ঞাত থাকিবে না।

ভারতীয় আর্য্যের সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। দেবভাষা সংস্কৃতা, সম্মার্জ্জিতা, সুমধুরা ও সুখদা। ইহার সেবা গৃহে প্রবর্ত্তিত হইলে দুঃখদ জীবন সহনীয় ও মহনীয় হইবে।

— কৃপাশরণ

চিত্র ও চরিত্র

বিদ্যাসাগর

বিগত উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় জীবনের বিভিন্ন বিভাগ বিচিত্র প্রতিভার সংস্পর্শে সক্রিয়, উজ্জ্বল এবং সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমান বাংলার ভাবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র, কর্ম্মজীবনে প্রথম বেগ সঞ্চার করিয়াছেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন কবি, ঈশ্বরচন্দ্র কর্ম্মী।

বর্ত্তমান বাংলা ঈশ্বরচন্দ্রের—ভাবে নয়, আদর্শে প্রভাবিত। যে সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা ভাষা ও ভঙ্গী শিক্ষা করিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের আঠারো বৎসর পূর্ব্বে, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর দুই বৎসর মাত্র পূর্ব্বে, ১৮৯১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বর্গারোহণ করেন।

বীরসিংহের এই সিংহ-শিশু বাংলার বিস্ময়।

সদর্প তেজস্বিতার সহিত সুমধুর কোমলতার সমাবেশে তাঁহার চরিত্র অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে প্রথম বৎসরের 'নবজীবনে' কবি হেমচন্দ্র ব্যঙ্গ-কবিতা লিখিতে লিখিতে বিদ্যাসাগরের অবতারণায় সসম্ভ্রমে সুর ফিরাইয়া লিখিতেছেন,

> আসছে দেখো সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর,
> বিদ্যের সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের মিহির!

বঙ্গের সাহিত্যগুরু শিষ্ট সদালাপী,
দীক্ষাপথে বুদ্ধঠাকুর স্নেহে জ্ঞান ব্যাপী।
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দ্রাঢ্যে শালকড়ি,
কাঙাল-বিধবা-বন্ধু অনাথের নাড়।
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতাকর্ণ দানে,
স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুল-কাঁটা—পারিজাত ঘ্রাণে।
ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত 'ডিস',
টোল-স্কুলী অধ্যাপক দুয়েরই 'ফিনিস'।

মাইকেল মধুসূদন এক পত্রে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলিয়াছেন

"The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman, and the heart of a Bngali mother."

প্রশস্ত-ললাট, দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ-ওষ্ঠাধর, উজ্জ্বল-চক্ষু, শ্যামবর্ণ, ঋজুকায়, এই বলিষ্ঠ ব্যক্তিটির ইচ্ছাশক্তি ছিল যেমন সবল, হৃদয় ছিল তেমনি কোমল।

বিদ্যাসাগরের প্রতিভা গঠনমূলক। তাই সাহিত্য, শিক্ষা—সমাজ—যাহাতেই তিনি হাত দিয়াছেন, তাহাই নূতন করিয়া গড়িতে চাহিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইটালীতে জন্মিলে তিনি হইতেন মুসোলিনী, অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম শতকে ফ্রান্সে জান্মলে—নেপোলিয়ন।

সেদিনের বাংলার অপরিসর কর্ম্মক্ষেত্র তাঁহার বিরাট কর্ম্মপ্রতিভাপ্রকাশের পক্ষে একান্ত সঙ্কীর্ণ ছিল।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

মানুষ লইয়া যাহার কারবার, তাহা নিষ্প্রাণ নয়। মানুষের সমষ্টিগত জীবন সমাজে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাই সমাজ অনড়, অচল, অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু নয়। তাহার গতি আছে, বেগ আছে। সে বেগ জীবনের বেগ। কাজেই সমাজ স্থির হইয়া থাকে না। বৈদিক সমাজ পৌরাণিক সমাজে রূপান্তরিত হয়। আধুনিক আচার-ব্যবহার পৌরাণিক সমাজের আকার পরিবর্ত্তিত করে। তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের আর্য্য-সমাজের সহিত বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ঐক্য অপেক্ষা বৈলক্ষণ্য বেশী। কিন্তু ধারা চলিয়া আসিয়াছে।

* * *

মানবের সমষ্টিগত মন—সামাজিক মন। সামাজিক মন ব্যক্তির মন হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে। তবুও সেই মন ব্যক্তিকে পরিচালিত করে। যুগে যুগে মানব-মন নব নব উন্মেষে ফুটিয়া উঠে। ফুলকে কুঁড়ি হইতে বলাও যা, সামাজিক মনকে পুরাতনের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে বলাও তাই।

* * *

অভিব্যক্তি আমাদের অজ্ঞাতসারে ঘটে সংস্কার হয় সজ্ঞানে। যুগধর্ম্মে মানব-মন জাগিয়া ওঠে, উন্মেষিত হয়। সেই জাগ্রত মনের ইচ্ছা পরিতৃপ্ত না হইলে, সে কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। জড়ের জগতে যথাস্থানে সন্নিবেশিত বস্তু

যথাস্থানেই থাকে। প্রাণের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন। সমাজ সম্পর্কে সামাজিক ইচ্ছা সেই পরিরবর্ত্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে। সেই ইচ্ছা কখনও সমষ্টিগত মনের ভিতর দিয়া অজ্ঞাতভাবে প্রকাশিত হয়। কখনও বা প্রতিভাশালী ব্যক্তি আপনার বুদ্ধি বিচারের ভিতর দিয়া জানিয়া শুনিয়া তাহাকে ব্যক্ত করে। সামাজিক মন প্রস্তুত থাকিলে, তবেই তাহা গৃহীত হয়। নহিলে ভাবমাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

* * *

অভিব্যক্তির ধর্ম্ম অনুসারে যাহা নিকৃষ্ট তাহা পরিত্যক্ত, যাহা প্রকৃষ্ট তাহা পরিগৃহীত হয়। ব্যক্তির মনের প্রভাব কখনও কখনও সামাজিক মনকে প্রভাবিত করে। তখন সেই ব্যক্তি সমাজের প্রতিনিধি।

দিন-পঞ্জী

আইরিশ আমেরিকান নিউজ, চিকাগো, ২০শে নভেম্বর—আমেরিকার উপনিবিষ্ট আইরিশদের এক বিরাট সভায় ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট প্যাটেল তাঁহাদের অভিনন্দনের উত্তরে বলেন, যতদিন ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদ থাকিবে, ততদিন পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন অসম্ভব। বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যার চাবিকাঠি আমেরিকার হাতে, এবং সে সমস্যার সঙ্গে বিশ্বের শান্তি

বিজড়িত। আমেরিকা ইচ্ছা করিলেই শান্তির দ্বার খুলিয়া দিতে পারে, কিন্তু শুধু নিজের স্বার্থের দিক হইতে বিবেচনা করিলে চলিবে না, তাহার উচিত বিশ্বমানবের দিক হইতে বিবেচনা করা।

১৬ই জানুয়ারী— ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এইরূপ জানাইয়াছেন যে মেডিকেল বোর্ড স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া সুপারিশ করিয়াছেন, টিউবারকিউলসিসের চিকিৎসার জন্য ফ্রান্স বা সুইজারল্যাণ্ড উপযোগী। সুতরাং শ্রীযুক্ত বসু যদি ইউরোপ যাইতে ইচ্ছা করেন ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে জাহাজে আরোহণ করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে ও তিনি মুক্তি পাইবেন।

মীরাট— গত সোমবার সেসন জজ মিঃ ইয়র্ক মীরাট মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ৩২ জন আসামীর মধ্যে মামলার শুনানীর সময় একজনের মৃত্যু হইয়াছে। ৩ জন খালাস পাইয়াছেন ও অবশিষ্ট সকলের দণ্ড হইয়াছে। এই মামলায় প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আসামীগণ আদালতে প্রবেশ করিবার সময় যথারীতি কমিউনিষ্টগণের অভ্যস্ত সঙ্গীত গান করিতে থাকে।

১৭ই জানুয়ারী— নয়াদিল্লীর জোর গুজব যে, মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি সম্বন্ধে সিমলা ও হোয়াইট হলের মধ্যে

আলোচনা চলিতেছে, ও এই সম্পর্কেই নাকি স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু ও মিঃ জয়াকরকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

আবহাওয়া—আঃ কি শীতই পড়েছে মশায়! কলিকাতার পথে ও ঘাটে শুধু এই কথা, এবার বেজায় শীত, শীতে বাঁচাই দুষ্কর। শৈত্যানভ্যস্ত কলিকাতাবাসী হয়ত কোন্ সুপ্রভাতে উঠিয়া দেখিবে যে আর কলে জল পড়িতেছে না। সব বরফ হইয়া গিয়াছে। কারণ ময়মনসিং পর্য্যন্ত যেকালে আসিয়াছে তখন দার্জ্জিলিং হইতে আর কত দেরী! কিন্তু বাস্তবিকই শুধু কথা নয়, এবার আমরা শীতের প্রকোপ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি। গত ৮ই জানুয়ারীর আবহাওয়ার রিপোর্টে দেখা গেল ৪৯ ডিগ্রি। ১৮৯৯ সালের ২০শে নভেম্বর হইয়াছিল ৪৪ ডিগ্রি, তারপর ১৯২৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর উত্তাপ নামিয়াছিল ৪৭ ডিগ্রি। উপস্থিত ১৬ই জানুয়ারীর রিপোর্টে দেখা গেল অতিকষ্টে মাত্র ১ ডিগ্রি নামিয়াছে অর্থাৎ ৪৮ ডিগ্রি।

সকল প্রকার সদ্য অথবা দূষিত বেদনা
এবং ক্ষতাদির জন্য
অমৃত প্রলেপ
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

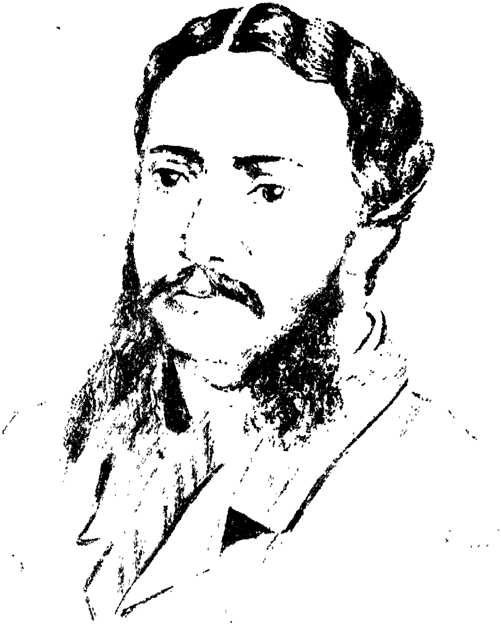

মধুসূদন দত্ত

ছোট গল্প

১ম বর্ষ]　　১৫ই মাঘ ১৩৩৯　　[২৯শ সংখ্যা

জল

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ

১

ফাল্গুন মাসের প্রাতঃকাল। হাতিবাগানের খ্যাতনামা স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত মদনমোহন বটব্যাল মহাশয় নিজবাটীর প্রশস্ত অঙ্গনে রৌদ্রে বসিয়া পশ্চিমা গোয়ালা চাকরের হস্তে সর্ষপ তৈল ম্রক্ষণ ও মর্দ্দনাদি সেবা লইতেছেন। বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে। মাথার চুলগুলি কদমছাঁট করিয়া ছাঁটা। একগাছিও পাকে নাই গোঁফদাড়ি সুচারুরূপে কামানো। মাথার পিছনে গ্রন্থিবদ্ধ গোক্ষুরাকৃতি শিখা লম্বমান। দীর্ঘায়ত তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দেহ, উন্নত ললাট, খড়্গনাসা, উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়ের ব্যবধান ও সূক্ষ্মাগ্র

দৃঢ় চিবুক দেখিলে মনে হয়, সাধারণ বাঙ্গালীর যদি এই ছাঁদ হইত তবে বাঙ্গালী সঙ্কর জাতি বলিয়া কে বদ্‌নাম রটাইতে পারিত ?

সামনে পুরানো চুণার-টালির মেজের উপর চাটাই ও সতরঞ্চ বিছাইয়া দশ বারটি ছাত্র ব্যাপ্তিখণ্ড পড়িতেছে, ডানদিকে মোড়ার উপর বসিয়া একটি চসমা ও চাপকানধারী যুবক একখানা দলিলের খস্‌ড়া পড়িয়া শুনাইতেছেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া জবাব লিখিয়া লইতেছেন। ইনি বটব্যাল মহাশয়ের দূরসম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্র নিরঞ্জন চাটুয্যে। দুজন গেরুয়া আলখাল্লামণ্ডিত স্বামীজী বাঁ-দিকের একখানা বেঞ্চি দখল করিয়া বসিয়া আছেন।

সুবৃহৎ পুরানো চক্‌মিলান বাড়ীটি অতীত গৌরবের মৌন সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভাঙ্গা থাম ও ফাটা খিলানওয়ালা বিশাল ঠাকুরদালানটি কত সমারোহ দেখিয়াছে। ইহার টালিবরগা-খসা সমুন্নত ছাদ ও দেয়ালের জীর্ণ পঞ্জর কতদিন শঙ্খঘণ্টারবে আনন্দে কাঁপিয়াছে, কত ধূপদীপ পুষ্পচন্দনসৌরভে নব নব দেবতার বরণ করিয়াছে, কত বিচিত্র বেশবাসে-ভূষিত কত নরনারী ইহার উদার আশ্রয়ে আনন্দের মুহূর্ত্তগুলি চয়ন করিয়াছে, তাহার পরিচয় দিতে পাড়ার বুড়ারা আজিও শতমুখ।

করাল কাল যেটুকু দয়া করিয়া বাকী রাখিয়াছেন, কর্পোরেশন সেটুকু শেষ করিবার জন্য আড়েহাতে

লাগিয়াছেন। 'সাধারণের বিপজ্জনক ইমারৎ' বলিয়া ঠাকুরদালানটিকে এক মাসের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য নোটিস দিয়াছেন। আগামী বৈশাখে ভাঙ্গিয়া নূতন বাড়ী হইবে।

বেলা বাড়িয়া সূর্য্য মাথার উপর উঠিলেন। অদূরে ঘড়িওয়ালা বাড়ীতে টুংটাং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল। বটব্যাল মহাশয় স্বামীজীদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "তাহলে আপনাদের কষ্ট করে এতদূর আসাই সার হোলো, এক্ষেত্রে আমি কোন সাহায্য করতে পারলাম না ব'লে বড়ই দুঃখিত।"

প্রবীণ স্বামীজী অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনি দয়া ক'রে আর একবার বিষয়টা ভাল কোরে ভেবে দেখুন। ব্যবস্থা তো অনেকেই দিয়েছেন এবং দিতেও পারেন, কিন্তু আপনার মত দিকৃপালেরা যদি স'রে দাঁড়ান তবে আমাদের এটা শিবহীন যজ্ঞ হবে।"

তরুণ স্বামীজী তাঁহার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া বলিলেন, "আর এটাও বিবেচনা করে দেখুন, আমরা আপনার কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে ব্যবস্থা নিতে আসিনি, স্বার্থটা হচ্ছে গোটা হিন্দু সমাজের। আমরা মফঃস্বলের অনেক জায়গায় কাজ করে বেশ বুঝেছি যে বিধর্ম্মীরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ব্যাপকভাবে আক্রমণ করলে অস্পৃশ্য হিন্দুরা হয় নির্লিপ্ত দর্শক হয়ে থাকবে, নয়তো বিধর্ম্মীর সঙ্গে যোগ দেবে—আজ

না হয় দুদিন পরে। প্রতি বৎসর চোখের সামনে এরা দলে দলে স্বধর্ম্মত্যাগ কোরে বিধর্ম্মীর সংখ্যা পুষ্ট করছে। এ দৃশ্য কি দাঁড়িয়ে দেখা যায়? আজ আমাদের চিরদাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়তে হ'লে এই ক্লিষ্ট, বুভুক্ষিত, উৎপীড়িত, ধূলি-ধূসরিত ভাইদের ভাই ব'লে বুকে তুলে নিতে হবে—

'এইসব ম্লান মূক মৌন মুখে দিতে হবে ভাষা—'

বটব্যাল। (তরুণকে) স্থিরো ভব, এত উতলা হবার প্রয়োজন কি? আপনার সঙ্গে আমার মতবিরোধ নেই।

(প্রবীণকে) একটা কথা বলি শুনুন। আপনারা অন্ত্যজ সমাজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চাইছেন, বেশ কথা। আর বোঝাপড়ার প্রয়োজনটা যে রাজনৈতিক তাও বেশ বুঝতে পারছি। এতে আমার কোন আপত্তি নেই, কারো থাকতে পারে না। আপনারা তাদের উন্নতির চেষ্টা যত খুসী করুন। তাদের অন্ন বস্ত্র দিন, তাদের স্বধর্ম্ম এবং স্ববৃত্তি পালনের শিক্ষা দিন। আর লাটসাহেবের সভায় এবং মুন্সিপালেও দুচারটে গদীআঁটা কেদারা ছেড়ে দিলে, কি সরকারী দপ্তরে গোটাকয়েক যেমন তেমন চাকুরীর দাবী ছেড়ে দিলে, যদি তারা আনন্দে বগল বাজিয়ে নৃত্য করে তবে তাও করুন, কোন ক্ষতি নেই। মোট কথা ভোটাভুটির লড়াইয়ের সময় তাদের হাতে রাখবার জন্যে যা-কিছু দরকার সব করুন, কিন্তু দোহাই মশায় তাদের ধর্ম্মদ্রোহী কাজে প্ররোচনা দিয়ে রাজনীতি আর ধর্ম্মনীতির গণ্ডী ভেঙ্গে

একাকার করে ফেলবেন না। কেন, হিন্দুধর্ম্মের বহিঃশত্রুর কি এতই অভাব হয়েছে যে ঘরের শত্রু ডেকে আনতে হবে?

তরুণ। ধর্ম্মদ্রোহী কাজ আপনি কাকে বলেন? মনগড়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে আমরা যুগ যুগ ধরে যাদের মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছি—

প্রবীণ। আহা থামো না দাদা। (বটব্যালের প্রতি) আমরা এখন তো বেশী কিছু বাড়াবাড়ি করছি না, কেবল জলে স্পর্শদোষটা বিলোপ করবার জন্যে পণ্ডিত সমাজের কাছে শাস্ত্রীয় বিধান চাইছি। আমাদের প্রোগ্রামের আর সব কাজ এখন স্থগিত রেখেছি—

বটব্যাল। (প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া) অসম্ভব, অসম্ভব, স্মৃতিবহির্ভূত বিধান আমি দিতে পারি না, তাহলে ধর্ম্মে পতিত হব। আমাকে মাপ করবেন, এখন আমার মনু থেকে রঘুনন্দন পর্য্যন্ত সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র ঘেঁটে বিধিনিষেধের ফর্দ্দ তৈরী করবার অবসর বা ধৈর্য্য নেই। আপনারা বরং এক সপ্তাহ বাদে আসবেন, সব দেখিয়ে দেব। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে রাজনৈতিক সুবিধার খাতিরে যথার্থ স্মৃতিবিদ্ কোন পণ্ডিতই আপনাদের এই অশাস্ত্রীয় প্রস্তাব সমর্থন করবেন না। উঃ, কি কুক্ষণেই গান্ধী আপনাদের নাচিয়েছেন—

তরুণ। মহাত্মা গান্ধী।

বটব্যাল। বেশ, তাই হোলো,—মহাত্মা আছেন মহাত্মাই থাকুন। কথা হচ্ছে হিন্দুধর্ম্মের তিনি কি জানেন? যে মীমাংসা বা স্মৃতিশাস্ত্র সনাতনধর্ম্মের আসল বুনিয়াদ, তার একপাতাও না পড়ে তিনি লম্বা লম্বা ফতোয়া দিচ্ছেন। চিরটা কাল সাহেবদের দেশে কাটিয়েছেন, অখাদ্য খেয়েছেন, আজ অঙ্গে খদ্দরের কৌপীন এঁটেছেন ব'লে তাঁর মনটাও কি কোট পেণ্টুলুন ছাড়তে পেরেছে? শুনতে পাই তিনি কথায় কথায় বাইবেলের ছড়া কাটেন, আবার রুষিয়ার কোন্ গোরা বাউল নাকি তাঁর ইষ্টগুরু। কেঁদে ককিয়ে একখানি গীতার টীকা লিখেছেন, তাও আগাগোড়া ভুল এবং পাগলামিতে ভরা। এই যে কিছুকাল আগে একটা বাছুরকে গুলি ক'রে মারতে হুকুম দিলেন, এটা কোন্‌দেশী হিন্দুয়ানী? সেটার হয়েছিল কি? না—সাংঘাতিক রোগ হোয়েছিল, যন্ত্রণা পাচ্ছিল। কেনরে বাপু, রোগের যাতনায় কেউ চোখ কপালে তুলে হাত পা খেঁচতে থাকলে, তাকে যমের দোর অবধি এগিয়ে দিতে হবে, এ কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে? খোদার ওপর খোদ্‌কারী আর কাকে বলে?

প্রবীণ। আপনি রাগ করবেন না ঠাকুরমশায়, আপনার সময় বৃথা নষ্ট ক'রে আমাদের কোনো লাভ নেই। আপনি যদি আশ্বাস দেন যে বিষয়টা পুনর্ব্বিবেচনা করবেন এবং আপনার ফুরসুৎমত শাস্ত্রের নজীরগুলো একবার উলটে-পালটে দেখবেন তা হলে আমার বিশ্বাস কিছু না কিছু

আমাদের অনুকূলে পাওয়া যাবেই। আর—যদিও আপনার মর্য্যাদার উপযুক্ত তৈলবট দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই, তবু যথাশক্তি কিছু—(চারিখানি দশটাকার নোট বাহির করিলেন)।

বটব্যাল। ও! ঘুষ দিয়ে ব্যবস্থা নেবেন, বটে। আপনারা ভেবেছেন কি? আমি কি টাকার কাঙাল?

তরুণ। কেন মশায়, এতে দোষের কি আছে? বাংলাদেশের নামজাদা স্মার্ত্ত পণ্ডিত বলতে যে কজনকে বোঝায় তাঁদের মধ্যে অনেকেই ব্যবস্থা দিয়েছেন, এবং তার জন্যে তৈলবট নিতে অপমান বোধ করেন নি। এই দেখুন সব ব্যবস্থাপত্র—

বটব্যাল। আরে রাখ রাখ অর্ব্বাচীন ছোকরা, কামারের কাছে ছুঁচ বেচতে এসেছ? তোমরা যদু সার্ভ্যোমের মত একটা পতিত ব্রাহ্মণকে সম্বৎসরের আফিং কিনে দিয়ে একখানা চোতা কাগজ যোগাড় করেছ—তাই এত বুকের পাটা বেড়ে গেছে, আমাকে টাকা দেখাও!

তরুণ। যদু সার্ব্বভৌম মহাশয় আপনার চেয়ে কোনো অংশে কম নন।

প্রবীণ। (তরুণের হাত ধরিয়া) চেপে যাও দাদা, আর কথায় কথা বাড়িয়ে লাভ কি? দেশের কাজে যখন নেমেছ, ‘তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুণা’ এই মহাজন বাক্যটা

সর্ব্বদা মনে রাখবে। এস এখন যাই, এখানে আর কিছুর প্রত্যাশা নেই।

তরুণ। চলুন, চলুন।

অনেক বেলা হইয়াছে এবং বটব্যাল মহাশয়ের মেজাজ ভাল নয় দেখিয়া অন্য সকলেই বিদায় হইলেন।

২

ইহার দুই তিন দিন পরে নিরঞ্জন আসিতেই বটব্যাল মহাশয় বলিলেন, "দেখলি নিরঞ্জন, সেদিন অর্ব্বাচীন দুটোর স্পর্দ্ধাটা একবার দেখলি? আমার বাড়ী বয়ে এসে আমাকে অপমান করে যায়! মদন বটব্যালকে পয়সার লোভ দেখায়! ছাত্রগুলো না থাকলে বেটাদের চাকর দিয়ে পৈতে উলিয়ে জুতো পেটা করতাম। বেল্লিক বেটারা আবার হিন্দু ব'লে পরিচয় দেয়! হিন্দু মিশন! সোনার পাথরবাটী! বেটাদের গোষ্ঠীর শ্রাদ্ধ!

নিরঞ্জন। যেতে দিন, যেতে দিন কাকা, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা গরম করবেন না। আপনি বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘের ব্রীফ নিয়ে ফেলেছেন ব'লে গোড়াতেই পত্রপাঠ বিদেয় করতে পারতেন, তা নয় আবার কেস নিয়ে আর্গুমেণ্ট করতে লেগে গেলেন। যাক, আসুন এখন কাজের কথা হোক, আমার আবার একটু সকাল সকাল কাছারী যেতে হবে। পীরখালি যাবার কি ঠিক করছেন?

বটব্যাল। আচ্ছা দেখ, আমার নিজের কি না গেলে নয়? আমলা টামলা দিয়ে কাজ চলতে পারে না?

নিরঞ্জন। (হাসিয়া) তাকি হয় কখনো? শত্রুপক্ষ প্রবল, আমলাকে পয়সা খাইয়ে হাত করতে কতক্ষণ? আচ্ছা এখন না হয় নাই গেলেন। আপনার তালুকের দক্ষিণে বোষ্টমখালি লাটে যে ক্যাম্প পড়েছে. খোদ সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার সেখানে চৈত্র মাসের শেষে ইন্‌স্‌পেক্‌শনে যাচ্ছেন। সেই সময়টা কিন্তু আপনি নিজে সেখানে থেকে তদ্বির তদারক করবেন। ছোট হুজুরদের নগদ বিদায়ে তুষ্ট ক'রে, আর আর বড় হুজুরের বাবুর্চিখানার এক হপ্তার আণ্ডা মুরগী দুধ কলা সাপ্লাইএর ব্যবস্থা ক'রে দলীলপত্র নিয়ে দেখা করবেন, হুজুরদের সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরে চৌহদ্দি দেখাবেন, রেকর্ড করাবেন, তবে তো মামলার সুসার হবে?

বটব্যাল। আরে বাপু সে যে বড় বেপোট জায়গা! আমার আমীন বলে কলকেতা থেকে মোটে ৭০ মাইল রাস্তা, তবু গিয়ে পৌঁছুতে নাকি পূরো দুদিন লাগে। কাশী যাওয়া যে এর চেয়ে সোজা! তার ওপর নাকি পানীয় জলের অভাব, মশা, জোঁক, বাঘের উপদ্রব—

নিরঞ্জন। বাঘ কোথায় কাকা? ও ধাপ্পাবাজী শোনেন কেন? আপনার তালুকের ত্রিসীমানায় বাঘ তো দূরের কথা একটা বন-বেড়াল পর্য্যন্ত নেই। তবে শুনুন একটা মজার কথা। গেল বছর আমি বোষ্টমখালি লাটে একটা কমিশনে

গিয়েছিলাম। বোধ হচ্ছে মাঘ মাসে। সঙ্গে এক বন্ধু ছিলেন, ভাল কীর্ত্তন গাইয়ে, বাড়ী শান্তিপুর। সে দিন আমরা সন্ধ্যের একটু আগে যুধিষ্ঠির জানার কাছারি বাড়ীতে পৌঁছুলাম। কাজকর্ম্ম সারতে রাত্তির হয়ে গেল। যেমন দুরন্ত শীত, তেমনি দারুণ খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। সবে একটা ঢেঁকুর তুলে একখিলি পান মুখে দিয়েছি, এমন সময় বন্ধুটি পেটে হাত বুলোতে বুলোতে আমাকে চুপি চুপি বললেন, "ভাই একবার পেটটা খোলসা না হলেই নয়। কিন্তু বাবা, আজ লাখ টাকা দিলেও পাঁচিলের বাইরে পা বাড়াচ্ছি না। যদি কাছারির হাতার মধ্যে সে ব্যবস্থা থাকে তবে একবার খবর নাও। তুমি শুনলে হাসবে, কিন্তু মাইরি বলছি এখানে পৌঁছে অবধি একটা বিকট গন্ধ পাচ্ছি, ঠিক যেন-যেন-আলিপুরের——বুঝতে পেরেছো?

আমারও মনে হ'ল সত্যিই একটা কেমন কেমন বোট্‌কা গন্ধ পাচ্ছি। বেশ একটু ভয়ও হ'ল। রয়্যাল বেঙ্গলের দেশে এসেছি, এখানে যে গেরস্ত-বাড়ীর আনাচে কানাচে দু'একটা জানোয়ার ছোঁক ছোঁক করে বেড়াবে, সেটা এমন কিছু বিচিত্র নয়।

বটব্যাল। তবে যে বললি বাঘ নেই?

নিরঞ্জন। আরে মশায় শুনুন না শেষ পর্য্যন্ত। আমি তো বুদ্ধিমানের মত সোরগোল না ক'রে নায়েব মশায়কে বন্ধুবরের মুস্কিল আসানের পন্থা জিজ্ঞেস কল্লুম। তিনি একটা

চাকরকে হুকুম করলেন, "ল্যাণ্ঠান নিয়ে বাবুকে পৌঁছে দিয়ে আয়।" কাছারি-বাড়ীর একটেরে একখানা আলাদা উঁচু চৌচালা ঘর দেখা যাচ্ছে, তার সামনে দিয়ে যেতে হয়। বন্ধুবর হাতার বাইরে যেতে হবে না দেখে আশ্বস্ত হলেন। চাকরের হাত থেকে ল্যাণ্ঠানটা নিয়ে বললেন, "তুমি যাও, আমি নিজেই যেতে পারবো।" আমার মনটা কিন্তু খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল।

বটব্যাল। করবার কথাই তো, পাঁচিল আর কতই বা উঁচু।

নিরঞ্জন। আমরা তো এদিকে ঘরের দোর জানালা বন্ধ করে আপাদমস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে তক্তপোষের ওপর কম্বল পেতে পাশা খেলছি। দাকাটা তামাকের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে. বোটকা গন্ধটাও আর পাচ্ছি না। তক্তপোষের একধারে একটা হারমোনিয়ম আর একটা খোল—সতীশ এলেই কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। একথা সেকথার পর নায়েব মশায়কে বললাম, "আচ্ছা মশায়, সুন্দর বনের বাঘগুলো সব গেল কোথা? এ সব লাট তো শুনেছি আগে বাঘেরই জমিদারী ছিল। এখন কি আর তাঁরা কেউই খাজনা আদায় করতে পেয়াদা পাঠান না?"

নায়েব মশায় হেঁসে বললেন, "সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। প্রায় বছর দশেক হোলো আমার এই লাট আর এর দশ বারো কোশের মধ্যে সব লাটের জঙ্গল

হাসিল হয়ে গেছে। তার ওপর রামা শ্যামা সকলেই বন্দুকের পাশ নিয়েছে। এখন পেয়াদা বাবাদের এসব জায়গায় আসতে বোধ হয় চক্ষুলজ্জা হয়—

ব্যস্, মুখের কথা মুখেই রইল, এক ভীষণ আর্ত্তনাদ আর সঙ্গে সঙ্গে এক পৈশাচিক চীৎকারে সকলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, চুল খাড়া হ'ল। আমি তো লাফ দিয়ে "বাঘ বাঘ" বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। তারপরেই একটা পাঁচমিশিলী হাল্লা—অবশ্য যে যেখানে ছিলেন, সেখানে থেকেই প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলেন।

"বাঘ, বাঘ, ওরে হুড়্কো, হুড়্কো, দোরে হুড়্কোটা লাগা শিগ্গির। ওই যে ওই চৌচালার দিকে না? সতীশ বাবু! সতীশ বাবু! হায়, হায়, সর্ব্বনাশ হয়ে গ্যালো বুঝি! বন্দুক, বন্দুকটা কই? আরে এটা যে গাদা বন্দুক! আরে নিদ্রাসিং, ভোজসিং, জলদি ছিটে বারুদের বাক্সো লেয়াও। ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, সড়্কি বল্লম শাবল কোদাল—যে যা পারিস নিয়ে বেরিয়ে পড়্, সতীশ বাবুকে বাঁচাতে হবে!"

আবার আর্ত্তনাদ, আবার সেই বিদ্‌খুটে চীৎকার! নায়েবমশায় এতক্ষণ দোরের পাশে ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু এবার একগাছা মোটা লাঠি নিয়ে হুড়কো খুলে সাঁ কোরে বেরিয়ে পড়লেন।

বটব্যাল। বলিহারি সাহস! তারপর কি হল?

নিরঞ্জন। তাঁর সাহস দেখে আমিও সাহস পেলাম। কপাল ঠুকে আধমণি গাদা বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গুলি করতে না পারা যাক, চাগিয়ে বাঁটের বাড়ী এক ঘা দিতে পারলেই বাঘের পোর কর্ম্মশেষ! পিছনে বডিগার্ড আছেন সদরআমীন বাবু, হাতে একখানি পাঁঠাকাটা দা। তাঁর পিছনে বদরআমীন, কাঁধে জবরদস্ত কুড়ুল। দুজনেই আন্‌কোরা বরিশালের আমদানী—ফ্রেশ ব্লড্‌। চারিদিকে নজর রেখে সিঙ্গ্‌ল ফাইলে গুটি-গুটি দুচার পা এগোতেই শুনলাম ধপাধপ লাঠির আওয়াজ এবং সেই অদ্ভুত অলৌকিক চীৎকারের পুনরাবৃত্তি। মানুষের আর্ত্তনাদটা কিন্তু থেমে গেছে।

বটব্যাল। অ্যাঁ, শেষ হয়ে গ্যালো নাকি? চুঃ চুঃ চুঃ!

নিরঞ্জন। শুনুন না বলি—তারপর টপ্‌গিয়ার স্পীডে অকুস্থানে গিয়ে পৌঁছুলাম। দেখি সতীশ চৌচালার দাওয়ার ওপর চীৎ হয়ে পড়ে আছে। সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখা, কাপড় জামা ছিন্নভিন্ন, তবে জখম-টখম কিছু নেই দেখে ধড়ে প্রাণ এল। তার টাইগার ফিভার হয়েছে, দাঁতে দাঁতে ঠক্‌ঠকি তাঁত চলছে, আর মাঝে মাঝে ঝাপসা আওয়াজ বেরুচ্ছে "বাঘ, বাঘ"। আর এদিকে দেখি একটা প্রকাণ্ড কালো রংএর জানোয়ার অন্ধকারে দৌড়োদৌড়ি কচ্ছে, আর মুক্তকচ্ছ নায়েব মশায় তাকে এলোপাতাড়ি লাঠির বাড়ি পেটাচ্ছেন আর বাপান্ত কচ্ছেন। মার খেয়ে সেটার গলা

থেকে হাঁচি কাশি এবং হরেক নমুনার আওয়াজ বেরুচ্ছে—তায় আবার অন্ধকার। সেটা যে কি জানোয়ার সনাক্ত করাই দায়। হঠাৎ সেটা সাঁ কোরে একটা ধানের মরাইয়ের তলায় ঢুকে পড়ল, আর দেখা গ্যালো না।

নায়েব মশায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললেন, "মশায়, এই শালার পাঁঠা বড় হারামজাদা. অজানা লোক দেখলেই তেড়ে ঢুঁ মারতে আসে—"

আমি। পাঁঠা কি মশাই, কি বলছেন ?

নায়েব। হ্যাঁ মশায়, পাঁঠাই বটে—পাজি শয়তান বোকাপাঁঠা। ব্যাপারটা হচ্ছে, আমার এক আত্মীয় এই চৌচালা ঘরে থাকেন। তাঁর যক্ষ্মারোগ আছে কি না, তাই কবরেজের ব্যবস্থা মত একটা বোকাপাঁঠা সর্ব্বদা ঘরে বাঁধা থাকে। আজ এই ভদ্রলোকের ছেলের কপালে গেরো আছে কিনা তাই দড়িও ছিঁড়েছে, দোরও খোলা পেয়েছে। সামনে পেয়ে হামলা করেছে, আর উনিও অন্ধকারে বাঘ মনে করে প্রাণপণে দৌড়োদৌড়ি করেছেন। উনি যদি একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখতেন ত এত নাজেহাল হতেন না।

আজ আমিও ঐ অবস্থায় পড়লে যে অন্যরকম কিছু হত না তা বেশ বুঝতে পারছি। ইতিমধ্যে নেপথ্যে এবং জনান্তিকে অনেক হাসাহাসি এবং গা টেপাটিপি সুরু হয়ে গেছে—তা সে সবে আর ভ্রূক্ষেপ করলাম না। আমি আর নায়েব মশায় সতীশকে উনুনের পাশে নিয়ে গিয়ে খানিকক্ষণ

বেশ কোরে ঘি মরিচ ডলে চাঙ্গা ক'রে তুললাম। কীর্ত্তন টির্ত্তন আর হোলো না। বাবুরা অনেক রাত্তির ধ'রে বাঘ কুমীর সাপ চোর এবং ভূতের গল্প করে ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজলেন। আমরা বাকি রাত্তিরটুকু কোন রকমে কাটিয়ে পরের দিন ভোরে-ভোরেই কলকাতা রওনা হলাম—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম।

বটব্যাল। হাঃ হাঃ রজ্জুতে সর্পভ্রম হতে পারে বটে, দুটোরই প্রায় একরকম চেহারা, কিন্তু বোকাপাঁঠাতে ব্যাঘ্র ভ্রম কি ক'রে হয় তা ত বুঝি না। বাবুজীর অবিদ্যার কারণ কিঞ্চিৎ ঘটেছিল না কি ?

নিরঞ্জন। শ্রীবিষ্ণুঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ ! নদে জেলার ডাকসাইটে বৈষ্ণবকুলে তাঁর জন্ম, করণ-কারণের নাম শুনলেও কাণে আঙ্গুল দেন।

বটব্যাল। আচ্ছা বাঘের ভাবনা তো ঘুচল, এখন পানীয় জলের বন্দোবস্তটা কি রকম বল দিকি। আমার আমীন যে বলে সেখানে খাবার জল নেই, তার মানেটা কি ? সেখানকার লোকে কি জল খায় না ?

নিরঞ্জন। এটা মিথ্যে বলেনি—আপনার লাটে জল নেই। লাল মিঞার আমলে একটা পুকুর কাটানো হয়েছিল বটে, কিন্তু ৩০ সালে বাঁধ ভেঙ্গে নোনা জল ঢুকে পুকুর ভেসে গেছলো। তার জল এখনও মুখে দেওয়া যায় না। আপনার প্রজাদের বড় কষ্ট, তারা সব আড়াই কোশ রাস্তা

ভেঙ্গে বোষ্টমখালির কাছারি-পুকুর থেকে জল নিয়ে যায় আপনি তো বরাবর নৌকো করে যাবেন, কুমোরটুলির বড় বড় জালা দু'তিনটে কিনে জল ভর্তি করিয়ে নিয়ে যাবেন, কিম্বা একটা গ্যালভানাইজ্‌ড্‌ ট্যাঙ্কও নিতে পারেন। একটা ভাল মশারি নেবেন। তাছাড়া সর্ষের তেল, কুইনাইন, ক্লোরোডাইন—

বটব্যাল। আচ্ছা, আচ্ছা যাবার তো দেরী আছে, সময় হলে তোর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সব ঠিক করা যাবে।

নিরঞ্জন। আচ্ছা তাহলে উঠি। ভাল কথা, উইলের খসড়া হয়ে গেছে, আজ সন্ধ্যেবেলায় আনব।

বটব্যাল। হয়েছে! তা থাক্‌, তাড়াতাড়ি কিসের? (অন্যমনস্ক হইলেন)

নিরঞ্জন। (মাথা চুলকাইয়া) আমি বলি কি আপনি আর একবার তাকে চান্স দিয়ে দেখুন যদি শোধরায়!

বটব্যাল। (চমকিয়া) অঁ্যা! (ম্লান হাসিয়া) হুঁঃ তুমিও যেমন, 'অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি'।

নিরঞ্জন। 'কয়লামে ময়লা ছুটে যব আগ্‌ করে পর্‌বেশ'—

বটব্যাল। কেন, অনুতাপের আগুন দেখা দিয়েছে নাকি?

নিরঞ্জন। অনুতাপ টনুতাপ নয় কাকা, এখানে আগ্‌ মানে টাকার খাঁকৃতি।

বটব্যাল। বটে! তার হাতে তো অনেক পয়সা ছিল, সে-সব কি হোলো?

নিরঞ্জন। কলসীর জল! কলসীই বা বলি কেন, তার মত সৌখীন লোকের কাছে তিরিশ হাজার টাকা এক গেলাসের মাপ। আমার মনে হয় এখন তার 'আবার ডাকিলেই খাইব' গোছের অবস্থা হয়েছে। এখন যদি আপনার তিন বছর আগেকার অফার রিপীট্ করেন তবে সে সুড়্ সুড়্ করে সুবোধ ছেলেটির মতই চলে আসবে।

বটব্যাল। তাহলে খুবই দুরবস্থা হয়েছে বল?

নিরঞ্জন। আজ আমাকে একবার দেখা করতে লিখেছে। মাথার ওপর একটা ফৌজদারী আর দুটো দেওয়ানী মামলা ঝুলছে, বডি ওয়ারেণ্ট বেরুলো বলে। তারপর এখন বিছানায় পড়ে আছে; লিভারে বেদনা, বাতজ্বর—এই সব।

বটব্যাল। বটে এতদূর! (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আচ্ছা তোমার কথামত আর একবার তাকে সুযোগ দিচ্ছি, কিন্তু এই শেষ। আমার সর্ত্তগুলো তো তুমি জান, তাকে সব কথা পরিষ্কার করে বলবে। আজই না হয় চলে যাও। উইলের কথাটা এখনও গোপন রেখেছি, তোমার খুড়ীমা এখনও জানেন না। তোমার কাছে তার জবাব শুনে যা হয় করব।

নিরঞ্জন। আচ্ছা আজই যাই। (প্রণাম)

বটব্যাল। এস, কল্যাণ হোক। (দীর্ঘনিশ্বাস) শিব, শম্ভো।

৩

১৯২৫ সাল হইতে যে চারটি ছেলে রামজয় সেমিনারীর সেকেণ্ড ক্লাসের একখানি পিছনের বেঞ্চি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ইজারা লইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মদনমোহন বটব্যাল মহাশয়ের প্রথম একমাত্র ও অতি আদরের সন্তান শ্রীমান্ লাড্‌লিমোহন বটব্যালও এক সরিক ছিলেন। সেকেণ্ড ক্লাসের উপর এই অহৈতুকী প্রীতির জন্য অবশেষে যেদিন পিতার কাছে যৎপরোনাস্তি তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইলেন, শ্রীমান্ সেইদিনই অভিমানভরে পিতাকে না জানাইয়া তিনপুরুষে কাঁঠাল কাঠের সিন্ধুকটি ভাঙ্গিলেন এবং নগদে নোটে ও অলঙ্কারে উপযুক্ত পরিমাণ—পাথেয় আহরণপূর্ব্বক মার্কিণগামী জাহাজে চড়িলেন। সেখানে পৌঁছিয়া দীর্ঘ আট বছরের সাধনার পর লাড্‌লিমোহন ফিল্‌ম্‌কলায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

স্বনামো পুরুষো ধন্যঃ। এখন মিঃ লাড্‌লি ভাটাভেল E.P.N.S. (Boston) A.S.S. (Chicago) কলিকাতার তথা আন্তর্জাতিক ছায়াছিত্র জগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, এবং একাধারে নট, নাট্যকার, সমালোচক, সিনারিও লেখক, প্রযোজক ও উৎপাদক। লক্ষ্মীর কৃপা না হইলেও নাম হইয়াছে।

দৈহিক সৌন্দর্য্য, বাক্‌বৈদগ্ধ্য এবং মার্জ্জিত শিষ্টাচার—ভাটাভেল সাহেবের এই তিন দফা মূলধন ইয়াঙ্কি দেশে ধাতব

মূলধনের চেয়েও বেশী কাজ দিয়াছে। ইহারই জোরে অরণ্যকোটের রাজকুমার বলিয়া ভদ্রসমাজে পরিচিত হওয়া এবং কাঞ্চনকুলীন সমাজের দুই চারিটা খানা-পিনায় নিমন্ত্রণ পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। ইহারই জোরে সুন্দরী রমণীরত্ন লাভ হইয়াছে। শ্বশুর বড় কেও কেটা নন, শিকাগো শহরের 'র‍্যাগ এণ্ড বোন কিং' বিল বাম্পার—যিনি দশ বছর বয়স হইতে শহরে হাড় ও নেকড়া বেচিয়া এখন ধনকুবের। পর পর চারটি মেয়েকে মোটা মোটা ডলারের বস্তা সমেত ইউরোপের চারটি নামজাদা হাঘরে অভিজাত-সন্তানের হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন। কিন্তু পঞ্চমা কন্যা পেগি যখন দুধে-কফি-রঙের ইণ্ডিয়ান প্রিন্সটাকে বিবাহ করিবে বলিয়া গোঁ ধরিল তখন ঘোরতর আপত্তি করিলেন। তাহা সত্ত্বেও যখন তাহারা তাঁহাকে লুকাইয়া রাতারাতি এক গীর্জ্জায় গিয়া বিবাহটা রেজিষ্টারী করিয়া আসিল, তখন খামের মধ্যে একখানি দশহাজার ডলারের চেক এবং একটি পেনসিলে আঁকা ছবি পুরিয়া কন্যা জামাতাকে পাঠাইয়া দিলেন। ছবিটি এই রকম—তাঁহার নিজের বাড়ীর দরজায় একটি বুলডগ দাঁত বাহির করিয়া গজরাইতেছে, তলায় শুধু লেখা আছে "Beware" অর্থাৎ "সাবধান!"

অবশ্য দেশে ফিরিবার পর দশহাজার ডলার ফুরাইতে বেশী দিন লাগে নাই। চাকরীর খোঁজ করিতে করিতে একটা নামজাদা বাঙ্গালী ফিল্‌ম্ কোম্পানীতে ভাল চাকরী জুটিয়

গেল। কিন্তু একদিন বেহেড্ অবস্থায় ষ্টুডিওর ভিতরে তাহাদের 'তাড়কা' অভিনেত্রীর ব্লাউজ ধরিয়া টানাটানি করাতে সেটুকু খোয়া গেল। তারপর কিছুকাল ধরিয়া বোম্বাইএর Talkyrot ও মাদ্রাসের Moviebunkum কাগজের এডিটারী করিয়াছেন এবং মনের সাধে বাঙ্গালী ফিল্‌ম্‌ওয়ালাদের বাপান্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি গুটিকয়েক অপোগণ্ড ধনী-সন্তানকে নানারূপ দুনিয়াদারী দেখাইয়া সাবালক করিয়াছেন বলিয়া তাহারা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার প্রস্তাবিত “ইণ্ডো-আমেরিকান চাটার্‌ড্ ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেডের” কিছু কিছু শেয়ার নগদ টাকা দিয়া কিনিয়াছে এবং অধিকাংশ শেয়ারই কিনিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

আজ লাড্‌লি সাহেব তাঁহার তেলেঙ্গাবাগান লেনের বাংলোর বারান্দায় একখানি ইজিচেয়ারের উপর আড় হইয়া পড়িয়া খোঁয়ারি ভাঙ্গিতেছেন। কালিকার রাত্রিটা বজবজের এক বান্ধবীর গৃহে কাটিয়াছে। বার্ণিস-চটা টেবিলের উপর একটি টাম্‌ব্লার গেলাসে সস্তা দেশী রম্— বাঁ হাতের দুই আঙ্গুলের ফাঁকে কড়া বর্ম্মা চুরুট মড়াপোড়া গন্ধ ছাড়িতেছে। চোখ লাল, মাথার চুল উস্‌কো-খুস্‌কো, দুদিন দাড়ি কামানো হয় নাই বলিয়া ফর্সা মুখখানাকে সবুজ দেখাইতেছে! পরণে লালনীল ডোরাকাটা ইমিটেশন ফ্লানেলের শ্লীপিং সুটের উপর একটা আধময়লা এবং অনেক দাগলাগা ফুলদার কিমোনো। পায়ে তালি-দেওয়া এলবার্ট

স্লিপার। ছোট-হাজরির দেরী নাই, উঠানের কোণে ভাঙ্গা টালি-ছাওয়া রান্নাঘর হইতে তীব্র পেঁয়াজের গন্ধ আসিতেছে।

বাড়ীর পিছনে চৌবাচ্ছার ধারে একটি তরুণী মেমসাহেব আস্তিন গুটাইয়া একটা কাঠের টবে সাবানগোলা জলে কাপড় রগ্‌ড়াইতেছেন। সুন্দরী, সুমধ্যমা, ছিপছিপে গড়ন। এতদিন গরম দেশে থাকিয়াও রংটির দুগ্ধশুভ্রতা ম্লান হয় নাই। চোখে মুখে বিষাদের অনপনেয় রেখা অঙ্কিত হইয়াছে।

সাহেবের ছোট-হাজরি শেষ হইতেই নিরঞ্জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঝকঝকে সাদা দাঁত বাহির করিয়া এবং নীলশিরাবহুল শীর্ণ গৌরহস্ত প্রসারিত করিয়া সাহেব বলিলেন, "Hello, old boy, it's really kind of you to come down, I have been wanting you so badly." চুরুটের বাক্সটা আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "Help yourself."

নিরঞ্জন। ওসব চলবে না বাবা, সিগারেটটা আসটা থাকে তো দাও। তারপর কাজের কথা কও দিকিন। তলব করা হয়েছে কি মনে করে? ঘুম থেকে উঠেই তো এক কাঁড়ি মদ গিলেছ দেখছি, কাজের কথা কইবার মতন হাল তোমার নয়।

লাড্‌লি। Oh, don't you worry, I'm good enough for a ten mile gallop.

নিরঞ্জন। গ্যালপ্‌ কি সাহেব? ঘোড়া কিনলে কবে?

লড্‌লি! (বিকৃত সুরে গান)

My little pony is for you,
I bought a lover for a penny & don't want two,
My little pony—

নিরঞ্জন। বেড়ে আছো, ভাবনা কিসের—যা দুঃখ তোমার অন্ন বস্ত্রের, আর কিছুর নয়।

লাড্‌লি। Ah, yesh, you've hit the nail on the head this time. I am really at the end of my tether-r-r.' Well, look here old boy, I-I've done sowing my wild oatsh and I'm goin' to r-r-reform. Know what I mean ?

নিরঞ্জন। Yes, you are going to reap—reap the whirlwind.

লাড্‌লি। Tommyrot ! আমি খি—খি—বোলছি তলিয়ে বোঝো।

নিরঞ্জন। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি, অত বোকা নই। তিন বছর আগেকার কথাটা মনে পড়ছে—নয় ?

লাড্‌লি। দেখ নিরু, You're a 'cute boy. তুমি যা আঁচ করেশো, আমি ক-মাস ধ'রে তাই seriously ভাবছি, seriously বললে ভুল হয় furiously ভাবছি, কারণ অবস্থাটাও deshperate হয়ে আসছে। এই দেখনা এতবড় একটা লিমিটেড কোম্পানির পত্তন কল্লুম, কতো বাপের সুপুত্তুরের মাথায় হাত বুলিয়ে শেয়ার বেচলুম, কতো জায়গায় পট্টি

লাগিয়ে বাছা বাছা ষ্টার আর্টিষ্ট ভাঙ্গিয়ে আনলুম, খেটে খেটে শরীর ভেঙ্গে গেল, তবু বেটারা বলে গুরি করেশি—গুরি করবার আশে কিরে শালারা? দশ লাখ টাকা ক্যাপিটালের দশ হাজার টাকা পেড্ আপ্ শেয়ার! ব্যাংএর আধুলি! যাঃ শালারা ব্যাংএর আধুলি ধুয়ে খেগে যা। আমি তো ইস্তফা দিশ্শি। Let the Company go to blazes! I don't care a hang.

নিরঞ্জন। আচ্ছা তা তো হোলো, এখন কি করব বল দিকিন? তোমার বাবা কি করছেন শুনেছ ত?

লাড্নি। Why, what's the old devil up to? চট্ করে বলে ফ্যালো।

নিরঞ্জন। উইল করছেন, দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীকে সব সম্পত্তি দিয়ে যাবেন।

সাহেব এইবার রীতিমত চটিয়া অনুপস্থিত পিতা ও বিমাতার উদ্দেশ্যে যেসব সুমধুর ভাষায় মন্দাকিনীধারা বহাইয়া দিলেন, লেখনীতে তাহার বর্ণনা অসম্ভব। নিরঞ্জন কাণ হইতে আঙ্গুল নামাইয়া বলিলেন, "হয়েছে, না আরও আছে? অত তড়পাচ্ছ কেন মাণিক, শেষ পর্য্যন্ত শোনই না?"

লাড্লি। Fire away!

নিরঞ্জন। তোমার বাবা বলছেন, এ উইল স্থগিত রাখবেন যদি তুমি তিন মাসের মধ্যে তাঁর চারটি সর্ত্ত পালন

কর। পয়লা নম্বর—বাস্তুভিটেতে ফিরে এসে বাস করা, দু'নম্বর—কালাপানি পার হবার প্রায়শ্চিত্ত, তিন নম্বর—ম্লেচ্ছ রমণী সংসর্গ ত্যাগ, এবং চার নম্বর—তোমার বাবার পছন্দমত একটি বনেদী নিষ্ঠাবান পরিবারের একটি সুশীলা কন্যাকে বিবাহ করে সংসারী হওয়া। তাঁর কথা যদি শোনো তবে তুমি বার আনা সম্পত্তির ওয়ারিশান হবে এবং তোমার নতুন বৌয়ের নামে ৩০০৲ টাকা মাসহারা বরাদ্দ হবে।

লাড্‌লি। (লাফাইয়া উঠিয়া) মাইরি? ঠিক বোল্‌শো? ধাপ্পা নয়তো?

নিরঞ্জন। যদি বিশ্বাস না হয় তো সোজাসুজি বাপের কাছে চলে যাও।

লাড্‌লি। (নিরঞ্জনের হাত ধরিয়া) ওহো ভাইরে, নিরুরে! কি কথাই শোনালি রে! আহা, এমন সতীলক্ষ্মী বাপ ছেড়ে কোন্ বনবাসে পড়ে আছি রে! (ক্রন্দন) আমি সব বদখেয়াল ছেড়ে দেব, গোবর খাব, কুলোর বাতাস দিয়ে অলক্ষ্মী বিদেয় করব, একটা পোঁটাপড়া ছিঁচকাঁদুনে বৌ এনে সুখে ঘরকন্না করব—আর দুবেলা বাবার খড়ম পুজো করব। (ক্রন্দন)

(একটু সামলাইয়া) পিতা স্বর্গঃ পিতা অর্থঃ তারপর কিরে? (নাকে রুমাল প্রদান)

নিরঞ্জন। (স্বগতঃ) মাতালটার হুঁসপবন বেশ আছে দেখছি!

লাড্‌লি সাহেবের রাসভবিনিন্দিত কণ্ঠে কান্নার আওয়াজ পাইয়া মেম-সাহেব দৌড়াইয়া আসিলেন। সাহেবের দুই কাঁধে দুই হাত রাখিয়া মুখের কাছে মুখ নিয়া ভীতা ত্রস্তা হরিণীর মত দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন "What ails you dearie ? লিভারের ব্যথাটা আবার হচ্ছে ?" তার পরেই মদের গেলাসে চোখ পড়িতে বলিলেন, "ও মাই গড্, আবার আরম্ভ করেছ ? সেদিন ডক্টর সেন কি বলে গেছেন মনে নেই ? তোমার কি জীবনের ওপর একটু মায়া নেই ? নিষ্ঠুর, তুমি নিজেও মরবে, আমাকে মারবে !" এই বলিয়া হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

লাড্‌লি। Well I ain't, darling—তুমি আগে মরলে বড়ই বাধিত হব। (অল্প অল্প ঝিমাইতে লাগিলেন)

পেগি। (হাত কচলাইয়া) দেখুন, দেখুন মিষ্টার চাটার্জ্জি, আমি আর পারি না—I'm tired of this man and my life. আমি বড় আশা করে স্বামীর সঙ্গে এদেশে এসেছিলাম, আমার সব আশাই নির্ম্মূল হয়েছে। এই লোকটাকে ভালবাসি বলেই এর শত লাম্পট্য, প্রবঞ্চনা এবং অত্যাচার সয়ে আছি। আমার মনের কোণে এখনও একটু আশা আছে, একে ভাল করে তুলতে পারব, ও যদি কেবল মদটা ছাড়ে! আমার ইচ্ছে করে, ওকে নিয়ে কোন দূর গ্রামে চলে যাই, সেখানে একখানি কুঁড়ে বেঁধে থাকি, ফার্ম্মিং, পোলট্রি, ডেয়ারী এইসব করি। এই কুৎসিত,

কদর্য্য, বিষাক্ত শহর ছেড়ে, যেখানে হোক পালাতে চাই। সেদিন ডাক্তার সেন ওর death warrant দিয়ে গেছেন, বলেছেন মদ চলতে থাকলে ছ-মাসের মধ্যে মারা যাবে। (ক্রন্দন)

লাড্‌লি। Shut up, you darned idiot! (মাথা তুলিয়া এবং চোখ পাকাইয়া) জানো এখন আমি কি করব? আমার স্নেহময় রাজা বাপের কাছে ফিরে যাব। আমাদের সাবেক রাজবাড়ীতে ফিরে গিয়ে রাজার ছেলের মত থাকব।

মেমসাহেব। Oh, he has squared up with the old man, has he, Mr. Cratterji? ওঃ, আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে। এই নরকে আর এক মিনিটও থাকতে চাই না। (তাহার পর অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল) আপনি বোধ হয় জানেন না, মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি, ক্যালিফোর্ণিয়াতে আমার দিদিমা স্বয়ং বিবেকানন্দের কাছে হিন্দুধর্ম্মের দীক্ষা নিয়েছিলেন! বোধ হয় সেই রক্ত আমার শিরাতে বইছে বলে ছেলেবেলায় ভারতবর্ষ দেখবার এত ইচ্ছে হত। শিকাগোতে ধনগোপাল মুখার্জ্জির বই পড়ে অবধি আমার বড় সাধ হয়েছিল, একটি খাঁটী বনেদী হিন্দু পরিবারের মধ্যে থেকে তাদের জীবনধারার খুটিনাটি স্বচক্ষে দেখবো, চার হাজার বছরের পুরানো কালচারের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াব। এইবার ভগবান বুঝি

সেই আশা করলেন! কি মিষ্টার চাটার্জ্জি, কথা কইছেন না যে? লাড্‌লি ডিয়ার, চলো আমরা আজই ড্যাডের কাছে যাই। I'll break the ice. আমরা দুজনে তাঁর পায়ের তলায় বসে আশীর্ব্বাদ চাইব। তাঁর তো মেয়ে নাই, আমি তাঁর মেয়ে হব, তাঁর সব কাজ করে দেব, রোজ সকাল সন্ধ্যে তাঁর দেবতার ঘর পরিষ্কার করব, পূজার আয়োজন করে দেব। (হঠাৎ শঙ্কিতভাবে) ও, আমি বুঝতে পেরেছি, তোমরা কথা কইছ না কেন! আমি বিধর্ম্মী আমি খ্রীষ্টান, ওল্ডম্যান আমায় ঢুকতে দেবে না। তবে আমি কোথা যাবো? আমার কি হবে? (লাড্‌লি সাহেবকে জড়াইয়া ধরিয়া এবং হাঁটুতে মাথা রাখিয়া) না না, আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না, তাহলে মরে যাব। আমি হিন্দু হব, আমায় শুদ্ধি করিয়ে নাও—তোমার জন্যে আমি বাপ মা ভাই বোন সবাইকে ছেড়ে সাত হাজার মাইল দূরে এসেছি, এইবার ধর্ম্ম ছাড়বো। আমি তোমার কাছে না থাকলে তোমায় চোখে চোখে রাখবে কে? আমি সাবিত্রীর গল্প পড়েছি, সে যেমন সত্যবানকে বাঁচিয়েছিল আমিও তেমনি তোমাকে বাঁচাবো।”

পেগির প্রেমের বন্ধনে অসহায় হইয়া লাড্‌লি সাহেব নিরঞ্জনের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইয়া আছেন। নিরঞ্জনও তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন, মুখে কথা যোগাইতেছে না। এই ধূমায়মান অগ্নিগর্ভ নীরবতার

আবরণ ভেদ করিতে কাহারও সাহসে কুলাইতেছে না। লাড্‌লি সাহেবের যখন সুদিন ছিল তখন নিরঞ্জন পেগিকে কয়েকবার দেখিয়াছেন, কিন্তু এত কাছে, এত অন্তরঙ্গ সুনিবিড় পরিচয়ের অবকাশ কখনো ঘটে নাই। তখন তাহাকে দেখিয়াছেন স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য্যের আবেষ্টনে তীব্রোজ্জ্বল বিলাসলাস্যের পটভূমির কেন্দ্রগতা রঙ্গিণী-রূপে, আজ দুর্দ্দিনের বর্ষণমুখর মেঘের ধূসর চন্দ্রাতপতলে দেখিলেন, তাহার একাধারে নারী, বনিতা ও মাতা-রূপ—বৃষ্টির জলে ধোয়া কচি পাতার মত স্নিগ্ধশ্যাম নয়নাভিরাম মাধুরী। আজ দেখিলেন সেই নগ্না চিরন্তনী নারীকে, যে নারী দেশ কাল পাত্রাতীতা, যাহার অঙ্গের শর্ট স্কার্ট, সাড়ী সিঁদুর আলতা, কাঁচলি, পেশোয়াজ, পাউডার, সুর্মা—সবই নিরর্থক, অথবা সবই সার্থক।

নিরঞ্জনের নিজেকে সহসা অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘৃণার্হ মনে হইল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা সাহেব, আমি তবে উঠি, আমার একটা জরুরী অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।" পেগিকে একটা বিদায়-সম্ভাষণ পর্য্যন্ত না করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

ভাটাভেল সাহেব ডাকিলেন, "পেগি ডিয়ার!"

পেগি। লাড্‌লি ডার্লিং!

ভাটাভেল। এই—এই—তোমার কোন লভার ছিল?

পেগি। (হাসিয়া) কেন? যদি বলি হাঁ?

ভাটাভেল। এখনও আছে? সে তোমায় ভালবাসে?

পেগি। (দুষ্টামি করিয়া) খু-উ-উব। এখনও প্রতি মেলে তার প্রেমপত্র আসে।

ভাটাভেল। তার পয়সা আছে?

পেগি। ওঃ, টাঁকশাল বললেই হয়।

ভাটাভেল। তার বাড়ী কোথা।

পেগি। শিকাগো।

ভাটাভেল। বিয়ে করেছে?

পেগি। না। Why what's the game? তিনজনে মিলে লিমিটেড ফ্যামিলি করতে চাও? হি হি হি হি।

ভাটাভেল চুরুটটি শেষ করিয়া আধপোড়া টুকরাটি ফেলিয়া দিয়া, বলিলেন "তুমি তার কাছে ফিরে যাও!"

পেগি। What! (উঠিয়া কোমরে দুই হাত দিয়ে দাঁড়াইল)

ভাটাভেল। আমি ঠাট্টা করছি না। তুমি আমার সঙ্গে থেকে কোন কালে সুখী হবে না। তুমি তোমার লভারের কাছে ফিরে যাও, আমি আমার বাপের কাছে ফিরে যাই।

পেগি কিছুক্ষণ পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর কঠিনকণ্ঠে বলিল, "তোমায় স্ত্রী তোমার সঙ্গে তোমার বাড়ীতে যেতে পারে না কেন, তাকি বলতে আপত্তি আছে, মিষ্টার ভাটাভেল?"

ভাটাভেল। (ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া) Oh, I'm tired of you! তুমি তো নিজেই জান তুমি খ্রীষ্টান, আমার বাবা তোমার বাড়ী ঢুকতে দেবেন কেন?

পেগি। আমি হিন্দু হব, তাহলে নিশ্চয়ই দেবেন।

ভাটাভেল। (হাসিয়া) অত সোজা নয়। তাছাড়া তুমি নিজমুখেই স্বীকার করলে তুমি দ্বিচারিণী। হিন্দু বাড়ীতে দুশ্চরিত্রা মেয়ের স্থান নেই।

পেগি। (মেঝেতে জুতা ঠুকিয়া) পাজী! লম্পট! স্কাউণ্ড্রেল! তোমায় আমি কিক্ কোরবো। (সাহেব ভয়ে পিছাইয়া গেলেন) তুমি কি আমাকে সেকালের মোগল হারেমের ক্রীতদাসী পেয়েছ যে যা খুসী তাই করবে? তোমাকে খোরপোষের দাবী দিয়ে আদালতে দাঁড় করাবো! টাকা তো তুমি দিতে পারবে না, তখন তোমার সিভিল জেলে পুরব—

ভাটাভেল। তার আগেই মাই ফ্রেণ্ড চ্যাটার্জ্জিকে দিয়ে ব্যভিচারের অজুহাতে ডাইভোর্সের মামলা রুজু করে দেব। সাক্ষী সাবুদ প্রেমপত্র এ সবই পয়সা খরচ করলে পাওয়া যায়। আর এটা কিছু অন্যায়ও হবে না, যখন তুমি নিজমুখে স্বীকার করেছ। (হাসিয়া) তোমার ভাবনা কি ডিয়ারি, তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে, লভারও আছে। (চলিয়া গেল)

পেগি। উঃ, কি শয়তান! (কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তারপর আপন মনে বলিতে লাগিল) আমি কোথায়

যাব, কি করব, কে আমায় আশ্রয় দেবে? (ম্লান হাসিয়া) এক আশ্রয় আছে বটে সেখানে চিরদিনের মত শান্তি! (কঠিন হইয়া) না, আমি ইয়াঙ্কি গার্ল, এত সহজে জীবনযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করব না। আমার গায়ে জোর আছে লেখাপড়া জানি, খেটে খেতে পারি—নূতন করে জীবনের পত্তন করব। পৃথিবীর আর কোন বাঁধন আমায় বাঁধতে পারবে না—আমার প্রেম মরেছে, মরেছে, মরেছে, (কান্না চাপিয়া চলিয়া গেল)

৪

বটব্যাল মহাশয় জলপথে পীরখালি তালুকে চলিয়াছেন। সাদা রং করা বড় ভাউলিয়াখানির দুটি কামরা। গলুইয়ের দিকের কামরায় মুসলমান দাঁড়মাঝিরা ও তাহাদের পোঁটলা-পুঁটলি এবং তরাটের দিকের কামরায় তিনি ও তাঁহার বাক্সপেঁটরা। সামনে পাটাতনের উপর একটি প্রকাণ্ড কালো জালা কাণায় কাণায় গঙ্গাজলে ভর্ত্তি এবং সরা দিয়া ঢাকা নৌকার চার খানি দাঁড় আছে, তবে তাহা কাজে লাগানো হইতেছে না। পাল তুলিয়া হালকা বাতাসে ভর করিয়া ভাউলিয়াখানি বনহংসীর মত অলসমন্থর গতিতে চলিয়াছে। শেষা চৈত্রের দুপুর বেলার হাওয়া আগুনের হলকার মত গরম।

জলে, স্থলে, আকাশে বাতাসে একটা ক্লিষ্ট স্তব্ধতা ও—নিশ্চেষ্টতা ওতঃপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছে। সবুজ রংএর বড়ই অভাব। নদীর ধারে ছাড়া গাছপালা বড় একটা নাই—বহু দুরে দুরে দুই একটা দেখা যায়। ধানের গোড়াকাটা মাঠগুলা ধূসর ও প্রাণহীন। মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়াছে, তৃষ্ণা মিটিতে এখনও অনেক দেরী। তেলপানা নিথর জল একঘেয়ে একটানা ধীরগতিতে চলিয়াছে। মাথার উপরের আকাশ স্বচ্ছনীল, কিন্তু নীচের দিকে ঘোলাটে রং। দিগ্‌বলয়ের সীমা অনির্দ্দেশ্য ও অপরিস্ফুট, আকাশ ও মাটির রং সেখানে মিশিয়া একাকার হইয়াছে।

বটব্যাল মহাশয় মাথায় ভিজা গামছা জড়াইয়া বসিয়া আছেন, মনে মনে নানা কথা তোলাপাড়া করিতেছেন। "অর্থ, অনর্থ, অশান্তি—এ তিনই এক। কার্য্য কারণের অভেদটা দেখছি সব জায়গাতেই খাটে। আমার অর্থের ভবিষ্যৎগতির কথাটা যেদিন ব্যক্ত হয়েছে, সেদিনই অশান্তির বীজবপন হয়েছে। মরবার বয়স তো আমার হয়নি, এখনও বোধ হয় ১০।১৫ বছর বাঁচব, এত শিগ্‌গির উইল করবার দুর্ম্মতিই বা আমার হল কেন? ইতিমধ্যেই তো বিমাতা এবং পুত্রে আসন্ন সংঘর্ষের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আমার জীবদ্দশায় না হয় একরকম করে কেটে যাবে, কিন্তু আমি মলে কি হবে? দূর হোক্‌গে ছাই, ও-সব ভেবে কি হবে? মলে যা হবার তা হবে, আমি তো আর দেখতে আসব না? আমার পরম

শান্তি এই যে উচ্ছৃঙ্খল ছেলেটা ঘরে ফিরে সংসারী হয়েছে। আমি না হয় গৃহিণীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কাশীর বাড়ীতে বাস করব। তবে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' এই যা কথা, সহজে রাজা হবে কিনা সন্দেহ। তা সেখানেও যুবতীর মনোরঞ্জনের সব সরঞ্জামই আছে। থিয়েটার আছে, বায়োস্কোপ আছে, ভাল ভাল কাপড় গয়নার দোকানও আছে। হাওয়া খাবার জন্যে একখানা মটরগাড়ীর ভারি সাধ, কথা দিয়ে কথা রাখিনি বলে উঠতে বসতে গঞ্জনা দেয়। বেশ, কাশী গিয়ে তার খোঁটা দেওয়া বন্ধ করব। নগদ টাকা কড়ি আর অলঙ্কারগুলো নিজের কাছেই রাখব, সাবধানের মার নেই। ঘরবাড়ী জমিজমার ঝামেলা সব ছেলেটার ঘাড়ে ফেলে দেব, বারমুখো হবার সময় পাবে না, বিষয়বুদ্ধিও পাকবে। জীবনের বেশী ভাগটাই এই ঝামেলা পুইয়ে কাটল, এখন আর ভাল লাগে না। এইবার পরকালের ভাবনা ভাববার অবসর চাই। উঃ কি অসহ্য গরম, একটু জল না খেলে তো প্রাণ বাঁচে না। আজ আবার একাদশী, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাটা সেরে নিই। ওরে ভজুয়া, ওঠ্ বেটা ওঠ্, সন্ধ্যের যোগাড়টা করে দে। এই নৌকোতেই হবে'খন, বৃহৎকাষ্ঠে দোষ নেই।"

ভজুয়া ঘুমাইতেছিল, তাড়াতাড়ি উঠিল সব জোগাড় করিয়া দিল।

ইতি মধ্যে নৌকাখানি আঠারোবেঁকির খালে ঢুকিয়াছে। মাঝি এতক্ষণ হালখানি ধরিয়া ঝিমাইতেছিল, এইবার উঠিয়া দাঁড়াইল। এই খালে তাহারা একটু হুঁসিয়ার হইয়াই হাল ধরে! দুই পাশে ঝোপঝাপ এবং একটু আধটু পাতলা জঙ্গল দেখা দিয়াছে। চার পাঁচটা বাঁক ঘুরিতে খালটি সরু হইয়া আসিল এবং স্রোতের বেগ বাড়িতে লাগিল। ক্রমে নিবিড় নীরন্ধ্র বনভূমি দেখা দিল, মাঝে মাঝে দু'একটা বুনা শুয়ার হুটপাট করিয়া শুকনা ডাল ভাঙ্গিয়া এবং লতাপাতা ছিঁড়িয়া পালাইতে লাগিল। খালটী এই দিন দুপুরে অন্ধকার সুড়ঙ্গের আকার ধারণ করিয়াছে। দুই তীরের বড় বড় সুঁদরি বাইন এবং কেওড়া গাছগুলি ঠেকাঠেকি করিয়া মাথার অনেক উপরে সবুজ খিলান বানাইয়াছে। মিশকালো জল আকুল উচ্ছ্বাসে নৌকার দেহকে আলিঙ্গন করিয়া তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। একটা বেয়াড়া রকমের প্যাঁচালো বাঁক ঘুরিয়াই নৌকাখানা হঠাৎ একটা ঝুলিয়া পড়া ভাঙ্গা গুঁড়ির সামনে পড়িল। দাঁড়ি মাঝি সব হৈ হৈ করিয়া নৌকার মুখ ঘুরাইতে না ঘুরাইতে গলুয়ের উপর প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিল এবং নৌকাখানি একেবারে কাত হইয়া ডুবু ডুবু হইল। ভাগ্যক্রমে হালখানি ভাঙ্গে নাই বলিয়া অনেকখানি জল বোঝাই লইয়া নৌকা আবার আস্তে আস্তে খাড়া হইল। জল সমেত জালাটি ডিগ্‌বাজী খাইয়া খালে পড়িয়া গিয়াছে!

বটব্যাল মহাশয় চোখ বুজিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছিলেন, ব্যাপারটা কি বুঝিবার আগেই ঝটকা লাগিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া দুর্ঘটনার বিবরণ শুনিলেন এবং জলের জালাটি অদৃশ্য হইয়াছে দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

"এখন উপায়? এই দারুণ গ্রীষ্মে জল না পেলে তো প্রাণটা যাবে! কি হে শেখের পো! এ তো বড় মুস্কিল হয়ে গেল! কি করা যায় বল দিকি? এই খালের ধারে কাছাকাছি কোন গ্রামট্রাম আছে নাছে নাকি, যেখানে জল পাওয়া যায়?"

"এখানে গাঁ কম্নে ঠাকুর মশায়? এতো অজগর বিজগর বন। এই বন ছাড়িয়ে সন্ধ্যে লাগাদ্ হা—ই বেদেডাঙ্গা পৌঁছুলে তবে খাবার পানি পাওয়া যাবে।"

বটব্যাল মহাশয় বিরসবদনে ভাবিতে লাগিলেন। সহসা খালের পাড়ে হেঁতালের ঝোপের ভিতর হইতে গম্ভীর কর্কশ ষড়্জস্বরে রহস্যময় প্রশ্ন আসিল, "কবা, কবা, কো-বা কো-বা?"

ভয়চকিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কি ও!

মাঝি হাসিয়া বলিল, "এজ্ঞে ওটা ডাহুক পাখী, কর্ত্তা!"

রাত্রির অন্ধকারে বেদেডাঙ্গা পৌঁছিয়াও দুর্ভাগ্যক্রমে পানযোগ্য জল পাওয়া গেল না, কারণ গত দুই তিন দিনের গ্রামের একশত জন বাসিন্দার মধ্যে পনেরো জন কলেরায় মরিয়াছে এবং সেখানকার একটিমাত্র পানীয়জলের পুষ্করিণী,

কলেরা রোগীদের কাঁথাকানি কাচিয়া দূষিত হওয়ায়, গতকল্য প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ আসিয়া সেটিকে কাঁটার বেড়া দিয়া ঘেরাইয়াছেন এবং যাহাতে কেহই তাহার জল ব্যবহার না করিতে পারে সেজন্য চৌকীদার মোতায়েন রাখিয়াছেন।

রাত পোহাইলে 'শেখের পো' বলিল বেদেডাঙ্গা হইতে তাঁহার পীরখালি লাট বেশী দূর নয় অতএব একেবারে পীরখালি পৌঁছিয়াই ভাল জল পাওয়া যাইবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রতিবাদ করিলেন, কেন না তিনি নিরঞ্জনের কাছে শুনিয়াছেন, তাঁহার লাটে পানীয় জল নাই, প্রজা সব মুসলমান, বোষ্টমখালি হইতে জল আনিতে হয়। তাহার উত্তরে শেখের পো জানাইল পীরখালিতে একঘর সদ্গোপ আছে, অন্ততঃ লালমিঞার আমলে যে ছিল তাহা সে জানে।

জোয়ারের মুখে নৌকা ছাড়িয়া পীরখালি পৌঁছাইতে চার পাঁচ ঘণ্টা লাগিল। বটব্যাল মহাশয়ের এ পর্য্যন্ত একরকম নিরম্বু উপবাসই চলিয়াছে জল পান না করিয়া কোন খাদ্যদ্রব্যই মুখে তুলিতে রুচি হইতেছে না। কেবলমাত্র দু'চারখানা শাঁকআলু, শশা এবং আকের কুচি চিবাইয়াছেন, এখন তাহাতেও বমনোদ্রেক হইতেছে। মুখ বিশুষ্ক, ঠোঁটে ফেকো পড়িয়াছে, হাতে পায়ে জোর পাইতেছেন না। ভজুয়াকে জল আনিতে পাঠাইয়া এবং মোড়লকে ডাকিতে বলিয়া শূন্য কাছারি বাড়ীর দাওয়াতে গিয়া বসিলেন। লালমিঞার আমলে

এখানে একজন কর্ম্মচারী থাকিত বলিয়া বছর বছর মেরামত হইত, এখন ইহার ভগ্ন দশা।

সামনে উন্মুক্ত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। আজ বাতাস ও গরম দুইয়েরই প্রচণ্ড তেজ। গায়ের ঘাম শুকাইয়া গা জ্বালা করিতেছে, গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, কাণে ঝিঁ ঝিঁ লাগিয়াছে। বটব্যাল মহাশয় ভাবিতেছেন "শুভদিন দেখেই তো যাত্রা করেছি, তবে এত দুর্ভোগ কেন? আশ্চর্য্য! এমন তাজ্জব দেশও কোথাও দেখিনি! খালি শুকনো মাঠ, নোনা খাল, আর গরাণ সুঁদরির জঙ্গল! না আছে একটা আম কাঁঠালের বাগান, না আছে একটা শানবাঁধান পুকুর! একেবারে কিরাতভূমি! কেবল পোদ, কৈবর্ত্ত, জেলে মালা আর মুসলমানদের বাস! এমন দেশেও লোকে আসে? নিরঞ্জনটার পাল্লায় পড়েই আমার আজ এই গেরো। সে জেদ কল্লে বলেই তো আসতে হলো। আচ্ছা, আমারই বা আক্কেলটা কি? রওনা হবার একদিন আগে খবর পাঠালেই তো হ'তো!"

.........ওঃ তেষ্টায় প্রাণ যায়, দুদিন জল খাইনি, আর যে পারি না। ভজুয়া বেটা এত দেরী করে কেন? ওই যে আসছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ ওই বটে! ওর সঙ্গে আবার কে? মোড়ল বোধ হয়? ও কি, কলসীটা অমন কানা ধরে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে আসে কেন? তবে কি জল পায় নি? হা ভগবান!"

মোড়ল আসিয়া আভূমিপ্রণত সেলাম করিল এবং জানাইল এগ্রামের সদ্গোপ প্রজাটী শ্বশুরের বিষয় পাওয়াতে ছয়মাস আগে চাটিপাটি তুলিয়া অগস্ত্য যাত্রা করিয়াছে। ঠাকুর মহাশয়ের সেবার যোগ্য জল এগ্রামে পাওয়া যাইবে না। ভজুয়াকে বোষ্টমখালি পাঠাইতে হইবে, সেখানকার নায়েববাবু বড় ভদ্রলোক, খবর দিলেই ভজুয়ার সঙ্গে নৌকা করিয়া জলের টাঙ্কি পাঠাইয়া দিবেন। ভজুয়া চলিয়া গেল।

বটব্যাল মহাশয়ের দুর্ভোগ এইবার কানায় কানায় পূর্ণ হইল। কোন কথা না কহিয়া উত্তরীয় খানি মাটীর মেঝের উপর বিছাইয়া শুইয়া পড়িলেন। গ্রামবাসীরা একে একে আসিয়া সেলাম দিতেছে। ছেলেবুড়ো সকলেই নূতন জমিদারকে দেখিতে আসিয়াছে। তাঁহার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে মোড়লের ব্যক্ত মতামত এবং সমবেত গ্রামবাসীদের চাপা কথাবার্ত্তার মৃদু গুঞ্জন কোন অতীন্দ্রিয় স্বপ্নলোকের অস্ফুট ধ্বনির মতই কাণে লাগিতেছে। কাছারিবাড়ী, লোকজন, ধানের মরাই, উড়ন্ত পায়রার ঝাঁক, সুদূর দিগন্তে নৌকার পাল, সবই যেন লঘু অবাস্তব, অশরীরী ছায়ার মত চোখের সামনে ভাসিতেছে। ক্রমে চেতনা লুপ্ত হইল, বটব্যাল মহাশয় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

* * *

জাগিয়া দেখিলেন সূর্য্যাস্তের দেরী নাই। একি, উঠিয়া বসিতেও দেহের সবটুকু শক্তি নিয়োগ করিতে হইতেছে।

ভজুয়া নাই, কেহ কোথাও নাই। অসহনীয়, অসীম তৃষ্ণা! মনে হইল তালুমূল হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত সবই যেন শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া গিয়াছে! একটা ঢোক গিলবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। চোখের সামনে হল্‌দে রংএর কি সব ভাসিয়া বেড়াইতেছে, কপালে হাত দিয়া দেখিলেন আগুনের মত গরম।

...একটা লুঙ্গীপরা ছোট ছেলে কলসী করিয়া জল আনিল এবং কাছারির সামনে একটা খোঁটায় বাঁধা জীর্ণ গরুর মুখের কাছে মাটীর গামলায় ঢালিয়া দিল। বটব্যাল মহাশয় তাহাকে ইসারায় ডাকিলেন। সে ভয় পাইয়া দৌড়িয়া পলাইয়া গেল।

* * *

“পাপ? কিসের পাপ? “আতুরে নিয়মো নাস্তি।” আত্মহত্যাও তো মহাপাপ। দুটো পাপ ন্যায়ের তুলাদণ্ডের দুধারে চাপালে কোন দিকটা বেশী ঝুঁকে পড়ে? গৃহস্থের ধর্ম্ম কি? পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। প্রাণটাই যদি গেল যজ্ঞ করবে কে? পিতৃপুরুষের পিণ্ড দেবে কে? আপৎকালে আত্মরক্ষা করা কি ধর্ম্ম নয়? হা ভগবান আর ভাবতে পারি না, পাগল হয়ে যাবো!

* * *

বটব্যাল মহাশয় অতিকষ্টে দুই হাতে ভর করিয়া উঠিলেন, রোয়াক হইতে নামিয়া হামাগুড়ি দিয়া ধীরে ধীরে গামলার

দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গরুটা ভীত ও চকিতভাবে শিং নাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

* * *

সম্পাদক মহাশয় জোর তাগিদ দিয়াছেন গল্প শেষ করিতে হইবে। জোর কদমে চলিতে চলিতে যদি খানা খন্দলে পড়িয়া গল্পটির হাত পা ভাঙ্গে তবে আপনারা কৃপা করিবেন।

সকলেই লক্ষ্য করিতেছে বটব্যাল মহাশয়ের একটা মস্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। খরচ কমাইবার অজুহাতে তাঁহার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রতিষ্ঠিত দুইশত বৎসরের পুরাতন চতুষ্পাটী তুলিয়া দিয়াছেন। ব্যবস্থাদান করাকে এখন শাস্ত্রব্যবসায় বলিয়া নিন্দা করেন। আজকাল বাড়ীর বাহিরে কোথাও যান না রাতদিন পুঁথি বই কাগজ কলম লইয়া থাকেন। কেহ দেখা করিতে আসিলে প্রথমে তাড়াইবার চেষ্টা করেন, নেহাৎ নাছোড়বান্দা হইলে দুই চারিটা সংক্ষিপ্ত কথা কহিয়া বিদায় করেন। অযত্নে মাথার চুল এবং গোঁফদাড়ি বড় হইয়াছে। আত্মীয় কুটম্বেরা এবং অনেক অনুরক্ত শিষ্য তাঁহার উপর মনে মনে চটিয়াছেন। স্ত্রী অনেক আগেই চটিয়াছেন।

পুত্রের পরিবর্ত্তন আরও অপ্রত্যাশিত। দুই বছর আগেকার লাড্‌লি ভাটাভেল এখন মরিয়া লাড্‌লিমোহন দেবশর্ম্মা হইয়াছেন। তাহার মত নিষ্ঠাবান এবং ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ এখন কলিকাতা সহরে খুঁজিয়া মেলা ভার। সে এখন হিন্দু ধর্ম্মের একটা স্তম্ভস্বরূপ। তাহারই একাগ্র উদ্যম এবং

উৎসাহে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষাকল্পে মহারাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুরের শুঁড়ার বাগানবাড়ীতে সনাতন ধর্ম্ম-সমর-সংসদ্ স্থাপিত হইয়াছে। রাজা মহারাজা এবং হোমরাচোমরা সরকারী চাকুরিয়ারা ইহার সভ্য। ইতিমধ্যেই একলাখ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে এবং ভলণ্টিয়ার বাহিনী গড়া হইতেছে। শ্রীমান্ লাড্‌লিমোহন ইহার অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক। টাকাকড়ির চার্জ্জ তাঁহারই হাতে. সেজন্য খরচের খাতার উপর বাঘের মত দৃষ্টি রাখিয়াছেন!

ইদানীং একদিন তাঁহাকে এঁড়েদহ "কৈবল্যদায়িনী সভায়" বক্তৃতা দিতে শুনিয়াছি। বিষয়টা ছিল "আধুনিক নারীর অধোগতি" আহা সে দৃশ্য ভুলিবার নয়! একহারা ঋজু গৌর দেহ গরদের ধুতি পাঞ্জাবী এবং গঙ্গাজলি শালে ভূষিত, হ্রস্বকেশমণ্ডিত মস্তকে অর্দ্ধহস্তপরিমিত শিখা আরক্ত বদন-মণ্ডল ও মুষ্টিবদ্ধ পাণিযুগলের সহিত ইতস্ততঃ আন্দোলিত, কপালে শ্বেত চন্দনের তিলক, পায়ে হরিণের চামড়ার নাগরা জুতা,—যেন শাশ্বত সনাতন ধর্ম্ম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এঁড়েদহে অবতীর্ণ হইয়াছেন!

* * *

আজ বহুদিন পরে বটব্যাল মহাশয় জনকয়েক বাছাবাছা সতীর্থ বাল্যবন্ধু, আত্মীয় এবং অন্তরঙ্গ শিষ্যকে বাড়ীতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। উদ্দেশ্য কি কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই এমনকি স্ত্রী পুত্রের কাছেও না। সকলে সমবেত হইলে

পুত্রকে ডাকাইলেন এবং স্ত্রীকেও পাশের ঘরে থাকিয়া সমস্ত কথাবার্ত্তা মনোযোগ দিয়া শুনিতে বলিলেন।

"দেখ তোমরা সকলেই আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ এবং স্নেহাস্পদ, কেউ বা আবাল্য সুহৃদ্ কেউ বা পরমাত্মীয়। বোধ হয় তোমাদের ধারণা তোমাদের কাছে আমার এই অতি সাধারণ অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার কিছুই অগোচর নেই।"

বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয় রহস্য করিয়া বলিলেন "কেন হে, ঝুলির ভেতর আরও ভেল্‌কি আছে না কি ?"

"প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের এমন একটা অধ্যায় থাকে যেটা সে লোকচক্ষের সামনে ধরতে ভয় পায়, অথচ সেটা হয়ত ভগবানের চক্ষে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও অনাবিল। এই ভয়ই হলো সর্ব্বনাশের অঙ্কুর। এই ভয় যদি মানুষকে সত্যগোপন করতে প্রবৃত্ত না করত তবে তার মানসিক অশান্তি এত বাড়্‌তো না এবং সে এত ভণ্ড এবং পাপিষ্ঠও হত না। দুর্ব্বলের মুক্তি নেই—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

সকলেই বিস্মিত ও কৌতূহলান্বিত হইয়া মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন।

"লোকের এবং সমাজের চক্ষে আমি পতিত, কারণ আমি মুসলমানের ছোঁয়া জল খেয়েছি এবং জ্ঞানতই খেয়েছি।"

"সে কি কথা," "কি বল্‌ছ হে তুমি" "হাঃ হাঃ ঠাট্টা কচ্ছেন, বুঝতে পাচ্ছেন না ?" ইত্যাদি নানা মন্তব্য বর্ষিত হইতে লাগিল।

বটব্যাল মহাশয় দীপ্তচক্ষে বলিলেন, "না, আপনারা যদি ঠাট্টা মনে করে থাকেন তো স্বচ্ছন্দে নিজের নিজের বাড়ী যেতে পারেন, আমার আর কিছু বলবার নেই।" সকলে নিস্তব্ধ হইলেন।

"দুবছর আগে যখন পীরখালি যাই তখনই এই ঘটনা ঘটে। প্রবল জ্বর হয়েছিল, তার ওপর প্রচণ্ড গরম। সঙ্গে জল ছিল না। সেখানে কোনো জলাশয় নেই, প্রজারা সব মুসলমান। আড়াই ক্রোশ দূর থেকে তারা নৌকো করে জল নিয়ে আসে। অসহ্য তৃষ্ণায় পাগলের মত হয়ে গেছলাম, প্রাণ যায় মনে করে গরুর গামলা থেকে মুসলমানের ঢালা জল খেয়েছিলাম। এতদিন ভীরু মূর্খ প্রাকৃতজনের মত সত্য গোপন করেছি, এখন সেই দুর্ব্বলতার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

বাহিরে নিকষকৃষ্ণ মেঘের ঘনঘটা, বিজলীর চমক ও শান্ত স্তব্ধ বায়ু শ্রোতাদের মনে একটা আসন্ন ট্রাজেডির ছায়াপাত করিয়াছে। দুচার ফোঁটা বৃষ্টির জল ঘরের ভিতর আসিতেছে দেখিয়া বটব্যাল মহাশয় জানালার সার্সী বন্ধ করিয়া বসিলেন।

সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাচস্পতিঠাকুর বলিলেন "প্রায়শ্চিত্ত কোরতেই হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তুমি অত ম্রিয়মাণ হয়ো না। পাপ যতই গুরুতর হোক না কেন তার প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে একথা তোমার মত কৃতবিদ্য লোককে বলাই বাহুল্য।"

বটব্যাল। তুমি যে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলছো আমি তা করবো না।

বাচস্পতি। অ্যাঁ!

বটব্যাল। আমি মুসলমানের ছোঁয়া জল খেয়ে পাপ করিনি, পাপ করেছি সত্য গোপন করে।

বাচস্পতি কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন "যবনস্পৃষ্ট জল খাওয়া পাপ নয়?"

বটব্যাল। দেশকালপাত্র বিশেষে কোনটা পাপ, কোনটা নয়।

বাচস্পতি। বৃদ্ধবয়সে তোমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে।

লাড্‌লি। বাবা, আপনার মাথা খারাপ হয়েছে। আপনি আজকাল দিনরাত্তির ঘরের ভেতর পুঁথি নিয়ে বসে থাকেন, মাঝে মাঝে একটু মাথায় হাওয়া না লাগালে—

বটব্যাল। চুপ কর অর্ব্বাচীন। শোন বাচস্পতি, লোকচক্ষে আমি পতিত, প্রায়শ্চিত্ত না করলে গার্হস্থ্যাশ্রমে আমার অধিকার নেই। অথচ প্রায়শ্চিত্ত করতেও আমার বিবেকে বাধছে। এ ক্ষেত্রে আমার কি কর্ত্তব্য? আমি গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করব, সন্ন্যাস গ্রহণ করব।

লাড্‌লি। এমন শাস্ত্রও তো কখনো শুনিনি। বুড়ো বয়সে ওঁর ভীমরতি হয়েছে। আপনারা জানেন না বোধ হয় উনি আজকাল নিত্যক্রিয়া পদ্ধতিরও সব অনুষ্ঠান পালন করেন

না। আচারশুদ্ধির দিকে কোন নজরই নেই, যখন খুসী খান, যখন খুসী—

বটব্যাল। চোপরাও নির্লজ্জ কুলাঙ্গার, লম্পট! আমি ঘরের কোণে পুঁথি নিয়ে বসে থাকলেও তোমার সব খবর রাখি। ভাল চাও তো এখন মুখবন্ধ করে বসে থাকো।

বাচস্পতি। আহা থাক্ থাক্। তা, তুমি কি এই কথা বলবার জন্যেই আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলে?

বটব্যাল। আসল কথাই বলা হয়নি। আমার সম্পত্তির মোট সালিয়ানা আয় বোধ হয় ষোল হাজার টাকা হবে। বারো আনা সম্পত্তি আমি একটা ট্রাষ্টের হাতে দেবো, তার আয় থেকে প্রতি বৎসর যে কটা সম্ভব দীঘি ইঁদারা কিম্বা টিউবওয়েল করা হবে। বাংলা দেশের যে সব গ্রামে জলকষ্ট খুব বেশী সেগুলোতেই আগে কাজ আরম্ভ করতে হবে। বাকী চার আনার অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক আমার স্ত্রী এবং পুত্র পাবে। আমি তোমাদের এই ট্রাষ্ট এবং উইলের অছি নিযুক্ত করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চাই।

লাড্‌লি। (বাচস্পতি এবং ন্যায়চঞ্চুর প্রতি জনান্তিকে) আপনারা দেখুন মাথা খারাপের আর বাকী কি? এ কি সুস্থ লোকের কথা?

পাশের ঘরের দরজার শিকল খট্‌খট্ করিয়া নড়িয়া উঠিল।

সকলে চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া বটব্যাল বলিলেন

"আচ্ছা আজ এই পর্য্যন্ত, তোমাদের ভাববারও সময় চাই, কাল সন্ধ্যে বেলার মধ্যে আমাকে তোমাদের মতামত জানাইও। তোমরা যদি এ দায়িত্ব নিতে না রাজী থাক তবে আমার অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।" সকলে বিদায় হইলেন।

* * * *

আজ বড়ই দুর্য্যোগ। একে অমাবস্যা রাত্রি তায় মুষলধারে বৃষ্টি বজ্রপাত ও বিদ্যুতের ঘটা। বটব্যাল মহাশয় আজ কাল বাহির মহলেই থাকেন, অন্দরের দিকে বড় একটা যান না। আজ কি একটা দরকারে চলিয়াছেন।

পুরাণো কাগজ এবং দলিলপত্র যে ঘরে থাকে সে ঘরে ঢুকিয়া একটা বাক্স খুলিতে যাইবেন এমন সময় পাশের ঘরে কাহারা কথা কহিতেছে শুনিতে পাইলেন। গলার আওয়াজে বুঝিলেন একজন তাঁহার স্ত্রী, আর একজন তাঁহার পুত্র। এত রাত্রে ইহারা কি কথা কহিতেছে? দুই একটা কথা কাণে যাইতেই উৎকর্ণ হইলেন।

নিরঞ্জন বলিতেছে "দেখুন মা যে রকম করে হোক এই পাগলামী বন্ধ করতে হবে। অবশ্য আপনি আমায় দেখতে পারেন না, আমিও আপনাকে দেখতে পারি না, তবু এক্ষেত্রে আমাদের দুজনের স্বার্থই এক। যা কিছু করতে হবে একসঙ্গে পরামর্শ করে করতে হবে তা না হলে বিশেষ কিছু ফল হবে না।"

বিমাতা বলিলেন, "হাঁ বাবা, আমারও তাই মত। এতদিন আমার সন্দেহ ছিল, আজ সন্দেহভঞ্জন হয়ে গেছে। একেবারে উন্মাদ পাগল। তা না হলে রাজার ঐশ্বর্য্য দুহাতে বিলিয়ে দিয়ে স্ত্রী পুত্তুরকে পথে বসিয়ে সন্নিসী হয়ে যায়? ওঁকে আর বাড়ী থেকে বেরুতে দেওয়া উচিত নয়, কি জানি রাস্তা ঘাটে কি কাণ্ড করে বসেন। তা বাবা, তুমি যে জজ সাহেবের কাছে দরখাস্তর কথা বলছিলে তাতে ওঁর কোন খারাপ হবে না তো?

নিরঞ্জন। কিসের খারাপ?

বিমাতা। এই—এই ধর যদি পাগলাগারদে ধরে নে যায়—

নিরঞ্জন। হাঃ হাঃ তা কেন হবে? আমরা খালি এই বলে দরখাস্ত করব যে উনি সম্প্রতি উন্মাদ হয়েছেন বলে ওঁর নিজের সম্পত্তি নিজে ম্যানেজ করবার ক্ষমতা নেই, হুজুরের কাছে আরজি করা যাচ্ছে যে অমুক অমুক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে ওঁর মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করান হোক এবং উন্মাদ প্রমাণ হলে আমাদের সম্পত্তি ম্যানেজ করতে দেওয়া হোক। ভাল ভাল ডাক্তারের জন্যে আপনি ভাববেন না, সে সব আমার হাতে আছে।

বটব্যাল মশায় আর দাঁড়াইলেন না। বাহিরের মহলে তাঁহার শুইবার ঘরে গিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারি

করিতে লাগিলেন...ঘরের দরজা জানালা সব খোলা হাট, চাকর বন্ধ করে নাই। বৃষ্টিরছাটে বিছানা বালিশ কাপড়-চোপড় সব ভিজিয়া গিয়াছে, একখানা উত্তরীয় কড়িকাঠের হুকে বাধিয়া ধ্বংসের জয়পতাকার মত উড়িতেছে। সহসা একটা হিমশীতল দমকা হাওয়া আসিয়া তেলের বাতিটা নিবাইয়া দিল। অতীত যুগের প্রতীক এই বিশাল আঁধার জনবিরল পুরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মত্ত উদগ্র বিধূনিত বায়ু অশরীরী প্রেতের মত হা হা রবে অট্টহাস্য করিতে লাগিল।

* * * *

পরদিন সকালে তাঁহাকে কেহ খুঁজিয়া পাইল না। নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথিবীর মাঝে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে কিনা কে জানে?

প্রসঙ্গ

বিবিধ

চলচ্চিত্র বা বায়স্কোপ একটা আমদানি আমোদ। যে দেশে ইহার জন্ম, তথায় ইহা লইয়া সাহিত্যিক মহলে বেশ আলোচনা চলিতেছে। নাটক অভিনয় ও চলচ্চিত্র অভিনয় যে এক বস্তু নয় তাহা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু দর্শকের মনোরাজ্যে প্রভাব দুই বস্তুর দুই রকমে হয়। চলচ্চিত্রের অভিনেতারা যখন অভিনয় করে, তখন অভিনেতা অভিনেত্রীর সম্মুখে কোনও দর্শক থাকে না যে তাহাকে দর্শকের মনোভাবের উদ্দীপনা করিতে প্রয়াস পাইতে হইবে। তাহার বা তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে কি করিয়া অভিনেতা বা অভিনেত্রীর মুখে ও চালচলনে তাহার নিজের অর্থকৃত ভাবব্যঞ্জনা সুষ্ঠু করিয়া ফুটানো যায়। এ ক্ষেত্রে তদ্ভাবভাবিত হইয়া অভিনয় করা চলে না, প্রধান লক্ষ্য থাকে—ব্যক্তিগত ভাবাভিব্যক্তির কৌশল। তাহার ফলে চলচ্চিত্রের চিত্রগৃহের প্রদর্শনীর সময় দর্শক দেখে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর রূপ মাত্র, বিষয়বস্তুর রসাবেশ-স্ফূটনকৌশলী অভিনয় নহে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে প্রত্যেক দৃশ্যের ভিতর দিয়া নাটকের মূল রসকে ক্রমে ক্রমে পরিবেশন করিতে হয়। 'চন্দ্রশেখর' অভিনয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসীসৃষ্টি প্রতাপ, শৈবলিনী, চন্দ্রশেখর, দলনী প্রত্যেককে জীবনরঙ্গভূমে দেখিতে পাই এবং তাহাদের কার্য্যাবলী ও কথাবার্ত্তায় প্রত্যেক

মুহূর্ত্তে দর্শকের হৃদ্‌তন্ত্রীতে জীবন্ত অঙ্গুলির আঘাত লাগিয়া একটা রাগিণী বাজিতে থাকে। চলচ্চিত্রে হয় প্রেতলোকের রূপভঙ্গী, তাহার ভিতর কোনও চেষ্টা নাই, কোনও ভাবের আদানপ্রদান নাই, কোনও স্পর্শবোধ নাই—সমস্ত রস নিঃশেষ হইয়া কেবল থাকে একটা অশরীরী বাসনার অদ্ভুত রস। তাহার ফলে দর্শকের মনে হয় উত্তেজনা, তৃপ্তির কোনও অবসর থাকে না। সম্প্রতি বিলাতের কয়েকজন সাহিত্যিক এই সব বিবেচনা করিয়া বলেন যে, জাতীয় চরিত্র সংরক্ষণের জন্য চলচ্চিত্র উঠিয়া যাওয়াই ভাল, থিয়েটার ও জীবন্ত অভিনয় জাতীয় চরিত্রে প্রাণ সঞ্চার করে এবং তাহারই পরিবৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়।

* * *

পাঠ্যপুস্তকগুলি আমাদের শিশু ও যুবকদের কি মানসিক খাদ্য যোগাইতেছে তাহা দেখিবার বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যে কেহ আজকালকার স্কুল কলেজের ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক লইয়া দুই দিন নাড়া চাড়া করিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন যে ছেলেরাই কি আর মেয়েরাই কি স্কুলে যাহা শিখিতেছে তাহা না শিখিলেই ভাল হয়। এই সকল পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদেব দুইটি উদ্দেশ্য থাকে। ১ম—কমিটির সদস্যদের মনের মত কথা। ২য়—আধুনিকতার হাওয়ার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলা। যে কোনও পাঠ্যপুস্তক লইয়া

দেখানো যায় যে, কি পুস্তক রচয়িতা, কি বিষয়সন্নিবেশ, কি রচনাভঙ্গী, কি চিন্তাধারা—কোনও কিছু হইতে আমাদের ছেলেমেয়েদের মনে কোনও আদর্শের জন্য কোনও স্থায়ীভাব সূচিত হয় না। শিক্ষার আদর্শ কমিটির সদস্যদেরও নাই, আর জাতীয় আদর্শ আধুনিকতার হাওয়ায়ও নাই। ফলে এম-এ পাশ করা কৃতবিদ্যও জীবনে কোনও আদর্শ না শিখিয়া সমাজে শিক্ষিত বলিয়া স্থান চায়। আর না পাইলে দেশের, জাতির, সমাজের প্রতি গালি বর্ষণ করে। দেশের ভিতর এই বিয়োগান্ত নাটকের পরিসমাপ্তি করিতে হইলে নানাদিকে প্রচেষ্টা দরকার স্বীকার করিলেও, অর্থগৃধ্নু পাঠ্য-পুস্তক-রচয়িতা ও ফন্দীবাজ পাঠ্যপুস্তকনির্ব্বাচকমণ্ডলীর উপর একদল নির্লোভী, জাতীয়তাদর্শী, স্বজাতিপ্রিয় ও স্বধর্ম্ম-পরায়ণ পরিদর্শক প্রয়োজন। নতুবা দিন দিন প্রচারণা (propaganda)-পরায়ণ হীনমতিদের হাতে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্ক আরও বিগড়াইয়া যাইবে।

* * *

যাঁহারা চল্‌তি ভাষা বা কহত ভাষা সাহিত্যে চালাইবার প্রয়াসী ছিলেন, হয়ত গত পনের বৎসরের চেষ্টার পর তাঁহারা আজকাল স্বীকার করিবেন যে, মতলব করিয়া ভাষার গতি বদ্‌লানো যায় না। এখনও আমরা অনেক বই দেখিতে পাই যাহাতে কষ্ট করিয়া কহত ভাষা চালাইবার চেষ্টা বিদ্যমান।

তাঁহারা একটা বিষয় লক্ষ্য করিলেই পারেন। বাঙ্গলায় অগণিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্র চলিতেছে। লেখকগণের মধ্যে শতকরা ৯০ জনের ভাষার একটা চলিত-আদর্শ বর্ত্তমান। এক কথায় বলিতে গেলে তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের ঢং। আসল কথাটা এই যে, বিষয়বস্তুর সহিত লেখকের হৃদয়ের যোগ যেখানে বর্ত্তমান, যেখানে ভাষা কি হইবে সে ভাবনা দূর হইয়া যায় এবং গিরিনির্ঝরের উৎসের মত আপনিই তাহা ফুটিয়া বাহির হয়। বাধা পাইলে তাহা কল্‌কল্‌ করিয়া উঠে, অথবা পর্ব্বত পাইলে তাহা গর্জ্জন করিয়া উঠে। হরিদ্বারে সুরধুনীর প্রবাহ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, প্রকৃতির লীলায় স্রোতস্বতীর স্বচ্ছন্দ গতি কি মনোরম, আর তাহারই পার্শ্বে খাতপ্রবাহিত কৃত্রিম প্রবাহ কি চক্ষুপীড়াদায়ক। সময় আসিয়াছে যখন সাহিত্যিক মাত্রেরই জানা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে যে, সাহিত্য ভগীরথের গঙ্গাবতরণের তপস্যা, ভাষা শঙ্খধ্বনিতে আপনি দুকূল ভাঙ্গিয়া দুকূল ছাপাইয়া বাহিয়া যাইবে। তাহাতে কোনও কৃত্রিমতার স্থান নাই, কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং নাই।

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ।

চিত্র ও চরিত্র

মধুসূদন

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভাবের অঞ্জলি দিয়া দেশমাতৃকার সাধনায় যাঁহারা আত্মনিয়োগ করেন, শক্তি তাঁহাদের সুনিয়ন্ত্রিত। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের সমাহিত মহিমায় আমাদের মুগ্ধ মন শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠে।

প্রতিভার প্রাখর্য্যে মধুসূদনের জীবন আবেগবান্। সমাজ, দেশ ও সংস্কারের বন্ধনে তাহা আবদ্ধ নয়। শক্তির চাঞ্চল্যে মধুসূদন আত্মহারা। সে শক্তি বিরাট।

সাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়াই সেবা করিয়াছেন একমাত্র শ্রীমধুসূদন। বাণীর তিনি বরপুত্র।

ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রয়োগে অমিত্রাক্ষর ছন্দের মত এত বড় সৃষ্টি আর কখনও সম্ভবপর হয় নাই,—বাংলায় নয়, কোথাও নয়।

মধুসূদন বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক, বয়সে মাত্র চার বৎসরের ছোট। ১৮২৪ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া, ১৮৭৩ সালে কবি অমরধামে যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে যে অমৃত তিনি বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, গৌড়জন তাহাতে নিরবধি আনন্দলাভ করিবে।

তালতলার চটি এবং সাদা ধুতি-চাদরে সজ্জিত থাকিয়াও বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক যুক্তিবাদ এবং প্রতীচ্য কর্ম্মশক্তির

অধিকারী। হ্যাট কোট প্যাণ্ট এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিলাতী আচার সত্ত্বেও মধুসূদনের কৃষ্ণত্বকের নীচে স্পন্দমান ছিল একখানি কোমল, একান্তরূপে বাঙালী প্রাণ।

প্রতিভোজ্জ্বল বিশাল নয়নযুগল, তরঙ্গায়িত কেশ, পুরুষোচিত সুন্দর মুখ, সবল দেহ এবং ঘনশ্যামবর্ণ—মধুসূদনকে বৈশিষ্ট্যশালী করিয়াও বাঙালী করিয়াছে।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

সকল কলাবস্তু মানুষের কৌতূহলের সামগ্রী। কলা মাত্রেই মানবী সৃষ্টি। সেই হিসাবে সাহিত্যও কলা। সকল কলার সহিত আমাদের কামনা অনুভূতি ও চিন্তা জড়াইয়া আছে। কামনা অনুভূতি ও চিন্তা লইয়া আমাদের অন্তর-জীবন। সাহিত্য জীবনলীলার ইতিহাস এবং আলোচনা।

* * *

সাহিত্য—রসসৃষ্টি। পাশ্চাত্য ভাষায় রস কথাটির সমতুল্য কোনো কথা নাই। অন্তরিন্দ্রিয় দিয়া আমরা বিষয়ের আস্বাদ প্রাপ্ত হই। সেই আস্বাদন বাহিরের জিনিষ নহে, তাহা মানসিক ব্যাপার। উপভোগ করি বলিয়া এই আস্বাদন রস নামে অভিহিত হইয়াছে। সাহিত্যস্রষ্টা এই রস পরিবেশন করেন।

দিনপঞ্জী

লাহোর, ১৯শে জানুয়ারী—বেগম আলম সহ ডাঃ আলম এখানে পৌঁছিবার পর সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বাঙ্গালীদের আতিথেয়তার সুখময় স্মৃতি বর্ণনা করিয়া বলেন যে, কলিকাতায় তাঁহাকে এলোপ্যাথি, নেচারোপ্যাথি প্রভৃতি বহুবিধ "প্যাথি" মতেই চিকিৎসা করাইয়াছি; কিন্তু যে পদ্ধতির চিকিৎসায় তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপকার—হইয়াছে তাহা বাঙ্গালীদের "সিম্প্যাথি"।

বার্লিন, ২২শে জানুয়ারী—অদ্য ব্যুলোস্কোয়ারে দশ হাজার নাজী স্বেচ্ছা-সৈনিক অবিশ্রান্ত বরফপাতের মধ্যে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে হার ওয়েস্সেলের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, নাজী ও সাম্যবাদী দলের সঙ্ঘর্ষে হার ওয়েস্সেল নিহত হইয়াছিলেন। সমাধিক্ষেত্রে বিরাট সভা হয় ও ঘোষণা করা হয় যে, নাজীদল শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবে এবং পরিণামে জার্ম্মাণী হইতে অনৈক্য, দুঃখ, দৈন্য এবং অন্নাভাব বিদূরিত করিবে। যাজকগণ সমাধিক্ষেত্রে উপাসনা করেন ও আশীর্ব্বাদবর্ষণ করিয়া বলেন, পৃথিবী হয়ত প্রেতকুলের আবাস, কিন্তু জার্ম্মাণী একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করে না।

২৩শে জানুয়ারী, কলিকাতা—শতকরা ৪৲ টাকা হার সুদে ১৯৪৩ সালে পরিশোধনীয় ভারত সরকারে ঋণ মোট ২৪ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে—নগদ টাকার ৯ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা এবং ট্রেজারী বিল দ্বারা ১৪ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকা। এই টাকা না কি মাত্র ১৫ মিনিটে উঠিয়াছে ?

পুণা, ২৪শে জানুয়ারী—বড়লাটের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী জানাইয়াছেন যে হয় অস্পৃশ্যতা ভারতবক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইবে, নতুবা আমাকে চিরবিদায় লইতে হইবে।

সকল প্রকার সদ্য অথবা দূষিত বেদনা
এবং ক্ষতাদির জন্য
অমৃত প্রলেপ
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

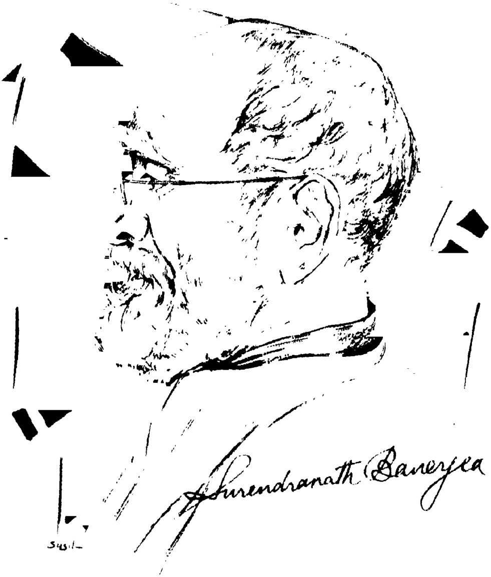
Surendranath Banerjea
Susil

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট গল্প

১ম বর্ষ]   ২২শে মাঘ ১৩৩৯   [৩১শ সংখ্যা

মাটির প্রদীপ

শ্রীসীতা দেবী

বন্ধুর বাড়ী আগ্‌লাইতে হঠাৎ প্রায় রাতারাতি, নূতন পাড়ায়, নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিতে হইল। আমাদের দুজনের ঘর সংসার, অনেকটা বেদুইন আরবের তাঁবুর মত। এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় ঝট্ করিয়া উঠাইয়া লইয়া যাওয়া যায়, বেশী কিছু হাঙ্গাম নাই। স্বামী চাকুরীর কল্যাণে কেবলি বাঙলা দেশের সাতঘাটের জল খাইয়া ফেরেন, সুতরাং আয়োজন-বাহুল্যে নিজেদের ভারাক্রান্ত না করাই আমরা শ্রেয় ভাবিয়াছি।

বন্ধুবর যোগেশবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী অন্য জাত এবং অন্যধাতের মানুষ। তাঁহারা কায়েমী গৃহস্থ, গৃহ

তাঁহাদের বহুদিনের এবং বহু যত্নের জিনিষ। বাড়ীটি তাঁহাদের নিজের, ভাড়াটে বাড়ী নয়। ইহার ছাদের আলিসা, সিঁড়ির রেলিং হইতে সদর দরজার কবাট পর্য্যন্ত তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর মমতা এবং মনের সুরুচির পরিচয় দিতেছে। গৃহসজ্জা, আসবাব কোনটাই চোখ কান বুজিয়া নীলাম হইতে কিনিয়া আনা নয়, অনেক সময় এবং অনেক কল্পনা খরচ করিয়া সংগ্রহ করা। অকস্মাৎ পিতার মৃত্যুতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য যোগেশবাবুকে সপরিবারে দেশে চলিয়া যাইতে হইল, না হইলে এই আরাম ও আয়েসের নীড়ে আমাদের মত জীবের আবির্ভাব ঘটিয়া উঠিত না। তাঁহারাই বলিয়া কহিয়া আমাদের রাখিয়া গেলেন। এতকালের যত্নপালিত সংসার হঠাৎ অযত্নে পাছে একেবারে লুপ্তশ্রী হইয়া যায়, এই ছিল তাঁহাদের ভয়।

নূতন পাড়ায় আসিয়া, প্রথম দিন দুই বড়ই আসোয়াস্তি বোধ হইতে লাগিল। পাড়াটায় বাঙালী বড়ই কম, দুই এক ঘরের বেশী নাই, বেশীর ভাগ চারিদিকে খোলার ঘর, টিনের ঘর। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বসতিই এদিকে অধিক বলিয়া বোধ হইল। নূতন পাড়া, একদিক দিয়া। খোলার ঘর, টিনের ঘরগুলি অবশ্য বহু পুরাতন বলিয়াই মনে হইল, তবে পাকা বাড়ীগুলি নূতন। সস্তায় জমি পাওয়া যাইতেছিল বলিয়া, যোগেশবাবু একরকম 'পাইওনীয়ার' হইয়া এ পাড়ায় আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছিলেন, এখন তাঁহারই চেষ্টায় এবং

আগ্রহাতিশয্যে আরো কয়েক ঘর বাঙালী ভদ্রলোক এদিকে বাড়ী করিয়াছেন এবং জমি কিনিয়াছেন। এখনো হঠাৎ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয় না যে কলিকাতায় আছি। এদিক ওদিক খোলা মাঠ, পুকুর, ডোবা, ঘনসন্নিবদ্ধ গাছের শ্রেণী, রাজধানী অপেক্ষা পল্লীগ্রামের কথাই অধিক স্মরণ করাইয়া দেয়। উঠানে গরু বাঁধা, পথে হাঁসের দলের উচ্চ কলরোল, গলির ভিতর পাড়ার বালকবালিকা শিশু প্রভৃতির নির্ভয় ক্রীড়াকৌতুক, এগুলিও কলিকাতায় সচরাচর চোখে পড়ে না।

বাড়ীর সামনে দোতলায় ছোট্ট একটি ঝোলানো বারাণ্ডা আছে। এখানে বেতের চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পাড়া-প্রতিবেশীর গতিবিধি লক্ষ্য করি। মন্দ লাগে না, সময়টা বেশ কাটিয়া যায়। প্রথম প্রথম আমাকেও তাহারা উত্তমরূপে দেখিত, কিন্তু ক্রমে হাল ছাড়িয়া দিল। নারীর দিকে মিনিট খানিক একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলেই সে যদি বিব্রত বোধ করিয়া পলায়ন না করে, বা শামুকের মত নিজের ভিতরেই নিজে অদৃশ্য হইবার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে সেরূপ স্ত্রীলোকের দিকে চাহিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি বোধ হয় এক জাতীয় পুরুষের চলিয়া যায়। তাহাকে পূরাপূরি স্ত্রীলোক বলিয়াই বোধ হয় তাহাদের মনে হয় না। সুতরাং আমিও দিন দুই চারের ভিতর সকলের চোখে সহিয়া গেলাম. আমার সম্বন্ধে কৌতুহল প্রায় সবটাই চলিয়া গেল।

নামে ষ্ট্রীট, তবে কার্য্যতঃ গলি, যদিও চওড়া গলি। বারান্দা হইতে গলা বাড়াইয়া থাকিলে বড় রাস্তাও একটা দেখা যায়। গলিটিতে দোকানপাট বিস্তর। খোলার ঘর, টিনের ঘরের ভিতর ব্যবসা-বাণিজ্যের স্রোত মুখরভাবেই বহিয়া চলিয়াছে। কোনো কিছুর অভাব নাই। মিঠাইয়ের দোকান, মুদীর দোকান, পানের দোকান, চায়ের দোকান। আবার চুল ছাঁটিবার সেলুন, ডাইং এণ্ড ক্লিনিং, ট্যাক্সির গারাজ, সাইক্‌ল্‌ ভাড়া দেওয়ার দোকান, তাহাও বিদ্যমান। দেখিতে চেহারার চটক্ নাই, তাই বলিয়া ধরণধারণে আধুনিক হইবার প্রবল চেষ্টা যে নাই তাহা নহে। মিঠাইয়ের দোকানে বেশীর ভাগ খাবার, খোলা পিতলের পরাতে সাজানো থাকে বটে, তাই বলিয়া জালঘেরা ছোট একটি আলমারী যে নাই, তাহা মনে করিবেন না। সন্দেশ রসগোল্লা গুটিকয়েক সর্ব্বদাই তাহাতে বন্ধ থাকে। চায়ের দোকান, পানের দোকানে আয়না আছে, মেমের ছবি আছে, তারের বাস্‌কেটে ঝোলানো মুর্গির ডিম আছে, কাঁচের বয়ামে রক্ষিত বিস্কুট আছে। আবার সন্ধ্যার সময় গ্রামোফোনের কাংস্যকণ্ঠের আর্ত্তনাদে পাড়া সরগরম হইয়া উঠে। চুল ছাঁটা যেমনই হউক, সেলুনটিতে বড় বড় ঝোলানো আয়না আছে, নাপিতের অঙ্গে ওভারঅল্ আছে। ডাইং ক্লিনিএর সাইনবোর্ডখানা ঘরের ভিতরেই প্রায় তোলা থাকে, ধোপা মাঝে মাঝে সেটা টানিয়া বাহির করে। আবার সম্প্রতি কোথা হইতে গোটা

দুই ভাঙা 'শো-কেস্‌ও সে জোগাড় করিয়া আনিয়াছে। ঘরে আর ঘুরিয়া দাঁড়াইবারও স্থান নাই, কিন্তু তাহার আনন্দ বিকশিত মুখ দেখিয়া মনে হয়, এ কষ্ট মোটেই তাহার গায়ে লাগিতেছে না। বস্তির ভিতর সবই দোকান নয়, রাস্তার উপরের ঘরগুলিতেই কেবল দোকানপাট, ভিতরের দিকে যত গরীব গৃহস্থের বাস। বাসিন্দারা অধিকাংশই মুসলমান বটে, কিন্তু দারিদ্র্যের আতিশয্যে পরদার বালাই মেয়েদের অনেকখানিই ঘুচিয়া গিয়াছে। তাহারা ঘরে উঠানে, ছাদে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে, গলিতেও ফেরীওয়ালা ডাকিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে ফলের, ঘুঘ্‌নিদানার বা সস্তা ছিটের দর করে, তবে গলির বাহিরে যাইতে হইলে একটা করিয়া শততালিযুক্ত নোংরা বোচকা চাপা দেয় বটে। শীতকালের দিন, সকালের রোদটুকু উপভোগ করিরার জন্য তাহারাও পুরুষদের সঙ্গে সমানে, কাঁচা ফুটপাতের উপর উবু হইয় বসিয়া যায়, ছেলের গায়ে তেল মাখায়, আবার চাল ডাল বাছার কাজটাও সারিয়া লয়। ঘরে জলের কল কাহারও নাই বোধ হয়, রাস্তায় জল দিবার ময়লা জলের 'হাইড্রাণ্টে'ই তাহারা বাসন কোসন মাজার সব কাজ সারিয়া লয়। খালি পানীয় জলটা মোড়ের উপরের জলের কল হইতে বহিয়া আনে। বাসন মাজাটাও এক পর্ব্ব, গোটা তিনচার পিতলের থালা ঘটি মাজিতে ঘণ্টাখানিক ত দিব্য কাটিয়া যায়। অবশ্য ইহারই ভিতর পাড়াপ্রতিবেশীর সকলরকম খবরাখবরও লইতে হয়।

ফুটপাথ ছাড়া অন্যত্র রোদ পৌঁছিতে অনেক বেলা হইয়া যায়, সুতরাং যে কোনো ছুতায় যতক্ষণ বাহিরে থাকা যায়, ততক্ষণই লাভ। স্ত্রীলোকগুলি নিতান্তই সাধারণ, রূপের বালাই কাহারও নাই, পরিচ্ছদও মলিন ছিন্ন, তবুও নিত্য তাহাদের প্রাভাতিক কর্ম্মকোলাহলটা দেখিতে শুনিতে বেশ ভালই লাগে।

হঠাৎ দেখি একদিন সকালে ফুটপাথের জলের কলের ধারে, নূতন একটি নারীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। চেহারা সাজসজ্জা, সমস্তই তাহার স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করিতেছে। কালো রং, ছিপছিপে গঠন, অতি আঁটসাঁট দেহের বাঁধুনী। নাক মুখ টিকলো, কোথাও বাহুল্যের লেশ মাত্র নাই। চুল পরিষ্কার আঁচড়ানো, পরণে লাল ছিটের আঙ্গিয়া এবং ছাপা বৃন্দাবনী শাড়ী। অন্য দশজনের সঙ্গে সেও পিতলের লোটা, পরাত এবং ডেকৃচি মাজিতে বসিয়াছে। রাস্তার ফুটপাথের উপর, অন্য কাহারও চেয়ে তাহার অধিকার বেশী হইবার কথা নয়, কিন্তু সকলেই যেন সসম্ভ্রমে তাহাকে আগে কাজ সারিয়া লইবার জন্য পথ ছাড়িয়া দিতেছে।

ধোপার ঘরের ভিতরেই যখন মেয়েমানুষটি ধোওয়া বাসন কয়খানি লইয়া ঢুকিয়া পড়িল, তখন বুঝিলাম এই ঘরেই নূতন মানবীটির আগমন হইয়াছে। এতদিন সেখানে ধোপা এবং ধোপার চাকর ভিন্ন আর কোনও মানুষ দেখি নাই। তাহারা পুকুর হইতে গাদা গাদা কাপড় কাচিয়া মাঠে

শুখাইতে দেয়, খরিদ্দারের সহিত হাঁকডাক করিয়া ঝগড়া করে, এবং চায়ের দোকান হইতে ঠোঙাভর্ত্তি তেলেভাজা খাবার কিনিয়া খায়, ইহা ভিন্ন তাহাদের বিষয় আর কিছু জানা ছিল না। কিন্তু একটি মাত্র স্ত্রীলোকের আবির্ভাবে খোলার ঘরদুইটির চেহারা একেবারে বদলাইয়া গেল। ছিল সেটা দোকান, এখন হইয়া দাঁড়াইল ঘরসংসার।

স্ত্রীলোকটি যে ধোপার সম্পর্কে কে তাহা ঠিক বুঝিলাম না। যেই হউক, যত্ন আদরের ঘটা দেখিয়া বুঝিলাম হৃদয়ের সম্পর্ক একটা আছেই, বাহিরের সম্পর্ক যাহাই হউক। মেয়েটি স্ত্রীলোক যখন, তখন ঘর সংসার চালাইবার ভার সেই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সামান্য কাজটুকুও সে এমন দৃপ্ত ভঙ্গীতে করে, যেন বিশ্বসংসারকে সে কাজ করিয়া একান্ত বাধিত করিয়া তুলিতেছে। ধোপা এবং তাহার চাকর, নূতন অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন জোগাইতে সারাক্ষণই ব্যস্ত। চায়ের দোকান হইতে এখন খাবার তিনজনের আসে, কিন্তু ঠোঙায় করিয়া নয়, প্লেটে করিয়া। আবার এক পেয়ালা চাও আসে। আগে পুরুষ দুইটি ঘরে রান্না করিত, না বাহিরে কিনিয়া খাইত, তাহা বুঝিবার কোনো উপায় ছিল না। এখন বাসনমাজা, উনুন ধরানো, চাল ডাল ধোওয়া বাছা, মাছ তরকারি কেনা, সব খুঁটিনাটিই চোখে পড়ে। দুটি ঘরের একটি দখল করিয়াছে—স্ত্রীলোকটি, সেইখানেই পাতিয়াছে তাহার ঘরসংসার। বড় ঘরটিতেও তাহার হাত

পড়িয়াছে। শো-কেস, ইস্ত্রি করিবার টেবিল, সব ঠেলিয়া ঠুলিয়া গুছাইয়া, সে খানিকটা জায়গা খালি করিয়াছে, এখন হাঁটিতে চলিতে প্রতিপদে ধাক্কা খাইতে হয় না।

সঙ্গিহীনতা নারী জাতির সহ্য হয় না একেবারেই। পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে গল্প করিয়া শুধু তাহার অভাব মিটিতেছে না বোধ হইল। হঠাৎ দেখি, গোটা দুই হাঁস, একটা তোতা পাখী এবং তিনচারিটা সদ্যোজাত কুকুরছানা আসিয়া ধোপার ঘরের স্বল্প পরিসর স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। হাঁসগুলা সম্বন্ধে কোন বালাই নাই, তাহারা ভোর হইবামাত্র গলা উঁচু করিয়া সরবে পাড়া প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হয়, সারাদিন কোথায় থাকে, কি খায়, তাহার ঠিকানা থাকে না, সন্ধ্যা হইবামাত্র ধীর মন্থর গতিতে আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসে। তোতা পাখীকে একটু আধটু যত্ন করিতে হয় বটে, তবে সে শিশ্ দিয়া, ভগবানের নাম গাহিয়া, স্বামিনীকে অনেকটা খুসিতে রাখে। তাহার চেহারার চটক্ আছে, ঘরের সামনে খাঁচায় ঝোলানো থাকে, তাহাকে দিয়া গৃহসজ্জার কাজ অনেকটা হইয়া যায়।

সব চেয়ে জ্বালাইয়াছে কিন্তু কুকুরছানা কয়টা। তাহারা প্রথম আগমন ঘোষণা করিল—শীতের রাত্রে। কেঁই কেঁই শব্দে সেদিন পাড়ার একজনও কেহ ঘুমাইতে পারিয়াছিল কিনা সন্দেহ। কোথা হইতে এ নূতন আপদের আবির্ভাব হইল, তদারক করিবার জন্য বারান্দায় বাহির হইতেই

দেখিলাম, বড় একটি ঝুড়িতে করিয়া চারটি গোলাকার কুকুর ছানাকে ধোপার আত্মীয়া আমারই দরজার সামনে রোদে দিবার জন্য লইয়া আসিয়াছে। ছানাগুলির কৌলিন্য বা আভিজাত্য কিছুমাত্র যে নাই, তাহা তাহাদের সর্ব্বাঙ্গই প্রমাণ করিতেছে। কিন্তু তাহার জন্য যত্ন আদরের কিছু ত্রুটি হইবে না, তাহাও ভাল করিয়া বুঝিলাম।

ধোপার ঘরের সামনে, ফুটপাথেরই উপর, মস্ত বড় একটা লোহার তারের খাঁচা জাতীয় ভাঙা জিনিষ, অনেকদিন হইতেই অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়াছিল। কোনকালে হয়ত হাঁস বা মুরগী রাখার কাজে লাগিত। এখন সেইখানেই কুকুরছানাগুলির রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হইল। দারুণ শীতের রাত্রি। ঘরের দরজা-জান্‌লা আঁটিয়া, লেপ-কম্বলে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়াও আমাদের শীত বারণ মানে না। সুতরাং এমন জায়গায় নগ্নদেহ কুকুরছানার ঘুম হইবে কেন? তাহাদের অভিভাবিকা অবশ্য ছেঁড়া চট দিয়া খাঁচা চাপা দিয়া তাহাদিগের যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু লাভ হইল না কিছুই। পাড়ার লোকের সে রাত্রেও ঘুম হইল না।

পরদিন সকালে ধোপা আমাদের কাপড়ের পুঁটুলি লইয়া দুতলার সিঁড়িতে দর্শন দিবা মাত্র আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম, "কোথা থেকে একপাল ককুরছানা এনে জুটিয়েছ, পাড়ার লোকে কি রাত্রে ঘুমোবে না?"

ধোপা অপ্রতিভ হইয়া বলিল. "কি করব মা? বাচ্চাগুলোর মাকে ঐ শাদা বাড়ীর ছোক্‌রা চাকরটা ঠেঙিয়ে মেরে ফেলেছে। ছানাগুলো রাস্তায় পড়ে মরছিল, তাই ও নিয়ে এসেছে।"

আমার ঝি ছুটিয়া আসিয়া ধোপার হাঁড়ির খবর লইতে বসিল, "ও তোমার কে হয়? বউ নাকি?"

ধোপা লজ্জিতভাবে বলিল, "না, ও আমার চাচীর বেটী।" বলিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় মিলাইয়া দিয়া পলায়ন করিল।

পরে খবর পাইয়াছিলাম, স্ত্রীলোকটি চাচীর বেটী বটে, তবে চাচার নয়। চাচী নিকা করিয়া দ্বিতীয় সংসারে প্রবেশ করিবার সময় প্রথম পক্ষের এই কন্যাটিকে সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিলেন। কিছুদিন আগে মেয়েও বিধবা হইয়াছে। আর কোন আশ্রয় নাই বলিয়া পাতানো ভাইয়ের ঘরেই আসিয়া উঠিয়াছে।

কুকুরছানা কয়টা পাখীর খাঁচায় থাকিতে একান্ত নারাজ। ইহাতে যে তাহাদের চতুষ্পদ মর্য্যাদার হানি হইতেছে, তাহা তাহারা কিছুতেই ভুলিয়া থাকিতে পারে না, পাড়া প্রতিবেশীকেও ভুলিতে দেয় না। বুড়া ডিমওয়ালা সকালে ঝুড়ি মাথায় করিয়া তাহাদের দরজার সামনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাখীর খাঁচায় জানোয়ারের জায়গা হয় কখনো?"

স্ত্রীলোকটী রসিকা, বলিল, "এস না তোমাকেও জায়গা করে দিচ্ছি।" বুড়ো হাসিয়া প্রস্থান করিল।

যাহা হউক কুকুরছানাকয়টা কিছুদিনের মধ্যেই মরিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল। তাহাদের চীৎকার অতিষ্ঠ লাগিত বটে, কিন্তু মরিয়া গিয়া পাড়াকে শান্তি দিক্, এ ইচ্ছা ছিল না। তাহাদের পালিকা মাতার নিরুৎসাহ মুখ দেখিয়া দুঃখ হইল। ধোপা আরো কুকুর লইয়া আসিবার কথা বলাতে সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, আর তাহার প্রয়োজন নাই।

ধোপার পাতানো বোনের নাম যে কি, তাহা জানিতাম না। নিজেই তাহার একটা নামকরণ করিয়া লইয়াছিলাম, দুলারী। বাংলা ভাষায় যাহাকে বলে আহ্লাদী, তাহাই আর কি? তবে বাংলা নামটা মানুষ অপেক্ষা ছাগলকেই মানায় ভাল, তাই হিন্দী নামটাই রাখিলাম। স্ত্রীলোকটি অতিরিক্ত দুলারী যে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। দুইটা পুরুষমানুষ, সারাদিন তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্য কত কাণ্ডই না করিতেছে! মেয়েটার সেদিকে যেন ভ্রূক্ষেপই নাই। সে যেন রাজেন্দ্রানী, আর ইহারা দুইজন অধীন প্রজা, মহারাণীর সেবা করিতে বাধ্য। তবু যদি আশ্রয়হীনা গলগ্রহ না হইত।

ক্রমেই বুঝিতে লাগিলাম, স্বর্গোদ্যানে শয়তানের প্রবেশ ঘটিয়াছে। ধোপার বাড়ীতে আগে টুঁ শব্দ শোনা যাইত না, এখন ক্রমেই তাহা কলহমুখর হইয়া উঠিতে লাগিল। পাড়ার লোকে যখন তখন তাহার ঘরের সামনে আসিয়া

ভীড় করিয়া দাঁড়ায়। ঘরের ভিতর হইতে নারীকণ্ঠের উচ্চ তীক্ষ্ণ স্বর, পুরুষের গলার তর্জ্জনগর্জ্জন শোনা যায়। কি লইয়া যে এত ঝগড়া তাহা বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারি না। নিত্য কলহ-কচ্‌কচিতে বিরক্ত ধরিয়া যায়। ইহাদের যেন কাণ্ডজ্ঞান একেবারে নাই। কিসের এত ঝগড়া? স্বামী স্ত্রীও নয় যে ব্যাপারটার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইব।

সকাল বেলা দুলারী ফুটপাথে বাসনের বোঝা লইয়া বসিয়াছে। মুখ অত্যন্ত ভার, পাড়ার অন্য মেয়েদের সঙ্গে একেবারে কথা বলিতেছে না। ধোপার চাকরটা আসিয়া কি মনে করিয়া দুলারীর বালতিটায় হাত দিল। সেটা যে মেয়েটার খুব বেশী প্রয়োজন ছিল তাহা নয়। জল তাহাতে খানিকটা ভরিয়া সে রাখিয়াছিল, তবে তাহা না রাখিলেও চলিত, কারণ হাতের কাছেই জলের ব্যবস্থা। কিন্তু দুলারী এমন ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল যে, চাকর বেচারা পালাইতে পথ পাইল না। তাহাকে তাড়াইয়াও দুলারীর ক্রোধ শান্ত হইল না, জলটা ঢালিয়া ফেলিয়া বালতিটাকে সে এক লাথি মারিয়া ফুটপাথের উপর গড়াইয়া দিল। ধোপা ঠিক সেই সময় ঘাটের কাজ সারিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। চাকরটার অপ্রতিভ ভাব এবং দুলারীর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিয়া সে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

দুলারী ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট মানুষ। পাঁচ মিনিটের বেশী দশ মিনিট তাহার একভাবে যায় না। আবার একটু

পরেই দেখি সে হাসিয়া গল্প সুরু করিয়াছে। ঘর দোর ঝাট দেওয়া শেষ হইয়াছে, ঘরের সামনের ফুটপাথের জঞ্জালগুলোকে সে এবার আক্রমণ করিয়াছে। চাকরটার লজ্জা নাই, সে আবার হাসি মুখে আসিয়া ঝাটাগাছটার জন্য হাত পাতিল। দুলারীর কাজে একটুখানি সাহায্য করিতে পারিলেই সে বর্ত্তিয়া যায়। মুখ বাঁকাইয়া একটুখানি হাসিয়া ঝাঁটাটা তাহার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দুলারী ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল। চাকরটা পরম তৃপ্তির সহিত ফুটপাথ ঝাঁট দিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে মনে হইতেছিল, মানুষ যাহা হাতের মধ্যে পায় না, তাহাই পাইবার জন্য চিরজীবন তপস্যা করিয়া মাথা কুটিয়া মরে। সেই জিনিষই একবার আয়ত্তের ভিতর আসিলে তাহার মূল্য অতি সামান্যই হইয়া যায়। এই দুলারী মেয়েটা যদি এই দুইটা মানুষের কাহারও বিবাহিতা পত্নী হইত, তাহার মধ্যে ইহারা আদর যত্ন করিবার কিছুই হয়ত খুঁজিয়া পাইত না; তাহার হাসির, তাহার কথার কোনই মূল্য থাকিত না। কিন্তু দুলারী যে কাহারও সম্পত্তি নয়, ইহাতেই তাহার মূল্য শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

ধোপার হাতে শাড়ী জামা হরেক রকম আসে। পাড়ায় সৌখীন মহিলার অভাব নাই। এ লোকটা কাপড় কাচে ভাল। এবং সময়-মত দেয় বলিয়া ইহার খরিদ্দার সবার চেয়ে বেশী। এতদিন কাপড় ধুইয়া, তাহার দাম বুঝিয়া লইয়াই

সে খুসি ছিল, এখন তাহার কাজ হইয়াছে রকম-বেরকমের শাড়ী দিয়া দুলারীকে সাজাইয়া তাহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা। দুলারীর সাত জন্মেও এত রকম শাড়ী পরা অভ্যাস নাই। মনের সকল সাধ সে ভাল করিয়াই মিটাইয়া লইতেছে। একটুখানি কৃতজ্ঞতারও সঞ্চার তাহার হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সারাদিন জল ঘাঁটার কাজ, আর এই প্রচণ্ড শীতের দিন, ধোপাটার কাশি হইয়াছে ভয়ানক। দুলারী একদিন জোর করিয়া তাহাকে কাজে যাইতে দিল না, নিজে সুখন চাকরটার সঙ্গে কাপড় কাচিতে চলিল। বাড়ী ফিরিয়া আবার পাতানো-ভাইয়ের জন্য পাঁচন সিদ্ধ করিল, তেল গরম করিয়া মালিশ করিয়া দিল। চায়ের পাতা কিনিয়া আনিয়া বার দুই ঘরেই চা করিয়া দিল।

মাঝে কয়েক দিন আবার শীতের ভিতর বর্ষার আবির্ভাব হইল। ঘরের বাহিরে পা দিবার জো নাই, সুতরাং বারাণ্ডায় বসা আমার আর হয় না। কিন্তু দুপুর বেলা রাস্তায় মহা কোলাহল শুনিয়া আর কৌতূহল সম্বরণ করিতে না পারিয়া খড়খড়ি তুলিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম। ধোপার ঘরের সামনেই ভীড়, ভিতরে মহা চেঁচামেচি চলিয়াছে। কি ব্যাপার বুঝিলাম না।

হঠাৎ দেখি দুলারী মহা উত্তেজিত ভাবে হাত নাড়িয়া কি বলিতে বলিতে বৃষ্টির মধ্যেই ঘরের বাহির হইয়া যাইতেছে। তাহার হাতে ছোট একটা পুঁটলি। বাহির

হইয়া যাইতে অবশ্য সে পাইল না, অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, টানাটানি করিয়া ধোপা তাহাকে আবার ঘরে ফিরাইয়া লইয়া গেল। প্রতিবেশীরাও যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেল।

এমন ভিজা দিনে, এত উত্তাপের সঞ্চার কোথা হইতে হইল, জানিবার জন্য ঝিটাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। সে নিশ্চয়ই এতক্ষণে সব খবর সংগ্রহ করিয়াছে।

সে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁরে কি নিয়ে অত হৈ হৈ হচ্ছিল?"

ঝি বলিল, "ওমা, তা জানেন না? ও মেয়েটা কি কম পাজী? যার খায়, তারই সর্ব্বনাশের চেষ্টায় থাকে। ভাগ্যে সুখনটা আছে তা না হলে ধোপাটাকে এতদিন মজাত। ঐ যে গো, ঐ মুসলমান বাড়ী না? ওদের গিন্নি একখানা ভাল রেশমের শাড়ী ইস্ত্রি করতে দিয়েছিল। ছুঁড়ীর আস্পর্দ্ধা দেখ মা, বলে কিনা সেখানা পরবে। সামনেই ওরা রয়েছে, দেখতে পেলে আর আস্ত রাখত? তাই সুখন বারণ করেছে বলে এত কাণ্ড। বলে বেরিয়ে যাব, হেন তেন। যেন বেরিয়ে যাবার জন্যে দশটা বাপের বাড়ী বসে রয়েছে। তাহলে আর মরতে এখানে এয়েছিস্ কেন?"

দুলারীর রাগটা কিছু বেশীই হইয়াছিল বোধ হয়। কয়দিন সে আর ধোপার ঘরের শাড়ীজামা কিছু স্পর্শ ই করিল

না। নিজের সম্পদ সেই ছিটের জামা, এবং ছাপা বৃন্দাবনী শাড়ী খানাই পরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সুখন বেচারারই হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা মুস্কিল। এই মনিবের ঘরে সে বহুদিন আছে, আশ্রয় পাইয়াছে, আহার পাইয়াছে এবং মোটের উপর বন্ধুর মত ব্যবহার পাইয়াছে। এতদিন সেও যথাসম্ভব প্রতিদান দিয়া আসিয়াছে, মনিবের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু 'প্রভুর কর্ম্মে, প্রণয় ধর্ম্মে বিরোধ বাধিল আজ।' বেচারা কোন্‌দিক সাম্‌লাইবে এখন?

ধোপার সঙ্গেও দুলারীর যে না লাগে তাহা নয়। একদিন ভাল এক খরিদ্দারকে ঝট্ করিয়া দুলারী কি একটা অপমানসূচক কথা বলিয়া বসিল। খরিদ্দার চলিয়া যাইবার পর, ইহা লইয়াই আর এক পালা বাধিয়া গেল। ধোপা ঘুঁষি তুলিয়া মারিতে আসিল, দুলারী ঝাটা হাতে তাড়া করিয়া আসিল। সুখন মাঝে পড়িয়া, ঘুঁষি এবং ঝাঁটা উভয়ই নিজের অঙ্গে গ্রহণ করিল। ঝগড়া খানিক বাদে মিটিয়া গেল। পরদিন দেখি দুলারীর নিরাভরণ হস্তে এক জোড়া রূপার চুড়ীর আবির্ভাব হইয়াছে।

দিনকতক শান্তিতে কাটিল, তাহার পর আবার খণ্ড প্রলয়। এবার দেখিলাম ব্যাপার সঙ্গীন। শুধু তর্জ্জন গর্জ্জন নয়, মারামারি বাধিয়া গিয়াছে, এবং গলির লোক খালি

নয়, বড় রাস্তার লোকও আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাড়াতাড়ি বারাণ্ডায় বাহির হইয়া আসিলাম।

দুলালীর ঘাড় ধরিয়া প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়া ধোপাটা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "শয়তানী, দুষমন্, সত্যি করে বল্, নইলে তোর জান বের করে দেব।"

দুলারী তাহাকে অশ্রাব্য গালি দিয়া বলিল, "ছেড়ে দে বল্‌ছি। নইলে পুলিশ ডাকব। তোর টাকা নিতে আমার বয়ে গেছে। ও গহনা আমার তোলা ছিল, কাল বের করে পরেছি।"

ধোপা চেঁচাইয়া সকলকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিতে লাগিল। কালই সে দুই তিন বাড়ীর মাহিনা পাইয়াছে। কুড়িটা টাকা আলমারীর দেরাজে রাখিয়াছিল, আজ সকালে দেখিতেছে তাহা নাই, এবং দুলারীর চরণকমল শোভা করিতেছে একজোড়া নূতন বাঁকা মল। গহনা কিনিবার টাকা সে পাইল কোথা হইতে?

দুলারী আবার কি একটা গালাগালি দিতেই ধোপাটা পাগলের মত তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। দুলারীর অদৃষ্টে সেদিন ফাড়া একটা লেখা ছিল বড় রকম, কিন্তু অল্পের জন্য সে বাঁচিয়া গেল। সুখন হঠাৎ ভীমবিক্রমে তাহার মনিবকে আক্রমণ করিল। দুই প্রতিদ্বন্দীতে বেশ ঝুটাপুটি বাধিয়া গেল।

পাড়ার লোকে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া দুইজনকে ছাড়াইয়া দিল। কোথা হইতে একটা লালপাগড়ীও আসিয়া জুটিল। বেশ ঘোরালো ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। ভীড় এত বেশী হইল যে আমি শেষ পর্য্যন্ত আর কিছু দেখিতেই পাইলাম না।

পুলিশ না আসিলে ব্যাপারটা মারামারি গালাগালির উপর দিয়াই শেষ হইত হয়ত, কিন্তু এখন আর তাহা চলিল না। হৈ চৈ খানিকটা কমিয়া আসিল বটে, কিন্তু সেটা পুলিশের ভয়ে। আবার সাক্ষী দিবার ফেসাদে পড়িতে হইবে হয়ত ভাবিয়া, লোকজন--বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকেরা একে একে রঙ্গমঞ্চ বা রণক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িবার জোগাড় করিতে লাগিল।

ধোপার উৎসাহ অনেকটাই কমিয়া আসিয়াছিল। নিজে রাগের মাথায় দুলারীকে দুচার ঘা দেওয়া এমন বেশী কিছু ব্যাপার নয়, তাহাদের ঘরে এত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, পরদিনই দুলারী সব ভুলিয়া যাইত। কিন্তু পুলিশের হাতে দুলারীকে সমর্পণ করা সে যে অন্য ব্যাপার! বেচারা এখন নানারকম ভাবে নিজের গোড়ার কথাগুলিকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কনষ্টেবলের কাছে দুই ধমক খাইয়া তাহাকে চুপ করিয়া যাইতে হইল।

দুলারীও মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া মড়া কান্না জুড়িয়া দিল। পিতা, মাতা, স্বামী সকলকে স্মরণ করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন শত্রু জানিলে সে কি ইহার ঘরে

আসিত? আপনার ভাইয়ের মত মনে করিয়া আসিয়াছিল। জেল খাটিয়া আসিলে আর কি সে মুখ দেখাইতে পারিবে? তাহাকে আর কি কেহ ঘরে স্থান দিবে? এখানে আসিবার আগে সে মরিয়া গেল না কেন?

কনষ্টেবল্‌টা ধমক দিয়া তাহার কান্না থামাইয়া দিল। এখন থানায় যাইতে হইবে—ডাইরী করিবার জন্য, সারাদিন দাঁড়াইয়া কান্না শুনিবার তাহার সময় নাই। দুলারী অগত্যা চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিয়া ব্যাধভীতা হরিণীর মত চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। ধোপাও আস্তে আস্তে তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

তাহাদের লইয়া কনষ্টেবল্‌টা রাস্তায় পা দিয়াছে, এমন সময় সুখন ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিল, বলিল, "এ জী, ওকে ছেড়ে দাও। টাকা আমি চুরি করেছি, ও কিছু জানে না।"

সকলে ত অবাক। ধোপাটা আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "তবে রে নিমক্‌হারাম! টাকা নিয়ে কি করেছিস্ তুই? ছুঁড়িকে গয়না দিয়েছিস্?"

সুখন একবার দুলারীর অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর অম্লানবদনে বলিল, "না ওকে দিতে যাব কেন? তাড়ি খেয়ে ঢের ধার জমেছিল, তাই শোধ দিয়েছি।"

আবার খানিক গালাগালি চলিল। নিতান্ত পুলিশ দাঁড়াইয়া, না হইলে মারামারিও হইত। অবশেষে দুলারী

বাঁচিয়াই গেল। পুরুষ দুইজনকে লইয়া কনষ্টেবল্ থানায় চলিয়া গেল। মেয়েটা রাস্তার ভিতর কোথায় যে লুকাইল বুঝিতে পারিলাম না। ধোপার ঘর যেমন তালাবন্ধ, তাহাই রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, আমিও ঘরের ভিতর চলিয়া আসিলাম।

পরদিন সকালে দেখি তালা খোলা হইয়াছে। কিন্তু কাজকর্ম্মের কোনো চেষ্টা নাই। ধোপা সিঁড়ির উপর চুপ চাপ বসিয়া আছে, সুখন ঘরের এককোনে বসিয়া ঝিমাইতেছে। কতরাত্রে ইহারা যে ছাড়া পাইয়াছে তাহা কে জানে?

হঠাৎ পাশের গলির ভিতর হইতে দুলারী বাহির হইয়া আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "সুখন্, আমার কাপড়ের পুঁট্‌লি দে, আমি চল্‌লাম।"

সুখন্ উত্তর দিল না, যেমন ঝিমাইতেছিল, ঝিমাইতে লাগিল। তাহার মনিব কট্‌মট্ করিয়া দুলারীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

দুলারী আবার খোঁচা দিয়া বলিল, "কি দিবিনা? কাপড়গুলো আটক করবি নাকি?"

খোঁচা যথাস্থানে পৌঁছিল। ধোপাটা লাফাইয়া উঠিয়া ভিতরের ঘর হইতে ছোট একটা পুঁটলি বাহির করিয়া আনিয়া ফুটপাথের উপর ছুঁড়িয়া দিল। দুলারী সেটা হাতে করিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। দুই চার পা গিয়া ফিরিয়া

আসিয়া দুইগাছা মল সিঁড়ির উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ধোপা সেটা তুলিয়া লইল।

আবার খানিকটা হাঁটিয়া গিয়া দুলারী ফিরিয়া আসিল। হাতের চুড়ি দুইটা খুলিয়া ধোপার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। এবার আর ফিরিল না।

ধোপার ঘরে এখন অটুট শান্তি। কিন্তু সেদিকে আর চাহিতে ইচ্ছা করে না। সকল আলো যেন এখানের নিভিয়া গিয়াছে, সকল শ্রী কেহ নিষ্ঠুর হাতে মুছিয়া লইয়াছে। সুখন আবার মুখ বুজিয়া মনিবের কাজ করে। জেলে যাইতে তাহাকে হয় নাই, ঘুষ দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছে। মাসে মাসে নাকি মাহিনা হইতে চুরির টাকা কাটা যায়।

এই মানুষটাই যে ক দিন আগে মনিবকে গলা টিপিয়া মারিতে গিয়াছিল, তাহা আর বুঝিবার কোনো উপায় নাই।

প্রসঙ্গ

বঙ্গদেশে নদীগুলি মজিয়া যাওয়াই যে ম্যালেরিয়া বিস্তারের অন্যতম কারণ, তাহা পাশ্চাত্য ম্যালেরিয়াবিদ্‌গণও স্বীকার করিয়াছেন। নদী মজিয়া যাওয়ার ফলে বন্যার জল যথেষ্ট পরিমাণে দেশকে প্লাবিত করিতে পারে না; এবং ডোবা, পুষ্করিণী, খাল-বিল প্রভৃতিতে বন্যার ঘোলা জল প্রবেশ করিয়া বর্ষার আবদ্ধ জলকে কর্দ্দমাক্ত করিতে পারে না।

* * *

বন্যার ঘোলা জল ম্যালেরিয়া-নিবারণে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। ম্যালেরিয়াবাহী এনোফিলিস্ মশার ছানা বা লারভি এই জলে মরিয়া যায়। কথায় বলে গঙ্গার জলে পোকা হয় না। এই লারভিও একরকম পোকা। গঙ্গার জল সর্ব্বদা ঘোলা থাকে বলিয়া মশারা ইহাতে ডিম পাড়ে না। কিন্তু অনেক নদীর জল বর্ষার পর থিতাইয়া নির্ম্মল হয়। তখন মশারা তাহাতে অবাধে ডিম পাড়ে। নদীয়া জেলার জলাঙ্গী ও চুর্ণী নদীতে শীত ও গ্রীষ্মকালে মশার লারভি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে

বন্যার ঘোলা জল নামিলেই ইহাদের আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

* * *

ম্যালেরিয়া দমন কার্য্যে ক্রুড কেরাসিন তৈল ও প্যারিসগ্রীন নামক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহাদের সংস্পর্শে মশার লারভি মরিয়া যায়। এই সকল লারভি-নাশক পদার্থ জলের উপর বেশীদিন থাকে না। তখন জলে মশার লারভি পুনরায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই লারভি ৬।৭ দিনে মশায় পরিণত হয়। সেজন্য প্রতি সপ্তাহে লারভি-নাশক পদার্থ দিতে হয়। ইহার প্রয়োগ ব্যয়সাপেক্ষ। যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়াবাহী মশা বহুবিধ জলাশয়ে দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় লারভি-নাশক পদার্থের সাহায্যে ম্যালেরিয়া দূরীকরণ প্রকৃতই ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে।

* * *

প্রকৃতিপ্রেরিত বন্যার ঘোলা জলের ন্যায় লারভি-নাশক পদার্থ আর নাই। এ বিষয়ে প্রকৃতির কার্পণ্য নাই। যতদিন বন্যাপ্রবাহ থাকে ততদিনই ঘোলা জল দেশ প্লাবিত করে। যদি এই ঘোলাজল কোনরূপে ম্যালেরিয়া-প্রাদুর্ভাবের সময় পর্য্যন্ত রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে ক্রমে ম্যালেরিয়াবাহী মশার সংখ্যা হ্রাস এবং ম্যালেরিয়া দূরীভূত হয়।

* * *

বাংলা সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর ডাক্তার চার্লস্ বেণ্টলি এই মত পোষণ করেন যে, ভাগিরথী, জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা—এই তিনটি নদীর মুখ যদি খুলিয়া দেওয়া হয় তবে পদ্মা হইতে বন্যার ঘোলা জলরাশি প্রচুর পরিমাণে আসিয়া বঙ্গদেশের খাল-বিল, ডোবা-পুষ্করিণী প্লাবিত করিয়া ম্যালেরিয়া দূরীভূত করিতে সমর্থ হইবে। মিশর দেশের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার পরলোকগত স্যর উইলিয়ম উইলকক্স এই সকল নদীর মুখ ও গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই মতই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কি উপায়ে এই বিরাট কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে, তাহারও তিনি আভাস দিয়া গিয়াছেন। রস ইনষ্টিটিউটের বিখ্যাত ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞ স্যর ম্যাল্কলম ওয়াট্সনও বেণ্টলি সাহেবের মত সমর্থন করিয়াছেন। এমন কি লীগ-অফ্-নেশনের ম্যালেরিয়া কমিশন বঙ্গদেশের বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া সরকার বাহাদুরকে বেণ্টলি সাহেবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী উক্ত নদীগুলির মুখ খুলিয়া দিবার অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই বিশেষজ্ঞদিগের রিপোর্ট সংবাদপত্রে বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। সরকার বাহাদুরও এই রিপোর্ট সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন নাই।

* * *

সম্প্রতি বাংলার গভর্ণর কলিকাতার 'হাইজিন ইনষ্টিটিউট' উদ্ঘাটন করিবার সময় বলিয়াছেন, সুশাসন ও স্বাস্থ্যোন্নতি পরস্পরের উপর নির্ভর করে। তিনি আশা করেন. বঙ্গবাসী স্বায়ত্ত-শাসন কার্য্যে যে নূতন ক্ষমতা শীঘ্রই লাভ করিবেন, তাহার দ্বারা তাঁহারা স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করিবেন। তৎকালীন বাংলা সরকার কি স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়সাধ্য প্রস্তাবে সম্মত হইবেন ?

শ্রীকৃষ্ণশেখর বসু

চিত্র ও চরিত্র

সুরেন্দ্রনাথ

বঙ্কিমচন্দ্রের দশ বৎসর পরে এমন একজন শক্তিমান্ পুরুষের আবির্ভাব হইল, যিনি ফরাসী গণতন্ত্রে জন্মিলে হইতেন মন্ত্রীপ্রধান, বিলাতে জন্মিলে হইতেন সচিবশ্রেষ্ঠ, মার্কিনের যুক্তরাজ্যে জন্মিলে হইতেন রাষ্ট্রপতি ; বাংলা দেশে জন্মিয়া তিনি হইলেন 'স্যর'।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া আট বৎসর পূর্ব্বে ১৯২৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। রাজনীতি লইয়া যাহার আরম্ভ, প্রায় রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সেই কর্ম্মকুশল দীর্ঘজীবনের পরিসমাপ্তি।

সুরেন্দ্রনাথের জীবন—যোদ্ধার জীবন। তিনি ছিলেন সেদিনের তরুণ দলের সেনাপতি। জীবনমধ্যাহ্নে যে দিন তিনি কারাবরণ করিলেন, সে দিন তিনি 'বালক-বীর' সুরেন্দ্রনাথ। একদা তাঁহার সহিত আর সাতাশ জন কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য পদ ত্যাগ করিয়া হইল 'সাবাস্ আটাশ'।

১৯০৫ সাল। বঙ্গ বিভক্ত হইয়াছে। বাংলার জীবনে সে দিন অপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নবজীবনের সাড়া, নবজাগরণের সাড়া। সে দিন সুরেন্দ্রনাথের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ

দিকে দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে কণ্ঠের মন্দ্র বাংলার সীমা অতিক্রম করিয়া সারা ভারতবর্ষের অন্তরে অনুরণিত হইতে লাগিল। স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনায় দেশ মাতিয়া উঠিল। সেদিন সুরেন্দ্রনাথের বাংলা যে কথা ভাবিয়াছিল, তাহার পনের বৎসর পরে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ সেই কথা ভাবিতে শিখিল, অথবা ভাবিতে শিখিল না।

তিনি ছিলেন বাংলার মুকুটহীন রাজা। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'বঙ্গলক্ষ্মী যদি আজ স্বয়ম্বরা হন ত সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠেই বরমাল্য অর্পণ করিবেন।'

সুরেন্দ্রনাথ জাতীয়তার জনক। কংগ্রেস তাঁহার মানসী সৃষ্টি। কলিকাতার নাগরিক সভাকে তিনি স্বরাজ্য প্রদান করিয়াছেন।

এই উন্নতললাট, শ্যেনচক্ষু, ধনুকের ছিলার মত ঋজু-দেহ, সঙ্কল্পে অটল, ইচ্ছাশক্তিতে অদম্য, প্রবলকণ্ঠ স্বভাব-নেতাকে আজ যদি আমরা ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বাঙালীর মত আত্মবিস্মৃত জাতি সত্যই আর নাই।

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের মত বাগ্মী আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। একদা তাঁহার আদেশ সারা ভারতবর্ষ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিত।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা বলিতেন, স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র। আধুনিক মনোবিদেরা ছাড়িবার পাত্র নন তাঁহারা অমূলক স্বপ্নের মূল অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া মনের অজ্ঞাত প্রদেশে গিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, যে পাশব প্রবৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়াছি বলিয়া সভ্য মানব এতদিন নিশ্চিন্ত ছিল, সেই মৌলিক প্রবৃত্তিগুলিই নির্জ্ঞানের অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া মানুষকে স্বপ্নে ও কার্য্যে প্রেরিত করিতেছে। স্বাধীন ইচ্ছার দম্ভ বৃথা, মানুষ প্রবৃত্তির দাস।

* * *

মানুষের মনে কতকগুলি বলবতী প্রবৃত্তি আছে। সেই প্রবৃত্তিগুলি নানাভাবে চরিতার্থ হইতে চায়। মনের যেমন একটি সজ্ঞান, তেমনি একটি নির্জ্ঞান অবস্থাও আছে। কামনাসঞ্জাত মানবপ্রবৃত্তিগুলি মনের গোপনে—নির্জ্ঞানের গুহায় বন্দীভাবে বাস করে। সচেতন মনের ভিতর এই-সব কামনার সন্ধান পাওয়া যায় না, কেন-না অধিকাংশ গুপ্ত কামনাই অসামাজিক। মনের রুদ্ধ ইচ্ছাগুলিই বিচিত্র ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া স্বপ্নে ও সাহিত্যে কাল্পনিক পরিতৃপ্তি লাভ করে।

* * *

পুরাতন মনোবিদেরা শুধু মনের সজ্ঞান অবস্থার ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলের বর্ণনা করিয়াছেন। ফ্রয়েড দেখিলেন, শুধু তাই নয়, সেই সংজ্ঞান নানা দিক দিয়া নির্জ্ঞানের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। বহুবিধ পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই মত বৈজ্ঞনিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। মনস্তত্ত্বজগতে যুগান্তর আনিয়া ফ্রয়েডের নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িল।

* * *

আমাদের দেশে ফ্রয়েডের অনুসরণে স্বপ্ন-বিশ্লেষণে এই মানসিক নির্জ্ঞানের পরিচয় লাভ করিয়া গিরীন্দ্রশেখর প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ নূতন গবেষণা পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। লোকে বলে, মনের অগোচরে পাপ নাই। মনোবিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন, আমাদের মনের অগোচরে বহু পাপই অজান ইচ্ছারূপে লুকাইয়া আছে। মনের সেই রুদ্ধ বা অবদমিত ইচ্ছাই স্বপ্নে কাল্পনিক তৃপ্তি লাভ করে।

* * *

মনের অগোচরে সমাজ-নিন্দিত যে পাপ মনের গহনতলে লুকাইয়া থাকে, অন্তরের চির-সতর্ক নিষেধ-প্রবৃত্তির বশে তাহা স্বরূপে ব্যক্ত হইতে পারে না, সামাজিক বাধা বিশ্বাস ও সংস্কারের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ-কালে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। এই গৃহীত রূপ সামাজিক আবরণের ছদ্মবেশে আবৃত। এইরূপ অসামাজিক কামনারহস্যে জন্ম বলিয়া রস যখন আর্ট

ও সাহিত্যে রূপ গ্রহণ করে, তখন তাহার আধার ও আবেষ্টন বিশেষ ভাবে সমাজ স্বীকৃত ধারণার অনুবর্ত্তী হইলে তবেই হৃদয় তৃপ্ত হয়। স্বপ্নে ও সাহিত্যে রুদ্ধ ইচ্ছার কাল্পনিক পরিতৃপ্তি। যেখানে এই গোপন পরিতৃপ্তি, সেইখানে রস।

* * *

সাহিত্য অজ্ঞাত আবেগশীল রুদ্ধ কামনাপ্রবাহপ্রকাশের একতর উৎস। 'ছোট গল্পে'র অষ্টবিংশ সংখ্যার 'প্রসঙ্গ' বিভাগে সাহিত্য ও মনোবিদ্যার আলোচনা সম্পর্কে ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র এই কথারই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

—আগামী সংখ্যায়—

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্তের

'পাল্লী-ঋণ'

দিন-পঞ্জী

মাদ্রাজ, ২৬শে জানুয়ারী—অদ্য বেলা ১টার সময় ব্যবস্থাপক সভায় যখন জেলা মিউনিসিপ্যালিটি ও লোকাল বোর্ড আইন সংশোধন বিল পেশ করা হইতেছিল, সেই সময়ে দর্শকদিগের গ্যালারি হইতে জ্বলন্ত পটকা, দগ্ধ 'ইউনিয়ন জ্যাক' ও কতকগুলি ইস্তাহার নিক্ষিপ্ত হয়।

ডেট্রয়েট, ২৭শে জানুয়ারী—ফোর্ড মোটর কোম্পানী ঘোষণা করিতেছেন যে, তাহারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত মোটর কারখানা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ কবিয়া দিলেন। ঐ সমস্ত কারখানায় মোট একলক্ষ শ্রমিক কাজ করিত।

ডাবলিন, ৩০শে জানুয়ারী—আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের সাধারণ নির্ব্বাচনের চুড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে:—

ডি ভ্যালেরার দল—৭৭, কসগ্রেভ দল—৪৮, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট—৮, শ্রমিক—৮, সেণ্টার—১১, লেবার—১। যদি নূতন ডেলে সমস্ত দল একত্রিত হইয়া ডি ভ্যালেরার বিরুদ্ধতা করে তথাপি ডি ভ্যালেরা ১টি ভোট (স্পীকারসহ) বেশী পাইবেন।

কলিকাতা, ২রা ফেব্রুয়ারী—বুধবার অপরাহ্নে কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় ডাঃ বি-এন-দে দশ বৎসরের জন্য চীফ ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পদে ইতিপূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয় নাই।

৩রা ফেব্রুয়ারী—প্রসিদ্ধ ইংরাজ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার জন গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি গত মঙ্গলবার পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার সময়ের প্রধান সাহিত্যরথীদের তিমি অন্যতম। গত বৎসর তিনি নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছিলেন।

গত বুধবার রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত শিবসেবক মিশ্র ৪৮ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার অগ্রজ শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্ পণ্ডিত পশুপতি সেবকের মৃত্যু হয়।

সকল প্রকার সদ্য অথবা দূষিত বেদনা
এবং ক্ষতাদির জন্য
অমৃত প্রলেপ
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

ছোট গল্প

১ম বর্ষ] ২৯শে মাঘ ১৩৩৯ [৩১শ সংখ্যা

পত্নীঋণ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

শাস্ত্রে বলে মানুষ জন্মে সামান্য তিনটি ঋণ লইয়া—দেবঋণ, ঋষিঋণ, আর পিতৃঋণ। শাস্ত্রে আরও বলে যে এ ঋণ শোধ করিতে একটি পয়সাও খরচ করিবার দরকার হয় না। এই কটি ঋণ শোধ করিয়া যে জীবন কাটাইয়া যায় তার আর কোনও চিন্তাই থাকে না।

ত্রিকালজ্ঞ শাস্ত্রকারেরা তিনকালের খবর জানিতেন, চতুর্থের খবর তাঁদের জানা ছিল না। তাই আমাদের যেটা সব চেয়ে বড় ঋণ সেটার কোনও পরিচয় তাঁরা দেন নাই। সেটা পত্নীঋণ।

হরিশ চক্রবর্ত্তী যখন জন্মিয়াছিল তখন তার জ্ঞান বিশ্বাস-মতে সে ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। কারও কাছে কোনও দেনা, দায়িত্ব বা অধীনতার কথা সে জানিত না, বরং অনেকদিন পর্য্যন্ত তার আচরণ দেখিয়া মনে হইত যেন সে সারা পৃথিবীটাকেই তার হুকুমের অধীন বিবেচনা করে। কাজেই তার সামান্য কিছু অসুবিধা ঘটিলেই সে চটিয়া কাঁদিয়া এমন একটা অনর্থ করিত এবং পিতামাতার উপর এমন প্রতাপ প্রকাশ করিত যেন সে তার ক্ষুদ্র বিশ্বের অবিসম্বাদী মালিক, পিতামাতা তার সামান্য খিদমতগার মাত্র।

যদিও সে তার পিতামাতার 'একজাত' সন্তান ছিল না, তথাপি তার একটা বাহাদুরী ছিল যাহা তার ছয়টি ভাইবোনের মধ্যে কেহই করিতে পারে নাই—সে বাঁচিয়াছিল। আর সকলেই অল্প বা অধিক বয়সে মরিয়া গিয়াছিল। কেবল বাঁচিয়া থাকিয়া সে পিতামাতাকে এত কৃতার্থ করিয়া দিয়াছিল যে তাঁরা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন তাঁরা সর্ব্ববিষয়ে এই মৃত্যুবিজয়ী সন্তানের সকল হুকুম নির্ব্বিচারে পালন করিয়া তাঁদের জীবন সার্থক গণ্য করিয়াছিলেন।

হরিশের যখন পোনেরো বৎসর বয়স তখনও সে সম্পূর্ণ স্বাধীন—সম্পূর্ণ অঋণী। দেবঋণ, ঋষিঋণ সে পরিশোধ করিয়াছিল অতি সংক্ষেপে—টিকি রাখিয়া এবং পৈতা ধারণ

করিয়া। ত্রিসন্ধ্যা সে নিয়মিতভাবে করিত না, তার খোসখেয়াল অনুসারে মাঝে মাঝে করিত। পিতৃঋণ পরিশোধের সময় তখনও হয় নাই। কিন্তু যখন সে দিন আসিল তখন তার পক্ষে কোনও চিন্তা বা উদ্বেগের প্রয়োজন হইল না—না চাহিতেই একটি একটি করিয়া চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া তার চতুর্দ্দশ পুরুষের সর্ব্ববিধ ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিল।

কিন্তু তার পূর্ব্বেই তার স্কন্ধে চাপিল যে ঋণ তাহা সে তার জীবনে পরিশোধ করিতে পারিল না।

চলতি ভাষায় বলিতে গেলে সে বিবাহ করিল। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি জীবনের অবশ্যম্ভাবী ঘটনাগুলির মত তার বিবাহও ঘটিয়া গেল—তাহা তার ইচ্ছার অপেক্ষা রাখিল না।

তার পিতা ছিলেন যাজক ব্রাহ্মণ—তাঁদের পণ দিয়া কন্যা ঘরে আনিতে হয়। সুতরাং বিবাহটা প্রায়ই আয়াস-সাধ্য হয়। কিন্তু হরিশের বেলায় সে আয়াসটুকুও করিতে হয় নাই! তার পিতার দূরসম্পর্কীয়া এক দরিদ্র বিধবা আত্মীয়া কিছুদিন তাঁদের আশ্রয়ে বাস করিয়া হঠাৎ তাঁর কন্যাটিকে তাঁদের আশ্রয়ে রাখিয়া মারা গেলেন। সুতরাং যখন হরিশের বয়স পোনেরো এবং আনন্দময়ীর বয়স দশ, সেই সময় হরিশ ভাল করিয়া কিছু বুঝিবার পূর্ব্বেই দেখিতে

পাইল যে চিরপরিচিতা আনন্দময়ীর সঙ্গে তার হঠাৎ এমন একটা সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যার জন্য দিনের বেলায় তাকে দেখিতে পাইলে আনন্দময়ীর ঘোমটা টানিতে হয় এবং তাহাতে ভুল হইলে তার তিরস্কৃত হইতে হয়।

যথাক্রমে হরিশের পিতা ও মাতা স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁদের সদ্বিবেচনার ফলে তাঁরা মৃত্যুর পূর্ব্বেই পৌত্রমুখ দেখিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন। তখন হরিশের বয়স কুড়ি বৎসর। তখনও হরিশ ঘরে বাঁধা পড়ে নাই। পিতার নিকট যাজনাদি ক্রিয়াকর্ম্ম সে শিখিয়াছিল, কিন্তু উপবাসবহুল ঐ সব আয়াসসাধ্য কর্ম্মে তার প্রবৃত্তি ছিল না। মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া ফিরিয়া, বন্ধুমহলে আড্ডা দিয়া, তাস পাশা এবং সময়ে সময়ে তার চেয়ে গুরুতর ব্যসনে যোগদান করিয়া সে আপন ইচ্ছায় স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাপন করিত। পৃথিবীর কাহারও তোয়াক্কা রাখিবার যে তার প্রয়োজন আছে, এ জ্ঞান তখনও তার জন্মায় নাই।

পিতার মৃত্যুর পর তার ক্রিয়াকর্ম্মের সময় যজমান-বাড়ী ঘুরিয়া মন্ত্র পড়াইবার আয়াস স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু সে কার্য্য এত বেশী ব্যাপক ছিল না যাহাতে তার স্বাধীনতার বিশেষ কিছু ব্যাঘাত করে। এবং যদিও ইহাই ছিল তার বৃত্তি এবং যজমানদের প্রতি ইহা ছিল তার কর্ত্তব্য, তবু সে ইহার ভিতর কর্ত্তব্যের বন্ধন অপেক্ষা আধিপত্যের গৌরবটাই

বেশী অনুভব করিত। তার যজমানেরা তার প্রভু নয়, দাস বিশেষ—তার আজ্ঞা ও উপদেশে পরিচালিত এবং তার কাছে সদাসর্ব্বদা নতশির।

সুতরাং বাহিরে কাহারও কাছে তার উন্নত শির নত হয় নাই, কাহারও কাছে কোনও দেনার বোঝা সে অনুভব করে নাই। কিন্তু ঘরে—সে কথা স্বতন্ত্র।

—আনন্দময়ীর মত নিরানন্দ নারী সংসারে খুব বেশী দেখা যায় না। পৃথিবীর কোনও বিষয়ে কোনও দিন তাকে তৃপ্ত হইতে কেহ দেখে নাই। তার যে সন্তানের মুখ দেখিয়া তার শ্বশুর শ্বাশুড়ী কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তার মুখের দিকে চাহিয়াই আনন্দময়ী বলিয়া উঠিয়াছিল, "আহা ছিরি দেখ, যেন বাপের ছবি।"—দুর্ভাগ্যক্রমে হরিশের সঙ্গে কন্দর্প বা কার্ত্তিকের কোনও সাদৃশ্য ছিল না, এবং সে কথা আনন্দময়ী দিনান্তে একটিবার তাহাকে স্মরণ না করাইয়া ছাড়ে নাই।

নিরাশ্রয়া বিধবার সন্তান হইলেও আনন্দময়ীর এক সম্পদ ছিল—সে তার অসাধারণ রূপ। শিশুকাল হইতে সকলেই তাকে আদর করিয়া বলিত যে সে রাজার রাণী হইবে। দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে এই কথাটাই অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাসে সে রূপকথায় প্রত্যেক রাজপুত্রকে পর্য্যায়ক্রমে আপনার স্বামী বলিয়া কল্পনা করিয়া তাহার পত্নীত্বের অপরিহার্য্য সৌভাগ্যের বিবিধ কল্পনায়

তার চিত্ত বোঝাই করিয়া রাখিয়াছিল। যখন হরিশের সঙ্গে তার বিবাহ হইয়া গেল, তখন হঠাৎ সেই স্বপ্নের সৌভাগ্য হইতে চ্যুত হইয়া সে এমন একটা অতল গহ্বরে পড়িয়া গেল যে কিছুদিন তার ভাবনা-চিন্তার সব খেই হারাইয়া গেল। হরিশের কোনও রাজপুত্রের মত, না ছিল রূপ, না ছিল বৈভব! কাজেই সে যে এই হরিশেরই পত্নী, রাজরাণীর কাছাকাছিও কিছু নয়, এই রূঢ় সত্যটা মনের তলায় স্বীকার করিয়া লইতে তার অনেকদিন বিলম্ব হইয়াছিল। নদীর ধারে জল তুলিতে গিয়া যখন সে দূরে নদীর জলে কোনও ধনীর বিচিত্র বজরাকে পাল উড়াইয়া দৃপ্ত বেগে চলিতে দেখিত, তখন অনেক দিন তার মন বাস্তবের কঠোর বন্ধন ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া যাইত—মনে হইত সে যেন কোন রাক্ষসপুরীতে বন্দিনী রাজকন্যা, তার রাজপুত্র বুঝি ঐ বজরায় আসিয়া তাহাকে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া যাইবে। বজরা চলিয়া যাইত–রাজপুত্র আসিত না। তখন হঠাৎ তার স্মরণ হইত যে রূপকথার রাজপুত্রেরা অনেকদিন হইল অদৃশ্য হইয়াছেন। সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া কলসী ভরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিত।

যখন হরিশের পত্নীত্বটা তার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া গেল এবং রাজপুত্রের স্বপ্ন যখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমে বিলুপ্ত, হইয়া গেল তখন সে তার অবস্থাটা স্বীকার করিয়াও সম্পূর্ণ গায় নামিতে পারিল না। হরিশের সংসার সে করে, কিন্তু

রাজরাণীর ওজনে, এবং রাজপুত্রের সঙ্গে তুলনায় হরিশের যে-সব অশেষ খর্ব্বতা তার জন্য যথেষ্ট কুণ্ঠা ও অতৃপ্তি বহন করিয়া সে তার দুরদৃষ্ট কোনও মতে সহিয়া চলে। কোনও কিছুতেই তার মন ওঠে না, কোন সৌভাগ্যই তার পক্ষে যথেষ্ট মনে হয় না, বিন্দুমাত্র অভাব বা অসুবিধা তাহাকে পীড়ন করে।

রূপসী পত্নীর কাছে হরিশ সর্ব্বদাই আপনার সর্ব্ববিধ ক্ষমতার জন্য আপনাকে কুণ্ঠিত অনুভব করে। পিতামাতার ওপর সে যেমন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে, স্ত্রীর কাছে সে সেই পরিমাণে আপনাকে সঙ্কুচিত বোধ করে। আনন্দময়ীর রূপরাশির দিকে চাহিয়া তার কেবলি মনে হয় যে তার কুরূপ লইয়া এমন রূপসীর সঙ্গলাভ তার পক্ষে একটা নিদারুণ স্পর্দ্ধার কথা। যেটুকু প্রশ্রয় সে পত্নীর কাছে পায় সেইটুকুকেই সে মহা সৌভাগ্য বলিয়া মনে করে, এবং তার তিরস্কারে তার কুণ্ঠা ও লজ্জার সীমা থাকে না। স্বামীর এই দুর্ব্বলতার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে আনন্দময়ী কোনও দিনই কোনও সঙ্কোচ অনুভব করে না।

একে রূপসী হইয়া সে কুরূপকে ধন্য করিয়াছে, তাহতে আবার বিনা পণে! সহস্র মুদ্রা পণ দিয়া তাকে ঘরে লইতে পারিলে ধন্য হইত এমন কত লোক জগতে আছে—কিন্তু হরিশ ফাঁকতলে তাকে বিনা মূল্যে পাইয়াছে! সুতরাং

হরিশের উপর তার দাবীর সীমা থাকিবার কথা নয়—ছিলও না। কথায় কথায় সে হরিশকে বুঝাইয়া দিত যে পণের অন্ততঃ সহস্র মুদ্রার জন্য সে আনন্দময়ীর কাছে ঋণী। ছাপোষা গৃহস্থ হরিশ কোন দিনই এমন কোনও দান তাকে দিতে পারে না যাতে আনন্দময়ীর রূপের ঋণ বা পণের ঋণ পরিশোধ হইতে পারে।

কাজেই প্রাণপণ সেবা করিয়া, সাধ্যাতীত দান করিয়াও হরিশ কোন দিনই তার পত্নীঋণের কণামাত্র পরিশোধ করিতে পারিল না।

এত রূপ তার, তবুও সে মনের মতন গহনা পরিতে পায় না, ইহাই ছিল আনন্দময়ীর প্রথম অভিযোগ। হরিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যদি একখানা গহনা আনিয়া দেয়, ভ্রূকুটি করিয়া আনন্দময়ী তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়—বলে, "আহা মরি, কি গয়নাই এনেছেন!" তবু হরিশ গহনা গড়ায়, দেনা করিয়া অনেক গহনাই সে গড়াইল, কিন্তু তাতে সিন্দুকে যত গহনা বোঝাই হইতে লাগিল, আনন্দময়ীর অতৃপ্তির যোগফল ততই বাড়িয়া গেল।

একটি, দুটি, তিনটি, চারটি ছেলে হইল। আনন্দময়ীর তো ছেলে নয় যেন আপদ! তার ছেলে মানুষ করিবার প্রক্রিয়া—তাদের কারণে অকারণে প্রহার। হরিশ ভাবিয়াছিল বুঝি ছেলের মুখ দেখিয়া আনন্দময়ীর মুখে

আনন্দ ফুটিবে—তার ঋণের বোঝা লঘু হইয়া উঠিবে। হিতে বিপরীত দেখিয়া সে বেচারা দিনরাত ছেলেগুলি আগলাইয়া বেড়াইত।

আযৌবন হরিশ ছিল বায়ুর মত স্বাধীন। চারটি ছেলে কোলে কাঁখে করিয়া সে এখন একেবারে ঘরের ভিতর বন্দী হইয়া পড়িল। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া দু-দণ্ড বাহিরে যায় তার সাধ্য কি ?

যদিও ছেলে মানুষ করিবার আয়াস স্বীকার করিতে আনন্দময়ীর বিশেষ কোনও আগ্রহ ছিল না, তবু স্বামীকে নির্য্যাতন করিবার জন্য ছেলেদের উপর তার দরদের অভাব ছিল না। ছেলেদের যে ভদ্রলোকের ছেলের মত কাপড় চোপড় নাই, তাদের ষষ্ঠী বা অন্নপ্রাশনে যে যথেষ্ট স্বর্ণালঙ্কার হইতেছে না, তাদের আহারের জন্য যথেষ্ট খাদ্যের যে সঞ্চয় নাই, এই সব বিবিধ ত্রুটি লইয়া সে স্বামীকে দিন রাত্রি উদ্ব্যস্ত করিয়া রাখিত।

এই সব ত্রুটি আনন্দময়ী যতটা অনুভব করিত, হরিশ তার চেয়ে বেশী অনুভব করিত। তার সোণারচাঁদ ছেলেদের যে বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত ও নানা সুখাদ্যে পরিতৃপ্ত করিয়া রাখিবার শক্তি যে তার সত্য সত্যই নাই এজন্য তার নিজের মনে ক্ষোভের অবধি ছিল না। তাই আনন্দময়ীর মুখে এসব তিরস্কার সে মাথা পাতিয়া লইত। তাহাতে

তার অক্ষমতার ব্যথা ও লজ্জাই তখন তাহাকে পীড়া দিত, আনন্দময়ীর কটু কণ্ঠের তীব্রতায় সে ক্ষুব্ধ হইতে পারিত না।

আনন্দময়ী তাকে দিনরাত বলে তার ত্রুটির কথা, তার দেনার কথা। মাথা পাতিয়া সব মানিয়া লয় হরিশ—মনে প্রাণে সে স্বীকার করে যে সে দেনদার—তার ত্রুটির সীমা নাই—তার অপরাধের সংখ্যা নাই। একদিন আনন্দময়ী তার অসংখ্য বক্তৃতার একটার প্রসঙ্গে বলিয়াছিল, "এসব ছেলে তো আমি বাপের বাড়ী থেকে আনিনি যে এদের সব ঝক্কি আমি পোহাব।" বলিতেই হরিশের মনে হইল এ যুক্তির উত্তর নাই। মনে হইল প্রত্যেকটি ছেলে আনন্দময়ীর ক্রোড়ে চাপাইয়া সে শুধু তার অপরাধটির বোঝাই বাড়াইতেছে।

অনেক রকম ফিকির ফন্দী করিয়া হরিশ যখন কিছুতেই পত্নীর ঋণ পরিশোধের উপায় করিতে পারিল না, তখন সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যদি হঠাৎ কোনও অসম্ভব উপায়ে সে একেবারে আট দশ হাজার টাকা পাইয়া যায়, যদি সেই টাকাগুলি সে আনন্দময়ীর সামনে আনিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে! কত সব অসম্ভব অদ্ভুত উপায়ের কথা মনে হইল তাহা বলিবার নয়!

তার এক যজমানের গঙ্গাতীরে যাইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার বাসনা হইল। যজমান সম্পন্ন, সে হরিশকে সঙ্গে

লইয়া নৈহাটীতে গেল। সেখানে হরিশ সাক্ষাৎ পাইল এক সন্ন্যাসীর। সন্ন্যাসী দয়াময়, মাত্র পঞ্চাশটি টাকা দক্ষিণা লইয়া তিনি হরিশকে শিখাইলেন এক অমূল্য মন্ত্র। সেই মন্ত্র একবৎসর সাধনা করিয়া তারপর বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসারে যাগ করিলে লোহাকে সোণা করা যাইবে। এই এক বৎসর করিতে হইবে কঠোর নিষ্ঠার সহিত সাধনা।

সাধনা আরম্ভ হইল—আর হরিশ ঘন ঘন লক্ষ লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। ক্রমেই টাকার অঙ্ক চড়িতে লাগিল—কোটি টাকা অনায়াসে ছাড়াইয়া গেল, ছয় মাসের সাধনা না পূর্ণ হইতেই।

গঙ্গাতীর হইতে ফিরিয়াই স্বামীর হঠাৎ এতটা ধর্ম্মে মতি এবং নিষ্ঠার কঠোরতায় সহজেই আনন্দময়ী জ্বালাতন হইয়া উঠিল। একেই তো তার সংসারে জ্বালার অন্ত নাই; তার উপর হরিশের এই যাগযজ্ঞ ও নিষ্ঠা হইল তার নূতন উৎপাতের হেতু। এ সম্বন্ধে তার যে অভিমত, আনন্দময়ী তাহা তার অভ্যস্ত কটুত্বের চেয়ে অনেকটা বেশী ঝাঁঝের সঙ্গে হরিশকে দুবেলা জানাইতে লাগিল। হরিশ শোনে আর হাসে—এমন হাসিতে তাকে কখনও দেখা যায় নাই। সে ভাবে, বকে বকুক আনন্দময়ী—আর বেশী দিন নাই। তার ঘর যে দিন সোণায় ভরিয়া যাইবে সে দিন—

ওঃ, সেই দিনের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় তার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে।

এক একবার সুধু তার মনে হইত যে বড় ভুল হইয়া গিয়াছে—যদি আর গোটা পঞ্চাশ টাকা খরচ করিয়া সে সন্ন্যাসীর কাছে আনন্দময়ীর লোহার অন্তর সোণা করিবার মন্ত্র একটা শিখিয়া লইত! সাধনার এক বৎসর কাটিয়া গেল। এইবার সিদ্ধির পরীক্ষা।

সেদিন ভোরবেলায় স্নান করিয়া উঠিয়া হরিশ যাগের আয়োজন করিতে লাগিল। আনন্দে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল—এক একবার সংশয়ে ভয়ে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। সিদ্ধি হইবে কি? তার সাধনা সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন হইয়াছে তো? কে জানে? যদি না হয়, তবে আর একটা বৎসর এই সাধনা করিতে হইবে। যেন তেমন না হয়।

যজ্ঞের সমস্ত উপচার সংগ্রহ করিয়া সেদিন হরিশ দীর্ঘকাল ধরিয়া যজ্ঞ করিল। তারপর গভীর রাত্রিতে সে সমুদয় যজ্ঞোপচারের সহিত এক মণ লোহা মাটির তলায় চাপা দিয়া রাখিল। সাত দিন পর সেই স্থানে আবার যজ্ঞ করিয়া তাহা তুলিতে হইবে। সেই দিনের যজ্ঞের উপচারের মধ্যে চাই খাঁটি শিলাজতু, আসল পদ্মমধু, আরও এমনি কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য বস্তু। সে-সব কোথায় পাওয়া যায় তার সন্ধান সন্ন্যাসী ঠাকুরই দিয়াছিলেন। প্রথম দিনের

যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়াই হরিশ সেই সব উপাদান সংগ্রহে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

হরিশ থাকে সুদূর এক পল্লীগ্রামে—যে কোনও সহর হইতে সে প্রায় ষাট মাইল। থানা প্রায় দশ মাইল দূরে। জঙ্গলের মধ্যে এমনি একটা অজ পাড়া গাঁ সে।

বাহির হইবার আয়োজন উদ্যোগ করিয়া হরিশ একবার বাহির বাড়াতে আসিল। দেখিতে পাইল সেখানে এক আর্ত্ত অতিথি। পথশ্রান্ত বিদেশী ব্রাহ্মণ সে। এই অঞ্চল দিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ দারুণ জ্বরে কাতর হইয়া পড়িয়াছে। হরিশই গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণ দেখিয়া সে তার দ্বারে আশ্রয়ের জন্য আসিয়াছে।

যাত্রার মুখে ব্রাহ্মণ অতিথি দেখিয়া হরিশের মনে হইল ইহা সুলক্ষণ। যত্ন করিয়া সে তাকে বাহিরের ঘরে বিছানা করিয়া দিল, শুশ্রূষা করিল; ডাক্তার ডাকিয়া দেখাইল। তার জন্য তার যাত্রা করিতে একবেলা বিলম্ব হইয়া গেল।

অভাবের সংসারে এক নূতন আপদের আমদানী দেখিয়া আনন্দময়ী যে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অতিথির কর্ণগোচর হইয়াছিল।

রুগ্ন অতিথিকে তার ঘাড়ে ফেলিয়া স্বামী যখন বিশেষ প্রয়োজনের ওজুহাতে বাহিরে গেলেন, তখন আর একচোট খুব চোখা চোখা কথা বাহির হইল।

কিন্তু বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ আনন্দময়ীর দুইটি বড় ছেলে তার কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া তাকে বলিল, "দেখ মা বাবুটি কি দিয়েছেন," তখন আনন্দময়ীর কণ্ঠ স্তব্ধ ও চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। দুই ছেলের হাতে দুখানা চকচকে আসল গিনি!

আনন্দময়ী ছেলেদের হাত হইতে গিনি কাড়িয়া লইয়া চট্‌পট্ অতিথি-সৎকারে অবহিত হইয়া পড়িল। যত্ন করিয়া রোগীর পথ্য প্রস্তত করিয়া সে যথাসম্ভব পরিচ্ছন্নভাবে স্বয়ং যাইয়া তাহাকে পথ্য দিয়া আসিল।

রোগী উঠিয়া তাকে প্রণাম করিল—পায়ের উপর দুখানা গিনি রাখিয়া। আনন্দময়ী একেবারে নির্ব্বাক।

রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া তার অন্তরে যেন অপূর্ব্ব পুলকের ঢেউ খেলিয়া গেল। জ্বরে কাতর হইলেও সে যে পরম সুপুরুষ তাহা বুঝিতে দেরী হইল না।

অনেক দিনকার অনেক পুরাতন স্বপ্ন মাথা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল।—এতদিনে আসিল কি রাজপুত্র?

পাঁচ দিন পর হন্তদন্ত হইয়া হরিশ বাড়ী ফিরিল। তার সঙ্গে ছিল যজ্ঞের সমস্ত উপাদান - আর এক বস্তু।

বাড়ী ফিরিয়াই সে ত্রস্তে-ব্যস্তে তার যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিতে গেল। সমস্ত কাজ শেষ হইলে সে লৌহভার টানিয়া তুলিল। হরি! হরি! কোথায় সোণা—যেমন লোহা তেমনি।

ভাঙ্গা বুকে হরিশ কোনও মতে বাহির-বাড়ীতে গেল। সেখানে সেই অতিথিকে দেখিয়া তার হঠাৎ চমক লাগিয়া গেল। তারপর ক্রমে স্মরণ হইল যে ইহাকে সে বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিল।

সে এখন দিব্য সুস্থ হইয়াছে— কার্ত্তিকের মত চেহারা বাগাইয়া নিশ্চিন্ত মনে দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে।

তার দিকে চাহিয়াই হরিশের মনের ভিতর কি একটা খচ্ করিয়া উঠিল। তার ভাঙ্গা বুক চট্ করিয়া জোড়া লাগিয়া গেল সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণের পর অন্দরে গেল।

সেখানে যাহা দেখিল তাহা তার স্বপ্নের অগোচর— আনন্দময়ী হাসিমুখে তার সম্বর্দ্ধনা করিল। আনন্দময়ীর মুখে হাসি এতই দুর্লভ যে তাহা দেখিয়া হরিশ এক মুহূর্ত্তে আত্মবিস্মৃত হইল।

তারপর সে যেন হঠাৎ সম্বিৎ লাভ করিয়া ত্রস্তে-ব্যস্তে ঘরের ভিতর গিয়া কম্পিত চঞ্চল হস্তে তার পেঁটরা খুলিল। কম্পিত হস্তে তাহা হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া আলোর কাছে গিয়া ভাল করিয়া তাহা পরীক্ষা করিল।

তারপরই স্ত্রীর কাছে গিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, অতিথির কথা।

"ও যাবে কবে?"

একগাল হাসিয়া আনন্দময়ী বলিল, "ও যাবে না বলেছে, এই গ্রামেই বাড়ী ঘর করে বাস করবে।"

খুব খুসী হইয়া হরিশ বলিল, "বেশ, বেশ, তা'হলে আছে এ বাড়ীতেই কিছু দিন।"

"হাঁ, যে পর্য্যন্ত বাড়ী ঘর তৈরী না হয়, তদ্দিন আর যাবে কোথা?" প্রসঙ্গক্রমে আনন্দময়ী শুনাইয়া দিল যে অতিথি ধনী—দশখানা গিনি এ পর্য্যন্ত দিয়াছে তাহাকে।

"হুঁ" বলিয়া হরিশ একটু হাসিল।

বাহিরে গিয়া অতিথিকে মিষ্ট কথায় যথেষ্ট আপ্যায়িত করিয়া, তাহার বাড়ীকে নিজের বাড়ী বলিয়া বিবেচনা করিবার জন্য বিনীত অনুরোধ করিয়া, হরিশ একটু ঘুরিয়া আসিবার জন্য বাহির হইল।

গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে দ্রুতগামী অশ্ব সংগ্রহ করিয়া সে চলিয়া গেল।

সুপুরুষ ধনী ও মুক্তহস্ত অতিথির যথোচিত সম্বর্দ্ধনায় ব্যস্ত থাকায় হরিশ যে সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরিল না, এ কথা আনন্দময়ীর খেয়াল হইল না।

পরের দিন এক প্রহর বেলায় হরিশ ফিরিয়া আসিল।

তার সঙ্গে আসিল দারোগা ও কনেষ্টবল—তাহারা সেই অতিথিকে সামনে পাইয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল।

হরিশ সঙ্গে গেল।

দশদিন পর দশ হাজার টাকার গিনি আনিয়া হরিশ আনন্দময়ীর পদপ্রান্তে রাখিয়া সার্থকতার আনন্দে একগাল হাসিল—তার পত্নীর ঋণ এতদিনে বুঝি শোধ হইল।

*　　　　*　　　　*

হরিশ যখন শিলাজতু প্রভৃতির সন্ধানে গিয়াছিল, তখন সে বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে দেখিতে পাইল এক পরম লোভনীয় বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে একটি সুদর্শন যুবকের ছবি দিয়া বলা হইয়াছে যে এই ব্যক্তি বিমল চক্রবর্ত্তী—একটা প্রসিদ্ধ ডাকাতি মোকদ্দমার ফেরারী আসামী; যে ইহাকে ধরাইয়া দিতে পারিবে সে দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে। বিজ্ঞাপন দেখিয়া হরিশ ভাবিল, হায়রে, যদি একবার বিমল চক্রবর্ত্তীর দেখা মিলিত! বিজ্ঞাপনখানা পেঁটরায় ভরিয়া সে বাড়ী ফিরিল। ফিরিবার পথে সে অন্যূন লক্ষবার ছবিখানাকে দেখিল। দেখিয়া দেখিয়া তার সব চেহারাটা একদম মুখস্থ হইয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়া তার অতিথির দিকে চাহিয়াই মনে হইল সেই ছবির কথা। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া আর তার সন্দেহ রহিল না। তার গিনির ছড়াছড়ির খবর শুনিয়া তার বিশ্বাস পাকা হইয়া গেল। সে ছুটিয়া গেল থানায়।

পুলিশ লইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করাইয়া সে সঙ্গে সঙ্গে সদরে গেল। সেখানে বিমল চক্রবর্ত্তী সনাক্ত হইয়া গেল। হরিশ পুরস্কার লইয়া হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিল।

দশহাজার টাকার গিনি পত্নীর পদপ্রান্তে নিবেদন করিয়া দিয়া সে কৃতার্থভাবে পত্নীর মুখের দিকে চাহিল।

আনন্দময়ীর মূর্ত্তির উপর কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছিল। সে ম্লান মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় পেলে?"

মহা উল্লাসে সে সত্য কথা প্রকাশ করিল কিন্তু তার ফলে যাহা হইল তাহাতে সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। আনন্দময়ী ডাক ছাড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তার পর লাথি মারিয়া গিনিগুলি ছড়াইয়া দিয়া সে দুয়ারে খিল দিল।

* * *

যখন তার স্তব্ধতা কাটিয়া গেল তখন হরিশ বুঝিতে পারিল, আনন্দময়ীর কাছে তার সুবর্ণের ঋণ সে শোধ করিয়াছে, কিন্তু পত্নীর রূপ-যৌবনের ঋণ সে শোধ করিতে পারে নাই, কোনও দিন পারিবে না যে রূপ দিয়া সে ঋণ শোধ হইতে পারিত তাহা তার নাই।

—আগামী সংখ্যায়—
শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর
'নীল-লোহিতের আদি প্রেম'
এবং কোন বিখ্যাত চিকিৎসক-সাহিত্যিকের
'নৃত্যকলা'

সমালোচনা

ভাদুড়ী-মশাই—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, এবং ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব সত্যই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি প্রবীণ। প্রবীণ বয়সে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই তিনি বাঙালী পাঠকের মনোহরণ করিয়াছেন। যৌবনস্পর্দ্ধামুখর বাংলা সাহিত্যে তাঁহার এই প্রতিষ্ঠালাভ সকল সাহিত্যানুরাগীর আনন্দের কারণ। চোখে জল আনা সহজ, মুখে হাসি ফোটানো কঠিন। বয়সের সহিত যাঁহার মনের সরসতা উবিয়া যায় না, এ কঠিন কাজ শুধু তাঁহারই সাধ্য। পণ্ডিতেরা বলেন, প্রাণীদের মধ্যে শুধু মানুষই হাসিতে পারে। এই একান্ত মানবী বৃত্তিটির অনুশীলনে বাঙালী সাহিত্যিকেরা যতটা অবহেলা করিয়াছেন, এমন আর কেউ নয়। ভাগ্যে কেদারবাবু সাহিত্যের অভ্যস্ত পথটিকেই নিজের করিয়া লন নাই। তাই তাঁহার রচনার স্পর্শে আমাদের হৃদয় যখন ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে অভিষিক্ত হইয়া উঠে, তখন বুঝিতে পারি, এ রস আদি নয় বটে কিন্তু অনাদি ও অকৃত্রিম, ইহা মত্ত করে না কিন্তু আনন্দ দান করে। কেদারনাথ ও 'পরশুরাম' বাংলা সাহিত্যের আসরে হাস্যরসকে আভিজাত্যের মর্য্যাদায় মণ্ডিত করিয়াছেন।

'ভাদুড়ী-মশাই' উপন্যাসখানি সুবৃহৎ। এই প্রায় সাড়ে তিন-শো পাতার বইখানির প্রতি পৃষ্ঠা কৌতুকের কৌতুহলে পাঠকের মনকে উদ্রিক্ত করিয়া তোলে। ভাদুড়ী-মশাই নামী এটর্নী, পসার খুব, বয়স অল্প, মনটি সুকুমার, বপুখানি স্থূল। পায়ের কাছে চটি জোড়াটা দেখিয়া লইতে কষ্ট হয়; 'একদিন টেবী কুকুরটাকে পায়ে দিতে গিয়ে চোট্‌কে ফেলেছিলেন।' ভাদুড়ী-পত্নী, স্বামী-সোহাগিনী, স্বামীগর্ব্বে গর্ব্বিতা মাতঙ্গিনীর অভাব কিছু নাই, শুধু একটি সন্তানের অভাবে অতি সুখের মধ্যেও এক সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন ব্যথা মনের মধ্যে বিঁধিয়া থাকে। প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়াই তাহার অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত ঈষৎ শঙ্কা ও ঈর্ষায় কাতর হইয়া পড়ে। নবনীর সাহচার্য্যে আচার্য্য আরো ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি তন্ত্রের কি-না জানি না, রস-রহস্যের আচার্য্য বটে; তাঁহার বাক্যোচ্ছ্বাসে নিরানন্দের গুমোট কাটিয়া যায়। লজ্জানত নয়নদুটি নামাইয়া মৃদুকণ্ঠী মীরা, আর হাসির হিল্লোল তুলিয়া আনন্দময়ী ইরা—আমাদের মনের উপর এক মাধুর্য্য মাখাইয়া যায়। বইখানি পড়িতে পড়িতে—ঘটনা-সংস্থানের কথা মনে আসে না, প্লটের কথা মনে থাকে না, বলিবার মনোহর ভঙ্গীতে গল্পের চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া আমাদের আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলে।

চিত্র ও চরিত্র

উমেশচন্দ্র

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলে তাহাকে চেনা যায় না বলিতে হয় ডব্লিউ-সি-বনার্জি। অসংখ্য গুণী পুরুষে সেদিন বাংলা দেশ পরিপূর্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলার মানসিক ঐশ্বর্য্য ছিল ভারতবর্ষের বিস্ময়ের বস্তু।

তখনকার সাধনা ছিল সাহেবিয়ানা। এই সাধনায় যে যতটা সার্থক হইত সমাজে সে ততটা প্রতিপত্তি লাভ করিত। বিলাত-ফেরত হইলে ত কথাই নাই। ভয় ও সম্ভ্রমের পাত্র ছিল বলিয়াই ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ শ্লেষ ও ঈর্ষার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সমাজ প্রধানতঃ বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টার লইয়া গঠিত। ইঁহারাই ছিলেন তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ—নেতা।

ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময় সাহেবিয়ানার মোহে রূঢ় আঘাত লাগিল। দেশীয় সাহেবেরা বুঝিলেন, বিলাত-ফেরত হইলেও গোরা সাহেবদের কাছে তাঁহারা 'নেটিভ' ছাড়া আর কিছু নহেন।

তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু হইয়াছে। বিলাত-ফেরতেরা দলে যোগ দিলে আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

উমেশচন্দ্র (১৮৪৪—১৯০৬) ছিলেন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের শ্রেষ্ঠ কুলিন। বিগত শতাব্দীর নবম দশকে কলিকাতা হাই-কোর্টে তাঁহার মত বড় কৌঁসুলী কেহ ছিল না। এখনকার দিনে হইলে তিনি হইতেন এডভোকেট-জেনারেল অথবা ল-মেম্বার, কিম্বা আরো কিছু। তখনকার দিনে এ-সব পদ সাহেবদের

একচেটিয়া ছিল। তিনি হইলেন প্রথম বাঙালী ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল। তেমন ইংরেজি অল্প সাহেবই বলিতে পারিত।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেস গড়িয়া উঠিল। বোম্বাইয়ে হইল ইহার প্রথম অধিবেশন। সেই প্রথম অধিবেশনে সভাপতির পদে বৃত হইলেন—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর, হ্যাট-কোট না ছাড়িলেও, যে ব্রত তিনি গ্রহণ করিলেন, তাহা আর জীবনে পরিত্যাগ করেন নাই। ১৮৯২ সালের এলাহাবাদ কংগ্রেসের সভাপতিত্বে তিনি নির্ব্বাচিত হন।

যেদিন স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার বুক অপূর্ব্ব দোলায় দুলিয়া উঠিল, সে দিনও সাগর-পার হইতে কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্রের কণ্ঠের সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। কার্য্যতঃ না হইলেও ফেডারেশন্ হল দেশবাসীর মনে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

দীর্ঘ শ্মশ্রু, মহিমাময় মুখমণ্ডল, প্রশান্ত গম্ভীর দৃষ্টি, প্রভুত্ব ব্যঞ্জক ভঙ্গী উমেশচন্দ্রকে সহজ নেতা করিয়া তুলিয়াছিল।

মাইকেলের চরিত্রকার লিখিতেছেন,

“রোগ-শয্যায় মধুসূদন যাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশবৎসল ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কোন কার্য্যে প্রশংসার প্রার্থী ছিলেন না, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদিগের বিপদে তিনি নীরবে যেরূপ সাহায্য দান ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন অতি অল্প লোকই তাহা অবগত আছেন। মধুসূদন এবং তাঁহার পত্নী হেন্‌রিয়েটা মৃত্যুশয্যা পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।”

সাময়িকী ও অসাময়িকী

আজ মাঘী পূর্ণিমা—নয় ? বিরল নক্ষত্রে, সাদা মেঘে, স্বপ্নময় নীলে আকাশ তাই এত পরিচিত। পৃথিবীর সমস্ত পার্থিবতা আলোর প্লাবনে ডুবিয়া, ভাসিয়া, অন্তর্হিত হইয়া গেছে। এ জগতে আছে শুধু মায়া আর মতিভ্রম। শব্দহীন বাঁশীর সুর ঝরে। অজস্র জ্যোৎস্নার এক ঝলক কেমন করিয়া মনের কোণে ঢুকিয়া পড়ে। অন্তরের অন্ধকার কক্ষ এক মুহূর্ত্তে চন্দ্রালোকে ভরিয়া যায়। এমনি রাতে। এমনি রাতে অজ্ঞাত জগতের দ্বার খুলিয়া যায়। ভুলিয়া-যাওয়া স্বপ্নগুলি প্রজাপতির মত অতি-লঘু, অতি-সুকুমার পাখায় ভর দিয়া উড়িয়া আসে। আলোর কূলে একেলা দাঁড়াইয়া আকুল হই। জ্যোৎস্না-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়ি। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণ মনে পড়ে। কতকাল পরে! যৌবন প্রারম্ভের সেই মাঘী পূর্ণিমায় আকাশে থাকে চাঁদ, আর মনের আকাশে চাঁদমুখ। সে মুখের সাক্ষাৎ মর্ত্ত্যে মেলে না, স্বর্গেও নয়। সেই অগাধ চন্দ্রালোকে সাঁতার কাটে মন আর মনের শৈবলিনী। এমনি রাতে। দিক নাই, দেশ নাই, সীমা নাই, শেষ নাই। সংসার সরিয়া যায়, শুধু চন্দ্রালোকের জগৎ সত্য হইয়া ওঠে। মাঘী পূর্ণিমা জীবনে বার বার ফিরিয়া আসে। শুধু আসে না সেই মানসী। তাহারই অশ্রুজল সিক্ত-চন্দ্রালোকে জড়াইয়া থাকে।

দিন-পঞ্জী

৩রা ফেব্রুয়ারী—অদ্য ভারত সরকার এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন যে সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাসের পরিমাণ কমাইয়া শতকরা ১০৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা করা হইল।

লণ্ডন, ৩রা ফেব্রুয়ারী—রোমের এক সংবাদে প্রকাশ বিসুবিয়স আবার রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বিসুবিয়স্ হইতে বহু উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল প্রস্তরখণ্ড বিক্ষিপ্ত হইতেছে, আর উহার ভাস্বর দীপ্তি নেপ্‌লসের সহস্র সহস্র অধিবাসী শঙ্কাকুল দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে।

লণ্ডন, ৫ই ফেব্রুয়ারী—ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস শ্রমিকদল এবং পার্লিয়ামেণ্টারী শ্রমিকদলের উদ্যোগে আড়াই লক্ষ শ্রমিক এবং বেকার অদ্য হাইড পার্কে সমবেত হইয়াছিল। ১৮৯১ সালের পর এত বড় সভা আর হয় নাই। মিঃ ল্যান্সবেরী স্বয়ং 'রক্ত পতাকা' তুলিয়া এবং কমিউনিষ্ট ইণ্টার-ন্যাশানালের সঙ্গীত করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন।

বোম্বাই, ৬ই ফেব্রুয়ারী—ডাঃ আন্সারী, স্যার মহম্মদ ইকবাল, বেগম সা-নওয়াজ, স্যার মানুভাই মেটা এবং কোলপুরের মন্ত্রী রাও বাহাদুর সুরভে অদ্য "ভিক্টোরিয়া" জাহাজে বোম্বাইয়ে পৌঁছিয়াছেন।

আমেদাবাদ, ৮ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য বোরসাদের ফার্ষ্ট ক্লাস ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কস্তুরীবাঈ গান্ধীকে ছয়মাস কারাদণ্ড ও ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ছয় সপ্তাহ কারাদণ্ডে দণ্ডিতা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আরও ছয় জন মহিলা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের ১৮ মাস করিয়া কারাদণ্ড ও ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

সকল প্রকার সদ্য অথবা দূষিত বেদনা
এবং ক্ষতাদির জন্য
অমৃত প্রলেপ
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

যে পড়িতে শিখিবে, যে পড়িতে শিখিতেছে,
যে পড়িতে শিখিয়াছে
সব ছেলে-মেয়ের মনের মতন বই
লালকালো
শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত ও শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন চিত্রিত
আবালবৃদ্ধবনিতার মনোহরণ করিবে

ছড়ায় গানে রেখায় লেখায় অতুলনীয়
বহুবর্ণের বহুচিত্রে সমুজ্জ্বল। অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার
শিশুসাহিত্যে এক ও অদ্বিতীয় পুস্তক
মুল্য দুই টাকা
এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

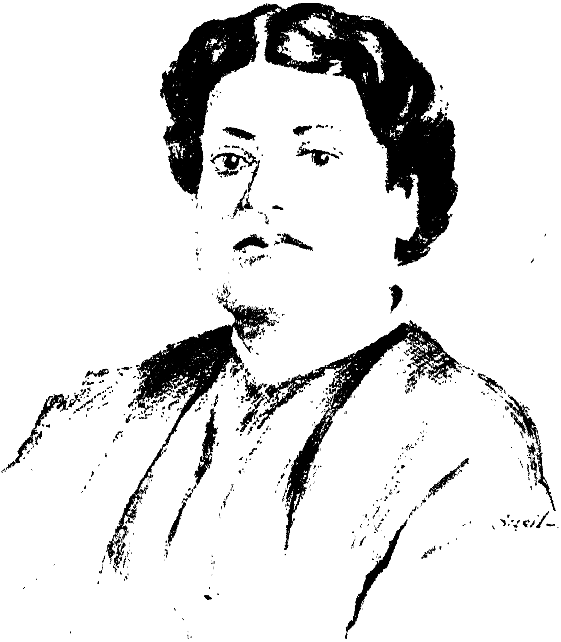

বিবেকানন্দ

ছোট গল্প

১ম বর্ষ] ৬ই ফাল্গুন ১৩৩৯ [৩২শ সংখ্যা

নীললোহিতের আদিপ্রেম

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

কি কুক্ষণেই নীললোহিতের হামবড়ামির গল্প পাঁচ জনের কাছে বলেছিলুম। তারপর থেকেই যাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তিনিই আমার মুখে নীললোহিতের আর একটি গল্প শুনতে চান। সে গল্প বলা যে কত কঠিন, তা নীললোহিতের admirerরা একবারও ভাবেন না। প্রথমতঃ নীললোহিতের গল্প শুনেছি বহুকাল পূর্ব্বে, এখন তা উদ্ধার করতে স্মৃতিশক্তির উপর বেজায় জবরদস্তি করতে হয়। কারণ নীললোহিতের বাজে কথা সব পলিটিক্স বা ধর্ম্মের লাখ কথার এক কথা নয়, যা শোনবামাত্র মনে গেঁথে যায় আর কাঁটার মত

বিঁধে থাকে। সুতরাং আমার বন্ধুবরের রূপকথার জন্য স্মৃতির ভাণ্ডারে হাতড়ে বেড়ানোর চাইতে গল্প নিজে বানিয়ে বলা ঢের সহজ। তবে গল্প যদি আমি বানিয়ে বলি, তাহলে তাতে কেউ কর্ণপাত করবেন না। কারণ সে গল্পের ভিতর বীর-রসও থাকবে না, মধুর-রসও থাকবে না। এর কারণ আমি বাঙালী। আমরা অবশ্য মরি, কিন্তু সে মৃত্যু ঘটে যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, রোগশয্যায়; আর আমরাও ভালবাসায় পড়ি, কিন্তু সে শুধু নিজের স্ত্রীর সঙ্গে, সঙ্গদোষে বা গুণে। পরিণয় হচ্ছে আমাদের বাধ্যতামূলক প্রণয় শিক্ষার সনাতন ইস্কুল। আর সে স্ত্রীও আমাদের সংগ্রহ করতে হয় না, গুরুজনেরা সংগ্রহ করে দেন—কিঞ্চিৎ দক্ষিণা সমেত। অপরপক্ষে নীললোহিত ছিল বীররস ও আদিরসের অবতার। নীললোহিতের আত্মকাহিনী আগাগোড়া অলীক হলেও তাঁর সকল কাহিনীর ভিতর একটা জিনিষ ফুটে উঠ্‌ত—সে হচ্ছে তাঁর মুক্ত আত্মা। আজ তাঁর একটা ছোট্ট গল্প মনে পড়ছে, সেইটে আপনাদের কাছে বলতে চেষ্টা করব। আশা করি এর পর নীললোহিতের আর কোন গল্প আপনারা শুনতে চাইবেন না। আজগুবি কথারও একটা সীমা আছে।

২

সেদিন আমাদের সভায় আমাদের বন্ধু উদীয়মান কবি শ্রীভূষণ মন খুলে বক্তৃতা করছিলেন, আর আমরা পাঁচজনে

নীরবে তাঁর বক্তৃতা শুনছিলুম। সে বক্তৃতার বিষয় ছিল অবশ্য প্রেম। শ্রীভূষণ বহু ইংরেজ কবির কাব্য থেকে দেদার কোটেসানের সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন যে, প্রেম বস্তুটি হচ্ছে মূলহীন ফুলের বিনি-স্থতোর মালা। শ্রীভূষণের ভাষার ভিতর এতটা প্রাণ ছিল যে, প্রেমনামক আকাশকুসুমের অশরীরী গন্ধে আমরা ঈষৎ মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলুম। একমাত্র মেডিকাল কলেজের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র অনিলচন্দ্রের মুখ দেখে মনে হল যে শ্রীভূষণের কবিত্ব তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছে। শ্রীভূষণ থামবামাত্রই অনিল বলে উঠলেন যে মানুষে যাকে প্রেম বলে, সে বস্তুটি একটি শারীরিক বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়, আর তা যে নয়, তা অনুবীক্ষণের সাহায্যে সকলকেই দেখিয়ে দেওয়া যায়। ওর বীজ আমাদের দেহের glandএর মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। আর সেই জন্যই লোকের মনে কৈশোরেই প্রেম জন্মায়, তার পূর্ব্বে নয়; কারণ বালকের দেহে প্রেমের বাহন glandএর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। নীললোহিত শ্রীভূষণের কথা শুনে বিরক্ত হচ্ছিলেন, কিন্তু অনিলের কথা শুনে একেবারে চটে উঠে বললেন, "তোমাদের শাস্ত্রে বলে নাকি যে, ছোট ছেলে প্রেমিক হতে পারে না? —অথচ আমি যখন প্রথম প্রেমে পড়ি, তখন আমার বয়েস কত জানো? সবে পাঁচ বৎসর।"

অনিল বললেন, "কি! পাঁচ বৎসর?"

নীললোহিত উত্তর করলেন, "তুমি যদি আমার বিলেতি-দস্তুর জীবনচরিত লিখতে চাও, তাহলে বলি—তখন আমার বয়েস পাঁচ বৎসর, পাঁচ মাস, পাঁচ দিন। যদি জানতে চাও যে আমি—আমি ঠিক বয়েস জানলুম কি করে? জানলুম এই জন্যে যে যেদিন আমি প্রেমে পড়ি সেইদিন আমি মাকে গিয়ে আমার জন্মতিথি কবে, জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমার ঠিকুজির সঙ্গে পাঁজিপুঁথি মিলিয়ে, আঁক কষে আমার ঠিক বয়েস বলে দিলেন।"

নীললোহিতের একথা শুনে আমরা সকলে চুপ করে থাকাই সঙ্গত মনে করলুম। সুধু শ্রীভূষণ বললেন যে, চণ্ডিদাস লিখেছেন—

জনম অবধি পীরিতি বেয়াধি অন্তরে রহিল মোর,
থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া ওঠে, জ্বালার নাহিক ওর।

চণ্ডিদাসের উক্তি যে সত্য—নীললোহিত তার প্রমাণ। নীললোহিত প্রতিবাদ করে বললেন যে, চণ্ডিদাসের কথা সত্য হত, যদি তিনি ঐ ব্যাধি শব্দটা ব্যবহার না করতেন। অনিল পাছে ঐ ব্যাধি নিয়ে একটা তর্ক বাধায়, এই ভয়ে আমি প্রস্তাব করলুম যে, প্রেম জিনিষটে ব্যাধি কি না, তা নিয়ে পরে তর্ক করা যাবে; এখন নীললোহিতের আদিপ্রেমের উপাখ্যান শোনা যাক। অমনি নীললোহিত তাঁর বর্ণনা সুরু করলেন।

৩

নীললোহিত এই বলে তাঁর গল্পের সূত্রপাত করলেন যে, এ গল্প তোমাদের বলতুম না, কারণ প্রেম যে কি বস্তু তা যারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছে, তারা পাঁচজনের কাছে প্রেমের ব্যাখ্যান করে না; আর করে তারাই, যারা প্রেমের সুধু নাম শুনেছে কিন্তু রূপ দেখেনি,—যথা আধ্যাত্মিক কবিরা আর দেহতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিকরা। এ কথা যে সত্য, তার প্রমাণ ত তোমরা হাতে হাতেই পেলে। কবি শ্রীভূষণ প্রেমকে এত উঁচুতে ঠেলে তুললেন যে, দূরবীক্ষণের সাহায্যেও তার সাক্ষাৎ মেলে না; আর বৈজ্ঞানিক অনিলচন্দ্র তাকে এত নীচুতে নামালেন যে, চোখে অনুবীক্ষণের চশমা এঁটেও তার সন্ধান পাওয়া যায় না। আজ তোমাদের কাছে যে আমার প্রেমের হাতেখড়ির কথা বলছি, সে সুধু এই কবি ও বৈজ্ঞানিকের মুখ বন্ধ করবার জন্য। এখন ব্যাপার কি ঘটেছিল শোনো।

আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলুম একটি পাড়াগেঁয়ে সহরে। পাড়াগেঁয়ে সহর কাকে বলে জানো? সেই লোকালয়—যা সহরও নয়, পাড়াগাঁও নয়। ও হচ্ছে একরকম কাঁঠালের আমসত্ত্ব। একটি পাড়াগেঁয়ে সহর দেখলেই বোঝা যায় যে, তা একটা পুরনো সহরের ভগ্নাবশেষও নয়; অথচ একটা নতুন সহরের পাকা বুনিয়াদও নয়। তার অতীতও নেই, ভবিষ্যতও নেই। যদি ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত, থানা ও

জেলখানা, বিদ্যালয় ও অবিদ্যালয় থাকলেই একটা মান্ধাতার আমলের পল্লীগ্রাম সহর হয়ে ওঠে ত আমার জন্মস্থানও সহর ছিল। কারণ সেখানে জজও ছিল, ম্যাজিষ্ট্রেটও ছিল, দারোগাও ছিল, স্কুলমাষ্টারও ছিল। আর স্কুল ছিল দু'জাতের—অর্থাৎ মেয়েদের আর ছেলেদের। কোন্‌টি যে কি, তা দেখলেই চেনা যেত। ছেলেদের স্কুল ছিল কোঠাবাড়ী, আর মেয়েদের চালাঘর। এর কারণও স্পষ্ট। ছেলেদের পড়ানো হত জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, দারোগা বানাবার জন্য; আর মেয়েদের পড়ানো হত কেন, তা মা গঙ্গাই জানেন। আজকাল অবশ্য এ প্রভেদ ততটা চোখে পড়ে না, কারণ একালে ছেলেরা হয়ে পড়েছে সব মেয়েলী, আর মেয়েরা পুরুষালী।

আমার বয়েস পাঁচ বৎসর হতেই আমাকে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেওয়া হল। বিদ্যালয় ছিল আমাদের বাড়ীর কাছে। আমাদের বাড়ী ও বিদ্যালয়টির ভিতর সুধু একটি মাঠের ব্যবধান ছিল। এ বিদ্যালয়ের সুধু একটিমাত্র ক্লাস ছিল, কারণ একটি বড় আটচালার একটিমাত্র ঘরে স্কুল বসত। মাথার উপর ছিল খড়ের চাল, আর চারপাশে

দর্‌মার বেড়া। আর ছাত্রীরা বসত সব ছেঁড়া মাদুরের উপর। মাষ্টার কি মাষ্টারণী কেউ ছিল কি না মনে পড়ে না। তবে এইটুকু মনে আছে যে, আমরা সকলে খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করতুম ; কিন্তু কি যে সেখানে পড়েছি, তার বিন্দু-বিসর্গও মনে নেই। সম্ভবতঃ সেখানে পড়ার চাইতে লেখাটাই বেশী হত। আমি অবশ্য এ স্কুল ছেড়ে ছেলেদের স্কুলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলুম, কারণ ছেলেদের স্কুলে গেলে পাঁচজন ছেলের সঙ্গে মারামারি করা যায়, পাঞ্জা কষা যায় ; কিন্তু এ স্কুলে পরস্পর পরস্পকে স্বধু চিম্‌টি কাট্‌ত। আমাকে বালিকা বিদ্যালয় থেকে তুলে নিয়ে ছেলেদের স্কুলে ভর্ত্তি করে দেবার কথাবার্ত্তা সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় এমন একটি ঘটনা ঘটল, যার ফলে কেউ আমাকে আর সে স্কুল ছাড়াতে পারলেন না। আমাদের স্কুলে পুরোনো ছাত্রী নিত্য ছেড়ে যেত, আর নূতন ছাত্রী নিত্য ভর্ত্তি হত। আমার বয়েস যখন পাঁচ বৎসর, পাঁচ মাস, পাঁচদিন ; ঠিক সেইদিন একটি নূতন ছাত্রী আমাদের স্কুলে এল, যাকে দেখবামাত্রই আমি তার প্রেমে পড়ে গেলুম। এর মূলে ছিল আলঙ্কারিকরা যাকে বলে পূর্ব্ববাসনা।

৫

এ কথা শুনে অনিলচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারলেন না, নীললোহিতের কথায় বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে,

তোমার মনের নতুন ভাবকে, তুমি সেই মুহূর্ত্তেই প্রেম বলে চিনতে পারলে? নীললোহিত বললে, "অবশ্য এ-জাতীয় মনোভাব ত আর বই পড়ে শিখতে হয় না, ঠেকেই শিখতে হয়। প্রেমে পড়া আমার সহজ প্রবৃত্তি। এর পর আমি বছরে অন্ততঃ দুবার করে প্রেমে পড়েছি, কিন্তু সে সবই হচ্ছে আমার সেই আদি-প্রেমের reprint মাত্র। পূর্ব্বের সঙ্গে পরের যা-কিছু প্রভেদ, সে সুধু ছোটবড় typeএর। অনেকের বিশ্বাস যে ছোট ছেলের কোন স্পষ্ট অনুভূতি নেই, আছে শুধু বয়স্ক লোকের। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমার বয়েস যখন ছ-বৎসর, তখন আমার একটি আত্মীয় মারা যান। সেদিন আমার চোখে পৃথিবীর যে নতুন চেহারা দেখা দিয়েছিল, তার পরে পরিবারে যতবার মৃত্যু ঘটেছে, প্রতিবারেই সেই চেহারা দেখেছি। মরে সুধু একজন লোক, আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যেন জনশূন্য হয়ে যায়, রোদ খাঁ খাঁ করে, আকাশের আলোর ভিতর একটা বিশ্রী ঔদাস্যের ভাব আসে, আর চারপাশের লোকজন সব ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়। মৃত্যু ও প্রেম সম্বন্ধে ছেলে-বুড়োর কোন অধিকারী ভেদ নেই। কিন্তু মানুষে মানুষে ঢের প্রভেদ আছে। সকলেই মরে, কিন্তু সকলেই আর প্রেমে পড়ে না। তাই ডাক্তারের কথা যেমন সর্ব্বলোকগ্রাহ্য, প্রেমিকের কথা তেমনি ডাক্তারি শাস্ত্রে অগ্রাহ্য।" এই লম্বা বক্তৃতার পর অনিলচন্দ্র আর রা কাড়লেন না।

৬

এর পর শ্রীভূষণ বললেন যে, তোমার প্রেমে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবান্তর ঘটেছিল তার বর্ণনা করত, তাহলেই বোঝা যাবে ব্যাপারখানা কি ঘটেছিল।

নীললোহিত বললেন, তুমি যে-সব বিলেতি বচন শোনালে, তার সঙ্গে আমার কথা মিলবে না। ইংরেজরা প্রেমে পড়লে তাদের মনের অবস্থা কি হয় জানিনে, তবে তারা যা লেখে, তার সঙ্গে সত্যের কোনও সম্বন্ধ নেই। আমার বিশ্বাস তারা প্রেম করে অনিলের শাস্ত্র-মতে, আর তা ব্যক্ত করে শ্রীভূষণের ভাষায়। আমার যা হয়েছিল, তা অবশ্য desire of the moth for the star নয়। কারণ আমিও moth নই, সেও star ছিল না। এক কথায়, প্রেমে পড়বামাত্র আমি যেন প্রথম জেগে উঠলুম, তার আগে ঘুমিয়ে ছিলুম। সেইদিন প্রথম আবিষ্কার করলুম যে তেলাকুচোর রঙ লাল। হঠাৎ দেখি পৃথিবী প্রাণে ভরপুর হয়ে উঠল, আকাশের রোদ চন্দ্রালোক হয়ে এল, চারিদিকের যত আলো সব হেসে উঠল, আর ঐ মেয়েটির চোখে আশ্রয় নিলে। কি সুন্দর সে আলো, আর তার অন্তরে কি গভীর অর্থ! তার চোখদুটি প্রথমে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তারপর আমার উপর যেই পড়া, সেই চঞ্চল চোখ একেবারে স্থির হয়ে গেল, আর তার পল্লব কিঞ্চিৎ নত হয়ে এল। আমি

বুঝলুম যে সেও আমার প্রেমে পড়েছে। যেমন এক হাতে তালি বাজেনা, তেমনি এক পক্ষেও প্রেম হয় না। আমি ভালবাসলুম কিন্তু সে বাসলে না—এমন যদি হয়, তাহলে সে একটা হা-হুতাশের ব্যাপার হয়ে ওঠে, তাকেই ব্যাধি বলা যেতে পারে। আমাদের উভয়ের মনে যা জন্মাল সে হচ্ছে যথার্থ প্রেম,—তাই উভয়ের মন একসঙ্গে নীরব আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

৭

এ প্রেমের কোন ইতিহাস নেই ; কেননা সেইদিন আর পরের দিন ছাড়া তার সঙ্গে আমার জীবনে আর কখনও দেখা হয়নি। কেন, তা পরে বলছি। তবে তার স্মৃতি আমার জীবনের বিচিত্র ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। আমি এমন কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখনও প্রেমে পড়িনি, যার মুখে আমি তার চেহারা দেখতে পাইনি। বর্ণ তার ছিল উজ্জ্বল শ্যাম, গড়ন ছিপছিপে, নাক তোলা, আর চোখ সাত রাজার ধন কালামাণিকের মত। আমি চিরজীবন তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর যখনই তার ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তখনই আবার প্রেমে পড়েছি। এই কারণেই আমি বলেছি যে, আমার সব নূতন প্রেম আমার সেই আদিপ্রেমের reprint মাত্র। যখনই কোন নূতন

প্রেমে পড়েছি, তখনই পৃথিবী একেবারে উল্টে-পাল্টে গিয়েছে, ডুমুরের ফুল ফুটেছে, অমাবস্যায় জ্যোৎস্না ফুটেছে, আকাশ কুসুমের গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং আমার মনে হয়েছে যেন আমি হঠাৎ জেগে উঠেছি আর তার আগে ঘুমিয়েছিলুম। এই আদিপ্রেমের কৃপায় কোন ইংরেজ কিম্বা জাপানী অথবা ইহুদী মেয়ের প্রেমে কখনও পড়িনি। কারণ ইংরেজের রং উজ্জ্বল শ্যাম নয়, চুনের মত সাদা; জাপানীর নাক তোলা নয়, চাপা; আর ইহুদীদের নাক হাতীর শুঁড়ের মত লম্বা। এখন আমাদের কি কারণে বিচ্ছেদ ঘটল, তা শোনো।

৩।

তারপর নীললোহিত বললেন যে, পরের দিন বালিকা বিদ্যালয় থেকে তাঁর ইংরেজী স্কুলে বদলি হবার কথা ছিল; কিন্তু তিনি বালিকা বিদ্যালয়রূপ স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট হতে কিছুতেই রাজী হলেন না। তাঁর মা নিলেন তাঁর পক্ষ, আর বিপক্ষ হলেন তাঁর বাবা। এ দুজনের মধ্যে অনেক বকাবকি হোলো; শেষটা নীললোহিতের জেদই বজায় রইল। তাঁর বাবা, 'এটার ছেলে না হয়ে মেয়ে হয়ে জন্মানো উচিত ছিল,'—এই কথা বলে মার সঙ্গে তর্কে ক্ষান্ত দিলেন। তর্কে বাবা কোথায় মার কাছে পেরে উঠবেন?

পরদিন সকালবেলায় নীললোহিত যথাসময়ে স্কুলে গিয়ে হাজির হলেন। গিয়ে দেখেন যে, মেয়েটি আগেই এসে যথাস্থানে একটি মাদুরের উপরে যোগাসনে বসে আছে, আর তার কালো কালো চোখ দুটি কি যেন খুঁজছে ; তাঁকে দেখবামাত্রই সে চোখ নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত হয়ে গেল।

নীললোহিত অমনি তাঁর শ্লেট নিয়ে বড় বড় অক্ষরে ক খ লিখতে বসে গেলেন। তাঁর সঙ্গে মেয়েটির যা-কিছু কথাবার্ত্তা হল সে স্রুধু চোখে চোখে, মুখের ভাষায় নয়। চোখের আলাপ যখন খুব জমে উঠেছে, তখন হঠাৎ একটা বন্দুকের বেজায় আওয়াজ হল ; অমনি ছাত্রীরা সব চম্‌কে উঠে ভয়ে হাঁউ মাঁউ করতে আরম্ভ করলে, আর সেই মেয়েটি নীললোহিতের দিকে সকাতরে চেয়ে রইল। সে চাহনির ভাবটা এই যে, গুলির হাত থেকে আমাকে যদি কেউ রক্ষা করতে পারে ত সে তুমি। এই সময়ে নীললোহিতের চোখে পড়্‌ল যে, দর্‌মার বেড়া ফুটো ক'রে একটা গোলাপী রংয়ের গুলি সোজা মেয়েটির দিকে ছুটে আসছে।

নীললোহিত আর তিলমাত্র দ্বিধা না করে, বাঁ হাত দিয়ে শ্লেটখানি মেয়েটির মুখের স্রুমুখে ধরলে, আর গুলিটি শ্লেট ভেদ করে বেরবামাত্র ডান হাত দিয়ে সেটি চেপে ধরলে। তখন সে গুলির তেজ কমে এসেছে, তাই সেটি নীললোহিতের মুঠোর মধ্যেই রয়ে গেল।

৮

ইতিমধ্যে বেড়ায় আগুন ধরে গিয়েছে, মেয়েরা সব ডুক্‌রে কাঁদতে আরম্ভ করেছে, আর বাইরে লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে। এমন সময় নীললোহিতের বাবা একটা দোনলা বন্দুক হাতে করে স্কুলে এসে উপস্থিত। তিনি এসেই প্রথমে আগুন নেবাবার ব্যবস্থা করলেন, এবং পরে ব্যাপার কি হয়েছিল তা গৃহস্বামীকে বললেন। নীললোহিতের বাবার অভ্যাস ছিল বাড়ীর সুমুখে পুকুরে একটা ছিপি-আঁটা বোতল ভাসিয়ে দিয়ে সেই বোতলকে গুলি মারা,—চোখের নিশানা ও হাতের তাক ঠিক রাখবার জন্য। সেদিন গুলিটে বোতলের গা থেকে ঠিকরে বেঁকে বিপথে চলে এসেছে। অবশ্য পথিমধ্যে তার তেজ অনেকটা মরে গিয়েছিল, তবুও নীললোহিত যদি সেটিকে না আটকাত, তাহলে গুলিটি অন্ততঃ ঐ মেয়েটির কপালে চিরদিনের জন্য একটি আধুলি-প্রমাণ হোমের ফোঁটা পরিয়ে যেত। তারপর তিনি নীললোহিতের পিঠ চাপ্‌ড়ে বললেন যে, ‘তুমি ছেলে বটে, বাপকো বেটা।’ মেয়েটি অমনি তার কচি হাত দুখানি জড় করে নীললোহিতকে ভক্তিভরে প্রণাম করলে। এর পর তার বাবা তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন।

ঘটনার পরে গৃহস্বামী তাঁর আটচালায় বালিকা বিদ্যালয় বসবার অনুমতি আর দিলেন না। ফলে সেই দিনই ও বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল।

আমরা সকলে নীললোহিতের আদিপ্রেমের কাহিনী শুনে না হোক, আদি বীরত্বের কাহিনী শুনে অবাক হয়ে গেলুম। এখন আপনারা বিচার করুন, এ গল্পের কোনও মানে মোদ্দা আছে কি না ?

নৃত্যকলা

'রূপতরঙ্গ', 'চলচ্চিত্র জগৎ' 'নৃত্যরঙ্গ' প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিকে আর্টের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া নাট্যামোদিগণের মধ্যে কলাবিৎ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলাম। থিয়েটারের দৃশ্যসজ্জা বায়স্কোপের পরিচালনা হইতে আরম্ভ করিয়া উদীয়মান নটনটীদের অভিনয় ও নৃত্যগীতাদি সম্বন্ধে উপদেশ লইবার জন্য অনেকে আমার নিকট আসিতেন। সখের 'বিরাট জলসা' হইলে ত কথাই নাই, আমাকে লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়।

একদিন হঠাৎ এক ছোট নীল খামে মেয়েলী হাতের ঠিকানা-লেখা পত্র পাইলাম। খুলিয়া দেখি ময়মনসিং হইতে শ্রীমতী মৃদুলা বক্সী লিখিতেছেন যে তিনি এক মেয়ে স্কুলের অভিনয় উপলক্ষে তাঁহার কিশোরী ভ্রাতষ্পুত্রী কুমারী তমালীকে সঙ্গে লইয়া দুই এক দিনের জন্য কলিকাতায় আসিতেছেন। তাঁহার ভ্রাতা মাইসোর দরবারে বড় চাকরি করেন। কুমারী তমালী সেইখানে স্বয়ং শ্রীযুক্ত তাণ্ডব শাস্ত্রী দ্রাবিড়ীর নিকট নৃত্যকলা শিক্ষা করিয়াছেন। শ্রীমতী মৃদুলা বক্সী আমার নাম কাগজে পড়িয়াছেন, তাঁহার বিশেষ অনুরোধ আমি যেন একবার কুমারী তমালীর নৃত্য দর্শন করিয়া আমার মতামত প্রকাশ করি। শ্রীমতী বক্সী তাঁর

ভ্রাতস্পুত্রীকে লইয়া পরদিন বিকালে আমার বাড়ীতে আসিবেন ও তাহার নৃত্যাভিনয় দেখাইবেন। বিনা পরিচয়ে আসিতেছেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন ও লিখিয়াছেন, আমার মতন সমঝদার ব্যক্তি অবশ্যই অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

চিঠি পাইয়া মহা ফাঁপরে পড়িলাম। নিজগৃহে কোনরূপ ললিতকলার চর্চ্চা করিতাম না। অপরিচিতা স্ত্রীলোক আসিয়া নাচ দেখাইবে। তাহাদের কোথায় বসাইব, কি করিয়াই বা অভ্যর্থনা করিব, মহাসমস্যায় পড়িলাম। গৃহিণী স্ত্রীজাতীয়া, সকলকেই সন্দেহের চক্ষে দেখেন। বৈঠকখানায় নাচ ত দূরের কথা নড়িবার জায়গা নাই। শুইবার ঘরে বিছানা সরাইয়া দিলে হয়ত কোন রকমে সামান্য স্থান হইতে পারে, কিন্তু আমাব স্ত্রী কি তাহাতে রাজী হইবেন? আসিতে বারণ করিয়া দিব তাহারও কোন উপায় নাই। শ্রীমতী বক্সী কোথায় আসিয়া উঠিতেছেন তাহা লেখেন নাই। তবে কি কাল বিকালে বাড়ী ছাড়িয়া গড়ের মাঠে পলায়ন করিব? না. তা হয় না, এ নিতান্তই কাপুরুষতা। অনেক ভাবিয়া গৃহিণীকে পত্রখানা দেখাইলাম। যেরূপ কুরুক্ষেত্র ঘটিবে ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না। বোধ হয় বিনা খরচায় নাচ দেখিবার ইচ্ছা তাঁহার মনের কোন অজ্ঞাত কোণে জাগিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "বেশ, ওপরের ঘরেই নাচ হবে। কিন্তু তুমি সেখানে থাকতে পাবে না।"

আমি বলিলাম, "সে কি রকম করে হয়? তারা আমারই মতামত জানতে চায়।"

গৃহিণী বলিলেন, "আচ্ছা বেহায়া মেয়েমানুষ ত!"

যাহা হউক অনেক কষ্টে গৃহিণী রাজি হইলেন। শুইবার ঘরে বিছানা তুলিয়া সতরঞ্জি পাতিয়া দেওয়া হইবে, সেইখানে তাঁহারা চা-পান করিয়া পরে নৃত্য দেখাইবেন।

পরদিন বিকালে যথাসময়ে একখানি ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল। একটি ছোকরার সঙ্গে মধ্যবয়সী শ্রীমতী মৃদুলা বক্সী ও দ্বাদশবর্ষীয়া কুমারী তমালী নামিলেন। সঙ্গে একটি সুটকেস। স্ত্রীর ভয়ে ছোকরাটিকে আর উপরে লইয়া যাইতে সাহস হইল না। তাহাকে নীচে বৈঠকখানায় বসাইয়া নিজে সুটকেস হাতে লইয়া ইঁহাদের দুইজনকে উপরে লইয়া গেলাম। গৃহিণী তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। শ্রীমতী মৃদুলা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। কৃশাঙ্গী বলিলে যাহা বুঝায় তিনি তাহা নন। তাঁহার বেশভূষা আধুনিক নব্যা স্ত্রীলোকের ন্যায়। ভ্রাতষ্পুত্রীটিকে দেখিলে মনে হয় সে পেট ভরিয়া খায় না। বোধ হয় খুব ক্ষীণা না হইলে অজন্তার ভাবের অভিব্যক্তি হয় না।

শিষ্টালাপ ও চা-পান শেষ হইল। পাশের ঘর হইতে শ্রীমতী বক্সী তমালীকে বেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া আনিলেন। তমালী পূজারিণী সাজিয়াছে। ভাঙ্গা তেপায়াটা ঘরের কোণে

সরাইয়া দিলাম। নৃত্য সুরু হইল। নানারূপ অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে হাত পা নাড়িয়া নৃত্যশীলা পূজারিণী দেবার্চ্চনা করিতে লাগিল। হঠাৎ নৃত্য বিচলিত হইল, মুখে বেদনাব্যঞ্জক ভাব দেখাইয়া তমালী কোণ হইতে ঘরের মাঝখানে ছিটকাইয়া আসিল।

"আহা হা! ভাঙ্গা তেপায়াটা পায়ে লাগল না কি?"

শ্রীমতী মৃদুলা বলিলেন, "না, না, না। এটাও নাচ।"

ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হ'লো?

মৃদুলা বলিলেন, "ঐতো! ফুল তুলতে গিয়ে মধুমাছি কামড়ে দিলো!"

স্ত্রী এতক্ষণ অপ্রসন্ন চিত্তে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, বিরক্তভাবে বলিলেন, "যত সব ঢং!"

ঢং? এই মূর্খ সেকেলে স্ত্রীলোকটা বলে কি? মৃদুলার ভাইঝীর নাচ দেখিয়া এ পর্য্যন্ত এমন মন্তব্য কেহ করে নাই। নৃত্য বন্ধ হইয়া গেল। বিনা বাক্যব্যয়ে সুটকেস নিজেই এক হাতে করিয়া অপর হাতে পূজারিণীবেশিনী তমালীকে টানিতে টানিতে শ্রীমতী বক্সী একেবারে ট্যাক্সিতে যাইয়া উঠিলেন। ছোকরাটি অপেক্ষা করিতেছিল। ফিরিয়া আসিবার জন্য অনেক অনুনয় করিলাম। কোনও ফল হইল না। ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

চিত্র ও চরিত্র

কথিত আছে, আচার্য্য শঙ্কর বত্রিশ বৎসর মাত্র বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন, পণ্ডিতদের বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন, পরিব্রাজক-রূপে সারা ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়াছেন, সকল প্রদেশে অসংখ্য শিষ্যকে বৈদিক ধর্ম্মে ও বৈদান্তিক চিন্তায় দীক্ষিত করিয়াছেন, ভারতের চারি প্রান্তে চারি মঠ স্থাপন করিয়াছেন।

উনচল্লিশ বৎসর বয়সে বিবেকানন্দ দেহ ত্যাগ করেন। বিবেকানন্দের উনিশ বৎসরের কার্য্য সংসারীর উন-শত বর্ষেও সাধ্যায়ত্ত নহে।

ধরিতে গেলে বিবেকানন্দ আধুনিক। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী। আজ বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার বয়স হইত সত্তর। জেনারেল এসেম্বলিস্ ইনষ্টিটিউশনে আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীলের তিনি সহপাঠী ছিলেন।

কলিকাতা সিমুলিয়া অঞ্চলের দত্ত-বংশে ১৮৬৩ সালে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। যে শক্তির পক্ষে বিরাট ভারতবর্ষও সীমাবদ্ধ ছিল, বাল্যে কে-ই বা সেই অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়াছিল।

কলেজে পড়িবার সময় নরেন্দ্রনাথ— পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের সাক্ষাৎলাভ করেন। রামকৃষ্ণের সংস্পর্শ হইল তাঁহার স্পর্শমণি। যাহা সাধারণ বলিয়া মনে হইতেছিল তাহা সোণা হইয়া গেল, তখনও নামে না হইলেও নরেন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দ হইলেন।

তাহার পর সংসার পিছনে পড়িয়া রহিল, তীর্থে তীর্থে, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া পরিব্রাজক বিবেকানন্দ প্রাচীন ঋষি-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই নবীন সন্ন্যাসীর বাণীর নবীতায় কত মূর্চ্ছিত প্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী চিকাগো সহরে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-মহাসভায়, হিন্দুধর্ম্মের এই অনিমন্ত্রিত তরুণ প্রতিনিধির মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠস্বরে হিন্দুধর্ম্মের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া দেশদেশান্তর হইতে সমাগত সুধীমণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ-মিশনের প্রতিষ্ঠা বিবেকানন্দের অতুল কীর্ত্তি।

বিবেকানন্দ দেশকে যোদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তিনি শিখাইলেন, সহিবার শক্তি অপেক্ষা, বহিবার শক্তি অপেক্ষা, করিবার শক্তি বড়। তিনি শিখাইলেন, ব্যক্তি অপেক্ষা জাতি বড়; পরোপকারই এক সার্ব্বজনীন মহাব্রত।

বিবেকানন্দের বাণীতে ছিল বিদ্যুৎ, বজ্রও ছিল। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম আচারগত ধর্ম্ম নহে। সে ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীন। তাহার সহিত শিক্ষা, সভ্যতা, কৃষ্টি, রাষ্ট্র, ঐতিহ্য, নীতি সকলই জড়াইয়া রহিয়াছে।

১৯০২ সালে বিবেকানন্দ মহাপ্রস্থান করিলেন।

এই দীপ্তচক্ষু, বক্ষনিবদ্ধবাহু, গৈরিকাবৃতদেহ, তেজঃপুঞ্জ-কলেবর তরুণ সন্ন্যাসীর প্রভাব বাংলার অতএব ভারতের মনের উপর অপূর্ব্ব।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

একশত বৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৩৩ সালে বিলাতের ব্রিষ্টলে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় দেহত্যাগ করেন। আজ ১৯৩৩ সাল। একশত বৎসরে ভারতবর্ষের বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেদিন পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিবে কি না, এই লইয়া লোকের দ্বিধার আর অন্ত ছিল না। পুরাতন বিগত হইয়াছে, নূতনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সেই যুগান্তরের সন্ধিক্ষণে রামমোহন আপনার শক্তি ও প্রতিভা লইয়া অসঙ্কোচে অগ্রসর হইলেন। দ্বিধা কাটিয়া গেল। আবরণ সরিয়া গেল। প্রাচীনত্বের মোহ অপগত হইল। শক্তিমান্ পুরুষ আত্মশক্তিতে পথ প্রস্তুত করিলেন। সে পথ ভবিষ্যতের পথ ; যে পথ দিয়া জাতি অগ্রে গমন করিবে সেই পথ।

* * *

জীবনের ধর্ম্ম নব নব পরীক্ষা। যুগধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা শক্তিশালী। রামমোহন নব যুগের প্রবর্ত্তক। যুগধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জাতি নূতন কথা ভাবিতে শিখিল, নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইল, নববেদনায় ব্যথিত হইল। যুগসন্ধিতে রামমোহন আবির্ভূত না হইলে ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত। শতবর্ষ ধরিয়া তাঁহার চিন্তা ও আদর্শ—শিক্ষা, ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যের প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে।

* * *

রামমোহন শতবার্ষিকী উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে দেশ প্রবুদ্ধ হইয়াছে। আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে ইহার আয়োজনার্থে এক সভার অধিবেশন হইবে। সে সভার সভাপতি রবীন্দ্রনাথ। এ অনুষ্ঠানের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবার পক্ষে রবীন্দ্রনাথই দেশের মধ্যে একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি রামমোহনের ভাব-ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী। রবীন্দ্র-সাহিত্যে—রামমোহনের চিন্তাধারা অনবদ্য-সুন্দর ভাব-রূপ ধারণ করিয়াছে। রামমোহনের আদর্শ রবীন্দ্রনাথেই পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

—আগামী সংখ্যায়—

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের

শেষ পৃষ্ঠা

দিন-পঞ্জী

দেরাদুন্, ৬ই ফেব্রুয়ারী—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বর্ত্তমানে পৃথিবীর ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত, উহা ভবিষ্যতে যুবজনের পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে। উক্ত পুস্তকে জগতের বিবিধ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উল্লেখ থাকিবে এবং নূতন ভাবসম্পদ থাকিবে। পণ্ডিতজী জেলের মধ্যে গত আট মাসে প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রায় ৯০০ শত মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন।

দিল্লী, ৬ই ফেব্রুয়ারী—গতকল্য স্বদেশী প্রদর্শনীতে আগুন লাগিয়া ২৪টি দোকান ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। অনুমানিক প্রায় এক লক্ষ টাকার জিনিষ নষ্ট হইয়াছে।

শ্রীনিকেতনে অনুন্নত-সম্মেলনে কবি রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার লজ্জা বোধ হয় যে, মানুষকে মানুষ ভালবাসবে এই সহজ কথাটি এত শাস্ত্র, এত প্রমাণ ও তর্ক দিয়ে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশকে এখনও বলতে হয়।' তিনি আরও বলেন, 'আজ আমাদের মিলতেই হবে, নতুবা এ দেশের আর কোনও মুক্তির পথ নাই। মানবের অপমানে বিধাতার অপমান করেছি, সেইজন্য পৃথিবীর লোক আজ আমাদের অপমান করতে সাহস পেয়েছে।'

লাহোর, ১১ই ফেব্রুয়ারী—এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি ডাঃ আলমের ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, 'জীবন বিপন্ন করিয়াও হয়ত আমি দেশমাতৃকার

সেবায় নামিয়া পড়িতাম এবং ইহাই আমার কর্ত্তব্য; কিন্তু সৈনিক হিসাবে আমি আমার সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ অমান্য করিয়া শৃঙ্খলা ও শিষ্টাচার ভঙ্গ করিতে পারি না। যারবেদার অবরুদ্ধ দুর্গ হইতে আদেশ আসিয়াছে,—তুমি অবশ্যই চিকিৎসকগণের পরামর্শগুলি তন্ন তন্ন করিয়া প্রতিপালন করিবে কোনরূপ কার্য্য অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হওয়া চাই।—আহত সৈনিক সম্মুখস্থ বাহিনী হইতে পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহাকে সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশানুবর্ত্তী হইতে হয়, তাই বলিয়া দেশ সেবার কার্য্য হইতে অবসর চাই না। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি দেশসেবার আশা পোষণ করি।'

সকল প্রকার সদ্য অথবা দূষিত বেদনা
এবং ক্ষতাদির জন্য
অমৃত প্রলেপ
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

ছোট গল্প

১ম বর্ষ] ২০শে ফাল্গুন ১৩৩৯ [৩৪শ সংখ্যা

আতঙ্ক

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বিপদ এক-একটা মানুষের জীবনে ঠিক এমনি করিয়াই আসে। কেন আসে কেহ কিছুই বলিতে পারে না, কখন আসে তাহারও কোনও স্থিরতা নাই। তবু আসে।

শুনিলাম আমাদের প্রকাশেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে।

অনেক দিন চুপচাপ বসিয়া থাকিবার পর চল্লিশ টাকা মাহিনার একটি চাকরি পাইয়া কি খুসীই না সে হইয়াছিল! পথে সেদিন আমার সঙ্গে দেখা। বলিল, 'যাক্ ভাই, এতদিন পরে বাঁচা গেছে। একটা চাকরি পেয়েছি।'

কিন্তু চাকরি না পাইলেও তাহার বিশেষ ক্ষতি ছিল বলিয়া ত মনে হয় না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন রে? চাকরি না পেলেই বা তোর এমন কি ক্ষতিটা হ'তো শুনি? বাবা চাকরি করছেন, দাদা করছেন,—কলিকাতায় নিজের বাড়ী,—অভাব কিসের?'

প্রকাশ হাসিয়া বলিল, 'বিয়ে করেছি, বৌএরও ত সাধ আহ্লাদ আছে। নিজে রোজগার না করলে—'

কথাটা তাহাকে আর শেষ করিতে হয় নাই। বুঝিয়াছিলাম। প্রকাশের বৌ আমি দেখিয়াছি। পরমা সুন্দরী বলিতে যাহা বুঝায় সে বোধ হয় তাহার চেয়েও বেশী। তেমন বৌ খুব কম লোকেরই ভাগ্যে জোটে! না চাহিতেই তাহাকে দিতে ইচ্ছা করে সেকথা সত্য। অথচ এই বয়সে বৌএর সাধ মিটাইবার জন্য বাপ-দাদার কাছে টাকা চাহিতে প্রকাশ চায় না।

সুতরাং চাকরি পাইয়া প্রকাশের খুসী হইবারই কথা।

অলক্ষ্যে থাকিয়া বিধাতা তখন হাসিয়াছিলেন কিনা জানি না। কারণ দু' তিন মাস পার হইতে না হইতেই শুনিলাম—প্রকাশ ভারি বিপদে পড়িয়াছে। যে বিপদের কথা বলিতেছিবাম—সেই বিপদ।

প্রকাশ তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল না। একেবারে অকস্মাৎ সম্পূর্ণ অতর্কিত অবস্থায় নিশীথ-রাত্রির ঝড়ের মত প্রচণ্ড বিক্রমে বিধাতার দেওয়া বিপদ আসিয়া প্রকাশকে

আক্রমণ করিয়াছে, এবং শুধু আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাকে একেবারে ধরাশায়ী করিয়া দিয়াছে।

বাবা তাহার সেদিন আফিস হইতেই ফিরিলেন—রোগ নাই, ব্যাধি নাই, দিব্য সুস্থ সবল মানুষ, আহারাদি শেষ করিয়া নিশ্চিন্তমনে শয়ন করিয়াছিলেন, রোগ ব্যাধির কথা তিনি চিন্তাও করেন নাই, হঠাৎ মধ্য রাত্রে শোনা গেল—তাঁহার কলেরা হইয়াছে। কলিকাতা সহর—ডাক্তারের অভাব নাই, চিকিৎসার ত্রুটিও কিছু হইল না, সেবাশুশ্রূষাও যথেষ্ট, কিন্তু প্রভাত হইতে না হইতে নাড়ী তাঁহার ক্ষীণ হইয়া আসিল, মুখের কথা মুখেই আট্‌কাইয়া রহিল, স্ত্রী পুত্র কন্যা বধূ জামাতা নাতি-নাতনীর কান্নায় কোলাহলে বাড়ী একেবারে মুখরিত হইয়া উঠিল; কেহই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চায় না,—তবু তিনি ছাড়িয়া গেলেন।

যাইবার বয়স হইয়াছিল, তাঁহার যাওয়াটা আকস্মিক হইলেও তত বেশী অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু এমনি বিধাতার বিচার, শ্মশান হইতে মৃতদেহের সৎকার করিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শশাঙ্ক সহসা শয্যা গ্রহণ করিল। —প্রকাশের দাদা শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক গেল এবং তাহার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শশাঙ্কর দশ-এগারো বছরের একটি ছেলে!

উপরি-উপরি তিনজন।

বাড়ীতে পুরুষ ব্যাটাছেলের মধ্যে রহিল একমাত্র—প্রকাশ।

এত বড় এই সংসারের বিরাট বোঝা এতদিন বাবা ও দাদায় ভাগাভাগি করিয়া বহন করিতেছিলেন, তাঁহাদের অন্তরালে থাকিয়া প্রকাশ কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এইবার সমস্ত দায়িত্বভার আসিয়া পড়িল তাহারই ঘাড়ে।

বাবা কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বাড়ীখানি ছিল, বন্ধকী দেনার দায়ে তাহাও গেল। দাদার ছিল মাত্র দু'হাজার টাকার জীবন-বীমা। সে টাকা গেল বৌদিদির হাতে। বৌদিদি বলিলেন, 'ও টাকা আমি দেবো না ভাই, আমার দু'দুটো আইবুড়ো মেয়ে, তাদের বিয়ে দিতে হবে।'

প্রকাশের মাত্র এই চল্লিশটি টাকার ভরসা। শহরের মাঝখানে থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। শহরতলীতে একটি টিনের বাড়ী ভাড়া লইয়া তাহারা উঠিয়া গেল।

বেচারা প্রকাশ! কতদিন বসিয়া বসিয়া শুধু তাহারই কথা ভাবিয়াছি। দেখা হইলে সে আর সহজে আমাকে ছাড়িতে চায় না। বলে, 'চাকরি নেওয়ার জন্যে তখন কত কথাই বলেছিলি, কিন্তু এখন?'

তাহাই ভাবি। প্রকাশ যদি তখন চাকরি না লইত, আজ তাহা হইলে তাহাদের কষ্টের আর সীমা থাকিত না। ভগবানের একটা বিচার ত আছে!

প্রকাশ বলে, ‘কিন্তু ভাই নীলিমাকে যদি না পেতাম তাহলে এ কষ্ট বোধ হয় আমি সহ্য করতে পারতাম না। নীলিমার মুখের পানে তাকিয়ে আমি সব দুঃখু ভুলে যাই।’

এত দুঃখের মাঝখানে স্ত্রীই তাহার একমাত্র সান্ত্বনা। রূপ এবং গুণ—দুইই একসঙ্গে পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। তা সে যত বড় অভাগাই হোক্, এদিক দিয়া সে ভাগ্যবান।

সেদিন বলিলাম, ‘তোর কোনও দুঃখই থাকবে না প্রকাশ, আমার মনে হয় ওই তোর স্ত্রীর জন্যেই আবার দেখিস তোর সবই হবে।’

প্রকাশ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ‘নীলিমাকে আজ এইকথা আমি বলব গিয়ে।’

মাকে লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, কলিকাতায় ফিরিলাম প্রায় এক বৎসর পরে। প্রকাশের কোনও খবর রাখি নাই।

সেদিন থিয়েটার দেখিতে গিয়াছি। থিয়েটার যখন ভাঙ্গিল রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। শীত কাল। গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া জড়সড় হইয়া পথ চলিতেছিলাম। দূরে একটা পানের দোকানের সুমুখে কে একটা লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন কিনিতেছে। দেখিতে ঠিক প্রকাশের মত। দেখিলাম, লোকটা দিয়াশলাই

জ্বালিয়া সিগারেট ধরাইল। প্রকাশ বিড়ি সিগারেট কখনও খায় না। কাজেই সে প্রকাশ নয় ভাবিয়াই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিলাম, কাছে গিয়া ভাল করিয়া আর-একবার তাহার মুখের পানে তাকাইতেই দেখি—সত্যই প্রকাশ। মাথার চুল বড় বড়, দেখিতে অনেকটা রোগা হইয়া গেছে, সহজে তাহাকে আর চিনিবার উপায় নাই। ডাকিলাম, 'প্রকাশ !'

আমার মুখের পানে তাকাইয়া চোঁ করিয়া সিগারেটটা টানিয়া খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'আয়। অনেকদিন পরে দেখা হ'লো।'

এই বলিয়া সে আমার পাশে পাশে পথ চলিতে লাগিল। কেমন যেন উদাসীন ভাব। এতদিন পরে দেখা হইলে আগে সে যেমন করিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিত এখন আর যেন সে ব্যগ্র ব্যাকুলতা নাই !

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সিগারেট ধরলি কতদিন ? আগে ত ও-সব খেতে দেখিনি !'

বলিল, 'হ্যাঁ ধরেছি।'

'চেহারাও দেখছি খারাপ হয়ে গেছে।'

ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'তাই নাকি ?'

বলিলাম, 'কেন নিজে বুঝতে পারিস না ?'

বলিল, 'বুঝে কি লাভ ? এই শরীর—শ্মশানে পুড়ে ত একদিন ছাই হয়ে যাবে।'

'সে আর হবে না কার? তবু যতদিন বেঁচে আছি—'

কথাটা সে আমায় শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'ঠিক বলেছিস। যতদিন বেঁচে আছি সুখে বাঁচতে হবে। সেই চেষ্টাই ত করছি আজকাল।'

কথাগুলা তাহার কেমন কেমন যেন মনে হইতেই তাহার মুখের পানে তাকাইলাম। বলিলাম, 'কী বলছিস প্রকাশ? আমার ভয় হয় তুই শেষে না পাগল হয়ে যাস!'

'পাগল হব কি রে!' বলিয়া প্রকাশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তাহার সে হাসিটাও যেন কেমন একরকম বলিয়া মনে হইল। বুঝিলাম তাহার দুঃখের মাত্রা বোধ হয় বাড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে এই এত রাত্রে কোথায় এসেছিলি?'

প্রকাশ বলিল, 'থিয়েটার দেখতে।'

'থিয়েটার দেখতে?'

'হ্যাঁ। এখানে আজকাল আমি প্রায়ই আসি।'

ভাবিতেছিলাম, এমনিই হয়। এমনি করিয়াই হয়ত সে আজকাল আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। দু'জনেই নীরবে পথ চলিতেছিলাম। প্রকাশই প্রথমে কথা বলিল। সিগারেটটা শেষ টান টানিয়া পথের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'ওই পুতুল-মেয়েটি দেখতে অনেকটা নীলিমার মত। তাই ওকে আমি প্রায়ই দেখতে আসি।'

হাসিয়া বলিলাম, 'নীলিমা সেকথা জানে।'

কথাটার কোনও জবাব না দিয়া দেখিলাম সে তাহার পকেট হইতে আবার আর-একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইতেছে।

বলিলাম, 'আজকাল এত সিগারেট খাচ্ছিস, থিয়েটার দেখছিস, মাইনে কি তোর বেড়েছে প্রকাশ?'

ঘাড় নাড়িয়া প্রকাশ বলিল, 'হ্যাঁ, আজকাল দেড়শ' পাই। নীলিমা অবশ্য দেখে যায়নি। সে মরবার পরেই এই চাকরিটা পেলাম।'

তাহার কথাটা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

'কি বললি প্রকাশ? নীলিমা মারা গেছে?'

'তা আজ প্রায় মাস পাঁচ ছয় হয়ে গেল।'

'কি হয়েছিল?'

'কিছু না। সামান্য জ্বর।'

'চিকিৎসা করিয়েছিলি?'

'আমাদের পাড়ার নেপাল ডাক্তার একদিন দেখেছিল। তখন আমি চল্লিশ টাকা মাইনে পেতাম, তার ওপর মাসের শেষ।'

আবার আমরা নীরবেই পথ চলিতে লাগিলাম। পথ তখন নির্জ্জন হইয়া আসিয়াছে। ফুটপাথের উপর আমাদের দু'জোড় জুতার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নাই।

প্রকাশ বলিল, 'আরে দূর-দূর! ডাক্তার দেখলেই কি মানুষ বাঁচে নাকি! কেউ বাঁচবে না ভাই, তুইও মরবি, আমিও মরব।'

ইহার উপর আর কথা চলে না। চুপ করিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পথ চলিবার পর প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ভগবান বিশ্বাস করিস?'

বলিলাম, 'করি।'

প্রকাশ হাসিয়া বলিল, 'আমিও করতাম।......এখন দেখছি বিশ্বাস ক'রে কোনও লাভ নেই। নীলিমা মরবার সময় যে কান্না আমি কেঁদেছিলাম, আর যে প্রার্থনা আমি জানিয়েছিলাম, তা শুনে ভগবান ত ভগবান, শয়তানেরও দয়া করবার কথা। কিন্তু তোর নিষ্ঠুর ভগবান আমার সে প্রার্থনা শোনে নি।'

এই বলিয়া সে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। প্রাণপণে সিগারেট টানার চোঁ চোঁ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না।

প্রচুর খানিকটা ধোঁয়ার সঙ্গে প্রকাশ যেন তাহার মনের অনেকখানি গ্লানি দূর করিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, 'কিছু না রে, কিচ্ছু না! দুনিয়ার প্রায় সবখানাই ফাঁকি। যতদিন বেঁচে আছিস যা খুশী তাই কর্—ফুর্তি ক'রে কাটিয়ে দে। তারপর মৃত্যু যেদিন আসবে কেউ আর তাকে আটকাতে পারবে না।...

মৃত্যুকে ভয় আর আমি করি না। বুঝলি? সেজন্যে সর্ব্বদাই নিজেকে প্রস্তুত ক'রে রেখেছি।'

প্রকাশ এইবার চুপ করিয়া আবার কি যেন ভাবিতে লাগিল। কথায় কথায় আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছিলাম।

রাস্তার ট্রামগাড়ী অনেকক্ষণ বন্ধ হইয়া গেছে। মাঝে মাঝে দু'একটা বাস এখনও চলিতেছিল।

প্রকাশ বলিল, 'তোকে আমি অনেক দূর টেনে নিয়ে এলাম। না?'

বলিলাম, 'তাতে আর কি হয়েছে! তোর সঙ্গে কতদিন দেখা হয়নি বল্ ত?'

প্রকাশ বলিল, 'হ্যাঁ, আজ রাত্রে যদি মরে যাই ত কাল আর দেখা হবে না।'

দু'জনে আরও খানিক দূর চলিলাম। প্রকাশ একবার হাঁচিল।

বলিলাম, 'বেশ হিম পড়ছে।'

ঘাড় নাড়িয়া প্রকাশ বলিল, 'হুঁ, ঠাণ্ডা লাগল বোধ হয়।'

বলিলাম, 'ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় আর বেশি ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়। চারিদিকে অসুখ-বিসুখ হচ্ছে।'

প্রকাশ আর কোনও কথা না বলিয়া একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া ফুটপাথ হইতে রাস্তায় নামিল। ঠিক সেই সময় একটা বাস্ পার হইতেছিল। চলন্ত গাড়ীটাকে হাতের

ইসারায় থামাইয়া প্রকাশ বোধ করি হিমের ভয়েই তাহার হাতল ধরিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।—'চললাম, আবার দেখা হবে।'

ঘণ্টা বাজাইয়া সশব্দে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ সেইদিক পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তাহার পর জনশূন্য শহরের পথ। কদাচিৎ দু'একটা মানুষে-টানা রিক্‌শা গাড়ী ঠুং ঠুং করিয়া পার হইয়া যাইতেছে। পথের দু'ধারে নিদ্রিত নিস্তব্ধ বড় বড় অট্টালিকা। কোথাও কাহারও সাড়াশব্দ নাই। শীতে ও কুয়াশায় সব যেন ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। যে পথে আসিয়াছিলাম আবার সেই পথ ধরিয়াই একাকী বাড়ী ফিরিতে লাগিলাম। দূরে কোথায় যেন শবযাত্রীর দল 'বল হরি হরিবোল' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কুয়াশাচ্ছন্ন শীতরাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সে শব্দ আমার কানের ভিতর দিয়া হৃৎপিণ্ডে আসিয়া ধ্বক্ করিয়া আঘাত করিল। শহরের চারিদিকে তখন বসন্তের মড়ক্ লাগিয়াছে। পথের দু'ধারে প্রাচীরগাত্রে ল্যাম্পপোষ্টে যেখানে-সেখানে বড় বড় লাল লাল অক্ষরে কর্পোরেশন নোটিশ দিয়াছে—অবিলম্বে বসন্তের টীকা না লইলে মৃত্যুর সম্ভাবনা। সর্ব্বনাশ! সেকথা এতদিন আমার মনেই ছিল না। ছি, ছি, প্রকাশের মত পাগলটার সঙ্গে

এতক্ষণ ধরিয়া ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় ঘুরিয়া বেড়ানো আমার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর জ্বালা হইলেই ত······

আসন্ন মৃত্যুর অজ্ঞানা আতঙ্কে আমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত শির্ শির্ করিয়া উঠিল।

দিন-দুই পরে ডাকে একখানি চিঠি পাইলাম। খুলিয়া দেখি প্রকাশের চিঠি।

আমাকে চিঠি লিখিবার প্রয়োজন তাহার কোনদিনই হয় নাই। আজ তাই সর্ব্বপ্রথমে চিঠির নীচে তাহার নাম দেখিয়া একটুখানি বিস্মিত হইলাম। চিঠিখানি বড় নয়। মাত্র তিন চার লাইন লেখা।

লিখিয়াছে—

হাতে টাকাকড়ি যাহা ছিল ফুরাইয়া গিয়াছে। তুমি যদি ভাই দয়া করিয়া দশটি টাকা লইয়া কাল একবার এখানে আসিতে পার ত বড় ভাল হয়। ইংরেজী মাসের পয়লা তারিখে আপিসের মাহিনা পাইলেই টাকা পরিশোধ করিব। ইতি—প্রকাশ।

থিয়েটার দেখিয়া ফুর্ত্তি করিয়া যেরকম ভাবে সে টাকা খরচ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি অভাব যে তাহার একদিন হইবে তাহা জানা কথা।

যাই হোক, দশটি টাকা লইয়া পরদিন সকালেই প্রকাশের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম।

বেলেঘাটার একটা গলির মধ্যে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাহার বাড়ীর নম্বর মিলিল। চারিদিকে টিনের বস্তি। মাঝখানে একটা পুকুর। সদর দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতেই কমবয়সী একটি মহিলা ঘোমটা টানিয়া সরিয়া গেলেন, আর একজন বর্ষীয়সী আমার কাছে আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কার বাড়ী?'

বলিলাম, 'প্রকাশের।'

দেওয়ালের ওপারে আঙ্গুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'ওই দিকে যাও বাছা, এদিকে নয়।'

সেখান হইতে বাহিরে আসিয়া আবার আর একটা দরজায় গিয়া কড়া নাড়িতেই ছোট একটি ছেলে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কাকাবাবুকে ডাকছেন?'

বলিলাম, 'কে তোমার কাকাবাবু? প্রকাশ?'

ছেলেটি একবার আমার মুখের পানে তাকাইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়াই ছুটিয়া পলাইল।

ভারি মুস্কিলে পড়িলাম। এইবার জোরে জোরে প্রকাশের নাম ধরিয়া ডাকিতেই তাহার সাড়া পাওয়া গেল। পাশের একটা বাড়ী হইতে প্রকাশ বলিল, 'নারকেল গাছটার পাশের গলি দিয়ে এগিয়ে আয়।'

দেখিলাম, পাশেই নারকেল গাছ এবং তাহার পাশেই নোংরা একটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গলি। নারকেল গাছের গায়ে একটা নম্বরের প্লেট পেরেক দেওয়া হইয়াছে

এবার আর দরজায় গিয়া কড়া নাড়িতেও হইল না, ডাকিতেও হইল না, দেখিলাম, দরজার পাশের ঘরখানি খোলা এবং সেই ঘরের একপাশে বিছানাপাতা তক্তপোষের উপর প্রকাশ একটা সাদা চাদর গায়ে দিয়া শুইয়া আছে।

বলিলাম, 'বেশ জায়গায় বাড়ী নিয়েছিস প্রকাশ! ছ'নম্বর বাড়ী কি এখানে সবগুলোই নাকি?'

প্রকাশ হাসিয়া বলিল, 'ননীদার বাড়ী ঢুকেছিলি বুঝি? ও একটা ভারি মজা হয়ে গেছে ভাই। ননীদার বাড়ীর নম্বর 'নয়'। তার দরজার প্লেট্‌টা গেছে উল্‌টে। তাই ইংরেজি নয়, ছয় হয়ে বসে আছে। একটা পেরেক ঠুকে প্লেট্‌টা সোজা করে বসাবার সময় আর ননীদার হয়ে ওঠে না। বোস্।'

বিছানার উপরেই প্রকাশ উঠিয়া বসিয়াছিল। আমিও তাহারই একপাশে চাপিয়া বসিলাম। বলিলাম, 'কই তোর অসুখের কথা ত লিখিস্‌নি চিঠিতে? কিরকম অসুখ? কবে থেকে?'

প্রকাশ বলিল, 'সেই যে থিয়েটার দেখে ঠাণ্ডা লাগিয়ে এলাম সেদিন, সেই রাত্রি থেকেই জ্বর। টাকা এনেছিস?'

পকেট হইতে দশ টাকার নোটখানি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। উপবাসক্লিষ্ট শুষ্ক ম্লান মুখখানি তাহার সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, 'বাঁচলাম। এ শালা এমন জায়গা যে দশটা টাকা কারও কাছে ধার পাবার উপায় নেই।'

বলিলাম, 'আমার ভাই আজ একটু দরকার আছে, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে।'

'সে কি রে! এত বেলা হয়েছে, খেয়ে যাবিনি ?'

বলিলাম, 'না।'

বলিয়াই উঠিতে যাইতেছিলাম, প্রকাশ বলিল, 'বোস্ না!'

মনে হইল আরও কি যেন সে বলিতে চায়। বাধ্য হইয়া বসিতে হইল।

প্রকাশ খানিক ইতস্তত করিয়া এটা-সেটা অবান্তর প্রশ্ন করিয়া শেষে বলিল, 'সেদিন সেই অসুখের কথা বলছিলি, আমাদের পাড়াতেও হয়েছে দু'একটা।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বসন্ত ?'

ঘাড় নাড়িয়া প্রকাশ বলিল, 'হুঁ। তুই টিকে নিয়েছিস ?'

বলিলাম, 'নিয়েছি।'

প্রকাশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুই নিস্‌নি ?'

সেকথার কোন জবাব না দিয়া প্রকাশ বলিল, 'হোমিওপ্যাথী ওষুধ খেলেও চলে, না কি বল্ ?'

চলে কি চলে না ঠিক জানি না, কাজেই তাহার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে একটুখানি শক্ত হইয়া পড়িল।

প্রকাশ বলিল, 'ওই-সবের চিকিৎসা করে এমন একজন ভাল ডাক্তার তোর জানা আছে ?'

বলিলাম, 'কেন বল্ দেখি! আমাদের পাড়ায় একজন আছেন জানি।'

সংবাদটা শুনিয়া প্রকাশ উল্লসিত হইয়া উঠিল। বলিল, 'তাকে একবার পাঠিয়ে দিতে পারিস? কত নেয় বল দেখি?'

বলিলাম, 'কিছুই নেন না, শুধু যাওয়া-আসার খরচ দিলেই হয়।'

প্রকাশ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। সুমুখে দেওয়ালের কাছে একটা বাক্স খুলিয়া একটি টাকা আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল, 'তুই গিয়েই তাঁকে পাঠিয়ে দিস্ ভাই, আমার এই বাড়ীর পাশে—ছোট্ট একটি ছেলের...আহা, বেচারার কেউ কোথাও নেই . বুঝলি? আজই আমার বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দিস্ যেন, ভুলিস্‌নি।"

পাশের বাড়ীর ছেলের কিছুই হয় নাই। বুঝিলাম প্রকাশ মিথ্যা বলিতেছে। তা বলুক্। তাহাকে লজ্জা দিয়া লাভ নাই।

মৃত্যু ও ব্যাধিকে প্রকাশ ভয় করে না বলিয়াছিল, অথচ মৃত্যুর আশঙ্কায় মুখে তাহার আজ আতঙ্কের ছায়া পড়িয়াছে দেখিলাম।

প্রসঙ্গ

রায় শ্রীসতীশচন্দ্র দে বাহাদুর, এম-এ, এম-বি

দুটি রোগ

ক্ষয়কাশ ও কুষ্ঠ—এই দুই রোগই আমাদের অনেক দিনের পরিচিত পুরাতন জিনিষ, খাঁটি স্বদেশী। রঘুবংশের শেষ রাজা অগ্নিবর্ণ ক্ষয়কাশ রোগে মারা যান; মহাভারতের বিচিত্রবীর্য্যেরও মরণ হয় এই কারণে। তাঁহার ভ্রাতা বিচিত্রাঙ্গদ চর্ম্মকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিলেন বলিয়া রাজা হইতে পান নাই; কুষ্ঠরোগের আরও অনেক উদাহরণ আমাদের পুরাণসমূহে পাওয়া যায়।

* * *

এই দুই রোগ যে পরস্পর নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ তাহা অনেকের জানা নাই। যে দুই ব্যাসিলস্ এই দুই রোগ উৎপন্ন করে, তাহারা দেখিতে একই রকম—ছোট, বেঁটে, এবং ইহাদের পেটে অনেকগুলি করিয়া ডিম বা স্পোর থাকে। কুষ্ঠরোগের ব্যাসিলস্ একটু ছোট—যেন ইহা অন্যের ছোট ভাই, কিন্তু তাহা বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্যে ধরিতে পারে না। উভয়ে একই প্রকার রংয়ে রঞ্জিত হয়—উভয়েই acid-fast bacilli, উভয়েই সহজে মরে না ও অত্যন্ত আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়।

* * *

মানুষের শরীরে উভয়ে একই পথ দিয়া প্রবেশ করে—নাসাপথ দিয়া ; তবে একজন স্নায়ুরজ্জুতে আশ্রয় লইয়া বৃদ্ধি পায়, অন্যজন রসগ্রন্থি ও ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতিতে আশ্রয় লয়।

* * *

উভয়েই যে রোগ উৎপন্ন করে, তাহা আস্তে আস্তে দেখা দেয় ; যখন রোগ বেশ শরীরে প্রবল হইয়াছে, তখন ইহারা শরীরকে নানারকমে বিকল করিয়া ফেলে, এবং তাহার পরে উভয় রোগই দুশ্চিকিৎস্য।

* * *

দুই রোগই সমানভাবে সংক্রামক—ক্ষয়কাশ নিষ্ঠীবন দ্বারা ও কুষ্ঠরোগ রোগীর ক্ষত হইতে নির্গত রস ও নাসাস্রাব দ্বারা। এই উভয় দ্রব্যই ধূলিতে মিশে ও নাসাপথ দিয়া শরীরে প্রবেশ করে।

* * *

তবে সভ্য সমাজে ক্ষয়কাশ এত বেশী দেখা যায় কেন, এবং সভ্যসমাজ হইতে কুষ্ঠরোগ প্রায় নির্ব্বাসিত হইয়াছে কেন ? নরওয়েতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষজনের মধ্যে ১৯১ জন কুষ্ঠরোগী ছিল, কিন্তু ১৯১০ সালে লক্ষ জনে মাত্র সাড়ে তের জন হইয়াছে। ক্ষয়কাশ ভারতবর্ষে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

* * *

ইহার কারণ, আমরা কুষ্ঠরোগীকে ঘৃণা করি ও ক্ষয়কাশ রোগীকে করুণা করি। দুইই জুগুপ্সা—'জুগুপ্সা করুণা ঘৃণে'। কেহই কুষ্ঠরোগীর কাছে যায় না, তাহাদিগকে পৃথক আশ্রমে আলাদা করিয়া রাখা হয়, এবং তাহাদিগের শরীরজাত ক্ষতরস প্রভৃতি অন্যকে রোগ দিতে পারে না। তাহাদের কাহারও মৃত্যু হইলে একজন কুষ্ঠরোগী কমিল।

* * *

কাহারও ক্ষয়কাশ হইয়াছে শুনিলেই আত্মীয়-বান্ধবগণ সহানুভূতি দেখাইবার জন্য তাহাকে দেখিতে আসিবেন ও নিজেদের মুখে ও নাসাপথে কতকগুলি ক্ষয়কাশের জীবাণু লইয়া যাইবেন। রোগী যতক্ষণ চলিতে পারে, পথে ঘাটে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া রোগের বিষ ছড়াইবে, এবং যখন একজন ক্ষয়কাশ-রোগীর মৃত্যু হয়, তখন সুস্থ অনেকগুলি লোক এই রোগের বিষ তাহার নিকট হইতে পাইয়াছে।

* * *

এই প্রথা যদি বিপরীতভাবে লওয়া যায়, কুষ্ঠরোগীকে যদি সমাজের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয় ও সে যদি অবাধে সকলের সহিত মিশিতে পারে ও সকলের সহানুভূতি পায়, এবং ক্ষয়কাশ-রোগীকে পৃথক করিয়া যদি asylumএ রাখা হয়, তাহা হইলে কিরূপ ফল হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জনক ছিলেন ঋষি এবং রাজা। বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ কামনা ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, কর্ম্ম নহে।

[illegible] জনক রাজার আদর্শ এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ যুগে যুগে নব প্রেরণা দান করিয়াছে।

স্বচ্ছন্দে যাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত, সেই এক কোটি টাকার পিতৃঋণ অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া দেবেন্দ্রনাথ যেদিন সংসারক্ষেত্রে দাঁড়াইলেন, সাধারণ লোক সেদিন বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। এই বিপুল ঋণ তিনি পরে সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করিতে পারিয়াছিলেন।

সংসার তিনি ত্যাগ করেন নাই, অর্থও তাঁহার মোহ উৎপাদন করিতে পারে নাই। গৃহে থাকিয়া গৃহীর কর্ত্তব্য সুষ্ঠু ভাবে পালন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাই তিনি মহর্ষি।

রামমোহনের পর দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব না হইলে রাজার কার্য্য অভিব্যক্তি লাভ করিত না।

রামমোহন রায় ছিলেন মহর্ষির পিতৃবন্ধু। এই পিতৃবন্ধুর ভাব ও আদর্শ তাঁহার জীবনে অদৃশ্যভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভা সৃষ্টিকুশল। রাজার প্রবর্ত্তিত যে ঔপনিষদিক ধর্ম্ম—ভাবগত, ব্যক্তিগত, আলোচনাগত, ধারণাগত

ছিল, মহর্ষি তাহাকে সামাজিক রূপ দান করিলেন। কিন্তু তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। তিনি ধর্ম্ম-সংস্কারক।

ব্রাহ্ম সমাজের সুপ্রতিষ্ঠা তাঁহার অনন্যসাধারণ কীর্ত্তি।

তিনি স্রোতোবেগে কখনও ভাসিয়া যান নাই। তাঁহার বুদ্ধির মধ্যে বিচারশীলতা, ইচ্ছার মধ্যে অটলতা, এবং ঔদার্য্যের মধ্যে একটি আত্মসমাহিত ভাব ছিল।

পাশ্চাত্য ভাবের যে মোহ শিক্ষিত সমাজকে গ্রাস করিতেছিল, মহর্ষি সে মোহ হইতে মুক্ত ছিলেন।

নূতন তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীনকে অকারণে ধ্বংশ করিবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। কার্য্যে এবং চিন্তায় নূতন ও পুরাতনের মধ্যে তিনি এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

তিনি জ্ঞান ও সংস্কৃতির ভক্ত ছিলেন, তাই তাঁহার গৃহ প্রকর্ষের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে অষ্টাশীতিতম বর্ষ বয়সে মহর্ষি স্বর্গারোহণ করেন।

এই সঙ্কল্পে অটল, গম্ভীরপ্রকৃতি, প্রশান্তচিত্ত, জ্ঞান-পিপাসু, ধ্যানপরায়ণ, সৌন্দর্য্যপ্রিয় পুরুষ এক সমাহিত মহিমায় শ্রীমান ছিলেন।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

মানুষ গুটীপোকার মত; চিন্তার রস যতক্ষণ তাহার ভিভর গুপ্ত থাকে ততক্ষণ তাহার কোনও মূল্য নাই। সেই অনন্তনিঃসৃত রসধারা যখন সংসারের আলোক ও বাতাসের স্পর্শে রূপান্তরিত হইয়া আপনার চারিদিকে কর্ম্মের সূত্র বয়ন করিয়া চলে তখনই তাহার সার্থকতা। মনঃশক্তি মাত্র লইয়া মানুষ বড় নয়, সেই শক্তি প্রকাশের মধ্যেই তাহার মহত্ত্ব।

* * *

মানুষের সভ্যতা ঐখানেই, চিন্তাকে কর্ম্মে অভিব্যক্ত করা; সে চিন্তা নেপোলিয়ানের ব্যূহরচনাতেই ফুটিয়া উঠুক, অথবা কালিদাসের কাব্যরচনাতেই ব্যক্ত হউক। কল্পলোকে যে প্রতীক্ষা করিয়া ছিল, কর্ম্মলোকে তাহাকে চরিতার্থ করিতে হইবে। যাহা চঞ্চল, যাহা ক্ষণিক, যাহা মানস, যাহা অদৃশ্য, তাহাকে বহির্জগতে বিধৃত করিয়া চিরন্তন এবং ইন্দ্রিয়গোচর করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং ধারণাকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে।

* * *

এমনি করিয়া, দেখিতে পাই, চিন্তা ধীরে ধীরে সাধনার ভিতর দিয়া কর্ম্মরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিন্তাহীন কর্ম্ম অথবা অমূর্ত্ত ভাবের সাক্ষাৎ লাভের সম্ভাবনা এ-সংসারে নাই। তবুও কিন্তু আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, ঐ লোকটা কর্ম্মী, ঐ লোকটা চিন্তাবীর। এমনটা না বলিলে চলে না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই কথাগুলি শুধু আমাদের আলোচনার সুবিধা করিয়া দেয় মাত্র। মূলতঃ ঐ ভাবুকের সহিত ঐ কর্ম্মীর কোনও প্রভেদ নাই। কর্ম্মের অন্তরালে চিন্তা না

থাকিলে কর্ম্মী দাঁড়াইত কোথায়? এবং ভাব ও ভাবনাসমূহ কর্ম্মরূপে আত্মপ্রকাশ না করিলে ঐ চিন্তাবীরকে চিনিত কে? নিউটন বা জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক বটে, কিন্তু তাঁহারা ভাবুক না কর্ম্মী?

* * *

সবলোকই কায করে, তাই বলিয়া ত সকলকেই আর কর্ম্মী বলা চলে না। সংসারের পনের-আনা তিন-পাই লোক না ভাবিয়া খাটিয়া যায়। বাকি এক পাই তাহাদের জন্য ভাবিয়া দেয়। এই যে নিতান্ত অল্প কয়েকজন সংসারের অধিকাংশের জন্য ভাবিয়া দেন, এই চিন্তাসম্বল অল্পসংখ্যকের কাহাকেও বলি কর্ম্মী কাহাকেও বলি ভাবুক। তবে এমন হইতে পারে যে, যাহাকে বলি কর্ম্মী তিনি হয় ত সন্তুষ্ট আছেন বর্ত্তমানের ভাবনা লইয়া, আর যিনি ভাবুক তাঁহার চিন্তা ব্যাপিয়া আছে অস্ফুট অতীত হইতে অন্ধকার ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, যাঁহার মানস কল্পনা প্রায় অমিশ্র ভাবরূপেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তাঁহাকে বলি ভাবুক, যেমন কবি। আর যাঁহার চিন্তার শক্তি বাহিরের সংস্পর্শে রূপান্তরিত হইয়া বাস্তবের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে তাঁহাকে বলি কর্ম্মী।

—আগামী সংখ্যায়—

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর

বৌভাত

দিন-পঞ্জী

বোম্বাই, ২৩শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য দ্বিপ্রহরে শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসু "গাঙ্গে" নামক জাহাজে বোম্বাই পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাত্রার পূর্ব্বে সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকটে তিনি বলেন, আমার পরিবার আমার রক্তসম্পর্কীয়গণকে লইয়াই নহে, আমার দেশ লইয়া আমার পরিবার। আমি যখন আমার ক্ষুদ্র জীবন চিরকালের জন্য আমার দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত করিয়াছি, তখন আমার মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখার অধিকার আমার নিকটতম আত্মীয়গণের যেরূপ, আমার দেশবাসীরও সেইরূপ আছে।

টোকিও, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—সমর বিভাগ ঘোষণা করিতেছেন, জাপানের সৈন্যদল অদ্য জেহল আক্রমণ আরম্ভ করিবে।

নয়াদিল্লী, ২৭শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকার সময় ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন স্থগিত থাকে। বাবু গয়াপ্রসাদ সিংহের অস্পৃশ্যতা বিরোধী বিলের আলোচনা অদ্য উঠিতে পারে নাই।

বার্লিন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী—'রিষ্টাগ'এ আগুন লাগিয়াছে। সমগ্র পরিষৎ গৃহটি অগ্নি কবলিত। পুলিশ বলিতেছে, কমিউনিষ্টগণই এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী। কেহ কেহ মনে করে, দায়িত্বজ্ঞানহীন নাজিরাই এই অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করিয়া-

ছিল। এতৎ সম্পর্কে একজন হল্যাণ্ড হইতে আগত কমিউনিষ্টকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ভন গায়েবং রিষ্ট্যাগের সমস্ত কমিউনিষ্ট সভ্যদিগকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিয়াছেন। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১০০ জন হইবে।

বার্লিন, ১লা মার্চ্চ—বহু সংখ্যক বিদেশীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রুষ ও ভারতবাসীও আছে। গত রাত্রি হইতে বার্লিনে এ পর্য্যন্ত ২৬০ জন কমিউনিষ্টকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, প্রুসিয়ার কয়েকটি সহরে আরও ৬০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

দিল্লী, ১লা মার্চ্চ—অদ্য প্রাতে হিন্দু কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকের এক সভায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন যে, আমি যদি একদিনের জন্যও দেশের ডিক্টেটার হইতাম, তাহা হইলে বিভিন্ন আইন কলেজ ভূমিসাৎ করিতাম ও তাহার দ্বারা ভারতের অগণিত পুষ্পসদৃশ যুবককে অকালে শুকাইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করিতাম।

আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে
আর ইনজেক্‌সান লইতে হইবে না
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

যে পড়িতে শিখিবে, যে পড়িতে শিখিতেছে,
যে পড়িতে শিখিয়াছে
সব ছেলে-মেয়ের মনের মতন বই
লালকালো
শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত ও শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন চিত্রিত
আবালবৃদ্ধবনিতার মনোহরণ করিবে

ছড়ায় গানে রেখায় লেখায় অতুলনীয়
বহুবর্ণের বহুচিত্রে সমুজ্জ্বল। অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার
শিশু সাহিত্যে এক ও অদ্বিতীয় পুস্তক
মূল্য দুই টাকা
এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ছোট গল্প

১ম বর্ষ] ১৩ই ফাল্গুন ১৩৩৯ [৩৩শ সংখ্যা

শেষ পৃষ্ঠা

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

আত্মীয়তা কাহারও সহিত কিছু নাই, গ্রাম-সম্পর্কে অনেকেই তাঁহাকে কাকাবাবু বলিয়া ডাকিত। কোথাও কোথাও তিনি মাষ্টার মশাই বলিয়া পরিচিত। ভদ্রলোকটির বয়স চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে, বেশ বলিষ্ঠ, সুপুরুষ এবং সদালাপী। বিবাহ তিনি করেন নাই, কোনোদিনই করিবেন না। আগে অবস্থা খুব ভালই ছিল, আজকাল এ বাজারেও তিনি যথেষ্ট অবস্থাপন্ন। গ্রামে থাকিতে বহু পরিবারের সুখ-দুঃখের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন, জ্ঞানী ও শিক্ষিত বলিয়া তাঁহার গৌরব সকলের কাছেই সমান। গৃহস্থগণের বধূ ও কন্যা,

ছেলে-ছোক্‌রা, প্রৌঢ় ও প্রবীণ সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ করিত, তাঁহার মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী চলিত, তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত এবং ভালবাসিত। বিপন্ন ও দুঃস্থকে সাহায্য করাটা ছিল তাঁর সকলের চেয়ে বড় গুণ। তাঁহার সৎ চরিত্রের দীপ্তি ও সৌরভ বাহিরকে প্লাবিত করিয়া অন্দরের একান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

তারপর কালক্রমে তাঁহাকে শহরে আসিতে হইল, শহরে আসিয়াও তিনি গ্রামের কথা ভুলিলেন না। গ্রামের ইস্কুলে, মন্দিরে, বারোয়ারিতে, লাইব্রেরীর নামে আজও তিনি নিয়মিত প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন; তাঁহার অকৃপণ দাক্ষিণ্যের ছায়ায় অনেকেই ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গ্রামের যে দুই চারি ঘর পরিবার গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়া বাস করিতেছে তাহাদের সংবাদ তিনি যথেষ্টই রাখেন। বিশেষ করিয়া মিত্র পরিবারের বড় মেয়েটির যে-ঘরে বিবাহ হইয়াছে তাহার খবর তাঁহার কাছে নিত্যই আসে। মেয়েটির নাম বিজয়া; সে এখন দু'তিনটি সন্তানের জননী।

একদিন শীতের সন্ধ্যায়, তখন খোলা জানালার ভিতরে ও বাহিরে অন্ধকার দল পাকাইতেছিল, ঘরের ভিতরটা নিস্তব্ধ, কেবল একটা টাইম্‌-পিস্‌ ঘড়িতে টিক্‌ টিক্‌ করিয়া শব্দ হইতেছে,—ভিতরের নিঃশব্দতা ভঙ্গ করিয়া বিজয়া কথা কহিয়া উঠিল, 'মৃণালকে ত আজ তাঁরা দেখে গেলেন!'

একই বিছানায় বিজয়ার বাঁ-পাশে মাষ্টার মশাই অনেকক্ষণ হইতে স্থির হইয়া শুইয়াছিলেন।

'বুঝলেন কাকাবাবু, মৃণালকে আজ তাঁরা—

'বেশ বেশ—' বলিয়া মাষ্টার মশাই একটু নড়িয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'এবার একটা তারিখ ঠিক করে ফেল মা, এই শীতেই,—আর হ্যাঁ, মৃণাল যেন বুঝতে না পারে তার বিয়েতে ঘটা হচ্ছে না। ঘটা করেই তার বিয়ে দিতে হবে।'

'সে ত আপনি দেবেনই কাকাবাবু, আপনি না থাকলে মৃণালদের অবস্থা যে কী হতো তা ভাবলেও—'

আবার অনেকক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। বিজয়া একবার উঠিয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল, সুন্দর ও সুসজ্জিত ঘরখানি ঝলমল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বিজয়া আবার আসিয়া লেপের ভিতর প্রবেশ করিল।

'মৃণাল যে-রকম চমৎকার মেয়ে, বিয়ের পর স্বামীকে নিশ্চয় সুখী করবে, কি বল বিজয়া?'

'যদি স্বামীর মত স্বামী হয়!'

'তা নিশ্চয়ই হবে। এ গ'ড়ে তুলবে ওকে, ও তুলবে একে। বিয়ের মানেই ত এই। তা ছাড়া মৃণাল লেখাপড়া জানে, গত বছর আই-এ পাশ করেছে!'

বিজয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর গলা পরিষ্কার করিয়া কহিল, 'আচ্ছা কাকাবাবু?'

'কি মা?'

'ধরুন এর সঙ্গে যদি মৃণালের বিয়ে না হয় ?'

'কেন, এ পাত্র ত ভালই, এত বড় একজন ডাক্তার, এত পসার, সুপুরুষ—'

'যদিই ধরুন না হয় ?'

মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'অবশ্য মৃণালকে আমি অল্পদিনই চিনি, আমি জানিনে কেমন পাত্রের সঙ্গে তাকে মানাবে। যদি এর সঙ্গে না হয় আবার অন্য পাত্র খুঁজে আনব !'

বিজয়া এবার আর কথা কহিল না। মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'বুঝলে বিজয়া, মনের মত পাত্রের সঙ্গে মৃণালের বিয়ে দিতেই হবে,—হ্যাঁ, মৃণালকে আমি ত ঠিক বুঝতে পারিনি, তুমিই তাকে জানো,—ঠিক পাত্রটি না পাওয়া পর্য্যন্ত—'

'কাকাবাবু ?—আচ্ছা, একটা কথা আপনি মানেন ?'

'কি বল ত ?'

'আমরা ছেলের দিকটাই দেখি, মেয়ের দিকটা দেখিনে। মৃণালের মতামত শুনলে আপনি রাগ করবেন কাকাবাবু ?'

মাষ্টার মশাই ঘাড় তুলিলেন, বলিলেন, 'রাগ করব ? তুমি এখনো আমাকে চিন্‌লে না মা, মেয়েদের মতামতের স্বাতন্ত্র্য থাকলেই আমি খুসী হয়ে কান পেতে শুনি।'

বিজয়া স্মিতমুখে কহিল, 'ও পাত্রকে বিয়ে করা মৃণালের মত নয় !'

'ও। পাত্র কি তার অযোগ্য ?'

'একটুও অযোগ্য নয়, অমন স্বামী হলে যে-কোনো মেয়েই সুখী হয়। কিন্তু—কিন্তু মৃণালের মত নেই।'

মাষ্টার মশাই নিঃশব্দে বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন, 'বেশ, আবার আমি চেষ্টা করি, আর একটি ভাল পাত্র আমার সন্ধানে আছে, যত টাকাই লাগুক...... আমার দ্বারায় যতটুকু সম্ভব হয়......বুঝলে বিজয়া, মৃণাল যেন সুখী হয়!' বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ একটু হাসিলেন, 'আমার বয়েসটা এতদূরে এসে পড়েচে যে পিছন দিকে দূরে আর কিছুই দেখতেই পাইনে, ঝাপসা দৃষ্টি, সহজ কথাটা সোজা করে বুঝতে পারাটা —'

তিনি হাসিলেন বটে কিন্তু বিজয়া হাসিতে পারিল না; এই মানুষটিকে সে চিরদিন শ্রদ্ধা করিয়াছে, আপন-জনের মত ভালবাসিয়াছে, গ্রামে থাকিতে তাহার প্রতি কাকাবাবুর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব লইয়া কতজনে কতদিন ঈর্ষা করিয়াছে ফুল আনিয়া কাকাবাবুর পূজার ঘর সাজাইয়া দিত বলিয়া অনেকে ঠাট্টা করিয়া বলিত, অত খোসামোদ করিসনে বিজয়া, ভয় নেই, কাকাবাবু তোর ভাল বরই এনে দেবেন। সত্যই তাই, স্বামীর মত স্বামীর হাতেই বিজয়া পড়িয়াছে। বিপদে, সম্পদে, দুর্ভোগে, পীড়নে—তাহার ছিল এই পরম শ্রদ্ধেয় পরমাত্মীয়টি, আজও তাহাদের সম্পর্ক অটুট আছে।

অথচ এই মানুষটিকেই সে কোনোদিন বুঝিতে পারিল না। এত ঘনিষ্ঠতা, এত বন্ধুতা,—বছরের পর বছর ধরিয়া

তাহারা পাশাপাশি বাস করিয়া আসিয়াছে, অনর্গল অবিশ্রান্ত আলাপ করিয়াছে, কিন্তু তাহার এই কাকাবাবুটিকে কোথায় যেন সে ধরিতে ছুঁইতে পারে নাই। কাকাবাবু সংসারী নন্, সন্ন্যাসীও নহেন—তবু মানুষের ঘন-জটলার মধ্যে চিরদিন বাস করিয়াও তিনি যেন সকলের নিকটেই দুর্লভ, একটি সুদূর ঔদাসিন্যের ওপারে তাঁহার আসন, বহু মানুষের একান্ত অন্তরঙ্গ বলিয়াই তাঁহাকে একান্ত করিয়া করতলগত করা যায় না, নিজেকে লইয়া নিজের মধ্যেই তিনি বাস করেন. অভিযোগ-অনুযোগ করিলে স্নেহার্দ্র কোমল হাসিটি দিয়া তিনি সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দেন। এমনিই তাহার কাকাবাবুটি।

সেদিনকার মত বিজয়ার নিকট বিদায় লইয়া মাষ্টার মশাই ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তিনি আর কোথাও থাকেন না, তাঁহার একাকী ঘরখানি তাঁহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে আকর্ষণ করিতে থাকে। অন্দরের জীবনের সহিত তাঁহার বাহিরের জীবনের বিশেষ মিল নাই। অত বড় বাড়ীর যে দিকটায় তিনি বাস করেন সেদিকে কেহ পা মাড়াইতে সাহস করে না, সেখানে কোথাও কোলাহল ও সাড়াশব্দ নাই,—এমনিই তার একটা শ্বাসরোধক আবহাওয়া যে উঁকি মারিতেও গা ছমছম করে।

মাষ্টার মশাইয়ের মা আছেন, বড় ভাই একজন আছেন, তাঁহারা থাকেন পাশের বাড়ীতে, নিতান্তই সংসারী মানুষ তাঁহারা—তাঁহাদের সহিত মাষ্টার মশাইয়ের কোনো ব্যবহারিক সম্পর্ক নাই, কোনোদিনই ছিল না। মৃত্যুপুরীর মত তাঁহার মহলটা নির্ব্বাক ও নিঃসঙ্গ, সেখানে কেহ নিশ্বাস ফেলিলে তাহার শব্দ হয়।

রাত্রি অল্পই হইয়াছিল, সবেমাত্র গায়ে একখানি র‍্যাপার জড়াইয়া তিনি টেব্‌ল্‌-ল্যাম্পটি জ্বালাইয়া বিছানার উপর বসিয়া একখানি বই খুলিয়াছিলেন, এমন সময় দরজার বাহিরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। আলো পার হইয়া ওদিকে অন্ধকারে তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত হইল না, বইয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়াই তিনি কহিলেন, 'চন্দর বুঝি? ঠাকুরকে বলে দিও রাত্রে আমি আর খাবো না।'

'চন্দর নয়, আমি এলাম।'

মাষ্টার মশাই মুখ তুলিয়া দেখিলেন, মৃণাল ততক্ষণে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি ব্যস্ত হইলেন না, শুধু হাসিয়া বলিলেন, 'এসো মৃণাল, এসো—এমন অসময়ে যে?'

'দিদিমার সঙ্গে এসেছিলাম আপনাদের ওবাড়ীতে, দিদিমা এখনো গল্প করচেন ওদিকে বসে।'

বিছানার একটা দিকে দেখাইয়া মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'বসো এইখানে,—গল্প শুনতে ভাল লাগল না বুঝি? কিন্তু আমার এখানে খুসী হবার মত কিছু দেখতে পাবে না ত?

তোমাদের মনের সঙ্গে আমার বাঁচার পদ্ধতিটা মিলবে না মৃণাল,—এ বইগুলো কি জানো ত?' বলিয়া তিনি আবার একটু হাসি হাসিলেন, বলিলেন, 'যে বইগুলো পড়তে পড়তে আমার চুল পাক্‌ল, সেগুলোর কতকগুলো হচ্চে সাহিত্য আর ফিলসফি, কিন্তু সেগুলো এ নয়, এগুলো অন্য জাতের।'

মৃণাল একটু কৌতুক অনুভব করিয়া কহিল, 'কি বলুন ত এসব?'

মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'বিয়ের উপহার নয়। এখানা হচ্ছে বিবেকানন্দের জীবন চরিত, এখানা শ্রীঅরবিন্দের গীতার ব্যাখ্যা, আর এখানা—'

'রবিবাবুর বই পড়েন না?'

'পড়তাম, এখন আর পড়িনে। এখন আত্মার আনন্দ আর চাইনে, এখন চাই নির্ব্বাণ!'

'গীতায় কি নির্ব্বাণের কথা পাবেন?'

'সে জন্যে ত গীতা পড়িনে মৃণাল, আমি শুধু পথ খুঁজে বেড়াই।' বলিয়া মাষ্টার মশাই ডান হাত বাড়াইয়া সুইচটা টিপিয়া মাথার উপরের আলোটা জ্বালিয়া দিলেন।

মৃণাল একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, তারপর কহিল, 'বেশি আলো আমার খুব ভাল লাগে......বাবারে, কোথাও টুঁ শব্দটি নেই, আপনি এমনি একলা থাকেন? থাকেন কেমন করে?'

মাষ্টার মশাই হাসিলেন, এবং তাহার কথা চাপিয়া অন্য কথা পাড়িয়া বলিলেন 'তুমি এসে ভালই করেছ মৃণাল, ভাবছিলাম চন্দরকে দিয়ে তোমার কাছে একটা খবর পাঠাবো। একটু আগে আমি বিজয়ার কাছ থেকে আসচি।' বলিয়া তিনি একটু থামিলেন, তারপর বলিলেন, 'তার কাছে আজ তোমার কথাই হচ্ছিল—'

মৃণাল মাথা হেঁট করিয়া রহিল। মাষ্টার মশাই বোধ করি গুছাইয়া বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মৃণাল বাধা দিল, কহিল, 'আমিও আপনাকে সেই কথাই বলতে এসেছিলাম।'

'কি বল ?'

গলা পরিষ্কার করিয়া মৃণাল কহিল, 'এদিকে এখন কেউ নেই . . আপনাকে আমি লজ্জা করব না,—বলচি, আপনি আর আমার জন্যে চেষ্টা করবেন না।'

মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'এ কথা তুমি কেন ভাবচ মৃণাল যে, আমার পরিশ্রম হবে ? তোমার বিয়ে দেওয়া, সেই আমার বড় কাজ, বড় আনন্দ !'

মৃণালের কণ্ঠে এবার একটু দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল, 'তা হোক, তবু আপনি আজ থেকে নিরস্ত হোন্। বিজয়াদিকেও আমি সেই কথা বলে এসেচি।'

মাষ্টার মশাই কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন ,'তুমি কি এখন বিবাহ করতে চাও না ?'

মুখের উপর মৃণালের একটা লজ্জার আভাস খেলিয়া গেল। বলিল, 'বিজয়াদিকে আমি বলেচি।'

মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'কত ছেলেমেয়ে দেখলাম, দেখতে দেখতে চুল পাক্‌ল। অল্পদিন হলেও তোমার সঙ্গে আমার যথেষ্টই ঘনিষ্ঠতা হয়েচে। এই দেখ না, একটু আগে পর্য্যন্তও আমার ধারণা ছিল—'

মৃণাল মুখ তুলিয়া তাকাইল।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই, ভেবেছিলাম তোমার মত শান্ত আর নিরীহ মেয়ে বুঝি আর কখনো দেখিনি, এখন মনে হচ্ছে অন্য কথা!'

'কি বলুন ত?' মৃণাল হাসিয়া কহিল।

'মনে হচ্ছে এক জায়গায় তুমি ইস্পাতের মত কঠিন,—দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, অটল মতামত,—বাস্তবিক, তোমার মত মেয়ে আমি দেখিনি। মেয়েদের মনে আসল মানুষটা কোথায় থাকে, কখন সে দেখা দেয়, আজ অবধি বুঝলাম না।'

'বোঝবার ত আপনি চেষ্টা করেন নি কোনোদিন?'

'সত্যি বটে, তা করিনি, ওপরটা দেখে ভিতরটাকে চিনতে চেয়েচি। আর কি জানো মৃণাল, মেয়েদের আমি চিরদিন স্নেহও করি, ভালও বাসি, কিন্তু বিচার করে দেখিনি। স্নেহ-ভালবাসা বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়!'

দুইজনে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন, কাহারও মুখে কোনো কথা সহসা আসিতেছিল না। কিন্তু মাষ্টার

মশাই নিজেই সেই নীরবতা ভাঙিয়া দিলেন। বলিলেন, 'কিন্তু মৃণাল, বিয়ে কেন করতে চাও না—তা ত কই বললে না?'

মৃণাল মাথা তুলিয়া কহিল, 'সে কি আপনি শুনতে চান? বহুলোক নিয়ে আপনার কারবার, অনেক লোকের মধ্যে আপনার গতিবিধি, আমার কথা শোনবার সময় কই আপনার?'

'এই কি তোমার ধারণা মৃণাল?'

'নিশ্চয়, এই আমার বিশ্বাস। রাসভারি লোক বলে সবাই আপনাকে সমীহ করে, আপনার চারিদিকে ভয়ের গণ্ডী; সবাই থাকে আপনার কাছে, আপনি থাকেন দূরে,—তার মধ্যে আমি আপনার কাছে ভিক্ষে চাইতে আসিনে।' বলিতে বলিতে মৃণালের গলা ধরিয়া আসিল।

মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'ভিক্ষে কি মৃণাল?'

'ভিক্ষে, একশোবার ভিক্ষে। আমি দরিদ্র হতে পারি কিন্তু কাঙাল নই। সবাইকে আপনি যা দান করেন আপনার সে-দান আমি ছুঁতেও চাইনে।'

মাষ্টার মশাই বলিলেন, 'কি আশ্চর্য্য!' বলিয়া স্নিগ্ধ হাসি হাসিলেন, পুনরায় কহিলেন, 'আমি শুনতে চাই এক কথা, তুমি বলতে চাইচ আর এক কথা! কী অপরাধ তোমার কাছে করেচি মৃণাল?'

মৃণালের চোখে বোধ হয় জল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে কথা বলিল না। মাষ্টার মশাই বিছানায় আড় হইয়া হইয়া পড়িয়া কহিলেন, 'যাদের চুল পাকে তারা জ্ঞান সঞ্চয় করে বটে, কিন্তু সেই পরিমাণে বুদ্ধি হারায়। বুদ্ধির খেলা যৌবনে। আচ্ছা বল মৃণাল, বল, তোমার কথাটা শুনতেই বোধ হয় আমার বাকি, তারপরেই বানপ্রস্থ নিয়ে বনে যাবো।' বলিয়া অতি স্নেহে ও মমতায় তিনি মৃণালের একটি হাত ধরিলেন।

হাতটা মৃণাল ছাড়াইয়া লইল তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কি এক অস্বাভাবিক কণ্ঠে কহিল, 'বলতে আমার একটুও দ্বিধা নেই আপনাকে, বলব বলেই আসি, কিন্তু বলবার সুযোগ না পেয়ে চলে যাই।' বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

চাকরের হাতে চিঠি দিয়া বিজয়া ডাকিতে পাঠাইয়াছিল, মাষ্টার মশাই যখন আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন রৌদ্র ম্লান হইয়া আসিয়াছে। স্বামী এখনও আসিয়া পৌঁছান নাই, ছেলে-মেয়েরা বাহিরে খেলা করিতেছিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া প্রথমেই মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'আর শুনেচ বিজয়া, মৃণালের এখন বিয়েতে মত নেই?'

'ও একটা পাগল কাকাবাবু, মত ওর কোনোদিনই নেই!'

'থাকলেই কিন্তু ভাল হ'তো বিজয়া, আমি ছুটি পেতাম, ওর কাজ শেষ না করতে পারলে আমার স্বস্তি নেই।'

বিজয়া কহিল, 'আমার এখানে আজ সকালেও এসেছিল, আবার আসবে বলে গেছে।' বলিয়া সে ভিতরে ঢুকিয়া তাহার কাকাবাবুর কাছে আসিয়া বসিল।

'যে-চেহারা আমি তার দেখলাম তাতে তুমিও অবাক হয়ে যেতে বিজয়া। মেয়েদের মনের বাঁধন পুরুষের চেয়ে অনেক শক্ত। বিয়ের কথাটা সে হেসে প্রত্যাখ্যান করে দিল। আচ্ছা, মৃণালের আসল কথাটা কি বল ত? এখনকার শিক্ষিত মেয়েরা কি বিয়েটাকে উড়িয়ে দিতে চায়?'—মাষ্টার মশাই মুখ ফিরাইয়া তাহার মুখের উপর চোখ রাখিলেন।

'মোটেই না কাকাবাবু।' বলিয়া বিজয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

'শুনতে পাই বিয়ের আগেই অনেক মেয়ের সঙ্গে অনেক ছেলের ভাব হয়, ওই তোমরা যাকে বলো ভালবাসা, এ রকম একটা কিছু ঘটনা মৃণালের ঘটেনি ত?' বলিয়া মাষ্টার মশাই হাসিতে লাগিলেন, 'মৃণালের চেহারা দেখে আমি নিজের মতামত একটু বদ্‌লেছি বিজয়া, ও মেয়েটি শতকরা নিরেনব্বই জন মেয়ের মধ্যে পড়ে না!'

বিজয়া কহিল, 'মৃণাল আমাকে সব কথা বলেচে কাকাবাবু, কিন্তু আপনার কাছে সে সব প্রকাশ করা বড় কঠিন।'

'তা হলে বোলো না মা, সব কথাই শুন্‌তে নেই, মেয়েমানুষের মনের কথা অতি নিকট আত্মীয়ের কাছেও প্রকাশ করা চলে না।'

'আপনাকে যে বলতেই হবে কাকাবাবু!'

'আমাকে? কেন মা?'

বিজয়া কহিল, 'আপনাকে বলতেই হবে, যে-কথাটা অনেকদিন মৃণাল আপনার কাছে প্রকাশ করতে পারেনি সে আপনাকে শুনতেই হবে, এই তার অনুরোধ, এই তার দাবি। কী অবস্থায় পড়লে যে মেয়েমানুষের বুক ফাটে, তা আপনি জানেন কাকাবাবু।'

'কী সে বল ত বিজয়া?'

বিজয়া কহিল, 'মৃণালের বিয়ে হয়ে গেছে!'

মাষ্টার মশাই সবিস্ময়ে তাহার দিকে তাকাইলেন। বলিলেন 'ও, তাই নাকি?'—একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিলেন, 'বেশ, বেশ!'

'কার সঙ্গে হয়েচে তাও আপনাকে শুনে যেতে হবে কাকাবাবু।'

মাষ্টার মশাই হাসিয়া কহিলেন, 'নিশ্চয়, স্বামী স্ত্রীকে নেমন্তন্ন করে আশীর্ব্বাদ করে যাবো যে, বল।'

এবারে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া বিজয়া শেষ কথাটা বলিয়া ফেলিল, 'আপনি হচ্ছেন তার স্বামী কাকাবাবু।'

নিজের দিকে আঙুল দেখাইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কাকাবাবু কহিলেন, 'আমি ? হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, মেয়েরা আজকাল রসচর্চ্চা করচে দেখচি ; মাথার যে দিকটায় চুল পেকেছে, তার ওপর একটু কলপ লাগিয়ে আসি, কি বল বিজয়া ?'

বিজয়ার বুকের ভিতরটায় ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল, সে কথা কহিল না। একটা হাত তাহার গলার উপর রাখিয়া অন্য হাতে তাহার মুখখানি সস্নেহে তুলিয়া ধরিয়া কাকাবাবু কহিলেন, 'মা লক্ষ্মী, চুপ করে রইলে যে ? এ রকম ছেলেমানুষী কি তোমাকে মানায় ?'

'আমি ছেলেমানুষী করিনি কাকাবাবু, মৃণাল মনে মনে অনেকদিন থেকে আপনাকে—'

'মনে মনে, মৃণাল, আমাকে—' আবার উচ্চকণ্ঠে তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং হাসি থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, মৃণাল নিঃশব্দে ঘরের ভিতর ঢুকিতেছে।

ভিতরের বাতাসটা যেন থম থম করিয়া উঠিল। মাষ্টার মশাই প্রথমেই কথা বলিলেন, 'মৃণাল, তুমি ত একটি অদ্ভুত স্বামী নির্ব্বাচন করেছ দেখচি ? একেবারে মৌলিক আবিষ্কার! ইতিহাসের সংযুক্তাও তোমার কাছে হার

মানলেন! বেশ নতুন ঘটনা, কাগজে ছাপিয়ে দেবো নাকি?'—সকৌতুকে তিনি হাসিতে লাগিলেন।

কেহ কোনও কথা কহিল না, তিনি বলিতে লাগিলেন, 'ভাগ্যি ছোট ছেলেমেয়েরা এদিকে কেউ নেই, এমন একটা মজার গল্প শুনলে তারা—'

মৃণাল নতমস্তকে কহিল, 'আপনি হয়ত আমাকে ঘৃণা করবেন এর পর।'

'ঘৃণা? তোমাকে? কী আশ্চর্য্য!'

বিজয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। মাষ্টার মশাই গুছাইয়া বসিয়া কহিলেন, 'গল্পটা শুনতে বেশ আমোদ লাগচে, এ রকম আজগুবী চিন্তা কবে তোমার মাথায় ঢুক্‌ল মৃণাল? প্রথম দর্শনেই নিশ্চয় নয়?'

'আপনার বিদ্রূপ আমার একটুও লাগবে না। আমি জানি আমি কী করেচি।'

মাষ্টার মশাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, 'জীবনে চমকপ্রদ কল্পনাকে ঠাঁই দিওনা মৃণাল, তোমার পথ এখনো অনেক দূর। আজ আমার সমস্তটা মনে হচ্চে, ঠিক কথাটা আগে বুঝতে পারলে তোমাকে অনেক আগেই সাবধান করে দিতাম, আমি সব কথাই দেরিতে বুঝি—এ রকম ছেলেমানুষী ক'রো না মৃণাল। আমি চিরদিন বিধাতার দেওয়া অনেক আঘাত সহ্য করেচি, তোমার ঠাট্টাও আমার সয়ে যাবে আমি জানি,—কিন্তু তুমি নিজের মাথায়

এমন করে অভিশাপ নামিয়ে এনো না। ছি ছি, তোমরা আমার স্নেহের বস্তু, এমন করে আমাকে লজ্জা দিও না!'

মৃণাল কহিল, 'আমি জানি আপনি এমনি করেই আমাকে বলবেন।'

'এর চেয়েও বেশি করে বলব যদি দরকার হয়। আশা করি দরকার হবে না, তার আগেই তুমি নিজের ভুল শোধরাতে পারবে। তুমি দু'টো তিনটে পাশ করেছ, বিদ্যা ও জ্ঞান নিতান্ত সামান্য নয়, নিজের কথাও তুমি ভাবতে শিখেছ— এসব বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া কি ভাল? কবে থেকে তুমি আমাকে ভালবেসেচ, কি করেচ না করেচ সে আর আমি শুনতে চাই নে, এটা জেনে রেখো পরস্পরের সমান অনুভূতিতেই ভালবাসার বিকাশ, কিন্তু আমার সেদিকটা আজ আর বেঁচে নেই মৃণাল, তোমাকে সত্যিই বলচি। হ্যাঁ, ভাল কথা, আর কোথাও যেন এ কথা প্রচার না হয়, ইতিমধ্যে ওই পাত্রটির সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলি, তুমি যেন বাধা দিও না।'

মৃণাল মৃদু কঠিন কণ্ঠে বলিল, 'আমাকে এমন করে অপমান করবেন না!'

'অপমান? অপমান ত তোমাকে করিনি?'

'বিয়ের চেষ্টা করার মানেই তাই, হিন্দুর মেয়েকে কি আপনি দ্বিচারিণী হতে বলেন? আমি কি এতই হেয়

আপনার চোখে ?'—বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা এইবার তাহার গাল বাহিয়া নামিয়া আসিল।

মাষ্টার মশাইয়ের যেন দম্ আট্‌কাইয়া আসিল। যে মেয়েটি ছিল তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের নিতান্ত একান্তে, আজ সেই যেন দুরন্ত ঝড়ের মত প্রবল হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'বিদেশ যাওয়ার সময় তুমি এরকম ব্যবহার আমার সঙ্গে না করলেই ভাল করতে মৃণাল।'

সাশ্রুনেত্রে মৃণাল কহিল, 'কবে যাবেন বিদেশে ?'

'কাল কিম্বা পরশু, যাবো হরিদ্বারে, অনেক দিনের জন্যে।'

'আমিও যেতে চাই আপনার সঙ্গে।'

'আমার সঙ্গে ? তুমি ? তার চেয়ে আত্মহত্যা করো মৃণাল।' বলিয়া মাষ্টার মশাই বাহির হইয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলেন।

বাহিরের ঘরের কাছে বিজয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল, কাকাবাবুকে বাহির হইতে দেখিয়া সে কহিল, 'আমি পড়েচি বিপদে কাকাবাবু, কি করি আমাকে বলে দিন।'

'কেন মা ?'—মাষ্টার মশাই দাঁড়াইলেন।

'একথা এতটুকু মিথ্যে নয়. আপনি ছাড়া মৃণালের আর কেউ নেই। এমন মেয়ে আজকাল হয় ? আমি ছাড়া আর কেউ জানে না, আপনি কী ওর কাছে! আপনার জীবনের

সঙ্গে ও নিজেকে একেবারে মিলিয়ে বসে রয়েচে, আপনার উপযুক্ত হয়ে ওঠাই ওর সব চেয়ে বড় সাধনা। কী ভালই ও বাসে আপনাকে! আমরা ওর নখের যুগ্যি নই!'

'এ আমার শান্তি বিজয়া।' বলিয়া মাষ্টার মশাই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে।

কেমন করিয়া তিনি পথ দিয়া চলিলেন, কত লোকের পাশ কাটাইয়া, কত মোড় ঘুরিয়া, কখন আসিয়া বাড়ী পৌঁছিলেন, ঘরে ঢুকিয়া কেমন করিয়া তিনি আলো জ্বালিলেন, তাহা কিছুই তাঁহার মনে নাই। ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া তিনি একটি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঘরটা যেন তাঁহার চোখের উপর দুলিতেছে।

কতক্ষণ বসিয়াছিলেন কে জানে, পায়ের শব্দে তাঁহার চমক ভাঙিল। বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, মৃণাল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভয়ে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। হঠাৎ তিনি ঠিক কী করিবেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অবশ্য ধৈর্য্য হারাইলেন না বটে, কিন্তু সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, 'আবার এসেচ?'

মৃণাল কহিল, 'হ্যাঁ। এসে আমি অন্যায় করিনি।'

'কেন এলে বল ত?'

'বলতে এলাম আপনার কোথাও যাওয়া হবে না।' বলিয়া মৃণাল কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

'সে কি, তুমি কি আমাকে বেঁধে রাখতে চাও?'

'যেতে আমি দেবো না আপনাকে।'

তাহার কণ্ঠে যেমন একটি সুস্পষ্ট দৃঢ়তা তেমনি গভীর আত্মপ্রত্যয়! মাষ্টার মশাই হাসিলেন, বলিলেন, 'আমার মনেও বন্ধন নেই, মনের বাইরেও বন্ধন নেই, তা জানো ত?'

মৃণাল কহিল, 'আমার মনের কথা শুনে নিয়ে আমাকে আপনি অশ্রদ্ধা করে চলে যাবেন, এ আমার সইবে না। আপনার কোথাও যাওয়া অসম্ভব।'

মাষ্টার মশাই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'তুমি যাও, যাও মৃণাল, তুমি আজ চলে যাও, আমাকে বাঁচাও।'—থর থর করিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল।

মৃণাল এক পাও পিছনে হটিল না, মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'আপনাকে বাঁচাবো কিন্তু আমি যাবো কোথায়? আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।'

'এ কী বিপদ মৃণাল? কি ভাগ্যি সাধারণ মেয়েরা তোমার মতন নয়, তাহলে পুরুষের জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠত। তুমি যাও, ছি, এসব ভাল নয়, নানা জনে নানা কথা বলতে পারে। মেয়েদের সম্বন্ধে অপবাদ লোকের ভারি রুচিকর। তুমি যাও।'

মৃণালের চোখে জল পড়িতে লাগিল কিন্তু সে উঠিল না। মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'এমন করে কবে থেকে তুমি আমাকে চুপি চুপি ভালবেসে আসচ শুনি? ভালবাসার সঙ্গে

এতখানি দৃঢ়তাই বা তুমি পেলে কোথায় ? যাও তুমি, মৃণাল। এ ত তোমার মোহ নয়, উচ্ছ্বাস নয়, সামান্য সস্তা ভালবাসার নেশাও নয়,—এ যে সত্যিই আর একটা কিছু ! তোমাকে দেখে ভাবচি, সত্যিকারের ভালবাসার জন্য আত্মসম্মান সহজেই খোয়ানো যায়। কিন্তু তুমি যাও মৃণাল, চলে যাও।' বলিতে বলিতে তিনি ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে লাগিলেন।

'আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে তোমার দেখা পাবো। তুমি এলে মৃত্যুর মত, নিয়তির মত। তুমি যখন এসে পৌঁছলে তখন আমার জীবনে বেজে উঠেচে ধ্বংশের বাজনা। তুমি যাও, তুমি যাও মৃণাল।'

মৃণাল তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'এখন আমি যাচ্ছি, কিন্তু জানবেন কোথাও আপনাকে আমি যেতে দেবো না। আমাকে ছেড়ে যাবার শক্তি অপনার একবিন্দুও নেই !' বলিয়া সে যেমন আসিয়াছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল।

* * *

'একে তুমি কী বলবে বিজয়া ?'—তৃতীয় দিন দুপুর বেলায় বন্ধ ঘরের ভিতর বসিয়া ডায়েরীর শেষ পৃষ্ঠায় মাষ্টার মশাই দ্রুতবেগে কলম চালাইতেছিলেন, 'বোধ হয় যাবার সময় সব চেয়ে বড় ভালবাসার সন্ধান পেয়ে গেলাম ! কিন্তু

আমার নিজের কথা? চল্লিশ পার হয়ে পঞ্চাশের দিকে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে চলেছি, পথ আর বাকি নেই। আমার সমস্ত আয়ুটা কেটে গেল উপবাসে। কী দিতে পারি মৃণালকে? কি আমার আছে?'

আবার তিনি লিখিতে লাগিলেন, 'কোথায় গেল আমার বাইশ বছরের যৌবন? কোথায় গেল পঁচিশ বছর? আমার বুকে ছিল অনন্ত আশা, অপরিমিত ভালবাসার আবেগ, সে-জীবন আমার কোথায় গেল? এই মৃণালের পায়ের শব্দের দিকে কান পেতে ছিলাম, মৃণাল আসেনি।

'কিছু মনে ক'রো না, এ আমার আত্মহত্যা নয়, দেহান্তর। আবার ফিরে এসে পথের ধারে দাঁড়িয়ে মৃণালকে চিনে নেবো। সেদিন হাতে থাকবে নতুন জীবন, নতুন দেহ, নতুন হৃদয়। আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ এবারের মত হারিয়ে ফেলেচি, সে আমার যৌবন। শ্মশানের পরে কি কেউ বাসা বাঁধে?

'জানি এখুনি তোমাদের আসবার কথা, আমারো তাই তাড়াতাড়ি, শেষের দিকটা অত্যন্ত সংক্ষেপে সেরে দিলাম। এত সমারোহে যার আরম্ভ, এত সহজে তার শেষ, এমনিই জীবন। আমাকে তোমরা ক্ষমা ক'রো। এই ডায়েরীর পাতাতেই তোমাদের জন্য শেষ আশীর্ব্বাদ রেখে যাই।'

* * *

দরজা ঠেলিয়া যখন বিজয়া ও মৃণাল ভিতরে ঢুকিল, দেখিল, সম্মুখে টেব্‌লের উপর একখানি ডায়েরীর খাতা, একটি ফাউণ্টেন্‌ পেন্‌, একটি ছোট্ট ঔষধের শিশি,—ও তাহাদেরই ওপাশে বিছানার উপর উপুড় হইয়া মাষ্টার মশাইয়ের মৃতদেহ !

প্রসঙ্গ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এস-সি, এ-আর-সি-এস (লণ্ডন)

ভারতের রত্ন

ভারতভূমি রত্নগর্ভা, একথা উচ্ছ্বাসের মুখে অনেকেই বলেছেন, অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু রত্ন বলতে কেউ বোঝেন লেখক বা বক্তা কেউ বোঝেন কবি! রত্নের মূল অর্থে এই প্রবাদটির ব্যবহার বড় বেশী হয় না। হ'লেও গোলকোণ্ডার হীরকই একমাত্র উদাহরণ দেওয়া হয়। কিন্তু রত্ন অর্থে খনিজ সম্পদের কথা বললে যে এই প্রবাদটি কতদূর সত্য, সে কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না।

* * *

প্রকৃত রত্নের মধ্যে ব্রহ্মদেশের নীলকান্তমণি ও পদ্মরাগ ভুবনবিখ্যাত। কিন্তু সে রত্নের আহরণের একচেটিয়া অধিকার একমাত্র একটি ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে। অন্য রত্নের আকর এদেশে বিশেষ নাই, হীরক ও মরকত মাঝে মাঝে পাওয়া যায় মাত্র। অনেক উপরত্নই এদেশে এবং সিংহলে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলির দাম বা চাহিদা কোনটিই বিশেষ নাই

ধাতুর মধ্যে নিকেল ভিন্ন অন্য সকলগুলিই এদেশে অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। কিন্তু লাভজনক খনি যে কয়টি আছে

সে সবই বিদেশীর হাতে, একমাত্র টাটা কোম্পানির লোহার খনি ও কারখানা এদেশীয়দের অধিকারে আছে, কিন্তু তাহাও এখন বিদেশী বণিক-সঙ্ঘের পদানত। সোণার খনির মধ্যে মহীশূরের কোলার ক্ষেত্র প্রসিদ্ধ, সেখানে বৎসরে প্রায় ৪৫০ মণ সোণা ওঠে, কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ বিদেশীর অধিকারে। তাম্রের খনি এদেশে একটি ও ব্রহ্মে আর একটি আছে, দুটিই ইংরাজের অধিকারে। টিন, সীসা, দস্তা, রৌপ্য, উলফ্রাম—এ কয়টির বিরাট আকর ব্রহ্মদেশে আছে এবং সব কয়টিই ইংরাজ কোম্পানির হাতে।

* * *

এদেশের খনিজের মধ্যে ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোম, ও অভ্র জগৎশ্রেষ্ঠ। এই তিনটির মধ্যে প্রথমটি এখন প্রায় সম্পূর্ণই বিদেশীর হাতে, দ্বিতীয়টির কিছু অংশ দেশীয়দের অধিকারে আছে, তৃতীয়টি (অভ্র) আট দশ বৎসর আগেও ভারতীয়দের অধিকারে ছিল, কিন্তু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদিগের ভেজালের চোটে এখন সম্পূর্ণরূপে ইংরাজেরই আয়ত্ত হয়ে গেছে।

খনিজ তৈল (কেরাসিন জাতীয়) এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খনিজসম্পদ বলে পরিচিত। আসামে, পঞ্জাবে, সিন্ধুদেশে ব্রহ্মদেশে এ জিনিষ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে, কিন্তু দুই একটি ছোট খনি বাদে এখন প্রায় সবই বিদেশীর অধিকারে।

* * *

কয়লার কথা প্রায় সকলেই জানেন। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে এদেশে কিরকম বিশাল কয়লার-খনির ক্ষেত্র রয়েছে। কিন্তু এ ব্যবসায় এখন প্রায় সম্পূর্ণই বিদেশীর হাতে। শ্রেষ্ঠ খনিগুলির মধ্যে যে-কয়টি এদেশীয়দের হাতে ছিল সে-সবই এক এক করে বিদেশীর হাতে যাচ্ছে। আরো বিপদের কথা এই যে, যে-সব বিরাট ক্ষেত্রে ভাল খনি হওয়া সম্ভব সেগুলিরও অধিকার ক্রমে ক্রমে ইংরেজের হাতেই যাচ্ছে।

চূণ, সিমেণ্ট ইত্যাদির শ্রেষ্ঠ আকরগুলি এখন বিদেশীর করতলগত হয়ে গেছে। চীনামাটি, গিরিমাটি ইত্যাদিরও প্রায় সেই অবস্থা।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গত ছয় সাত বৎসরের মধ্যে এই বিদেশীর প্রভাবের বিস্তার প্রায় দশগুণ হয়েছে। ইহার কারণ 'দেশনেতা'দিগের এই বিষয়ে অজ্ঞতা এবং এদেশের লোকের এ বিষয়ে শিক্ষার অভাব। দেশের লোক শিক্ষিত হ'লে দেশপ্রতিনিধি হিসাবে উকীলের দলের মধ্যে দুচারজন এই বিষয়ে জ্ঞানী লোকেরও স্থান হ'ত।

চিত্র ও চরিত্র

হেমচন্দ্র

যাঁহার কাব্যের ব্যাকুল-গম্ভীর শঙ্খধ্বনিতে দেশপ্রেমের গঙ্গা বঙ্গভূমির প্রান্তরে নগরে মুক্তধারায় অবতীর্ণ হইয়া দিকে দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহারই উচ্ছ্বসিত স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আজ সেই ভাবধারার ভগীরথকে ভুলিতে বসিয়াছি। হেমচন্দ্র ভারতের জাতীয়তার অবিনশ্বর কবি।

১৮৩৮ সাল স্মরণীয় বৎসর। সাহিত্যের অতুলনীয় পুরুষ, বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্রের ইহা জন্ম-বৎসর। দেশ-মাতৃকার আর এক ভক্ত, ভা রত-সঙ্গীতের কবি, বঙ্কিম-বন্ধু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৎসরেই জন্মগ্রহণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক এই সঙ্গীতের অনুরণনে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। বারম্বার আবৃত্তিতে সুর পুরাণো হইয়া যায়, কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাব জীবন্ত থাকে। এ বিপুল পৃথিবীতে সবাই স্বাধীন, একাকী ভারতবর্ষই শুধু ঘুমাইয়া রহিল,—যুগান্তেও কবির এই ক্রন্দন দেশের প্রাণে গুমরিয়া মরে।

সহৃদয়-জনের হৃদয়কে সমভাবে আন্দোলিত করিয়া তোলে যে-অনুভূতি, সহজ সরল জটিলতাহীন হইলেও, আন্তরিকতাপূর্ণ কবির সেই প্রখর অনুভূতির প্রকাশ যদি রস হয়, এবং রসাত্মক বাক্য যদি কাব্য হয়, তাহা হইলে হেমচন্দ্র নিঃসন্দেহে বিগত শতাব্দীর তীব্র দেশাত্মবোধের কবি।

দশ মহাবিদ্যার পরিকল্পনায় এবং বৃত্রসংহারের চরিত্র সৃষ্টিতে হেমচন্দ্রের কল্পনার বৈচিত্র্য ও বিপুলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'হা শম্ভু, তুমিও বাম'—এই কথাকয়টি এক বিরাট ট্রাজেডির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে।

বঙ্গদর্শনের ছত্রতলে যে সেনানীবৃন্দ একদা সমবেত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে হেমচন্দ্র এক প্রধান সেনাপতি। মাইকেলের মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'মধুসূদনের ভেরী নীরব হইল, হেমচন্দ্রের বীণা বাজিতে থাকুক।'

হেমচন্দ্র কাব্যে সৌন্দর্য্যের সন্ধান করেন নাই, শক্তির উপাসনা করিয়াছেন। তাই তাঁহার বাক্যে সুষমার অপেক্ষা তেজ, ইঙ্গিতের অপেক্ষা পরিস্ফুটতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যবহারজীবীর ব্যবসায়ে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিলেও এই উদারহৃদয়, মুক্তহস্ত এবং উন্মুক্তস্বভাব পুরুষের প্রকৃতি একান্ত কবিজনোচিত ছিল। অবিচার এবং অত্যাচারের আভাস মাত্রে তাঁহার কবি-হৃদয় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত, পরের দুঃখে তাহা গলিয়া যাইত।

দুঃখ এবং দারিদ্র্যে নিষ্পিষ্ট হইয়া ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহার যুগ শেষ হইয়া গেছে।

অসাধারণ দেশাত্মবোধ এই দৃশ্যত শান্ত, গম্ভীর, ভাবুক লোকটিকে তেজস্বী এবং দৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

ভাবজগতের সহিত ব্যবহার-জগতের যে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ আছে, তাহা নহে। একটা হইতে আর একটাতে যাইবার জন্য মিল্টনের মত কোনও ব্রিজ তৈয়ারী করিবার দরকার নাই। একটা যেখানে শেষ হইয়াছে আর-একটার সূচনা সেখানেই, এমন কথাও বলা যায় না। চিন্তা ও কর্ম্ম নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়াছে, উভয়ের মধ্যে অবকাশের অনুসন্ধান করা বৃথা। দিন যে কোথায় গিয়া অবসান লাভ করিল এবং রজনী আরম্ভ হইল কোথা হইতে সেই সীমা-রেখাটি বড় বড় জ্যোতির্বীও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। তবুও আমরা জানি দিবস আলোকময় এবং নিশা অন্ধকার।

* * *

রাত্রি সঞ্চয় করে, দিবস প্রকাশ করে। প্রাণ কেবলই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, কর্ম্মের মধ্যে। কিন্তু চিন্তার মধ্যে সে আপনার শক্তি আহরণ করিতেছে উপচয় করিতেছে। কর্ম্মের মধ্যে চাঞ্চল্য আছে আবেগ আছে; কিন্তু স্তব্ধতা এবং গভীরতা চিন্তার মধ্যেই। অর্থাৎ ব্যবহার-জগৎ আমাদের প্রতিদিবসের কোলাহলময় কারখানা, এবং ভাবজগৎ রূপকথার ঘুমন্ত পুরী এক নিমেষে জাগিয়া উঠিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

* * *

উদ্ভিদ্ অঙ্কুরিত হয় আলোকে, কিন্তু বীজ কার্য্য করে লোকচক্ষুর অন্তরালে। কর্ম্মের পিছনে থাকে কল্পনা চেষ্টার

পিছনে থাকে চিন্তা। অথবা বলা যাইতে পারিত কর্ম্ম অজ্ঞাতবাস করিতেছিল কল্পনারূপে অন্তরের অন্তঃপুরে এবং চেষ্টা সাজিয়াছিল চিন্তা। দোকানের খাতা, ইঞ্জিনের চাকা, মালের গুদাম, ক্রাপের কামান, এমন কি এরোপ্লেনের পাখা, তড়িৎবার্ত্তার তারহীনতার মধ্যেই কর্ম্ম নিঃশেষে প্রকাশ নহে। সকল কাব্য. সকল গান, সকল চিত্র, সকল কলার মধ্য দিয়াই কর্ম্মের মূর্ত্তি উঁকি মারিতেছে ; চিন্তার ছদ্মবেশে সে-ই যে মানসারণ্যে লুকাইয়াছিল তাহা কি ধরা পড়িতে আজও বাকি থাকে ?

* * *

একজন উদীয়মান সাহিত্যিক সাহিত্যজগত হইতে অন্তর্হিত হইল। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন দেশপ্রেমিক নবীন লেখক। দিবাকর শর্ম্মা নামের অন্তরালে তাঁহার দীপ্তি প্রকাশ পাইত। তাঁহার কবিতায় তেজ, রচনায় সাহস, বিদ্রূপে তীব্রতা, গল্পে ভঙ্গী ছিল। 'ছোট-গল্পে' তাঁহার লিখিবার কথা ছিল। এই শক্তিশালী লেখকের আকস্মিক অকাল-বিয়োগে সকল সাহিত্যসেবীই একান্ত ব্যথিত।

—আগামী সংখ্যায়—

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

গল্প

দিন-পঞ্জী

নিউ ইয়র্ক, ১৩ই ফেব্রুয়ারী—গত কল্য রাত্রে মিয়ামিতে প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্টের প্রাণনাশের এক চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পর পর পাঁচটি গুলি ছোড়া হয় কিন্তু একটিও লাগে নাই। একটি গুলি চিকাগোর মেয়র মিঃ সেরমাকের মস্তকে লাগে ও আরও পাঁচ জন আহত হয়। আততায়ী একজন ইটালীয়ান, নাম ই-এম-জিঙ্গারা।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—গত কল্য রাত্রি ২-৪৪ মিঃ সময় বিশিষ্ট সংবাদপত্রসেবী শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল ঘোষ পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বিখ্যাত মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দেড় বৎসর হাজত বাসের পর সম্প্রতি বিচারে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

গত শুক্রবার সকাল ১০টা ১৫ মিনিটের সময় শক্তিমান্ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (দিবাকর শর্ম্মা) অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৩৩।৩৪ বৎসর হইয়াছিল।

লণ্ডন, ২০শে ফেব্রুয়ারী—জেহল সীমান্তে দুই পক্ষের বিরাট বাহিনী মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ৫০ হাজার জাপানী সৈনিক, বহু মাঞ্চুকু সৈন্য, ১০০ বিমান পোত, বহু সাঁজোয়া গাড়ী যে কোনও মুহূর্ত্তে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত।

অপর দিকে দেড় লক্ষ চীনা সৈন্য এবং স্বেচ্ছাসেবক জেহলে পার্ব্বত্য অঞ্চল পরিপূর্ণ করিয়া বসিয়াছে। পিকিং হইতে জেহলে যাইবার একটি মাত্র রাস্তা আছে। অস্ত্রশস্ত্র-গোলাগুলি-বাহী লরীতে রাস্তা একেবারে ভর্ত্তি।

জব্বলপুর, ২২শে ফেব্রুয়ারী—শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু অদ্য অপরাহ্নে বোম্বে মেলে জব্বলপুর ত্যাগ করিয়া আগামী কল্য পূর্ব্বাহ্নে ১০টার সময়ে বোম্বাই পৌঁছিবেন। ষ্টেশন হইতে তিনি সরাসরি এম-ডি-গাঙ্গে নামক জাহাজে বেলা ১টার সময় ইউরোপ যাত্রা করিবেন।

আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে

আর ইনজেক্‌সান লইতে হইবে না

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

ছোট গল্প

১ম বর্ষ]   ২৭শে ফাল্গুন ১৩৩৯   [৩৫শ সংখ্যা

বৌভাত

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

নাকে একটি টলটলে মুক্তার নোলক, মুখখানি দিব্যি ঢলঢলে, কপালের উপর সিঁতিপাটীর সবুজ মিনে-করা মুক্তার আবলী, হাতে গায়ে অনেকগুলি করিয়া গহনা, গলায় ডবল ফুলের চিক, সাতনর দড়িহার কোমরে কাঁকড়া বিছে, বেশ চওড়া তার খামিথানি, পায়েও খোট্টাই পাঁইজোরের সঙ্গে ঘুমুরগাঁথা পালংপাতা মল।

দিদিশাশুড়ী নাতবৌয়ের মুখ দেখিয়া দিলেন হাতে দুখানি রতনচুর, আর পায়েরও ঠিক সেই জিনিষই, কিন্তু গড়নটি

রূপার, আর নামটিও সেই সঙ্গে বদল করিয়া হইয়াছে চরণপদ্ম।

তা চরণপদ্মই বটে! খাসা পাদুখানি। অবশ্য বৌ দেখার সময়ে বৌয়ের হাত কি পা, কান কি কপাল, কিছুই বেশ ভালভাবে দেখা যায় নাই, সর্ব্বত্রই তার সোনা-রূপায় মুড়িয়া অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছিল; কিন্তু বৌ যখন চরণপদ্ম এবং পাঁইজোরজোড়া খুলিয়া ফেলিয়া নাপিতবৌ স্বর্ণর কাছে আলতা পরিতেছিল, সেই সময় ভবেশ একবার বাড়ীর ভিতর ঘুরিতে আসিয়াছিল, তার ঔৎসুক্যচঞ্চল চোখ পড়িয়া গেল ঐ নাপিতবৌয়ের হাতে ধরা পাদুখানির উপরে। মরি মরি, পা যদি থাকে তো যেন ঐ রকমই হয়। যেন একটি সদ্যফোটা শ্বেতপদ্ম! তার পাশে পাশে আলতার ডোরা দিয়া যেন বাহার আরও শতগুণ খুলিয়াছে। কিন্তু কি আপদ! একটু কিনা চোখ ভরিয়া দেখারই উপায় আছে? "হ্যাঁ ছোড়দা, ওখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্চে? আমাদের বৌ দেখচো বুঝি? শুধু হাতে দেখতে তো দোব না, আগে টাকা আনো তবে দেখতে পাবে"—বলিয়া হাঁক দিয়া ছোট বোন মেনি ছুটিয়া আসিল। তার গলার সাড়ায় স্বকার্য্যনিরতা পিসিমা ভাঁড়ার ঘরের জানালা দিয়া একবার এদিকে চাহিয়া ভিতর হইতেই মেনিকে উদ্দেশ করিয়া ভবেশকে শুনাইয়া দিলেন, "ওলো ও মেনি! আজ কালরাত্তির, আজ যেন ওদের একত্তর করে এক কাণ্ড করে বসে থেকো না বাছা!"

বড়দি ওদিক হইতে ছেলে কোলে হন্তদন্ত হইয়া আসিতেছেন দেখা গেল, ভবেশ বেচারী লজ্জায় অপ্রস্তুতে কোথা পালাইবে যেন ঠিক পায় না।

বৌভাত হইয়া গেল। কি ভাগ্যি যে বধূর হাতের চাকার মত রতনচক্র জোড়াটি তখন খোলা ছিল।

রূপার থালায় বাড়া রাশি-করা ভাত-ব্যঞ্জন, তার উপর মেনির আলগোছে ধরা কাঠের ফ্রেমে মোড়া হাত-আয়না, বেগুনি রংয়ের বেনারসী চেলি, কড়ির থোপা ঝোলানো সিঁদুর-চুপড়ী, বর বধূর হাতে দিতে দিতে ঠাকুরমার শেখানো মতন আস্তে আস্তে উচ্চারণ করিল, "আজ থেকে তোমার খাবার পরবার সমস্ত ভার আমি নিলাম।" বলিয়া থালাটা বধূর প্রসারিত দুটি হাতে ছাড়িয়া দিতে গিয়া হঠাৎ মনে হইল, 'অমন কচি কচি ছোট্ট হাতে ও কি অত বড় থালা ধরতে পারবে?' থালাটা সে ছাড়িতে পারিল না, ধরিয়াই রহিল, এবং অপাঙ্গে বার দুই বৌয়ের থাট থাট হাতদুটির দিকে দৃষ্টি করিল।

মেনি মেয়েটি দুষ্টামির একটি সর্দ্দার। দাদার অবস্থা বুঝিয়া সে তাহাকে ব্যঙ্গ করিল, "কি ছোড়দা, বউএর খাবার পরবার ভার নিয়েও যে হার মানতে পারচো না! কেন বাপু আর থালা নিয়ে টানাটানি করা? গেলবার

কোটবার ভার যখন নিয়েইছ তখন কেড়ে বিগড়ে আর সুবিধে করতে পারবে না, তার চাইতে বহাল তবিয়তে দিয়েই ফেল।”

ভবেশ একলা থাকিলে যা বলিত এত লোকের মাঝখানে সে জবাব দিতে পারিল না, কথাতেই বলে বর না চোর, কাজেই চোরের মতই কিন্তু করিয়া জবাব দিল, “ছেড়ে দিলে পড়ে যায় যদি ?”

“নাগো যাবে না, তোমার বউটি তো আর কুলোয় শুয়ে তুলোয় দুধ খেতে খেতে বৌ হয়ে আসেনি, একখানা থাল ধরতে খুব পারবে। দাও দিকিনি তুমি ছেড়ে। এখুনি ওকে বামুনদের পাতে ভাত দিতে যেতে হবে না ?”

“বেশ আমার কোন দায় নেই”—বলিয়া আর একটা চোরা কটাক্ষে হাতদুটি এবং তার অধিকারিনীটিকে চকিতে একবারটি দেখিয়া লইয়া ভবেশ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তারপরও আর সেখানে থাকা ভাল দেখায় না বলিয়া নিরুপায়েই গট গট করিয়া বাহির হইয়া বাহির-মহলের দিকে চলিয়া গেল। সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া মেনি একটুখানি সকৌতুকে হাসিয়া ফেলিল।

ইতিমধ্যে বড়দি আসিয়া সদ্যপ্রাপ্ত স্বামীর হাতের প্রথম উপহার (যদিও একান্ত আবশ্যকীয় ও অত্যন্তই স্থূল বিষয়ের) বস্তুগুলির ভার বহন হইতে নূতন বৌকে মুক্তি দিয়া

ফেলিয়াছিলেন, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মেনির সঙ্গে হাত ধুইতে বাহিরে আসিয়া সে চুপে চুপে মেনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "তুমি তখন হাসলে কেন ভাই ?"

মেনি তার হাতে জল ঢালিয়া দিতে দিতে আবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "এমনি।"

বৌ বলিল, "না এমনি কক্ষনো নয়, নিশ্চয় কিছু মানে আছে, বলবে না ?"

মেনির কাজ সারা হইয়াছিল, বউএর হাত ধরিয়া বলিল, "চল, বলিগে।"

একপাশে নিরিবিলিতে আনিয়া বলিল, "ছোড়দার রকম সকম দেখে আর একজনের কথা মনে পড়ে গেল, তাই হাসলুম।"

"সত্যি! কার কথা ভাই? নিশ্চয় তোমার বরের কথা, না ?"

"তাছাড়া আবার কার হতে যাবে ?"

"দেখ আমি কেমন গুণে বলে দিয়েছি।"

"ওরে আমার গোণককার!" মেনি ভাজকে দুহাতে জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিল। তারপর বলিল, "আমার ছোড়দা বেচারী নেহাৎ ভাল মানুষ, ওকে ঠাট্টা করেও কোন সুখ নাই, মিথ্যে শুধু লজ্জা পায়। তোমার ঠাকুরজামাইটি কিন্তু ঠিক ওর উল্টো লোক ;—দেখচো তো তোমাকে নিয়েই কি কাণ্ডটি করচে। ও যখন আমার হাতে ভাত দিলে,

ঐ রকম করে নাকি ? উঃ, তেমনই পাত্তর বটে ! থালাখানা ধরে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে বসল, "নাও ধরো, যদি কিছু কম পড়ে তো বলো, আজ থেকে তোমার গেলবার কোটবার সমস্ত ভার আমার মাথায় তুলে নিলুম, অবিশ্যি ইচ্ছে করলে না নিতেও পারতুম, যেহেতু বিয়ে যারা দাঁড়িয়ে থেকে দিয়েছেন, ভার তাঁদেরও কিছু কিছু রইলো বৈকি, তবে হ্যাঁ, যদি জুটে ওঠে তো দেখা যাবে।"

বধূ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, "বাঃ, ভারি মজার লোক ত ! ওমা, তাই জন্তে বুঝি তখন গেলবার কোটবার কথাটা বলা হ'লো ? মাগো, আমার এমন লজ্জা করছিল।"

মেনি সস্মিতহাস্তে উত্তর করিল, "বাঃ, আমারও যেন করেনি ! নতুন শেখা বিদ্যেটা কাকে আর করি তোর ঘাড়েই চালান করে দিলুম।"

বৌ হাসিমুখেই প্রত্যুত্তর দিল, "তা বেশ করেচ। আচ্ছা ভাই, উনি—এই তোমার বর খুব হাসাতে পারেন, বেশ লোক, না ?"

"খুব পছন্দ হয়েছে যে ! নিবি ?"

বৌ ঈষৎ সলজ্জ হইল, কিন্তু তখনই আবার লজ্জা কাটাইয়া উত্তর দিল, "বেশ তো যদি বদলে নাও।"

"আ মর্ পোড়ারমুখী !" বলিয়া মেনি তাহার গালে একটা ঠোনা বসাইয়া দিল।

বড়দিদি পোলাওয়ের জন্য জাফ্রানের শিশি হাতে হস্তদন্ত হইয়া যাইতে যাইতে ওই দৃশ্যটি দেখিয়া গেলেন, যাইতে যাইতেই বলিয়া গেলেন, “এই যে আজ থেকেই ক্ষুদে ননদগিরিতে লেগে গেছ! দুটো দিনও বুঝি সবুর সয় নি! আজকের দিনে কি পোড়ারমুখী বলতে আছে? আ মরণ!”

দিদি চলিয়া গেলে মেনি বলিল, “শুন্‌লি লো? আমি তোকে পোড়ারমুখীও বলতে পাব না, আর উনি আমায় বললেন, মরণ!”

বধূ হাসিতে লাগিল, উত্তর দিল না। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁ ভাই, তারপর উনি আর কিছু বললেন না?”

দুষ্টুমি করিতে মেনি অদ্বিতীয়, ছল করিয়া প্রশ্ন তুলিল, “কিনি? ছোড়দা বুঝি?”

নতুন বৌ অপ্রস্তুত মুখে “ধেৎ” করিয়া উঠিল, তারপর বলিল, “তা কেন তোমার বরের কথা বলছি।”

“এক বছর আমার বিয়ে হয়ে গেছে, এখনও সে আমার বর থাকল? কেন তোমার বুঝি সে কেউ হয় না?”

বউ লজ্জায় পড়িল, নতুন-নতুন এই অপরিচিতদের নূতন সম্পর্ক ধরিতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ হয়। ইনি তিনি করিয়াই তখন কাজ চালাইয়া যাওয়া চলে। কিন্তু মেনিও তো সোজা মেয়েটি নয়, সে চট্ করিয়া বলিয়া বসিল, “তাহলে তার কথা জিজ্ঞেস করতে হলে বোলো দক্ষিণপাড়ার চাটুয্যে মশাই, না-হলে

বুঝতে পারব কেন? বুঝতে না পারলে উত্তর দেবো কি ক'রে? কেমন পারবে তো? দক্ষিণপাড়ার চাটুয্যে মশাই, মন্দ শোনাবে না।"

নূতন বৌ তার তাম্বুল-সরাগ ওষ্ঠাধর হাস্যরঞ্জিত করিয়া জবাব দিল, "না ভাই, তার চাইতে আমি ঠাকুরজামাই-ই বলব।"

"তাহলে তো আমি কৃতার্থই হলুম, ঐসঙ্গে আমার পদমর্য্যাদাটাও কায়েমী হয়ে গেল। আচ্ছা বেশ, তা'হলে এখন শোন, যা শুনতে চাইছিলে। হ্যাঁ সেদিনের কথা। তা বললে বই কি। ও কি ওইটুকু বলেই ছাড়বার পাত্তর? আমার দিকে চেয়ে বললে, 'এই যে বেনারসী সাড়ী দেখচো, মনে কোরো না যে ঐরকম কাপড় পরাবার ভার তোমার নেওয়া হ'লো। ও ঐ একখানাই যা বরাতক্রমে পেয়ে গেছ, ঐ পর্য্যন্ত। আমায় যদি ভার নিতে হয় তো তুলো এনে দোবো, চরকায় সুতো কেটে বুনে বা বুনিয়ে পরতে হবে, আর আমার গুরুজনেরা যতদিন তোমার ভার বইবেন তাঁরা কি করবেন, তাঁদের মনের কথা অবিশ্যি বলতে পারিনে, তবে বেনারসী যে নয়, এইটুকু বলতে পারি।' এমন আমার রাগ ধরছিল যে, ভাতের থালাটাই ইচ্ছে করছিল হাত থেকে টান মেরে কেড়ে নিয়ে নামিয়ে রেখে উঠে যাই। আমি যেন ওঁকে বলেচি যে বেনারসী কাপড় আমার আটপৌরেও দিতেই হবে, বেনারসী সাড়ী ছাড়া আমি আর কিছুই পরব না!"

নূতন বৌ কি বলিতে গেল, কিন্তু তার কথা বলার আগেই হাঁক আসিল, "ওলো মেনি ! বউমাকে এখানের সাড়ী পরিয়ে ভাল করে সাজা না লো, এক্ষুনি যে সব বউ দেখতে আসবে।"

মেনি সন্ত্রস্ত হইয়া বউকে ধাক্কা দিল, "চল্ চল্, ওমা সত্যিই তো এখন কি গল্প করবার সময় !"

বউএর হাতে হাতা, বউএর নন্দায়ের হাতে ভাতের থালা, ভোক্তাগণ সোৎসুক্যে মুখ তুলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।

জ্ঞাতি জ্যেঠশ্বশুর হন, আধাবয়সী ভদ্রলোক, স্নেহশ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ মিষ্টস্বরে কহিলেন, "অন্নপূর্ণা মায়ের হাতের অন্ন খেয়ে আজ জন্ম সার্থক করব, আজকে কি আমাদের যেমন তেমন দিন ! দাও মা দাও, ভয় কি ! আহা মায়ের আমার কচি হাতটি কাঁপচে।"

বরের বন্ধুর দল হাঁকাহাঁকি লাগাইল, "এইদিকে মশাই, এইদিকে আসুন, আমাদের পাতে পড়া চাই, নৈলে উঠে গিয়ে সব্বায়ের খাওয়া নষ্ট করে দোব। আয়াহি বরদে দেবি ! অধীনরা সেই অবধি পাতা কোলে করে বসে রয়েছে, একটুখানি কৃপাকটাক্ষপাত করে কৃতার্থ করে দিয়ে যান।"

একপাতে ভাত দিতে সাতজন দাবী জানায়, সবাই বলে, "এতকটি দিলেন ! এঃ, ভবেশটার কপালে দুঃখু আছে, পেটটা

ভয়ে খেতেও পাবে না দেখছি।" একে এক-গা গহনা আর বেশ মোটা জংলা বেনারসী সাড়ী পরা, তার উপর মুখে ঘোমটা এবং নূতন বধূর স্বাভাবিক সরম সঙ্কোচ, বউটি তো ফাঁপরে পড়িয়া গেল। তার নন্দাই ধীরেন তখন তাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়া গম্ভীরমুখে বলিল, "দেখুন, সেই ত্রেতাযুগে যা করেছিলেন তা করেছিলেন, আজকের দিনে আর সেগুলো কি শোভা পায় ? এই দেখুন না, ওঁদের তো মাথা ফুঁড়ে সেই সেবারকারই মতন ভাত উপ্‌চে উঠেছে, হয়ত উঠে দাঁড়াতেই পারবেন না, ষ্ট্রেচারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, তা দলকে দল সব্বাই কি ওই ব্যবস্থায় যাবেন ? সেটা কি এ যুগে 'ভাল দেখায় ?"

বাস্তবিকই সেই প্রদর্শিত তরুণকটির মাথায় তাদের সযত্নরচিত কেশপ্রসাধানের উপরে কয়েক দানা করিয়া ভাত যেন শ্যামপত্রাবলীমধ্যে শুভ্র জুঁই ফুলের মতই শোভা বিস্তার করিয়া আছে। দর্শকের দল উচ্চকলোরোলে হাসিয়া উঠিল ; কিন্তু হাস্যাস্পদরা খুবই খুসী হইল না, একজন একটু রুখিয়া উঠিয়াই ধীরেনকে বলিল, "এ কি-রকম ধারা তামাসা মশাই ? এটি কি নব্যতান্ত্রিক তামাসা না—"

ধীরেন ধীরতার সহিত উত্তর দিল, "আজ্ঞে না, এটি একটু বস্তুতান্ত্রিক। কিন্তু আমায় বলছেন কেন ? যিনি আপনাদের অন্নদাত্রী—তাঁকেই বলুন, আমি তো ভারবাহী মাত্র দেখতেই পাচ্ছেন। যদি কিছু করে থাকেন, উনিই করেছেন।"

নববধূ লজ্জায় মাটীতে মিশিতে চাহিল, ভীষণ রোলে চারিদিক হইতেই এবার হাসির সাড়া উঠিল, মাথা হইতে ভাতের দানাগুলো ফেলিয়া দিয়া তরুণ বন্ধুর দল সেই হাসির হিল্লোলে যোগ দিয়া দুজনকারই উদ্দেশ্যে শাসন করিল, "আচ্ছা আচ্ছা তোলা রইল, একমাঘেই কিছু শীত পালায় না, এর শোধ হবে একদিন।"

ভিতরে ফিরিয়া আসিয়া মেনিকে কাছে পাইতেই নূতন বৌ তার কাছে নন্দায়ের নামে নালিশ রুজু করিয়া দিল, "বাবারে তোমার বরটি কি মানুষ যে! নিজে দিয়ে কিনা আমার নামে দোষ চাপালেন। আমি না কি ওঁদের মাথায় ভাত দিতে পারি? কি বেহায়াই আমাকে মনে করলেন সব!"

মেনিদের কানে ইতিমধ্যেই নূতন বৌয়ের এই নূতন কীর্ত্তির কথা আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, এ খবর পাইয়া প্রবীণাদের মধ্যে কেহ কেহ গালে হাতও দিয়াছিলেন, একজন মন্তব্যও করেন যে, কালে কালে তাঁদের কতই না দেখিতে হইতেছে, এবং আরও একজন তাঁর মন্তব্যকে লুফিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ তার টিপ্পনিও কাটেন যে, এখনি দেখিবার হইয়াছে কি, আরও এখনও কতই বাকি রহিয়াছে, তা কে জানে?

কিন্তু মেনি তখনই জানিয়াছিল, এই অভিনয়ের নায়কটি কে। তাই অনর্থক নূতন বৌয়ের নামে এই অপবাদ সে সহ্য করিতে পারিল না। তারও তো সবে এই এক বৎসর মাত্র বিবাহ হইয়াছে, স্বামীর বিষয়ে কোন কথা

গায়ে পড়িয়া বলা—সেও ঠিক সঙ্গত নয়; কিন্তু অনর্থক একজন নির্দ্দোষীর নিন্দা কানে শুনিয়া সত্য গোপনে রাখা —সেও তো অসঙ্গত। কাজেই সে আর থাকিতে না পারিয়া খপ করিয়া মেজ ঠাকুমার মুখবন্ধ করিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল,

"ওগো, না গো না, নতুন বৌ কিছুই করেনি, তার সঙ্গে যে নারদঋষিটিকে পাঠানো হয়েছিল, এ কর্ম্মটি নির্য্যস্ তারই।"

মেজগিন্নি যেন কতক ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়া থামিয়া থামিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কে সঙ্গে গেছলো?"

ছোট্‌ঠাকুমা চোক টানিয়া বিস্ময়ের সুরে কহিয়া উঠিলেন, "নারদঋষি আবার কে লো? আজকের দিনে আবার ইচ্ছেসাধে ও নাম নেওয়া কেন?"

মেনি বিব্রতভাবে কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া 'জিজ্ঞেস করো না দিদিকে' বলিতে বলিতে একছুটে সেখান হইতে পলাইয়া গেল। নতুন বৌয়ের বদলে সেই বা বুঝি এইবার বেহায়া বনিয়া যায়।

আন্নুপিসি খোরাপাথরে নিরামিষ হেঁসেলের চাট্‌নীর জন্যে তেঁতুল গুলিতেছিলেন, তাহাদের দলের নির্ব্বুদ্ধি আর তাঁহার সহ্য হইল না, তিনি যথাকার্য্য-নিরত রহিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "ওমাঃ, তাও বুঝতে আটকালো! অমুক ঋষি ওর বর গো, আমাদের নতুন জামাই ধীরেন।"

মেজ গিন্নি তখন যেন ধাতে আসিলেন, "ও আমার অভাগ্যির দশা! তাই বল্, তা না বলে কিনা—যাহোক মেয়ে ঐ মেনিটা!"

ছোট গিন্নিও তখন যেন ব্যাপারটার হদিস পাইয়া গেছেন এমনি নিশ্চিন্ত আরামে একগাল হাসিয়া কহিলেন, "বলেছে ভাল! নারদ ঋষি! তা নাত-জামাইটি আমার কোঁদল শাস্তর্‌টা ভাল করেই শিক্ষে করেচন। বাব্বা, কথার তোড়ে সাম্‌নে দাঁড়ায় কার সাধ্যি!"

এমন সময় শূন্য অন্নপাত্র প্রত্যর্পণ করিতে সশরীরে ধীরেনই আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছে, সমালোচনাটা যে তারই এই নূতন কীর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া চলিতেছে, তাও তার জানিতে বাকি ছিল না, কিন্তু ভাল মানুষের মত মুখটি করিয়াই সে ইহাদের সঙ্গে কথা কহিল,

"হ্যাঁগা ঠাকুমায়েরা, ঐরাবতই তো গঙ্গার স্রোতের সাম্‌নে দাঁড়াতে পারেনি, আপনাদের আবার কি হ'লো?"

ঠাকুমায়েরা নাতজামাইকে সাম্‌নে পাইয়া মহাখুসী হইয়াছেন, বোধ করি একসঙ্গে দু'তিনজনেই যেন সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমাদেরও ভাই সেই ঐরাবতেরই দশা ধরেচে।"

ধীরেন এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন যে নতুনবৌকে লইয়া মেনি, মেনির দিদি, আরও দুতিনটি তরুণী এইদিকেই

আসিতেছে। সে অতিশয় গম্ভীর মুখে ও সহজ কণ্ঠেই তাদের শুনাইয়া ঠাকুমায়েদের বলিল, "প্রেম-মন্দাকিনীর নূতন ধারায় ঐ এঁরা সবাই এখন ভেসে বেড়াবেন, আপনারা কিসের দুঃখে ভাসতে গেলেন! গট্ হয়ে 'গড়ে'র মতন বসে থাকবেন আর মজা দেখবেন।"

মেনির দিদি রাণী কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, সে ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "দেখ ধীরেন, তুমি জিভটাকে একটু বেশী ছুটিয়েছ!" ধীরেন সবিনয়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "সে আপনার বোনের দোষ। আমি কি করব, তাকেই বকুন।"

রাণী বলিল, "আমার বোনের দোষ কি রকম? সে বুঝি তোমায় শিখিয়ে দিয়েছে যে বেপরোয়া মুখ ছুটিয়ে দাও, গুরু লঘু হিসেব না রেখেই?"

ধীরেন সবিনয়ে কহিল, "আজ্ঞে না, তা শেখায়নি বটে, কিন্তু মুখের লাগামটা তো কষে ধরা ওর উচিত ছিল? তা ধরলে কার সাধ্য আছে যে বেপরোয়া মুখ ছুটাতে পারে? এই ধরুন না যেমন আমাদের নিত্যধন দাদার কেস্‌টায় ঘটেচে। শিখিয়ে দেবেন না একটু ছোট বোনটিকে, কি করে স্বামীটিকে একেবারে গোবেচারা মৌনব্রতী করে নিতে হয়।"

রাণীর স্বামীটী আবার বেজায় ভাল মানুষ। রাণী হাসিয়া, 'যাও, তোমার সঙ্গে পারা যায় না' বলিয়া রণে ভঙ্গ দিল। মেনি তাহাকে সবার অলক্ষ্যে একটি ছোট্ট কিল দেখাইল, সে কিন্তু তার বদলে সকলকে শুনাইয়া দিল।

“হ্যাঁ এইতো চাই! আজকের দিনে কি আর অবলা থাকলে চলে? কিলতো কিল, লাঠি সোঁটা দরকার মত সবই অভ্যাস রাখতে হয়। দুর্ব্বৃত্ত দমন করতে পারবেন না—প্রয়োজন হলে যদি ঘরের দুর্ব্বৃত্তদের শাসন করে হাত পাকিয়ে না রাখেন। ভদ্রে, যদি অনুমতি করেন, এক্ষণি আপনার ওই কোমল কিলটির তলায় পিঠটি পেতে দিতে প্রস্তুত আছি। বাংলার পুরাতন ইতিহাসের মত বাঙ্গালীর নামে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের কলঙ্কের ছাপ আর পাকা করতে দিচ্ছিনে। অনেক কষ্টে মৈত্রেয়-চন্দ প্রভৃতিরা মিলে বাঙ্গালীর নামের সেই অদ্ভুত কলঙ্ককালিমা ক্ষালন করে এনে সবেমাত্র জগতের সামনে প্রমাণ করে এনেছেন যে, মেকলের বাঙ্গালীতে আর সত্যিকারের বাঙ্গালীতে অনেকখানি ফারাক আছে। পলাসীর যুদ্ধেও বাঙ্গালীর ভীরুত্ব প্রমাণিত হয়নি এবং সে-যুগের বাঙ্গালীই বাঙ্গালীর সমস্ত পরিচয় নয়। অতএব বাঙ্গালী হয়ে ভীরু নাম কোন মুল্যেই কিনব না।”

মেনি দুড়্ দুড়্ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল, তার পায়ের চারগাছা জলতরঙ্গ মল, শুধু ঝম্ ঝম্ নয়, ঝমাঝম্ শব্দে বাজিয়া বাজিয়া তার লজ্জারোষসংযুক্ত প্রচ্ছন্ন আনন্দটুকু চারিদিকে যেন আদর-অধিকারিণীর অকথিত কথাগুলিকে চারিদিকেই ব্যক্ত করিয়া ছড়াইয়া দিতে লাগিল, ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া বিধবা এবং ব্রাহ্মণদের জন্য ফল কাটিতে কাটিতে মা—সন্দেশ পাকাইতে নিরতা পিসিমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, “দেখ্‌ছিস ঠাকুরঝি, মেনিটার যদি

কোন আক্কেল আছে! বুড়ো হাতি মেয়ে আজ বাদ কাল শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে, বাড়ীতে জামাই রয়েছেন, মেয়ের সে-সব দৃক্‌পাত নেই, যেন ঘোড়ার নাচ নেচে বেড়াচ্চেন।”

মেনির পিসিমা অপত্যহীনা বালবিধবা, ভাইপো ভাইঝিই তার প্রাণ। তার প্রশ্রয়েই এ বাড়ীর ছেলেমেয়েদের যত কিছু আদুরেপনা, মায়ের এতটা তীব্র মন্তব্য তার পছন্দ হইল না, ক্ষমাসূচক মৃদু হাস্য করিয়া উত্তর করিল, “আহা করতে দে, কিছু বলিস্‌নি। ওসব আর কদিনরে ভাই? বলে ‘খা, খা, খা, যদ্দিন না হয় ছাঁ। শো, শো, শো, যদ্দিন না হয় পো।’ বউ হওয়া, মা হওয়া, গিন্নী হওয়া—ও সব তো পড়েই আছে।”

মেনির মা ননদের নিকট হইতে এর চেয়ে বেশী কিছু শুনিতে যদিও আশা করেন নাই, তথাপি ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “এখন থেকে একটু দস্যিপানা না কমালে, না শিখলে এর পরে ও সব পারবে কেন? নিন্দে হবে যে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে।”

ননদ এবার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, সহাস্যস্মিত মুখখানি তুলিয়া তারই মধ্যে ভ্রূকুটি হানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোর হয়েছিল? তোর যদি না হয়ে থাকে, ওরও হবে না। তুই যখন ঘর সংসার করতে পারছিস, ও-ও পারবে। তুই-ই কি কিছু ধিঙ্গি কম ছিলি নাকি? মনে নেই সেই আমাদের সঙ্গে মইয়ে চড়া, কাসুন্দি চুরি, আর গাছে উঠে পেয়ারা পাড়া!”

ভাজটি পূর্ব্ব কথার উত্থাপনে হঠাৎ লজ্জা পাইলেন, কিন্তু তা বলিয়া দমিলেন না, বরং সলজ্জ একটুখানি মিষ্ট হাসি হাসিয়া ননদকে তুষ্ট করিতে চাহিলেন, বলিলেন, "আমার কথা ছেড়ে দাও, আমার মতন শাশুড়ী ননদ ক-জনে পায়? তেমন তেমন বাড়ী হলে, আমি যা করেছি ঝ্যাঁটা মেরে বিদায় করে দিত।"

ননদ সস্নেহ দৃষ্টিতে ভাজের সকৃতজ্ঞ মুখের দিকে চাহিয়া শান্ত ঔদার্য্যের সহিত প্রত্যুত্তর করিলেন, "কেন হাঁড়িতেও খাস্‌নি, আর কিছুও করিস্‌নি, যা এ বাড়ীর মেয়েরা করেচে তুইও তাদের সঙ্গে মিশে তাইই করেছিস, মেয়েদের যদি ঝ্যাঁটা মেরে বার না করা হয়, তোকেই বা করবে কেন? বউ মেয়ের কি তফাৎ আছে? সেও তো আর এক বাড়ীর মেয়ে, আমার মেয়েও তো আর এক বাড়ীর বউ। তা আমাদের মেনির শাশুড়ীও লোক ভাল। বউকাঁট্‌কী নয়।"

সারাদিন বউ দেখিতে দলে দলে লোক আসিল। সারাদিন ধরিয়াই দীয়তাং ভুজ্যতাং চলিল। বউকে আপাদমস্তক অলঙ্কার বস্ত্রে মণ্ডিত করিয়া ঘর-জোড়া ফরাসের মাঝখানে বসাইয়া রাখা হইল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে-বউদের একটি রীতিমত ব্যূহ বধূকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, তাদের ভিতর মধ্যে মধ্যে লোক বদল হইলেও সংখ্যান্যূন কোন সময়েই হয় নাই।

বধূর সামনে একখানা রূপার থালা পাতা ও হাতে গিনি হইতে আরম্ভ করিয়া একসিকে পর্য্যন্ত সকল সংখ্যারই মুখদেখানি জমা হইতেছিল। সেগুলির জিম্মা ছিল রাণীর হাতে, মধ্যে মধ্যে আসিয়া চোখ দিয়া নজর রাখিয়া যাইতেছিল, কোন চঞ্চল বালক হঠাৎ হাত দিতে গেলে ধমক খাইতেছিল।

মেনিকে সহজে বউএর কাছ-ছাড়া করিবার উপায় ছিল না, সে নিজেই তো একে নড়িতে নারাজ, তার উপর বউও ছাড়িতে চায় না। ফিসফিস করিয়া মধ্যে মধ্যে দু'জনে কথাবার্ত্তাও এর ফাঁকে ফাঁকে চলিতেছে, মেনি বলিল, "আজ রাতে ছোড়দার সঙ্গে যা কথা হবে আমায় নিশ্চয় বলা চাই, না যদি বল টের পাইয়ে দোব।"

নতুন বৌ প্রায় খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলিবার যোগাড়, ফিসফিস করিয়া বলিল, "সেই ঠাকুর জামায়ের উপদেশ মতন লাঠি সোঁটা বসাবে বুঝি দুর্ব্বৃত্ত দমন করতে?"

"য্যাঃ"—বলিয়া মেনি তার গালে এক আঙুলের একটা ঠোনা মারিল। বউও দুষ্টামিতে কম যায় না, হাসিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই ঠাকুরজামাইকেও এই রকম এটা সেটা খেতে হয়, অভ্যাস পাকাই আছে দেখছি!"

মেনি মুখ গম্ভীর করিল, "কথার প্যাঁচে ভুলচিনে, যা কথা হবে বলা চাই।"

বউ বলিল, "কথা তো হবেই না, তার বলব কি?"

মেনি বলিল, “হ্যাঁ গো হ্যাঁ, কথা না কয়ে নাকি আবার কারু ফুলশয্যের রাত কাটে! ও অমন সব্বাই বলে।” “তুমিও বলেছিলে নাকি?” “বলি নি? আমার জায়েদের, ননদকে বলেছিলুম বই কি, তারা আড়ি পেতে যখন শুনলে খোঁটা দিলে না?” “দেখো আমি কইব না।” “বেশ দেখাই যাবে, না বলবে বড় বয়েই গেল, আমি শুনতেও চাইনে।” মেনির মনে কোন্ বিস্মৃত স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। আড়ি পাতা তো তার হাতেই রহিয়াছে ভাবনা কিসের?

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। বাবুদের মধ্যে অনেকেই এ-বেলা আসিয়া বউ দেখিয়া বউ-ভাতের ভোজ খাইয়া কাজ সমাপন করিয়া গিয়াছেন। মেয়ে খাওয়ানো শেষ হইয়াছে। তবে বেশির ভাগ মেয়েই ফুলশয্যার তত্ত্ব দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে নববধূর বাপের দেওয়া অলঙ্কারপত্রের সমালোচনা করিতেছেন, এই সূত্রে নিজের নিজের নূতন ও পুরাতন কুটম্বদের ও অন্যান্য অনেকেরই আলোচনা চলিতেছিল। যিনিই আসিতেছিলেন বউএর খোঁপা টানিয়া তার মাথায় কতটি চুল, ফুলকাঁটা কয়টা আছে, খোঁপার মধ্যে চিরুণি আছে কি না, পাশচিরুণি জোড়ার ওজন কত ভরি হইবে, গুঁজিকাটী, পানকাঁটা ইত্যাদির গড়নপেটনের তদারক ও নিন্দাখ্যাতি শেষ করিয়া, তার পর তার কান ফিরাইয়া সোনার

কান, ঝাড় ইয়ারিং দেখিয়া লইয়া, মাথার সিঁথি-ঝাপটা হইতে গলার সবগুলি একে একে তদ্বির করার শেষে, বাজু তাবিজ জশম তাগা বাঁক চুড়িসেট ও কটিতটের মাত্র একখানি দেখিয়া কিছু হতাশ হইয়া পায়ের দিকে নামার পর কিছু সন্তোষলাভ করিতেছিলেন। কেহ কেহ নতুন বউএর বাপের বাড়ীর দানকে স্বর্গে তুলিয়া ধরেন, কেহ বা মর্ত্তে ঠেলিয়া পাঠান। কেহ বলেন, "এ ত নিজের মেয়ে জামাইকে দেওয়া, ফুলশয্যাটা আগে দেখি কুটুমকে কি দিলে।" বরের গার্ডচেন ঘড়ি হীরার আংটীর তদারক ইতিমধ্যে অনেকবারই হইয়া গিয়াছে, মায় বেগুণী রংদার বেনারসী জোড়টাও বাদ পড়ে নাই। এ সব তো হইল উপরি পাওনা, আসল জিনিষটারও যাচাই সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছিল। কেহ বলে, "বউ তোমাদের বেশ হয়েচে, বেঁচে থাক, মনের সুখে ঘর-করনা করুক, সাতপুতের মা হোক।" শুনিয়া আত্মজনে তৃপ্তি পায়, বউএর 'কান' ঢাকা কানের গোড়া রাঙা হইয়া উঠে। আবার কেহ কেহ খুঁৎ কাড়ে, বলে, "হ্যাঁ-অ্যাঁ, বউ সুন্দর হয়েচে বটে, তবে বড্ড রোগা। বড় ঘরের মেয়ে এমন সুঁটকো চেহারা কেন গা? ঘি দুধ তো খেতে পায়।"

মেনি রাগ করিয়া বলিয়া উঠে, "বেশি খেতে পায় বলেই অমন গো, কম খেলে তবু হজম হয়।" আবার কাকেও বলে, "আমাদের রোগাই পছন্দ, এখন থেকে ধুম্‌সো গতর হলে এরপর যে জগদম্বা হয়ে উঠবে।"

উত্তর পায়, "ওমা তাই নাকি। তা হবে বাছা, এখন যে মেমদের মতন হওয়াই ফ্যাসান! তা তোদের বউকে গাউন টোপ পরালে মেমের বাচ্ছা মনে হতে পারে।"

কাপড় ছাড়ার সময়ে নতুন বউ জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর জামাই তোমায় চিঠি লেখেন তো? আমায় একটা দেখিও না ভাই!"

মেনি বলিল, "বদলা দেখাতে পারি অমনি নয়।" "বেশ তাই হবে। কিন্তু সে ত দেরি আছে আমি তোমায় পাঠিয়ে দোব।"

"আচ্ছা তাহলে ধারেই কারবার চলুক, আজ তো আর হবে না, কাল দেখাব। তবে তার ভাষাটা শুনে রাখো, সবিনয় নিবেদন, মহাশয়া!

আপনি লক্ষ্য করিবেন আমি আপনার ইচ্ছানুসারেই এই পত্রখানি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আপনাকে সম্বোধন করিবার মত ভাষা আমি সমস্ত বাংলা অভিধানের মধ্যে খুঁজিয়া না পাইয়া শব্দকোষ অভিধান লইয়া।বসিয়াছিলাম, সেখানেও হতাশ হইয়া আসিয়া অবশেষে আমারই যথাজ্ঞান সম্বোধনে এই পত্র লিখিতে বসিয়াছি। আশা করি অনভিজ্ঞের ত্রুটি আপনার সদৃশা মহদন্তঃকরণবিশিষ্টা মহীয়সীর নিকট মার্জ্জনীয় হইবে। পরন্তু যদি উহাকে অমার্জ্জনীয় অপরাধই বোধ করেন, অনুগ্রহ

পূর্ব্বক জানাইয়া দিলে যথাবিধি প্রদত্ত শাস্তি গ্রহণেও আমাকে পরাঙ্মুখ মনে করিবেন না। আপাততঃ ভবৎসকাশে উপস্থিত হইয়া আপনকার সেবার্থ কায়োৎসর্গ করিতে না পারিলেও মনপ্রাণ দ্বারা যতটুকু সেব্য তাহার কোন প্রকার ত্রুটি করিতেছি ইহা সর্ব্বান্তঃকরণেই বিশ্বাস রাখিবেন; এবং সুযোগ প্রাপ্তি মাত্রই এ অধীনজনকে ভবদীয়ের শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত দেখিতে পাইবেন, তাহা নিউটন পণ্ডিত মহাশয়ের আবিষ্কৃত ভৌগলিক সত্যের মতই দৃঢ় জানিবেন। আপনার কায়িক আত্মিক এবং মানসিক সকল প্রকার মঙ্গলের জন্য শ্রীমজ্জগদীশ্বরের নিকট সতত প্রার্থনায় নিরত রহিলাম। আপনার কমনীয় করযুগলের স্পর্শসুখকণ্টকিত রক্তশঙ্খের সুকল্যাণে এই অকিঞ্চনের দেহ আশাতীতরূপে স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু মনপ্রাণ সম্বন্ধে কিছুই কথিতব্য নাই, উহা শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু হইয়া গিয়াছে—যখনই সেই শুভ উচ্চারণ করিয়াছি ‘যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম।’ যাক্ আপনি আমার যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করুন, অধিক আর কি বলিব?

আপনারই অনুগত দাসানুদাস, শ্রীহীন (সম্প্রতি) অমুক।”

নূতন বৌ সকৌতুকে হাসিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়ার উপক্রম করিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, “এযে মুখস্থ রাখারই মতন! কি অদ্ভুত চিঠি ভাই! কাগজে ছাপিয়ে দিলে বোধ হয় আদর্শ পত্র লিখনের মধ্যে স্কুলবুক সোসাইটী থেকে ঢুকিয়ে দেয়। আচ্ছা ঠাকুরজামাই কেন হাসির গান আর হাসির গল্প

লেখেন না? বোলো ভাই ওঁকে লিখতে, দেখো দুদিনে নাম হয়ে যাবে।"

মেনির উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বাহিরের দিকে পোঁ করিয়া শাঁখ বাজিয়া উঠিল, সকলকার উত্তেজনাপূর্ব্বক কলরবে জানাইয়া দিল ফুলশয্যার তত্ত্ব আসিয়াছে। মেনি তৎক্ষণাৎ বউকে কাপড় পরানো ছাড়িয়া উৎসুক হইয়া ছুটিল কুটুমবাড়ীর তত্ত্ব দেখিতে, আর নববধূ উৎকণ্ঠিত ও উৎকর্ণ হইয়া রহিল তার বাপের বাড়ীর লোকজনদের দেখিবার জন্য। মেনির সঙ্গে তারও সেখানে ছুটিয়া যাইবার জন্য মন ছুটিয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল, বাড়ীতে সকলেই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন যেন সে সেখানকার মতন যেখানে সেখানে ছুটাছুটি না করে, যেখানে বসাইয়া রাখিবেন যেন সেইখানেই বসিয়া থাকে ইত্যাদি। মনের ইচ্ছা মনেই দমন করিয়া সে দোরের কাছটিতে আসিয়া কপাট ধরিয়া দাঁড়াইল, তার চোখদুটি ছলছল করিয়া আসিল, জল বুঝি চোখ ছাপাইয়া ঝরিয়া পড়ে!

এমন সময় 'কৈ গো আমাদের ছোড়দি কেথায়?' বলিয়া একদল রঙ্গীন কাপড়পরা ঝি, তাদের প্রধানার পরিধানে তসরের ধুতি, আসিয়া উপস্থিত হইল।

আবার এদিক হইতে ভাসুরের সঙ্গে আসিয়া তার মেজদা ডাকিল, "মিনু!"

সুপ্রসন্ন হাসিতে মুখখানি যেন ভরিয়া গেল, সারাদিনের বউদেখার বধূর যে আসল রূপটুকু দেখা যায় নাই, এতক্ষণে তার সেই স্নেহপ্রেমভালবাসায় গড়া মমতাময়ী নারীমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া উঠিল।

“মা কেমন আছেন মেজদা? খোকা? অমিয়? দাদা?” যেন সে কতদিনেরই প্রবাসিনী!

—আগামী সংখ্যায়—

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্তের

জ্ঞানাঙ্কুর

প্রসঙ্গ

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

—১—

হিপ্‌ন্‌টিজ্‌ম

হিপ্‌নটিজ্‌মের কথা অল্পবিস্তর সকলেই জানেন। বাংলায় হিপ্‌নটিজ্‌মকে অনেকে সম্মোহন বলিয়া থাকেন। এই নাম বিশেষ উপযোগী নহে। আমি হিপ্‌নটিজ্‌মকে সংবেশন বলিতে চাই। সাধারণের মধ্যে সংবেশন সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। কেহ মনে করেন, এক ব্যক্তি অপরকে সংবেশিত করিলে সে তাহার দ্বারা যাহা খুসী করিয়া লইতে পারে। কেহ বা মনে করেন, সংবেশিত অবস্থায় ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল ঘটনার জ্ঞান মনে প্রতিভাসিত হয়; কোন্ ঔষধে কোন্ রোগী আরোগ্য হইবে, রেসে কোন্ ঘোড়া জিতিবে, কে গহনা চুরি করিল, কবে ভূমিকম্প হইবে, গণিতের দুরূহ প্রশ্নের উত্তর কি, ইত্যাদি সকল সমস্যার সঠিক উত্তর বুঝিবা সংবেশিত ব্যক্তি দিতে পারে। খবরের কাগজে প্রায়ই দেখা যায়, সংবেশনের প্রভাবে অমুক স্ত্রীলোক অমুকের প্রেমে পড়িয়াছে, খুনী বলিতেছে আমাকে অমুকে সংবেশিত করিয়া খুন করিয়াছে। এই সকল কথা যে অধিকাংশই অতিরঞ্জিত তাহা বলা বাহুল্য।

* * *

সংবেশনের নানাপ্রকার প্রক্রিয়া আছে। এই সমস্ত প্রক্রিয়ারই মূল সূত্র এই, সংবেশিত ব্যক্তির মনে ধারণা জন্মে যে তাহাকে সংবেশকের কথা মত চলিতে হইবে।

সংবেশকের কথায় অতিরিক্ত বিশ্বাসই সংবেশনের প্রধান ভিত্তি। স্বাভাবিক অবস্থাতেও আমরা নিজের বিচারবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরের কথায় চলিয়া থাকি। কেহ বা পরের কথায় বেশী আস্থাবান কেহ বা কম। অপর কেহ কোন এক বিশেষ ব্যক্তির অন্ধ আজ্ঞাবাহী। এই যে স্বাভাবিক বিশ্বাস প্রবণতা, হিপ্‌নটিজম্‌ বিদ্যায় ইহাকে ইংরেজীতে Suggestibility বলা হয়। সংবেশনের উদ্দেশ্য কৃত্রিম উপায়ে এই বিশ্বাস প্রবণতা বৃদ্ধি করা। যে কথা, যে ভঙ্গী বা যে উপায় দ্বারা বিশ্বাসপ্রবণতা বৃদ্ধি করা যায় তাহাকে ইংরেজীতে Suggestion বলে। আমি Suggestionকে অভিভাব বলিব। সংবেশিত ব্যক্তির মন সংবেশকের দ্বারা অভিভাবিত হয়। কি উপায়ের দ্বারা এই 'অভিভাব্যতা' বাড়ানো যাইতে পারে সংবেশক তাহারই অনুসন্ধান করেন।

* * *

একবার শুনিলে আমরা যে কথা অবিশ্বাস করি, বার বার শুনিতে শুনিতে সেই কথায় বিশ্বাস জন্মে। আমাদের মনের ইহাই বিশেষত্ব। সংবেশক যদি কাহাকেও বার বার বলিতে থাকেন, 'ঘুম আসিতেছে, ঘুম আসিতেছে'—তবে সে বাস্তবিকই ঘুমাইয়া পড়ে। পুনরুক্তি 'অভিভাব্যতা' জন্মাইবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। ঋজুপাঠে গল্প আছে, এক ব্রাহ্মণ একটি পাঁঠা কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছেন। তিন ধূর্ত্ত পাঁঠাটি হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে

ব্রাহ্মণের গন্তব্য পথে তিনটি বিভিন্ন স্থানে যাইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণের সহিত দেখা হইলে প্রথম ধূর্ত্ত বলিল, 'আপনি কুকুর কাঁধে করিয়া কেন যাইতেছেন?' ব্রাহ্মণ তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয় ধূর্ত্তের সহিত দেখা হইল। সেও ঐ কথা বলিল। ব্রাহ্মণের মনে সংশয় জন্মিল। তৃতীয় ধূর্ত্তও যখন সেই একই কথা বলিল, তখন ব্রাহ্মণ পাঁঠাটিকে মাটীতে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

* * *

কেবল পরের কথা বার বার শুনিলেই যে আমরা তাহার দ্বারা অভিভাবিত হই তাহা নহে, নিজেও যদি কোন কথা একাগ্রচিত্তে বার বার আবৃত্তি করা যায় তবে তাহাও আমাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বার বার যদি একাগ্রচিত্তে বলা যায়, আমার মাথা ধরা সারিয়াছে, তবে বাস্তবিকই অনেক সময় মাথা ধরা সারিয়া যায়। শরীরের উপর মনের প্রভাব অতি বিচিত্র। মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে গুরুতর শারীরিক ব্যাধির নিবৃত্তি অনেক সময় দেখা যায়। এই কারণে সংবেশন দ্বারা কোন কোন ব্যাধি আরোগ্য করা যায়। বালকবালিকাদিগের নানা প্রকার কুঅভ্যাস,—অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠ বদ্ধতা, হাঁপানি, দন্তশূল, মাথা ধরা, হিক্কা, অনিদ্রা প্রভৃতি রোগে সংবেশন ফলপ্রদ। সংবেশন দ্বারা সকল প্রকার ব্যাধি আরোগ্য হইতে পারে, এ ধারণা ভ্রান্ত।

সমালোচনা

নীল-লোহিত—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত, এবং ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে কমলা বুক ডিপো লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

যুগপ্রতিভার অদৃশ্য শাসন কাটাইয়া সাহিত্যে নব-নবত্বের সঞ্চার করার মত কঠিন কাজ আর কিছু নাই। রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব রচনায় এড়াইয়া চলা যে-কোন সাহিত্যিকের পক্ষে দুঃসাধ্য। রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত হইয়াও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী সেই সুকঠিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার বৈশিষ্ট্য তাঁহাকে রীতিকুশল সুরসিক লেখক বলিয়া পরিচিত করিয়াছে। যাহারা তাঁহার রচনাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলে, তাহাদের সংখ্যা অল্প নহে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর স্বাতন্ত্র্যের উপর অনেক নবীন লেখকের প্রতিষ্ঠা।

রচনায় একটি বিশেষ রূপ এবং বিশেষ ভঙ্গীর প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রখ্যাত শ্রীপ্রমথ চৌধুরী যখন গল্প-লেখায় হাত দিলেন তখন অনেকে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অথচ ইহাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না, কেন-না চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ‘সাহিত্য’ পত্রে ফরাসী গল্পের অনুবাদ করিয়া বাংলায় ছোট গল্পের প্রবর্ত্তনে তিনি অগ্রগামী হন। ‘চার-ইয়ারী কথা’র সচমকে চকিত শিক্ষিত-সমাজের কাছে ‘আহুতি’র ‘ফরমায়েসী গল্প’ তাঁহার খ্যাতি বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

‘নীল-লোহিত’ এগারটি ছোট গল্পের সমষ্টি।

প্রচ্ছদপটের ছবির মাথার পাগড়ি একদিকে নীল আর একদিকে লালে আঁকা বলিয়াই বইখানির এ আখ্যা নয়, পাগড়ির অধিকারীর নাম নীল-লোহিত। ঘটনাক্রমে একবার

এই অপরূপ শিরস্ত্রাণ পরিলেও নীল-লোহিত বাঙালী, বয়স তেইশ, গল্প বলিতে অদ্বিতীয়। সব গল্পই তাঁর অসাধারণ জীবনের ঘটনা। বন্ধুরা বলিত নীললোহিত মিথ্যাবাদী। গ্রন্থকারের মতে, 'নীল-লোহিত যা বলতেন, সে সবই হচ্ছে কল্পলোকের সত্য কথা।' প্রথম গল্পটিতে নীল-লোহিতের চরিতাখ্যান, দ্বিতীয়টিতে তাঁর সৌরাষ্ট্র-লীলা, তৃতীয়টিতে তাঁর স্বয়ম্বর। 'ছোট গল্পে'র পাঠক-পাঠিকার নিকট তাঁর আদি প্রেমের তত্ত্বও সম্প্রতি আর অজ্ঞাত নহে।

আর আটটি গল্প—নীল-লোহিতের কথা নয়। 'ছোট গল্পে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত চৌধুরী মহাশয়ের চমৎকার 'সেকেলে গল্প'টি বইয়ে 'দিদিমার গল্প' নাম পাইয়াছে। তাঁহার গল্পগুলির একটি নিজস্ব গতি আছে। চরিত্রের প্রতি সহানুভূতির বশে বা অভাবে গ্রন্থকার গল্পকে মুচড়াইয়া ইচ্ছানুযায়ী বিকৃত করিয়া লন না। প্রত্যেক গল্পের নিজের সত্ত্বা বজায় রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে গল্প বলা শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর বিশেষত্ব। তিনি কলাবিৎ। 'সুনিপুণ চিত্রকরের তুলির প্রতি আঁচড় যেমন চিত্রকে রেখার পর রেখায় ফুটাইয়া তোলে,' তাঁহার নীল-লোহিতের মতন তিনিও 'কথার পর কথায় তাঁহার গল্প ফুটাইয়া তোলেন।' অথচ সে কথার একটিও অপ্রাসঙ্গিক নয়, অসঙ্গত নয়, অনাবশ্যক নয়। আলাপ-আলোচনায় যেখানেই কথার উপর কথার ঘা পড়িয়াছে, সেই-খানেই স্ফুলিঙ্গের মত তাহার রস-রসিকতা ঠিকরিয়া উঠিয়াছে। 'নীল-লোহিত' রসলিপ্সু পাঠকের আদরের বস্তু হইবে।

চিত্র ও চরিত্র

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে, ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রচলনের সময়, প্রতীচ্য সভ্যতার মোহ, মদের মত তখনকার তরুণ বাঙালীকে পাইয়া বসিয়াছিল। এই 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের শিক্ষিতশ্রেষ্ঠদের একটি অদ্ভুত নামকরণ হইয়াছিল—এজুরাজ। আহারে বিহারে, বসনে ভূষণে, আচারে ভাষণে ইঁহারা ইংরেজ হইবার অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন এই শিক্ষার ফল। তাঁহার জীবনে ইহার দোষগুণ চরমভাবে প্রকটিত হইয়াছিল।

মধুসূদনের সতীর্থ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন—হিন্দু কলেজের ছাত্র। কিন্তু নৈষ্ঠিক এবং পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাঁহার জন্ম। গৃহের প্রাচ্য এবং বিদ্যালয়ের পাশ্চাত্য প্রভাব তাঁহার চরিত্রকে অপূর্ব্বভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল। দোটানায় পড়িয়া সে জীবন ব্যর্থ হয় নাই। উভয় শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ হইয়া তিনি চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন।

ভূদেব ১৮২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মধুসূদনের সমবয়সী, মাত্র এক বৎসরের ছোট। বার তের বৎসরের বড় হইলেও, তাঁহার সহিত বয়ঃকনিষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রীতিপূর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরেজী এবং সংস্কৃতে পরিপূর্ণরূপে শিক্ষিত হইয়াও বাংলা সাহিত্যকে ভূদেব একান্তভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'পারিবারিক প্রবন্ধ'—তাঁহার সাহিত্যকীর্ত্তি।

আমরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই সাহিত্যের একটি দিকের প্রাধান্য দিই। রস-সাহিত্য চিরদিনের আদরের বস্তু। তাই বলিয়া জ্ঞান-সাহিত্যকে আমরা কেন ভুলিয়া যাইব? ভূদেবের সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তারাশি প্রবন্ধে রূপ পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞান সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

ভূদেব বঙ্গের শিক্ষাবিস্তারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। শেষে শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ তিনি লাভ করেন।

গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া হিন্দুর বৈশিষ্ট্যের একটি কথা উঠিয়াছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই বৈশিষ্ট্যের প্রথম সূত্রকার এবং প্রথম ব্যাখ্যাতা।

নবজীবনের একটি ব্যঙ্গ কবিতায় হেমচন্দ্র 'বাঙালি বাঘ' নামে অভিহিত করিয়া তাঁহার কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।—

'ইংরেজি শিক্ষার ফুল বাঙালি-শিকড়ে

* * *

তর্কেতে তক্ষক যেন তেজে তেজপাতা,
শিক্ষাব্রতে সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

সতেজ অথচ প্রশান্ত এবং প্রসন্ন বদন, সবল দেহ, বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু এবং আত্মনির্ভরশীল ভাব তাঁহাকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

কর্ম্মের মূলে চিন্তা এ কথাটি ভুলিয়া যাই বলিয়া ভাবুক ও কর্ম্মীর শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া তর্ক করিয়া মরি। সভায় আলোচনা চলিতেছিল. উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কে? অধিকাংশ সভ্যই তাঁহাদের নাম উত্থাপিত করিলেন, যাঁহাদের আমরা কর্ম্মবীর বলি। দেখিলাম ভাবুক অথবা কবিকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে সকলেই সঙ্কুচিত। যিনি কর্ম্মী তিনি মহৎ, একথা স্বীকার করি। তবুও আমার সন্দেহ হয়, বিচার করিয়া, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সময় আমরা এই স্থূল চর্ম্মচক্ষু দুটা দিয়াই দেখি, অন্তরের তৃতীয় নেত্রটি বন্ধ থাকে। ভাবুক বা কবিকে শ্রেষ্ঠ বলিতে শিহরিয়া উঠি। আরে ছি ছি, যে লোকটার কাজ আমরা হাতের মুঠার মধ্যে ধরিতে পারিলাম না, আঙুলের স্পর্শে ছুঁইতে পারিলাম না, নিঃশ্বাসে আঘ্রাণ করিতে পারিলাম না, জিহ্বায় যাহার রসের আস্বাদন পাইলাম না, তাহাকে কেমন করিয়া শ্রেষ্ঠ বলি!

* * *

তৃতীয় নেত্র নিমীলিত করিয়া এমনি অনায়াসেই আমরা বিচার করিয়া চলি। কিন্তু ইহাই কি সত্য? চিন্তা স্থূল শরীর পরিগ্রহ করিয়াই কি জিতিয়া যাইবে? সাহিত্যে যে ভাব সমূহের সাক্ষাৎলাভ করি, তাহাদের ছুঁইতে পারিনা ধরিতে পারিনা বটে, তাহাদের উপকার প্রত্যক্ষ করিবার উপায়

নাই সত্য, তাই বলিয়া তাহাদের শক্তিকে,—মানুষের মনোরাজ্যে তাহারা যে গতিবেগ সঞ্চার করিয়া বিপ্লবের সূচনা করে সেই বেগকে, তুচ্ছ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের যেন না ঘটে। সেই চিন্তার তড়িৎ আমাদের চারিদিকের আকাশে যে স্পন্দন তুলিয়া দিয়া যায় অনন্ত কালেও তাহা আর থামিবার অবসর পায় না। এবং সেই প্রত্যক্ষ কম্পনের আঘাতে এই দৃশ্য জগৎ দিনে দিনে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে। তথাপি আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, কর্ম্মী ও ভাবুকের মধ্যে মূলতঃ একটা অসামান্য পার্থক্য নাই। উভয়ের শক্তি একই ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিয়াছে। সেই শক্তির ব্যবহারের প্রকরণে একটা প্রভেদ দেখিতে পাই মাত্র—ফুল হইয়া যাহা বিকশিত হইয়া উঠিল, ফল হইতে তাহার বাধা ছিল না, কেবল অবস্থার সন্নিবেশে ফুল হইল ফুল এবং ফল হইল ফল। কর্ম্মের ফলকেই বড় করিয়া দেখিবার রুচি ও প্রবৃত্তি কাহারও কাহারও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল হইতে পারে, ফুলকে আদর করিবার লোকের অভাব কিন্তু দেবতা হইতে মানুষের মধ্যে আজও হয় নাই।

দিন-পঞ্জী

নয়া দিল্লী, ৪ঠা মার্চ্চ—এইরূপ জানা গিয়াছে যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় 'হোয়াইট পেপার' প্রকাশে বিলম্ব বাঞ্ছনীয় নহে। মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে—১৫ই হইতে ২০শের মধ্যে 'হোয়াইট পেপার' প্রকাশ করার ব্যবস্থা হইতেছে।

টোকিও, ৪ঠা মার্চ্চ—জাপানী বিমানপোত জেহল সহরের উপকণ্ঠস্থিত চীন সৈন্যদলের ব্যূহে বোমা বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করে। জাপানী সৈন্যদল জেহল সহর অধিকার করিয়াছে। চীন সৈন্যদল 'ল্যানপিং রাস্তা' দিয়া পশ্চিমদিকে পলায়ন করে। এই রাস্তা পিকিং অভিমুখে গিয়াছে।

বোম্বাই, ৪ঠা মার্চ্চ—শ্রীযুক্তা সরোজিনী নায়ডুর ভগিনী শ্রীযুক্তা সুহাসিনী নাম্বিরায় অদ্য প্রাতে জার্ম্মাণীতে তাঁহার স্বামী নারায়ণ নাম্বিরায় ও শ্রীযুক্তা নায়ডুর পুত্রের গ্রেপ্তারে ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, কার্ল মার্কস ও এলজেলসের দেশে আর এক মুসোলিনী হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হার হিটলারের ঝটিকা-বাহিনীর ভ্রূকুটিভঙ্গে যাঁহারা অবনত হইতে না চাহেন তাঁহাদের গ্রেপ্তার অবশ্যম্ভাবী।

আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে

আর ইনজেক্‌সান লইতে হইবে না

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

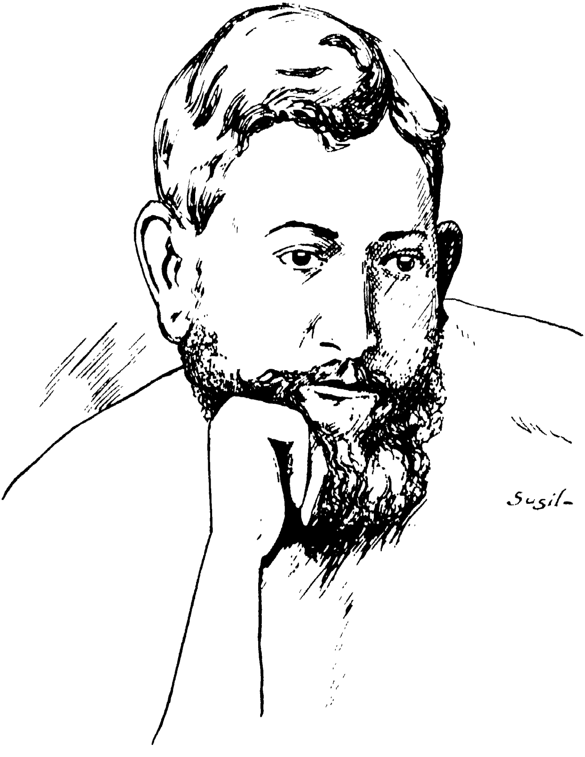

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ছোট গল্প

১ম বর্ষ]   ৪ঠা চৈত্র ১৩৩৯   [৩৬শ সংখ্যা

জ্ঞানাঙ্কুর

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

মহেশ্বর মিত্র যে যৌবনে অত্যন্ত সৌখীন পুরুষ ছিলেন তাহার নিদর্শন এখন তাঁর আপাদমস্তকে কোথাও নাই—তখনকার সেই ঘোর-বাবুটিকে এখন দেখিলে চেনা যায় না; কিন্তু তাঁর সৌখীনতার অনেক কাহিনী এখনও জনরবের বাহনে চলা ফেরা করিতেছে—আর, তার সবগুলিই নির্ম্মল নহে। এখন মহেশ্বরের দেহ স্থূল হইয়া কোমর মোটা বেঢপ্ দেখায়—পশ্চিমা ভৃত্য রামকেতন মেদরাশি মর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে আরাম দেয়। মহেশ্বরের চোখে ছায়া নামিয়াছে—সে দীপ্তি নাই; তাঁহার চক্ষু এখন যাহা দেখে

তাহা যেন পুরাতনেরই নামান্তর বা পুনরাবৃত্তি—চোখ আছে বলিয়াই চাহিয়া দেখা ছাড়া উপায় নাই, কিন্তু সে দেখায় রস নাই, লিপ্ততা আসে না। কিন্তু যৌবনে তিনি এমন নিস্পৃহ ছিলেন না—তখন তাঁর সৌন্দর্য্যবোধ ছিল, চারিদিকে সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান করিতেন, সৌন্দর্য্য ভোগ করিবার সুযোগ খুঁজিতেন, আয়ত্তাতীত বুঝিলে ক্ষুণ্ণ হইতেন।

লোকে বলে নানাকথা—

কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধের আর রসলিপ্সার বিশ্বাসযোগ্য একমাত্র তর্কাতীত প্রমাণ তাঁহার এবং তাঁহার পার্শ্বেই উপবিষ্টা স্ত্রীর অর্থাৎ তদানীন্তন নবদম্পতির ঐ চিত্রখানা—সস্ত্রীক ফটো তুলাইয়া বিলাতী শিল্পীর দ্বারা তাহা বৃহদাকার করাইয়া আনিয়াছেন—চতুর শিল্পী যুবক-যুবতীর অন্তরের ভাষাতীত ভাষা চোখে মুখে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

মহেশ্বর মিত্রের স্ত্রী অসিতার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়—মহেশ্বর সে বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ...ঐ অতুল রূপপুঞ্জ তাঁর সম্ভোগ্য, তাঁর অধিকার অবিসম্বাদিত—রূপৈশ্বর্য্যের একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে তিনি যত গর্ব্বিত তত আনন্দিত। ...তাঁর বসিবার ভঙ্গীতে, চাহনির ভঙ্গীতে, অধরের ভঙ্গীতে একটা ধূর্ত্ত অথচ নিশ্চিন্ত লালসালিপ্ততা ফুটিয়া আছে—অর্থাৎ ঐ ছবিখানি দেখিলেই মহেশ্বরের মনেরও একটা ছবি চোখে না পড়িয়া পারে না; অক্লেশেই বুঝা যায় মহেশ্বর মিত্র যৌবনে সৌন্দর্য্যের নিষ্ঠাবান উপাসক ছিলেন, রসিক

ছিলেন—অদ্বিতীয় সুন্দরী রমণীকে স্ত্রীরূপে লাভ করিয়া তিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

ছবিখানি তাঁর তখনকার শয়নকক্ষের দেয়ালে টাঙানো হইয়াছিল—সেখানেই আছে। এমনি কৌশলে তাহাকে স্থাপিত করা হইয়াছে যে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাহিরের রৌদ্রের প্রতিফলিত আভা সেই ছবির উপর পড়িয়া আলোকাতীত একটা সূক্ষ্ম শ্রীমণ্ডিত হইয়া ছবির শোভা যেন কানায় কানায় ভরিয়া ওঠে...প্রেমাবেশে ঢলঢল চারিটি চক্ষু এমন সত্য হইয়া ওঠে যে, শরীরে রোমাঞ্চ জাগে।

কিন্তু বহুবার দেখিয়া দেখিয়া সে ছবি বাড়ীর লোকের কাছে পুরাতন হইয়া গেছে। ছবি যাহাই বলুক, ছবি যাঁহাদের তাঁহারা এখন অন্য মানুষ। মনে হইতে পারে, মহেশ্বর এখনও বুঝি তৎকালীন মানসাভিসারসুখ ঐ অমর অভিজ্ঞান চিত্রের মারফৎ উপভোগ করিতে চান—তাঁর যৌবনের সহচরী এখনো বুঝি বন্ধন-উল্লাসে তেমনি বিহ্বল হইয়া রহিয়াছেন! কিন্তু তাহা সত্য নহে। মহেশ্বর মিত্র বিস্তর ভূসম্পত্তির আর কাঞ্চনের মালিক হইয়াও যথাসময়েই বিলাস-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্যসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃত্রিম উপায়ে রক্তকে উত্তেজিত করিলে সেই উত্তেজনার অনুপাতে মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা তিনি

জানেন। তিনি এখন অরণ্যবাসী, অর্থাৎ বৈঠকখানায় শয়ন করেন, মালা ধারণ করিয়াছেন, ঈশ্বরচিন্তা করেন, ইত্যাদি।

মহেশ্বর মিত্রের তিনটি পুত্র, চারিটি কন্যা। প্রথম সন্তান পুত্র, নাম সুখেন্দ্র—সুশিক্ষিত এবং বিবাহিত এবং কয়েকটি সন্তানের জনক; দ্বিতীয় সন্তান কন্যা, মালতী, বিবাহিতা এবং কয়েকটি সন্তানের জননী; তারপর কন্যা, বকুল—বিবাহিতা; তারপর পুত্র দীনেন্দ্র, অবিবাহিত; তারপর কন্যা গোলাপ, বিবাহিতা; তারপর পুত্র ধনেন্দ্র, অবিবাহিত এবং কলেজের ছাত্র; তারপর সপ্তম এবং শেষ সন্তান কন্যা শতদল, অবিবাহিতা।

পুত্র কন্যার অল্প-বয়সেই বিবাহ দেওয়া মহেশ্বর মিত্র পছন্দ করেন না। ছেলেমানুষ বাপ-মায়ের ছেলেমেয়ের হাড় মোটা হয় না বলিয়া তাঁর ধারণা।

মহেশ্বর সস্ত্রীক সুখী—তাঁহার সংসারে অশান্তি নাই। ছেলেরা মেধাবী, কথার বাধ্য; জামাই তিনটি কৃতবিদ্য, অর্থবান; মেয়েরা সুন্দরী; বিবাহিত তিনটি সুখে স্বামীর ঘর করিতেছে—পিতৃ-গৃহে আসিবার জন্য তাহারা সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্ করে না, কিন্তু হামেসাই খোঁজ-খবর লয়।...অনুরাগে, স্বাচ্ছন্দ্যে, নির্ব্বিরোধে, উন্নতিপরম্পরায় সুসজ্জিত হইয়া, তৈল-মসৃণ চক্রের মত নিঃশব্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে—

এমন সময়, পদ্মার সুবিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যস্থলে যেমন রুক্ষদেহ বালুচর পিঠ তোলে, তেমনি, বৃহৎ এবং অবাধগতি মহেশ্বরের সংসারে একটি বিরুদ্ধ শক্তি হঠাৎ মাথা তুলিল......

মহেশ্বরের কানে পৌঁছিল, মধ্যম পুত্র দীনেন্দ্র নাকি অন্তঃপুরে প্রকাশ করিয়াছে যে, বিবাহে তার রুচি নাই। তাঁহার সংসারের নিয়ম প্রতিপালনে পুত্রের এই অনিচ্ছা অর্থাৎ পুত্রের দুঃসাহস দেখিয়া মহেশ্বর মিত্র একটু হাসিলেন মাত্র—বিচলিত হইলেন না। পুত্রের বিদ্রোহ দমন করিয়া তাহাকে নিজের ইচ্ছানুবর্ত্তী করিতে তিনি সক্ষম। ছেলে-গুলিকে তিনি নিজের হাতের কাদার পুতুল মনে করেন—তাদের ভাঙা গড়া রূপ দে'য়ার কাজে তাঁর নিজের অঙ্গুলি চালনাই চরম শক্তি। ...আর একটা কথা এই যে, এই ছেলেটিকেই তিনি মনে মনে বেশী পছন্দ করেন—মনে মনে করিলেও অন্যান্য মন তাহা টের পাইয়াছে। এই ছেলেটির চেহারা ঠিক বাপের মত বলিয়াই ঐরূপ মানসিক পক্ষপাতিত্ব ঘটিয়াছে—ইহাই সকলের বিশ্বাস। দর্পণে নিজের মুখের ছায়া সকলেরই ভাল লাগে ইহা সত্য; সুতরাং আত্মজ সজীব প্রতিচ্ছায়াকে আরো ভাল লাগিবে ইহা ত খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া পুত্রকে যথেচ্ছাচারী হইবার স্বাধীনতা দিবার লোক মহেশ্বর মিত্র নয়; মনের কোনো অংশে দুর্ব্বলতা থাকিলে তিনি ধনে মানে সবাইকে ডিঙ্গাইয়া এমন অটল অভ্রভেদী হইয়া উঠিতে পারিতেন না।

গ্রাজুয়েট বুড়ো বুড়ো ছেলেদের এখনও এমন সাহস জন্মে নাই যে, জোরে জোরে পা ফেলিয়া জুতার শব্দ করিয়া বাপের সুমুখ দিয়া যায়—জুতা সমেৎ পা টিপিয়া টিপিয়া তারা যেন ভয়ে ভয়ে কাটাইয়া ওঠে।

দীনেন্দ্রের বয়স ছাব্বিশ।

মেয়েরা সবাই সুন্দরী; কিন্তু সকলের সেরা সুন্দরী ছোট মেয়ে শতদল—শেষ ফুলটির উপরেই যেন বিধাতার সকল স্নেহ ঢালিয়া পড়িয়াছিল। অন্তঃপুরে যাহাদের যাতায়াত আছে, শতদলের দিকে চাহিয়া তাহারা কতবার যে অবাক্ হইয়া গেছে তাহার ইয়ত্তা নাই; শতদলের রূপ দেখিয়া ফুরাইবার নয়, তুলনা দিয়া বুঝাইবার নয়—

তাহার তুলনা তার মা; তার মা যৌবনে যেমন সুন্দরী ছিলেন, শতদল ঠিক তেমনি সুন্দরী—এবং তাহার রূপের ইহাই শেষ কথা।

শতদলের বয়স পনর—

নারীরও মনে হয়, কালপ্রবাহের মুহূর্ত্তগুলিকে যেন অসহ্য বিস্ময়ে পুলকে জর্জ্জরিত করিয়া দিয়া শতদলের বয়োবৃদ্ধি এক দুই করিয়া গণিয়া গণিয়া পায়ে পায়ে এই পঞ্চদশে পৌঁছিয়াছে...

প্রতিবেশিনী শৈলসুতা হাসিয়া বলেন, "শতদলকে দেখলে আমার মনে হয়, স্বর্গদর্শনে যে পুণ্য হয় সেই পুণ্য আমার লাভ হল।"

শতদলের বিবাহের কথা চলিতেছে।

রূপের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া রাজতুল্য ঐশ্বর্য্যবান একটি ব্যক্তি নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত শতদলের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া পুত্রসহ এবং অনুগ্রহপ্রার্থীর মৃদুতা লইয়া মহেশ্বর মিত্রের দরবারে আসিয়াছিলেন; কিন্তু মহেশ্বর মিত্র তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন কেবল এই কারণে যে, ছেলেটি, তাঁহার মতে, দেখিতে তত সুশ্রী নয়।

শ্রেষ্ঠ কাঞ্চনকুলীনের ঘরে শতদলের এখনই বিবাহ হইয়া যায়, যদি মহেশ্বর ইচ্ছা করেন—বিনা পণেই হইতে পারে; কিন্তু ভাবী জামাতা অদ্বিতীয় রূপবান না হইলে কন্যার বিবাহ দিবেন না, এই তাঁর পণ।

কিন্তু সে-কথা যাক।

বিবাহ করিবে না, এই ইচ্ছা দীনেন্দ্র গোপনে পোষণ করিত কিন্তু তাহা আর গোপন নাই; এবং গোপনে সে আরো কিছু করিত, তাহাও আর গোপন রহিল না। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার পুস্তকগুলি পড়া শেষ করিয়াছে—সে অনেক; তবু তার বই পড়িবার আকাঙ্ক্ষা মেটে নাই। সে পড়ে, নাটক নয়, নভেল নয়—চিত্তরঞ্জনী লঘু সাহিত্য লইয়া কলাবিলাসিতা সে করে না; সে পড়ে ইতিহাস, ব্যক্তির আত্মার প্রস্ফুটনের,

প্রাণের জাগরণের, লক্ষ্যের সন্ধানে ব্যগ্রতার, চিন্তার পরিপুষ্টির, ব্রহ্মচর্য্যপালনের, জনসেবকগণের অনাহত আত্মদানের...দেশ বিদেশের সাধুগণের জীবন-কথা লইয়া চিন্তা করে, আর প্রলুব্ধ হয়।

দীনেন্দ্র তাহার নিভৃত কক্ষ হইতে একদিন প্রচার করিল যে, মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, মুশুরির ডাল, পান এবং আরো কয়েকটি অনুপকারী বস্তু সে অদ্য হইতে চিরজীবনের জন্য ত্যাগ করিল—সে আতপান্নে কয়েক বিন্দু গব্যঘৃত নিক্ষেপ করিয়া তাহাই আহার করিবে—তাহাও দু'বেলা নয়, একবেলা; এবং ভাতে লবণ না লইয়া যদি চলে তবে লবণও লইবে না।

এই বৈরাগ্যের নিদারুণ বার্ত্তা অতর্কিতে শুনিয়া তাহার মা অসিতাবরণী চমকিয়া উঠিলেন; দাদা সুখেন্দ্র অবজ্ঞার হাসি হাসিল; ভগিনীরা চিন্তিত হইল...ইহা যৌবনের ধর্ম্ম এবং তার অহৈতুকী ভাবাতিরিক্ততা মনে করিয়া পিতা মহেশ্বর মিত্র বৈঠকখানায় বিরক্তি বোধ করিলেন...

তা করুন—

এদিকে দীনেন্দ্র ত্যাগের দিকে আর একটু অগ্রসর হইয়া গেল; সুকোমল শয্যা অর্থাৎ গদি তোষক পাশ-বালিশ নামাইয়া দিয়া দুইখানি কম্বল তুলিয়া লইল—একখানি সাদা, একখানি কালো।

এই সব কৃচ্ছ্রসাধনা দেখিয়া একটা সন্দেহ জাগিল যে, পিতার মুখাবয়বের মত যদি পুত্রের মুখাবয়ব হয় সেই পুত্র সুখী

হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা কি সত্য ?...সুখে থাকিতে ভূতে কিলায়, তাহাই বুঝি কাজে কর্ম্মে এই গৃহেই ঘটে !

দীনেন্দ্রের ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থান এখন প্রায়ই কুঞ্চিত হইতে থাকিতে দেখা যায়।

বৈঠকখানায় বসিয়া দূতের মুখে মহেশ্বর মিত্র সব শুনিতেছেন কিন্তু টলিতেছেন না—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস একটি ধমকেই সব 'বেয়াড়াপনা' সিধা হইয়া যাইবে। পুত্রের বৈরাগ্য এখনো এতদূর অগ্রসর হয় নাই যে, বাক্যব্যয় করিতে হইবে। স্ত্রীকেও তিনি তাহাই বুঝাইয়া বলিয়া বৃথা অশ্রুমোচন করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। দেখা যাক, ছেলের খেয়ালের দৌড়ই কতদূর।

দীনেন্দ্রের বিবেচনায় পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরাম ইঁহারা কেহই নন—পরমহংসদেব। নারীর সঙ্গে যাঁর যতটা সংস্রব ঘটিয়াছে তাঁর আদর্শের উচ্চতা ঠিক সেই পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া গেছে ; দৈবী পার্থক্য ঘুচিয়া তিনি তখন সাধারণের পংক্তিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—পরে উৎকৃষ্ট কথা যতই বলুন, আর উৎকৃষ্ট আচরণ যতই করুন। পরমহংসদেবই একমাত্র উপাস্য—অনুবর্ত্তনের যোগ্য, অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য্য আর সহজ ঐশী সূক্ষ্ম জ্ঞানের জন্য। তাঁহাকে অশক্ত বলিবার উপায় নাই ; বুদ্ধদেব বা চৈতন্যদেবের মত তিনি নবধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে প্রচার করেন নাই,

কিন্তু তাঁহার চিৎশক্তির কণামাত্র লাভে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ যে কর্ম্মক্ষেত্র সম্মুখে উন্মুক্ত দেখিয়াছিলেন তাহা অলৌকিক; স্বামীজির শক্তি এখনো জাগ্রত—ভগীরথের শঙ্খধ্বনির মত তাঁর কণ্ঠ এখনো দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত হইতেছে; পতিতপাবনী সুরধুনীর মত এখনো সে কর্ম্মের ধারা হিন্দুস্থানে প্রবাহিত!...আরো আনন্দের কথা এই যে, স্বামীজি কোনো অনির্দ্দিষ্ট বা অজ্ঞাত থিয়োরীকে খাড়া করিতে ছুটাছুটি করেন নাই—শাশ্বত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং তাহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মজ্ঞান মানুষের অন্তরে সঞ্জীবিত আর সঙ্ঘের সংহতি শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গেছেন। এমন যে শিষ্য, তাঁহাকে প্রণাম। তাঁর কর্ম্মসাধনা ছিল আধ্যাত্মিকতারই স্বচ্ছ অভিব্যক্তি—মানুষকে মানবতার দিকে উন্মুখ করিয়া বিপ্লবসৃষ্টির জন্য যে সাধনসামর্থ্য আর পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগরীতির প্রয়োজন তাহা তিনিই আবিষ্কার করিয়া দেশকে বাক্‌সর্ব্বস্বতার ঊর্দ্ধে তুলিয়া দিয়াছেন। শিষ্য যে শক্তির আধার হইতে এই অপরিমেয় যোগবল গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শক্তিধরকে প্রণাম।...এত শক্তির মূলে ছিল অম্লান ব্রহ্মচর্য্য।

দীনেন্দ্র মনে মনে পরমহংসদেবের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যরক্ষাই হইল তার প্রধান লক্ষ্য—সকল সাধনার প্রথম সূত্র; উহাতে চিন্তা করিয়া একটা পদ্ধতি নির্ণয়ের প্রয়োজন নাই। ...আর্ত্ত আতুরের সেবার ব্রত

কোন্ আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গ্রহণ করা যাইবে তাহা ক্রমশঃ বিবেচ্য। ২১শে ফাল্গুনের দেরী আছে। ২১শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—ঐ দিনেই চূড়ান্ত হইবে।

যে অধমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিবার উপায় নাই, অথচ চক্ষুলজ্জার কাতরতা আছে, উত্তমর্ণের সঙ্গে দৈবাৎ চোখাচোখি হইয়া গেলে সে যেমন ভাঙিয়া পড়ে, পথে স্ত্রীলোক দেখিলে দীনেন্দ্রের বিপদ হয় তদ্রূপ—তার বুক ধড়পড় করে, মাথা হেট হইয়া যায়।

এ ত হইলই; আরো হইল ইহাই যে, বাড়ীতে যে গানের কল আছে তাহার অনেক গানই দীনেন্দ্রের অশ্রাব্য হইয়া উঠিল...থাক্ তাহাতে কলাশ্রী আর কণ্ঠলালিত্য, হউক তাহা সহজিয়া ধর্ম্মের নামে, কিন্তু দৈহিক লালসার উৎকটতা তাহাতে আছে। নারীকণ্ঠের প্রেমকাকুতি কলের মারফৎ কানে পৌঁছিলেও একবারে নির্ব্বিষ নির্জ্জীব ত সে নয়! প্রাণের কোটরে মৌচাক জমিয়া উঠিতে কতক্ষণ!

শতদল গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করে,—মেজদা সত্যই সন্ন্যাসী হবে নাকি?

দীনেন্দ্র বলে,—সাধ্য কি? তোমরা ঘিরে রয়েছ যে!

—আমরা সবাই সরে গেলে ত তোমার ঘরই হবে মঠ! তোমাকে সে সুযোগ দেবার উপায় থাকলে আর আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতে আস্‌ব কেন?

—আমার সময় নেই এখন। পড়ছি।

—তা ত দেখছিই। পড়ে শেখা যায়, কিন্তু কষ্টসহ হওয়া যায় না—ওটা অভ্যাসের দরকার।

দীনেন্দ্র একটু নিঃশব্দ থাকিয়া বলিল,—তা জানি।

শতদল পুনরায় বলিল,—আমার কিন্তু বিশ্বাস, তুমি পেরে উঠ্‌বে না—সে বেজায় কষ্ট। দেখেছি ত! শীতে বাদলে বেচারাদের কষ্টের অবধি থাকে না। সেবার ত এখানেই এক সন্ন্যাসী ফুস্‌ফুসে শ্লেষ্মা জমে মরেই গেল! …এখন বই পড়ে তোমার মন খারাপ হয়েছে মাত্র। …সে যা-ই হোক্, আমি একটা খবর নিয়ে এসেছি—দুঃসংবাদটা দেবার ভার আমার ওপরেই পড়েছে। তোমার বিয়ের ক নে আর দিন বাবা ঠিক করেছেন। তোমার যদি অমত থাকে তবে বাবাকে ব'লো। বলিয়া শতদল একটু হাসিল…

বইয়ের উপর হইতে হঠাৎ দৃষ্টি তুলিয়া দীনেন্দ্র শতদলের এই হাসিটা দেখিল। পিতার কাছে দাদা কত ক্ষুদ্র, এবং দাদার এই সন্ন্যাসগ্রহণের কথাটাকে তার প্রস্তাব আকাঙ্ক্ষা সঙ্কল্প লক্ষ্য আয়োজন ইত্যাদি সুদৃঢ় ভাষায় যাহাই বলা হউক, আর যতই তাহাকে দুস্তর আর দুরূহ মনে হউক, তাহা যে পিতার কেবল নিঃশব্দ ভ্রূভঙ্গির সম্মুখেই কত দুর্ব্বল, এই ইঙ্গিতই ছিল শতদলের হাসিতে—দীনেন্দ্রের তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না—

দীনেন্দ্রের মুখ চোখ এক মুহূর্ত্তের জন্য লাল হইয়া উঠিল; বইয়ের দিকে চোখ তাকাইয়া সে বলিল,—বাবাকে বল্‌ব।

—ব'লো; কিন্তু ফল হবে আশা করো? বলিয়া পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া শতদল দেখিল, মা আসিয়াছেন।

পুত্র ভোগবিলাসিতার বিরুদ্ধে কায়মনে তীব্র হইয়া অভিযান করিয়াছে দেখিয়া প্রাণে ছ্যাঁৎ করিয়া একটা আঁচ লাগিলেও, এবং তাহার জন্য বিলাপ করিলেও, দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইবার দরকার আছে ইহা অসিতাও মনে করেন নাই। পুত্রকে আতপান্ন ভোজন করিতে দেখিয়া তাঁহার কান্না পায়, কিন্তু তিনি ছেলেদের চেনেন—ছেলেদের পিতাকেও চেনেন। মহেশ্বর মিত্র ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। কেতাবী শিক্ষা তাহাদের কতদূর হজম হইয়াছে তাহা জানা নাই—কিন্তু পিতৃভীতি তাহাদের মজ্জাগত হইয়া গেছে...সকল শিক্ষার উপর এই শিক্ষাই নির্ণিমেষ একটি শিখার মত জ্বলিতেছে যে, পিতার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। বাড়ীর সকলেই তাহা জানে। পুত্র কন্যার খেয়াল কোনোদিনই তাহার পক্ষে সমস্যা হইয়া ওঠে নাই। সুতরাং দীনেন্দ্রের সন্ন্যাসানুরাগ অর্থাৎ আতপান্ন আর কম্বল দেখিয়া ক্লিষ্ট বই ভীত হইবার কি আছে?...মহেশ্বর খবর দিলে অন্তরালে উহারা বিস্তর হাসাহাসি করিয়াছেন, এবং বিবাহের কন্যা আর দিন

একেবারে স্থির হইয়া গেছে সেই সংবাদটা এখন দীনেন্দ্রকে দেওয়া যাইতেছে।

মাকে দেখিয়াই শতদল হাসিয়া বলিল,—মা, মেজদা বল্‌ছে যা বল্‌বার আছে বাবাকেই বল্‌বে।

অসিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিয়ের কথা বুঝি?...মেয়েটি খুব সুন্দরী রে! দেবে থোবেও ঢের—তোর অমত আছে না কি?

দীনেন্দ্র ব্যথিত হইল—

তার মনে হইল, জননীর এই বিস্ময়প্রশ্ন অত্যন্ত নিষ্ঠুর—জানিয়াও না জানার এই ভাণ তিনি করিয়াছেন, তাহাকে না হোক, তার প্রাণাধিক প্রিয় অভিলাষটিকে তুচ্ছ মনে করিয়াই ত! কিন্তু যে ব্যক্তি সেবাব্রতী হইতে যাইতেছে তাহার মনে যেমন ঘৃণা আর কুণ্ঠা থাকিবে না, তেমনি ক্রোধও থাকিবে না।

দীনেন্দ্র বই রাখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কাতরকণ্ঠে বলিল,—অমত আমার আছে, মা। ...তোমরা আমায় বড় ছেলেমানুষ মনে করেছ। আমায় কিছু সময় দিলে কিছু ক্ষতি হ'ত না ত।

অসিতা বলিলেন,—তাড়াতাড়ি ত আমরা করছিনে; সময় এখনো ঢের আছে, প্রায় ছ-মাস। আর তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করতেও ওঁর বারণ আছে। তোকে জানিয়ে রাখলাম মাত্র।

দীনেন্দ্র একটু ভাবিয়া বলিল,—আমাকে দায়িত্ব দিয়ে রাখলে বুঝি মা, যাতে পালাতে না পারি! কিন্তু আগে মেয়ের বিয়ের কথা না ভেবে ছেলের বিয়ের কথা কেন ভাবছ?

—জানিস্‌নে তা? ঠিক হয়ে গেছে যে! সাত দিনের আগু পিছু তোদের দু'জনের—

—কিন্তু আমি যে রাজি নই! বাবাকে ব'লো, মা। ...তোমাদের ত বহু সন্তান; আর—সবাইকে সংসারী করে তোমাদের সুখ হোক্, তারাও সুখী হোক। তোমাদের একটিমাত্র ছেলে যে-পথে গেলে সুখী হয় সেই পথেই তাকে যেতে দাও না, মা! ভুলেও ভেব না আমি তোমাদের মায়া কাটিয়াছি—তোমাদের সেবার জন্যে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাক্‌ব—যখনই আদেশ করবে তখনই আস্‌ব। ...ঐ আসা যাওয়ার মাঝেই আমি একটু নিজের কাজ ক'রে নিতে চাই—তাতে বাধা দিও না, মা। ···তোমরাই আমাকে শক্তি দেবে—তোমাদের হয়েই আমি নিজেকে দান করব—আমি তোমাদের প্রতিনিধি আর সেবক মাত্র, আর কিছু নয়।

বলিতে বলিতে দীনেন্দ্রের দু'চক্ষু সজল হইয়া উঠিল...

এবং ঐ দু'জনার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। দীনেন্দ্র যে এমন করিয়া অন্তরের অন্তস্তল হইতে উত্তোলিত করিয়া আর এমন অশ্রুসিক্ত করিয়া কথার ধারা বহাইতে পারে

তাহা তাঁদের জানা ছিল না—তাহাই বিস্ময়ের কথা ; আরো বিস্ময়ের কথা এই যে, কথাগুলি শুনিয়াই মনে হইতেছে, এ কথার যেখানে উৎস সে-স্থান অন্ধকার নহে ; ইহা খেয়াল নহে, স্বেচ্ছাচারিতা নহে, ভাণ নহে—এমন একটি সত্য বস্তু যাহা আবিষ্ট করিয়া পরাভূত করিতে চায়...কথাগুলি যেন অশ্রু-আর্দ্র ক্ষমার্থী হইয়া দেখা দিয়াছে, কিন্তু তাহা শুনিয়া, করুণায় নহে, বাধ্য হইয়াই যেন বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়—তাহার সুরে সুর মিলাইতে একটা টান ধরে।

মা আর মেয়ে বিভ্রান্ত হইয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যার পর দীনেন্দ্র পরমহংসদেবের মর্ম্মর মূর্ত্তির আরতি শেষ করিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় বৈঠকখানায় পিতৃসমীপে তার ডাক পড়িল। ...বাপের আদেশ ছেলের যেমন সহিষ্ণুতার সহিত পালন করা দরকার তেমনি সহিষ্ণুতার সহিত দীনেন্দ্র তাহা পালন করিল...

স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী পুত্রকে ব্রতভঙ্গে প্ররোচিত করিতে উদ্যত পিতার সম্মুখে যাইয়া যে-ভঙ্গীতে দাঁড়াইলে সেই পুত্রের পরবশ্যতা স্বীকৃত হয় না সে-ভঙ্গীতে সে দাঁড়াইল না—মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার ছেলে সে নয়।

আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই দরবারে উপস্থিত আছেন দেখা গেল—যেন সালিশী মজলিস বসিয়াছে

বিচারকগণের মধ্যে মথুরানাথই প্রধান—তিনি বিশেষ চতুর বৈষয়িক এবং তৎসত্ত্বেও বিবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন বলিয়া খ্যাত—আর বয়সে মহেশ্বর মিত্রেরও বড়।

দীনেন্দ্র যখন দরবারে হাজির হইল তখন মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া মথুরানাথকে ব'লতেছিলেন,—ভুল বলছ। ...মানুষকে দাগা দেবার প্রবৃত্তি যদি ধর্ম্মের অঙ্গ হয় তবে সে-ধর্ম্ম জাহন্নামে যাক্—চাইনে আমি সে ধর্ম্ম। ...আগে সে প্রমাণ করুক, সে পুত্র হিসাবে সৎ, ছাত্র হিসাবে সৎ, স্বামী হিসাবে সৎ, পিতা হিসাবে সৎ, তবেই ত তার ধর্ম্মচর্চ্চায় অধিকার জন্মাবে! তা নয়—কোনো পরীক্ষাই তার হ'ল না—সে অমনি বেরিয়ে বললে সোঽহং। ...ধুৎ। বইপড়া সন্ন্যাসের মাথায় ঝাড়ু। বলিয়া মহেশ্বর মিত্র তাঁর সুবৃহৎ চক্ষু দুটি পাকাইয়া তুলিলেন।

মহেশ্বর মিত্রের ঐ কথাগুলি মথুরানাথের কথার জবাব—

মথুরানাথ বলিয়াছিলেন,—যদি পুত্র বিবাহে অনিচ্ছুক হইয়া থাকে, এবং সংসারে থাকিয়াই কেবল ঈশ্বরচিন্তায় মনোনিবেশ করে এবং তৎসত্ত্বেও যদি নির্ব্বংশ হইবার আশঙ্কা না থাকে তবে কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? সে ত ধর্ম্মের কলে বাতাসের দম লাগাইয়া সমুদ্রযাত্রা করিতেছে না যে দরকারের সময় তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না! চিত্তশুদ্ধির সাধনায়, ভক্তিতত্ত্বের অনুশীলনে এবং ধর্ম্মের প্রেরণার অনুসরণে যোগ্য পুত্রকে স্বাধীনতা প্রদান

করাই উচিত—কেন না, ও আকর্ষণ দুর্ব্বার। ...তারপর, সে যদি বুঝিতে পারে ও-পক্ষ তার নয় তবে সে আপনিই ফিরিয়া আসিবে—দড়ি লইয়া দৌড়াইতে হইবে না।

মথুরানাথের ঐ কথাতেই মহেশ্বর মিত্র ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

দীনেন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইতেই মথুরানাথ বলিলেন,—এস, বাবা; তোমাকে বাবা, সাধুসন্ন্যাসীর বেশে মানাবে বেশ।... কিন্তু তোমার বাবা ত তোমার বিয়ে দেবেনই!...তোমার আন্তরিক ইচ্ছেটা কি বলো দেখি, বাবা? বলিয়া তিনি স্নিগ্ধ চক্ষে দীনেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দীনেন্দ্র সুপুরুষ সন্দেহ নাই; তার রং ফর্সা, বুক প্রশস্ত, দেহ দীর্ঘ, চক্ষু উজ্জ্বল, ললাট মসৃণ, নাসিকা উচ্চ, মুখশ্রী গম্ভীর।

দীনেন্দ্র বলিল,—আমার ইচ্ছা বিবাহ না করা।

মথুরানাথ বলিলেন,—উত্তম। তারপর?

—দীন দুঃখী আর্ত্ত আতুরের সেবা করা।

মহেশ্বর বলিয়া উঠিলেন,—অর্থাৎ মেথর আর মুর্দ্দফরাস-গিরি।

—আঃ, তুমি থামো। বলিয়া মথুরানাথ মহেশ্বরকে ধমক দিয়া দীনেন্দ্রকে বলিলেন,—কোনো মঠে যোগ দেবার ইচ্ছে বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কোথায়?

—দীক্ষা যেখানে পাব।

—সে স্থানটা কোথায় ?

—২১শে ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব হবে বেলুড়ে...সেখানে—

—ও, সে ত কাছেই। বলিয়া মথুরানাথ আনন্দিত দৃষ্টিতে মহেশ্বরের মুখের দিকে তাকাইলেন—অর্থাৎ তুমিও দেখ, বেলুড় খুব নিকটবর্ত্তী স্থান।

কিন্তু মহেশ্বর বলিয়া উঠিলেন,—আঁধারে ঢিল মেরো না, ঘুরে এসে নিজের কপালে লাগতে পারে।

মথুরানাথ তাঁহাকে পুনরায় ধমক দিলেন, তুমি কেন কথা বলছ।...একটু দাঁড়াও, বাবা।...তারপর মহেশ্বরের দিকে না তাকাইয়াও তিনি মহেশ্বরকেই উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আমার মনে হয়, একবার ঘুরে আসুক। আপত্তি ক'রো না ভাই, আমার বিশেষ অনুরোধ—বরং তোমরাই ওকে সাজিয়ে পাঠিয়ে দাও—বেলুড় কি কাশী কি হরিদ্বার, যেখানে যেতে চায় ওকে পৌঁছে দিয়ে এস—গুরুকরণ দীক্ষাগ্রহণ প্রভৃতি হয়ে যাক; তারপর ও ফিরে আসে ভালই—না আসে ত ওরই দ্বারা তোমার বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে।..ধর্ম্মের গতি আর তার অনুষ্ঠানের পন্থা-নির্দ্দেশ বর্ত্তমান অপক্ক অবস্থায় অনাবশ্যক।

মহেশ্বর গুম হইয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না।

মথুরানাথ হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, এস বাবা, এখন তোমার বাবাকে রাজি করেছি।

দীনেন্দ্র পিতৃচরণে প্রণত হইয়া চলিয়া আসিল; জ্যেষ্ঠতাত জ্ঞানে মথুরানাথকেও প্রণাম করিতে সে ভুলিল না। মথুরানাথ কল্যাণীয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

বজ্রাদপি এবং সংক্ষিপ্তভাষ কঠোরতা মহেশ্বর কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিয়াছেন, এই কথোপকথনে তাহাই যেন মনে হয়। কিন্তু এই নমনীয়তা তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে—মথুরানাথ প্রভৃতি সালিশগণ তাঁহাকে ভিজাইয়া তুলিয়াছেন। উঁহারা আধুনিক জগত প্রগতির এবং জগত-চিত্তের খবর রাখেন; উঁহারা মহেশ্বরকে বুঝাইয়াছেন যে, এ-যুগের ছেলেদের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বিবাহ সম্বন্ধে, পিতৃদর্পে জোর জবরদস্তি করা অতর্কিত সঙ্কটসম্ভাবনায় কঠিন আর বিষম দায়িত্বের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে—তাহাদের মন বুঝা অসম্ভব।...পিতার কথার অবাধ্য হইবার দুঃসাহস পুত্রের নাই; সুতরাং ধরা যাউক, পিতার আদেশে বিবাহ সে করিল; কিন্তু স্ত্রীকে যদি সে বিষচক্ষে দেখে! তার ইচ্ছাপূরণের পথে বিঘ্নরূপিণী বলিয়া স্ত্রীকে যদি আন্তরিকভাবে গ্রহণ না করে!...আগে স্বামী ছিল দেবতা; স্ত্রী তার সাক্ষাৎ পাইলেই বর্ত্তিয়া যাইত; কিন্তু এখন স্বামী আর স্ত্রীর সম্বন্ধ হইয়াছে বন্ধুত্বের—অর্থাৎ গুরু শিষ্যা বা প্রভু দাসী বা দেবতা সেবিকা সম্পর্কে পদধূলি

আর আশীর্ব্বাদ না হইলেও চলে, কিন্তু সখা সখীর প্রাণ-বিনিময় না হইলে বিবাহই বৃথা হইয়া যায়।...অনিচ্ছুক স্বামীত্বের অধিক বিড়ম্বনা আর আছে কি! নিরপরাধিনী মেয়েটির জীবন তাহাতে বিষময় হইয়া উঠিবে না কি! তখন ত ধমকে কাজ চলিবে না।...সুতরাং উহার যে দিকে গতি সেই দিকেই বাতাস দেওয়া বর্ত্তমান অবস্থায় যুক্তিযুক্ত পন্থা।...দীনেন্দ্র বড় ঘরের নবনীতকোমলাঙ্গ ছেলে—খালি পায়ে রাস্তায় হাঁটিতে এখনও সে শিখে নাই। রওনা হইলেও সে বেশী দূর যাইতে পারিবে না—ফিরিয়া আসিবে।...যদি না আসে, তখন ধরিয়া আনিলেই চলিবে।

মহেশ্বর বলিয়াছিলেন,—ধরো, মঠে গিয়ে ভর্ত্তি হ'ল—তারা হয়ত শপথ করিয়ে ওকে দলে নেবে; তারা সন্ন্যাসী হলেও হ্যাকাবোকা কাঁচা ছেলে নয়। তখন কি তাদের ভেতর থেকে ওকে ছিনিয়ে আনা যাবে?

মথুরানাথ হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—যাবে বৈ কি! এটা ত হিন্দু সন্ন্যাসীর ধর্ম্মরাজ্য নয়, আইনকানুনে বাঁধা ইংরেজ রাজত্ব।

—অতশত লট্‌খটে কাজ কি? না যেতে দিলেই হয়!

—এ হেঃ...এতক্ষণ বললাম কি তবে? তাতে যে উল্টো বিপত্তির ভয় রয়েছে। যে উদ্দেশে তাকে ধরে রাখা ঘরে বসেই সে তা পণ্ড করে দেবে।...ওকে যেতে দাও ভাই।...কোথাও সুখ নেই এ-কথা সত্যি। তোমার ছেলে যথার্থই সৎ—তা আমিও জানি, তুমিও জানো।...যদি মঠে

গিয়ে দেখে, সংসারের সঙ্গে তার তফাৎ তেমন নেই তবে সে পালিয়ে আসবে।

তারপর মথুরানাথ আরো অনেক কথা কহিয়াছিলেন... আজকালকার সন্ন্যাসীরা কেমন কাজের লোক তাহা বলিয়াছিলেন; তারাই সামাজিক বাধামূলক সংস্কারে এবং দুর্গতগণের দুঃখহরণকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়া দেশের নমস্য হইয়া উঠিয়াছে—

এবং তারপর মথুরানাথ এমন কয়েকটি সন্ন্যাসীর নাম করিয়াছিলেন যাহাদের নাম মহেশ্বরও শুনিয়াছেন।

মহেশ্বর বলিয়াছিলেন,—ডাকাই তাকে।

—কিন্তু রূঢ় হ'য়ো না। রূঢ় শাসন এ ক্ষেত্রে চলে না।

মহেশ্বর তাহাতে রাজি হইয়াছিলেন—

কিন্তু মথুরানাথের অর্থপূর্ণ তর্ক এবং সতর্কীকরণ তত কাজে লাগে নাই যত কাজে লাগিয়া গেছে তাঁরই অন্য একটি কথা—কথাটা মহেশ্বরের চিন্তনীয়।

মহেশ্বর দম্ভপরায়ণ চিরকাল; তাঁর টাকার দম্ভ আছে, সংসারের কর্ত্তা হিসাবে দম্ভ আছে, সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী হিসাবে সুসন্তানগণের জনক হিসাবে দম্ভ আছে, বংশপরম্পরার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হিসাবে দম্ভ আছে—বংশগৌরবজাত দম্ভ ত তাঁর শিরায় শিরায়—

সুতরাং তাঁর মনে হইল, পুত্র যদি সন্ন্যাসগ্রহণকরতঃ কৃতকর্ম্মা হইয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারে তবে তিনি

নিজের প্রভুইচ্ছাকে সম্বরণ করিতে পারেন। বংশের বৃদ্ধির চাইতে ব্যক্তির সুখের চাইতে বংশের গৌরব বৃদ্ধি শ্রেয়ঃ।

দীনেন্দ্র গৃহত্যাগ করিবার অনুমতি পাইয়াছে শুনিয়া অন্তঃপুরে কান্নাকাটি লাগিয়া গেল। এতদিন কান্নাকাটি লাগে নাই, মহেশ্বর মিত্র সম্মুখে তাঁহার পাষাণ-আসনে উপবিষ্ট আর তাঁর অটল ইচ্ছার পাষাণ-প্রাচীরে বেষ্টন করিয়া ছিলেন বলিয়া...তিনি নির্গমের রন্ধ্র দিতেই অন্তঃপুরের সম্মুখে শূন্য ছাড়া আর কিছু রহিল না।

অন্তঃপুরে আগুন লাগিলে মহেশ্বরকে বহির্ব্বাটি হইতে ডাকিয়া আনা যাইতে পারে—লঘুতর কারণে তাঁহাকে আসনচ্যুত করা নিষিদ্ধ; কিন্তু আজ অসিতার হুঁস রহিল না—স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে তলব করিলেন...

মহেশ্বর আসিলেন—

অসিতা কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে!

—উপায় কি! বাধা দে'য়া বিপদজনক।

—এ কি বেড়ালের বাচ্চা যে বস্তায় পূরে নদীপারে রেখে আসবে? শুনলাম, তাকে মঠে নিয়ে পৌঁছে দে'য়া হবে! তোমার ইচ্ছে হয়েছে তাই; কিন্তু তোমার ইচ্ছাই চরম বলে আমি মানব না তা জানো?

স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া মহেশ্বর মিত্র খানিক কি ভাবিলেন...বোধ হয় ভাবিলেন, মার্জ্জারী ক্ষেপিয়া গেছে।... বলিলেন,—তুমি রত্নগর্ভা তা কেবল আমিই স্বীকার করি, আর আমার যারা অনুগত হিতৈষী পরিচিত তারাই তা স্বীকার করে, কিন্তু দেশের লোকে তা জানে না। আমি নিজের পুত্র দেশের দশজনকে দান করলাম—আমার পক্ষে এ মুষ্টিভিক্ষা দান, কিন্তু শক্তি যদি ওর থাকে তবে বংশের মুখোজ্জ্বল ও করবে। তুমি বাধা দিও না, ও যাবে। বলিয়া মহেশ্বর প্রস্থানের উপক্রম করিয়াও প্রস্থান করিলেন না; পুনরায় বলিলেন,—আমাদের ইচ্ছে হ'লে ওকে দেখে আসব; ওর ইচ্ছে হ'লে আমাদের দেখে যাবে। বিদেশে চাকরী করতে বেরুলে যে অবস্থা হয় ঠিক তাই। ধরো তোমার ছেলে দূর দেশে চাকরী করতে যাবে। বলিয়া মহেশ্বর সম্মুখস্থ কয়েক জোড়া অশ্রুপূর্ণ চক্ষুর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া সম্পূর্ণ প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণের যে স্বয়ংক্রিয় বিভীষিকা আছে তাহা অসিতার ঘুচিল না—অর্থাৎ তাঁর মনে হইল, সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করা আর বিদেশে চাকুরী করিতে যাওয়া একই কথা নহে।...পার্ব্বতীর দিবসত্রয়ের জন্য পিতৃগৃহে আসিয়া দশমীর দিনে পুনরায় কৈলাসভবনে প্রত্যাগমনে তাঁহার মায়ের যে ক্রন্দন তাহা যেমন সকল কন্যার মায়ের, শচীমাতার নিমাইয়ের জন্য ক্রন্দনও তেমনি সকল মায়ের না হোক, যে ছেলে ঐ

পথের পথিক তার মায়ের বটে। অসিতা স্বামীর ধাত চিনিতেন; তাঁহার উপর যখন নির্ভর করিয়াছিলেন তখন কোনো ভাবনাই ছিল না; এখন তাঁহার উপর আর নির্ভর করা যাইতেছে না দেখিয়াই অসিতার হতাশার কিছু বাকি রহিল না...যশের লোভ আর গৌরববৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা যখন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে তখন পুত্রকে বলি দিতে তাঁহার প্রাণ একটুও কাঁপিবে না। অসিতার আকাশ কালো হইয়া উঠিল—তিনি ছুটিলেন পুত্রের কাছে—তাঁহার সঙ্গে গেল শতদল প্রভৃতি।

দীনেন্দ্র পূবের বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়াছিল। তখন চন্দ্রোদয় হইতেছে...বনানীগভীর দিক্‌প্রান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একখানা কালো গাঢ় মেঘ ছিল—তাহা গৈরিক বর্ণ ধারণ করিল...দেখিতে দেখিতে মেঘশীর্ষে ছটা ফুটিল...চন্দ্রমণ্ডলের সূক্ষ্ম কলাপ্রান্ত দেখা দিল... এবং তারপরই যেন চন্দ্রদেব লাফাইয়া লাফাইয়া মেঘান্তরালের বাহিরে আসিয়া স্বচ্ছ নীলিমার গায়ে ভাসিতে লাগিলেন...

দীনেন্দ্রের মনে হইল, ঐ মেঘখানা মুখের উপর ছিল বলিয়া কৃচ্ছ্রশ্বাস চন্দ্র যেন তাহাকে ছাড়াইয়া আসিতেই তাড়াতাড়ি করিাছে—এখন ত বেশ গতিহীন স্থির হইয়া আছে!...এই দৃশ্যটিকে সূত্র করিয়া একটি দার্শনিক চিন্তার উদয় হইল—

পরব্রহ্ম আর আত্মার মাঝখানে যতক্ষণ সংসারের কালিমা বিরাজ করে ততক্ষণই—'কই আলো, কই আলো' বলিয়া

রুদ্ধশ্বাস মুক্তিকামী মানবের আর্ত্তনাদ উঠে—সে কালিমা দূরীভূত হইলেই আত্মা অসীমের আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া ভূমানন্দে নিমগ্ন আর নিস্পন্দ হইয়া যায়...

এমন সময় সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া দীনেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল...

অসিতা উঠিয়া আসিলেন, তাঁহার পশ্চাতে আসিল শতদল প্রভৃতি।...দীনেন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল... ভূমানন্দলাভের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া সে জগজ্জননী জ্ঞানে জননীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল—

কিন্তু অসিতা যত কথা বলিবেন বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া তার একটিও তাঁর মুখে ফুটিল না—ছেলের মুখের দিকে তিনি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন...সদ্যোত্থিত জ্যোৎস্না পড়িয়া পুত্রের মুখ পাণ্ডুর দেখাইতেছে...বিচ্ছেদভয়ে-অস্থির চিত্তে অসিতার সহসা মনে হইল, দিন যত যাইবে মুখের এই পাণ্ডুরতা ক্রমশঃ বাড়িয়া একদিন প্রাণের জ্যোতিঃ একেবারে নিবিয়া যাইবে—আর সেই নিদারুণ অকাল নির্ব্বাণ তাঁর সম্মুখে ঘটিবে না।

অসিতা তথাপি আত্মসম্বরণ করিলেন; বলিলেন,—তুই পেটে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, যেন নতুন ছেলের আমার বুকের দুধে রুচি নেই—আমাকে ঠেলে ঠেলে দিয়ে সে কেবলি—

ছেলে পর হইয়া যাইবে এই ব্যথায় ক্রন্দন যেন বুক ভরিয়া ঢেউ তুলিয়া আসিল...কথার মাঝেই অসিতা নিঃশব্দ হইয়া গেলেন।

দীনেন্দ্র হাসিয়া বলিল,—তোমার স্বপ্ন সত্য নয়, মা ; সত্য হয় নি। তোমার দুধ খেয়েই আমি বড় হয়েছি। এখনও তোমার দে'য়া যে-অন্ন আমি খাই তা তোমার দুধের মতই মিষ্টি আর অত্যাজ্য।

—তবে ?

—যে দুধ খাইয়েছ তার শক্তি কি ঘরে বসে অপচয় করব, মা! তোমার দুধ রক্তে যে অমৃত ঢেলে দিয়েছে সেই অমৃত আমি বিতরণ করতে চাই। তোমার চরণ স্মরণ ক'রে আমি কর্ম্মক্ষেত্রে নামছি, মা। তুমি জগদ্ধাত্রীর স্বরূপ তা কি আমি জানিনে!

—কিন্তু তোকে যে দেখতে পাব না!

—যখনই আদেশ করবে সম্ভব হলে তখনই তোমার চরণ দর্শন ক'রে যাব।

যে মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে দীনেন্দ্রের পত্র-ব্যবহার চলিতেছে তিনি ঐ অনুমতি দিয়াছেন।

শতদল বলিল,—মায়ের দুধ একা তুমিই খেয়েছ! আমরা খাই নি ?

—কিন্তু আমি তার সাথে মায়ের দাসত্বের বর ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছি। ...এক আকাশ থেকেই বৃষ্টি পড়ে, শিলা

পড়ে, তুষার পড়ে, আবার বাষ্পও পড়ে। ...মা যাকে যে রূপ দিয়ে বা'র করতে চান সেই রূপ নিয়ে সে বেরুবে। এতে তর্ক নেই।

শতদল মনে মনে গর্জ্জন করিয়া ভাবিল,—বড় বড় কথা সব!

মা কাঁদিতেছেন, জ্যোৎস্নালোকে তাহা দেখা গেল।

দীনেন্দ্র বলিল, তুমি ব্যথা পেয়ো না, মা; আমাকে তুমি ত হারাবে না, বেশী ক'রে পাবে। ...তোমার ধ্যানই হবে আমার পাথেয়।

চোখের জল মুছিয়া অসিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কবে যাবি?

—দেরী আছে এখনও মাস তিনেক।

তিন মাস পূর্ণ হইতে আর সাতদিন বাকি।

অসিতা মনে মনে আশা করিয়া আসিতেছিলেন, ইত্যবসরে একটা বিঘ্ন, অথবা পুত্রের মতির পরিবর্ত্তন ঘটিবেই—কারণ বিধাতা বধির নন, আর মায়ের প্রাণ অহরহ সকাতরে তাহাই প্রার্থনা করিতেছে।

কিন্তু বিঘ্ন ঘটে নাই, পুত্রের মতির পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রাষ্ট্র হইয়া গেছে যে, মহেশ্বর মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র দীনেন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক সত্বরই গৃহত্যাগ করিবে—পিতামাতার সম্মতি পাইয়াছে।

লোকে বলিল, মহেশ্বর মিত্রের সবই অদ্ভুত।

কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্গে যে অলৌকিক, মহিমা না হোক, প্রহেলিকা সংযুক্ত হইয়া আছে, যৌক্তিকতা অযৌক্তিতা সার্থকতা অসার্থকতা বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝে পড়িয়াও লোকে সেই জন্যেই উদাসীন থাকিতে পারিল না। ভণ্ড আর সমাজের গলগ্রহ মনে করিয়া লোকে সন্ন্যাসীকে আদর করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু বিস্মৃত হইতে পারে নাই; ওরা অনেক ইচ্ছাকে অতৃপ্ত রাখে এবং যথেষ্ট শারীরিক ক্লেশ সহ্য করে ইহা ত ঠিকই। তারপর দীনেন্দ্র ধনীর দুলাল—একেবারে সম্মুখের ধৃত অনন্ত ভোগের আয়োজন ত্যাগ করিয়া সে যাইতেছে—

সুতরাং ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল—

ধূমধাম করিয়া আসিয়া কতজন দীনেন্দ্রকে দেখিয়া গেল, আর সুখ দুঃখ উৎসাহের কত কথা কহিয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। বাড়ীর লোকে যাঁহারা কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদেরও দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতে লাগিল, এ যাওয়ায় গৌরব আছে।

ওদিকে মথুরানাথ কেবল মুখের কথায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া দীনেন্দ্রের বিদায়োপলক্ষে এক ভোজের আয়োজন করিলেন—বাড়ীশুদ্ধ লোক যাইয়া খাইয়া আসিল। ...তাঁহার দেখাদেখি আরো অনেকে খাওয়াইল, এবং সকলের শেষে দীনেন্দ্রকে খাওয়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তর্কবাগীশ

মহাশয়। তাঁহার ব্রাহ্মণী আসিয়া সসন্তান বড়বধূকে এবং শতদলকেও নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

শতদল সাজিয়াছে—

অলঙ্কারে, বসনে, বর্ণে, রূপে, স্বাস্থ্যে অপরূপ ঐশ্বর্য্যময়ী হইয়া দর্পণে নিজের সর্ব্বাঙ্গের প্রতিবিম্বটি একবার দেখিয়া লইতে সে এই ঘরে আসিল...দেখিল, দীনেন্দ্র দর্পণের সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু দেখিলেই বুঝা যায়, অতিশয় অন্যমনস্কভাবে—দর্পণের দিকে তাকাইয়া সে কিছুই দেখিতেছে না। ভাবিতে ভাবিতে পদচারণা করা তার অভ্যাস, পদচারণা করিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়াও তার অভ্যাস।

শতদল তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু প্রথমেই তার চোখে পড়িল, তাহাদের পিতামাতার যৌবনের সেই চিত্রখানার প্রতিচ্ছায়া—আলোকোজ্জ্বল প্রতিবিম্ব দর্পণের অভ্যন্তরে যেন আলো বিকিরণ করিয়া জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে... চিত্রের চারিটি চক্ষুতে মোহের আবেশ...আর তাহারই নিম্নে তাহারা দু'জন, পিতামাতার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি—

দীনেন্দ্রও একবার ছবির ছায়ার দিকে চাহিয়া নিজেদের ছায়ার দিকে চাহিল...

হঠাৎ ছায়া কায়া একাকার করিয়া দিয়া তাহার সৃষ্টির সম্মুখটা যেন একটা কুজ্ঝটিকার অস্বচ্ছ আবরণে বুজিয়া আসিল...দৃষ্টি জড়াইয়া গেল...হৃদপিণ্ডে একটা স্পন্দন উঠিল...

একটি মুহূর্ত্ত মাত্র—তারপরই দীনেন্দ্র পিছন ফিরিয়া চলিয়া আসিল—

মায়ের কাছে আসিয়া বলিল,—আমার কোথাও যাওয়া হ'ল না, মা। বিয়ে করব।

চিত্র ও চরিত্র

গিরিশচন্দ্র

যে দুই বিভিন্নপথগামী শিষ্যের নাম গুরুর গৌরবকে দেশে এবং বিদেশে সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছে, গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ।

বিবেকানন্দের উনিশ বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে, গিরিশচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন।

কর্ম্মের মধ্য দিয়া বিবেকানন্দের সাধনা আত্মপ্রকাশ করে। তাই তাঁহার বাণী প্রেরণাময়। রামকৃষ্ণশিষ্য গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা নাটকে বাণীলাভ করিয়াছে।

প্রাণের প্রাচুর্য্য গিরিশচন্দ্রকে সারাজীবন স্থির থাকিতে দেয় নাই। শুধু অভিনয় তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই, বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ গঠনেও সে শক্তি নিঃশেষিত হয় নাই; নব নব নাটক রচনা করিয়া, রঙ্গালয়ের নিত্য অভাব দূর করিয়া, নিরুদ্ধ শক্তিকে এক উপযোগী প্রবাহপ্রণালীর পথে প্রবাহিত করিয়া তিনি আত্মচরিতার্থতা লাভ করেন।

গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যিক ভাগ্য অতি অদ্ভুত। একদিকে সাহিত্যসমাজের এক প্রভাবশালী বিভাগ তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা নীরবে অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন, আর-একদিকে আর-এক শ্রেণীর নিকট ইহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ তিনি মহাকবি আখ্যা লাভ করিয়াছেন।

তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু লিখিতেছেন,

'স্বাধীনস্বভাব গিরিশচন্দ্রের প্রকৃতি ছিল বহু বিপরীত ভাবের রঙ্গভূমি। একাধারে এমন আমোদপ্রিয়তা ও ঔদাস্য, আলস্য ও উদ্যম, ধৈর্য্য ও চাঞ্চল্য, গর্ব্ব ও বিনয়, ক্রোধ ও ক্ষমা;...এমন বিচারশীলতা ও হঠকারিতা, কর্ম্মতৎপরতা ও দীর্ঘসূত্রতা, অসমসাহসিকতা ও ভীরুতা, দম্ভ ও দীনতা, ভাবুকতা ও বিষয়বুদ্ধির একত্র অধিষ্ঠান; এমন সংশয় ও বিশ্বাস, জড় ও অতীন্দ্রিয় জড়িত, সদাসৎ কর্ত্তৃক সমভাবে চালিত, দেব ও দানব আশ্রিত, মমতা ও বৈরাগ্য-মিশ্রিত; এমন আত্ম ও ঈশ্বর-নির্ভর-পরায়ণ অদ্ভুত প্রকৃতি সচরাচর দৃষ্ট হয় না। গিরিশ একাধারে মানব ও ভৈরব ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি ছিল যেমন বহু দোষগুণের আধার, তাঁহার জীবনও তেমনি বহু দ্বন্দ্বসংঘর্ষে সঙ্কুল।'

জীবনের মত তাঁহার সাহিত্য-প্রতিষ্ঠার মধ্যেও দুই একান্ত বিরুদ্ধ ভাবের লীলা দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্য হই।

গিরিশচন্দ্র ছিলেন ভক্ত, তার্কিক, অনুসন্ধিৎসু, দুঃখের অভিজ্ঞতায় ঐশ্বর্য্যশালী, সৃষ্টিকুশল, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। তাঁহার পাঠানুরাগ ছিল প্রবল।

নাটকে এমন অসংখ্য চরিত্রসৃষ্টি এবং বিচিত্র গীতরচনা আর কেহ করে নাই। তাঁহার কল্পনা দূরপ্রসারী। ঘটনা-সংস্থানে তিনি নিপুণ।

তাঁহার 'সিরাজউদ্দৌলা', 'মীর কাসিম,' 'ছত্রপতি শিবাজী' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটকের প্রচার সরকার বন্ধ করিয়াছেন। 'জনা,' 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' 'পাণ্ডবগৌরব' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটকগুলি অপূর্ব্ব।

১৯১২ সালে গিরিশচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন।

এই ভাবুক, শক্তিশালী, প্রাণের প্রাচুর্য্যে দুর্দ্দম, আত্মবলে বিশ্বাসী, নেতৃত্বগুণের অধিকারী, অভিমানী, প্রবলস্বভাব পুরুষের সাধনার ফল—তাঁহার নাটকসমূহ।

সমালোচনা

করকোষ্ঠীর চাবিকাঠী—জ্যোতিঃশাস্ত্রী শ্রীযোগেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ প্রণীত, এবং ২৯, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা, ভাগ্যগণনা কার্য্যালয় হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম—দেড় টাকা, কাপড়ে-বাঁধা—সাত-সিকা।

বইখানির লিখন-ভঙ্গী আমাদের ভাল লাগিল। সামুদ্রিক বিদ্যার মত এক জটিল বিষয়ের প্রাথমিক কথাগুলি, গ্রন্থকার প্রাঞ্জলভাবে, প্রণালীবদ্ধভাবে, বিনা বাগাড়ম্বরে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, করতলের রেখার পাঠ পড়িয়া, মানুষের জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, যাহা ঘটিতেছে, এবং যাহা ঘটিবে, তাহা বলা যায়, অথচ উপায়-সৌকর্য্যের অভাবে বিদ্যাটি অধিগত হয় নাই, পুস্তকখানি তাহাদের সহায় হইবে। গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'অতিশয় সহজ ভাষায় এবং সরল ভাবে এই বইখানি লিখিয়াছি, যাহাতে অন্য কাহারও সাহায্য না লইয়া বইখানির আগাগোড়া অল্প লেখাপড়া-জানা লোকেরাও অনায়াসে পড়িতে পারে এবং বুঝিতে পারে। কঠিন শব্দ, শক্ত কথা সাধ্যমত ত্যাগ করা হইয়াছে।' ইহাতে রেখা-বিচার

ছাড়া, হাতের গড়ন, করতলের রং, আঙ্গুলের গাঁঠ, নখ, পাবের আলোচনা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। রেখা-বিচারের প্রাচ্য রীতি ও পাশ্চাত্য প্রণালী মিলাইয়া এই 'চাবিকাঠি' তৈয়ারী। লেখক বলিতেছেন, উভয় সত্য অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই করিয়াছেন। ইংরেজিতে 'চেরো' প্রভৃতির এই ধরণের পুস্তকে প্রাচ্য রীতির পরিচয় নাই। এ-গ্রন্থে বিবৃত মত-সমূহের প্রমাণ-স্বরূপ প্রাচীন শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

প্রাত্যাহিক জীবনের প্রয়োজন, প্রয়াস, ক্লান্তি, কোলাহল, দ্বন্দ্ব, বিজিগীষার নিষ্পীড়নে কল্পনা ক্লিষ্ট, মূর্চ্ছিত, আবিষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে। গীতিকাব্যে হৃদয়ের আবেগ সেই কল্পনাকে জাগ্রত, জীবন্ত, সতেজ ও বেগবান করিয়া তোলে। উপন্যাসে অথবা মহাকাব্যে আবার ইহার বিপরীত দেখিতে পাই। সেখানে আবেগ কল্পনাকে উদ্রিক্ত করে নাই—জীবনের সহিত জীবনের সম্পর্ক এবং জীবনের উপর অবস্থা ও অন্তঃপ্রকৃতির প্রভাব কল্পনার ভিতর দিয়া কবির মধ্যে মানস-রূপ লাভ করিয়াছে এবং সেই কল্পনা-সঞ্জীবিত মানস-রূপ হৃদয়কে আবেগ-চঞ্চল করিয়া ভাবসৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে।

* * *

এমনি করিয়া আবেগ কখনো কল্পনাকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে, আবার কল্পনা কখনো হৃদয়াবেগের মধ্যে গতি সঞ্চার করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'In a Balcony' কবিতাটি লওয়া যাক। পুঞ্জীভূত গর্ব্ব ও সম্মানের ভিতর হইতে, প্রেমের আশার স্পর্শে জীবন্ত ও চঞ্চল হইয়া যে চির-বুভুক্ষু নারী-হৃদয় বিপুল আবেগে উচ্ছল ও প্রখর হইয়া উঠিল—সে নারী

Browning-এর কল্পনার সৃষ্টি। কবিকেও আবেগপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাই—

"There is no good of life but love but love !
What else looks good, is some shade flung
from love ;
Love gilds it, gives it worth. Be warned by me,
Never cheat yourself one instant ! Love,
Give love, ask only love, and leave the rest !'

* * *

আবার গীতি-কাব্যের দিকে চোখ ফিরানো যাক। এক আবেগময় অনুভূতি কবির কল্পনাকে আলোড়িত করিয়া তাহাকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছে—চণ্ডীদাস গাহিতেছেন—

"পীরিতি মূরতি পীরিতি রতন
যার চিতে উপজিলা,
সে ধনী কতেক জনমে জনমে
যজ্ঞ করিয়াছিলা।

সই পীরিতি না জানে যারা
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে,
কি সুখ জানয়ে তারা !"

কিম্বা—

"সই, পীরিতি বিষম মানি।
এত সুখে এত দুখ হবে বলে
স্বপনে নাহিক জানি।"

দিন-পঞ্জী

বোম্বাই, ১১ই মার্চ্চ—কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি আণে, মহাত্মা গান্ধী ও সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের সহিত সাক্ষাতের জন্য অনুমতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যারবেদা জেল কর্তৃপক্ষ জানান যে তাঁহারা অনুমতি দিতে অক্ষম।

লস এঞ্জেলস, ১১ই মার্চ্চ—ক্যালিফর্ণিয়ার ভূমিকম্পে মেক্সিকোর সীমানা হইতে সাণ্টা বারবারা পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল। গতকল্য অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৯ ঘটিকার মধ্যে পর পর ২৩ বার কম্পন অনুভূত হয়। উহাতে ১৩৯ জন নিহত ও চৌদ্দ হাজার ব্যক্তি আহত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকরা বলিতেছেন যে, আরও কয়েক দিন কম্পন চলিবে।

নয়া দিল্লী, ১৪ই মার্চ্চ—অদ্য ব্যবস্থাপক সভায় বিভিন্ন দলের ১০ জন সদস্য, সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত করিবার জন্য মিঃ সম্মুখম্ চেট্টির নাম প্রস্তাব করেন। আর কোনও প্রতিযোগী না থাকায় মিঃ চেট্টি সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হন। অতঃপর ১২-১৫ মিঃ সময়ে বড়লাট লর্ড উইলিংডন, মিঃ চেট্টির নির্ব্বাচন অনুমোদন করিলে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নিউইয়র্ক,—ইলিনয়েস ওকপার্ক নামক স্থানে প্যাট্রিসিয়া নাম্নী ২৭ বৎসর বয়স্কা এক সুন্দরী যুবতী ১ বৎসর ২ মাস কাল নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় রহিয়াছে। সে এখনও নিদ্রিত, তাহাকে জাগরিত করিবার সকল প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে
আর ইনজেক্‌সান লইতে হইবে না
ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

যে পড়িতে শিখিবে, যে পড়িতে শিখিতেছে,
যে পড়িতে শিখিয়াছে
সব ছেলে-মেয়ের মনের মতন বই
লালকালো
শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত ও শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন চিত্রিত
আবালবৃদ্ধবনিতার মনোহরণ করিবে

ছড়ায় গানে রেখায় লেখায় অতুলনীয়
বহুবর্ণের বহুচিত্রে সমুজ্জ্বল। অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার
শিশু সাহিত্যে এক ও অদ্বিতীয় পুস্তক
মূল্য দুই টাকা
এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

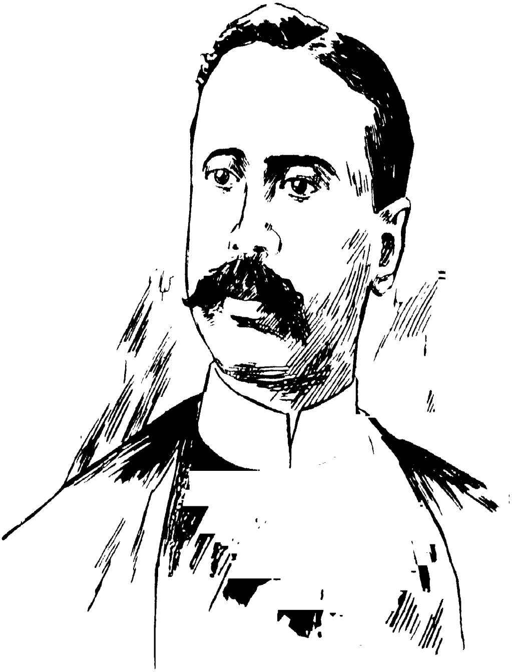

নবীনচন্দ্র সেন

ছোট গল্প

১ম বর্ষ] ১১ই চৈত্র ১৩৩৯ [৩৭শ সংখ্যা

দুস্তর

শ্রীহাসিরাশি দেবী

গৃহিণী আন্নাকালী বর্ত্তমান থাকতেও পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে নিমাই ভশ্চায্ অন্য গ্রামে কি একটা যজমানী কাজে গিয়ে আলোচাল, কাঁচকলা ও দক্ষিণার সঙ্গে আর একটি সজীব দক্ষিণা নিয়ে আশ্বিনের অপরাহ্নে যখন একটা ভাঙ্গা পাল্কী থেকে নেমে সঙ্কুচিত পদে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলে, তখন তাল নারিকেল গাছের মাথায় পাতায় পাতায় সূর্য্যাস্তের সোনার আলো চিক্‌চিক্ করছিল, প্রাচীরের ওপাশে হেলে পড়া বৃহৎ ও শাখাবহুল তেঁতুলতলা থেকে মাঝে মাঝে ছাতারে পাখীর কলরবও শোনা যাচ্ছিল।

নিমাইয়ের পরণে তখনও লাল চেলি, মুখে চোখে ক্লান্তির ছায়া, কপালে গালে চন্দনের মলিন চিহ্ন অঙ্কিত। উঠোনে দাঁড়িয়ে সে কুণ্ঠিত স্বরে ডাকলে,

"বৌ, অ বৌ!"

বাইরে, পাল্কীর মধ্যে তখনও নতুন-বৌ পুরো এক হাত ঘোমটা টেনে লাল চেলির মধ্যে আত্মগোপন করে বসেছিল; দানের জিনিষ কিছু সঙ্গে নাই, শুধু সে একাই এসেছে বৃদ্ধ স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হয়ে তার ঘর করতে। নিমাইয়ের ইচ্ছেয় ঠিক এ বিয়েটা হয়নি। দৈব-দুর্ব্বিপাকে এই যে ঘটনাটা ঘটে গেল, এর জন্যে যে তার ভাবনাও না হয়েছিল তাও নয়,—কিন্তু ভেবেও সে এর কূল-কিনারা করতে পারছিল না; তবু ইচ্ছে ছিল আন্নাকালীর হাতে পায়ে ধরে সে এই কাণ্ডটার জন্যে ক্ষমা চেয়ে মিটমাট করে নেবে; অন্ততঃ এ ব্যবস্থাটা উপস্থিতের মত হলেও ক্ষতি নাই।

কিন্তু বিধি বাম।..

তাই আন্নাকালী বাড়ী ছিল না, পুকুরে কাপড় কাচতে গিয়েছিল; শুধু ঘরে বসে একাগ্রচিত্তে তবলায় বোল সাধছিল তার মা-বাপ-মরা ভাইপো পাঁচু।

ঘরের মেঝেয় মাদুর পেতে বসে পাঁচু বোল মুখস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে বাঁয়া তবলায় হাত ঠুকে বেয়াড়া সুর বার করছিল,—বোলের শব্দও সমানে মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল, "তিন্ তা, তিন্ তা, তেরে কেটে তা তিন্!—"

বাইরের ডাক শুনে অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করলে,

"কে ?"

সবিনয়ে উত্তর এলো,

"ওরে আমি।"

পাঁচু মুখ বাড়িয়ে উঠোনে দণ্ডায়মান নিমাইয়ের বেশ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

নিমাই যেন চোরের মত চুপি চুপি প্রশ্ন করলে,

"তোমার—তোমার পিসি কোথায় পাঁচু ?"

পাঁচু একবার মাথা চুলকে 'আমতা' 'আমতা' করে উত্তর দিলে,

"ঘাটে গেছে কাপড় কাচতে।"

"কতক্ষণ ?—"

"তা অনেক্ষণ হবে।"

কি করা যায় হঠাৎ তা ঠিক করতে না পেরে নিমাই ইতস্ততঃ করছিল, এমন সময়ে খিড়কীর ভেজানো দরজা ঠেলে ভিজে কাপড়ে জলপূর্ণ কলসী কাঁখে নিয়ে আন্নাকালী এসে দাঁড়াল।

নিমাইয়ের দিকে দৃষ্টি পড়তে চমকে এক মুহূর্তে যেন কাঠের মত শক্ত হয়ে উঠল,

"তুমি !"

নিমাইয়ের ইচ্ছে হচ্ছিল চীৎকার করে বলে,

"মা বসুমতি, দ্বিধা হও, তোমার মধ্যে মুখ লুকিয়ে আমি এ লজ্জার হাত এড়াই !"

কিন্তু সে কোনও উত্তর দেবার আগেই কাঁখের ঘড়া ঠক্ করে পায়ের কাছে নামিয়েই আন্নাকালী সরোদনে পাড়া মুখর করে তুললে,

“ওগো, মিন্সে মরে এসেছে গো! অমন মাছ ভাতের মুখে আগুণ দিয়ে আমি থান পরে শুধু হাত করব গো! ..”

“ও বৌ, চুপ কর বৌ, দোহাই তোমার, হাতে ধরছি .”

নিমাই সরে এসে দুহাতে আন্নাকালীর হাত জড়িয়ে ধরতেই সে এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে ফেলে মাটিতে আছড়ে পড়ল,

“ওগো, আমার কি হোলো গো!...”

কথাটা তন্মুহূর্ত্তেই সালঙ্কারে পাড়া থেকে পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল; তার ফলে হ'ল এইটুকু যে তখনকার মত ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল, বধূ নামানোও হ'ল, তবে আন্নাকালীর দ্বারায় নয়।

সে যে সেই ভিজে কাপড়ে উঠে গিয়ে নিজের ঘরে খিল দিলে, আর কারো শত সাধা-সাধিতেও খুললে না।

ভোরের আলো জানালা-দরজার ফাঁক দিয়ে চোখে এসে লাগতেই নতুন-বৌ ঘোমটা টেনে উঠে বসল; পাশে পাড়ার যে মেয়েটি এসে কাল রাত্রির মত শুয়েছিলেন, তিনি

আস্‌পাশ মোড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেও কেন যে আলস্য ভেঙ্গে উঠছিলেন না তা তিনিই জানেন।

নতুন-বৌ ভেজানো দরজা খুলে ধীরে ধীরে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকটা দেখে নিলে; চারখানা পাকা ঘর, দুটো বারান্দা, কোলের কাছে উঠোন।

উঠোনের একপাশে শুয়ে দুটো গাই ঘুমুচ্ছে; বাড়ীর কেউ তখনও ওঠেনি, সমস্ত নিস্তব্ধ।

পদ্ম চুপ ক'রে থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সরে দাঁড়াল নিমাইয়ের সাড়া পেয়ে।

ঘুম ভেঙ্গে এসেই নিমাই বড়বৌয়ের দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলে,

"দরজা খোলো, ওগো!"

কিন্তু কারো উত্তর নাই; নিস্তব্ধ বাড়ীর মধ্যে শুধু দরজায় করাঘাতের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

অনেক ডাকাডাকিতেও সাড়া মিলল না।

বেলা বাড়ল। রৌদ্রে চারিদিক ভ'রে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার্ত্ত কাকগুলোও যেন দল বেঁধে এসে এই বাড়ীটার কাছেই আহার্য্য প্রার্থনা করতে লাগল।

বাইরে থেকে কৌশলে দরজার কপাট খুলে ফেলেই সকলে শিউরে উঠল; সবিস্ময়ে দেখলে আন্নাকালী গলায় দড়ী দিয়ে কড়ি কাঠের সঙ্গে ঝুলছে। —

তার সে ভিজে লাল পাড় শাড়ী তখন শুকিয়ে গেছে; চোখের কোনেও জলের রেখা ছিল না; সে তখন কান্না-হাসির পরপারে পৌঁছেছিল।

বাড়ীর গৃহিণীর পদ খালি।

ছোটবৌয়ের বয়স বড় জোড় পনেরো কি ষোল; দেখতে নেহাৎ মন্দ নয়, – নাম পদ্ম।

পদ্মর সাংসারিক বুদ্ধিটা কিছু কাঁচা। এক এক মেয়ে যেমন অল্প বয়স থেকেই ও বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে, পিতৃমাতৃহীন ও পরের সংসারে প্রতিপালিত হয়েও পদ্ম তা হতে পারেনি, তাই কথায় কথায় চোখের জলটার ব্যয়ই সে করত বেশী; ফলে নিমাই মুস্কিলে পড়ল। সেদিন কাঠের উনুন জ্বেলে রান্না চড়াতে গিয়ে পদ্ম ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল, তবু উনুন জ্বলল না।

সকালে স্নান আহ্নিক সেরে, কয়েকটি মাইনে-করা পূজা সাঙ্গ করে নিমাই যখন বাড়ী ফিরল তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা।

ক্ষুৎপিপাসাতুর নিমাই বারান্দার ওপোরে বসে পড়ে ডাকলে, "ওগো!"

রান্নাঘরের দরজা খোলা।

ছ্যাঁক্-ছোঁক্ শব্দ নাই, কারো চলা-ফেরা বা ব্যস্ততারও কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না, তবু, নতুনবৌ ঐ ঘরেই আছে নিঃসন্দেহে জেনে নিমাই বার দুই ডেকে শেষে গুঁড়ি মেরে উঁকি দিয়ে দেখলে, পদ্ম উনুন পাড়ে চুপ করে বসে অদূরে প্রজ্জ্বলিত কেরোসিনের ডিবাটির দিকে নির্ণিমেষে চেয়ে আছে। উনুন নির্ব্বানপ্রাপ্ত, ধোঁয়ার চিহ্নও নাই।

নিমাই কি বলবে বা করবে ভেবে পেলে না, রাগও যে না হ'লো তাও নয়, কিন্তু তার চেয়ে মাত্রায় বাড়ল বিস্ময়।

উঠে, রান্নাঘরে ঢুকতেই পদ্ম চমকে উঠে তার মুখের দিকে তাকালে, তারপরেই কেঁদে ফেললে, "উনুন জ্বালতে পারছিনে।'

নিমাইয়ের ক্ষুধা-তৃষ্ণা অন্তর্হিত হয়েছিল ; নীচু হয়ে উনুন জ্বালতে ব'সে শান্তস্বরে প্রশ্ন করলে,

"তবে তুমি পরের বাড়ীতেই বা এমন কি কাজ করতে ?"

আঁচলে চোখ মুছে, একহাতে অন্যহাতের রুলি খুঁটতে খুঁটতে পদ্ম ধরা-গলায় উত্তর দিলে,

"কেন,—বাটনা বাটতুম, খার কাচতুম গরুর কাজ করতুম, আরও—"

নিমাইয়ের বুঝতে দেরী হ'ল না।

একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর মুখে নিমাই বললে,

"কিন্তু, এখানে তো শুধু সে করলে চলবে না। রাঁধতে হবে, উনুন ধরাতে হবে, সব করতে হবে। নইলে আমরাই বা খাব কি করে?"

উনুন ধরিয়ে, পদ্মর দেওয়া জলখাবারের আশা পরিত্যাগ ক'রে নিমাই নিজেই উঠে জল-বাতাসা খুঁজে নিলে। তবে সুখের খবর এইটুকু যে পদ্ম তাড়াতাড়ি করেই সংসারের সব কাজ শিখে নিলে, কিন্তু ঠিক নিজের বলে ভাবতে পারলে না নিমাইকে।

কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড কাঁটা খচ খচ করে বিঁধতে লাগল।

বাড়ীতে পাঁচুর স্থান এখনও অটুট।

মৃতা পত্নীর স্মৃতি ব'লেই হোক, কিম্বা তার আর কেউ নেই বলেই হোক, নিমাই তাকে তাড়ায়নি।

পাঁচু আছে বটে, কিন্তু সাংসারিক কাজের মধ্যে ঐ এক বাজার করা ছাড়া আর সে বিশেষ কিছুতে নেই; খায় দায় আর বাঁয়া তবলায় বোল সাধে; এই তার কাজ। নিমাই বাড়ী থাকলে দু'চারটে কথাবার্ত্তা বলে এই পর্য্যন্ত। আন্নাকালী জীবিত থাকতে সে যেমন অসঙ্কুচিত ছিল, তেমন যে আর নাই, এটা নিমাইও লক্ষ্য করেছিল। নিজের তরফ

থেকে নিমাইও একটু লজ্জিত যে না হয়েছিল, তা নয়। তবু পাঁচুকে ডেকে বলে দিলে,

“তোমার অমন কুণ্ঠিতভাবে থাকবার কোনও কারণ নেই বাবাজী; যেমন ছিলে, তেমনিই থাকবে। তোমার পিসি নেই বলে যে আমিও পর হয়ে গেছি একথা যেন ভেব না।”

বলা শেষ ক'রে, হাতের হুঁকোটায় বার কয়েক টান দিয়ে পাঁচুর দিকে তাকাতে দেখলে তার মুখে একটু হাসি ভেসে উঠেছে মাত্র।

পাঁচু কিছু বললে না, শুধু নীরবে মাথা নাড়লে; যেন এ কথা সে জানে, তাই পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

পাঁচুর বয়েস কুড়ি কি বড় জোর একুশ, বুদ্ধিটা কিন্তু তার বয়েসোপযোগী ছিল না, তাই ওর ঘাড়ে ভর করে এ বাড়ীতে যে-সব গুণমণিদের আনাগোনা স্থুরু হ'ল তাদের কারো বয়স বাইশ, কারো বা বত্রিশ; চরিত্রে চারিদিকে চৌকস, তাই দিনরাত্রির অধিকাংশ সময়েই পাঁচুর ঘরে তাস, দাবা, পাসার মহলা ও গান-বাজনার আসর বসতে লাগল।

পদ্ম সকালের বাসিপাট সেরে ঘাটে যাচ্ছিল।

তার একহাতে আমাজা বাসনের রাশি, অন্তহাতে কাঁখে ঘড়া। চলতে চলতে হঠাৎ শুনতে পেলে, পাশে পাঁচুর ঘর থেকে কে গেয়ে উঠল,

অনুগত জনে কেন কর এত প্রবঞ্চনা.
যারে রাখিলে রাখিতে পার, মারিলে কে করে মানা।

সঙ্গে সঙ্গে পাঁচু তবলা ঠুকছে,

“ধা তিন্, তিন্ তা, তেরে কেটে, তা তিন্!”

ঘোমটা টানাই ছিল, আরও খানিকটা টেনে দিয়ে পদ্ম হন্ হন্ করে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

ঘাটে গিয়ে তার শুধু মনে হতে লাগল সতীনকে। একটিবারের জন্যই সে তাকে দেখেছে বটে, কিন্তু তেমন ভালো করেও নয়।

সেই বিকৃত মুখ চোখের কথা স্মরণ হতে সেই ঘাটভরা লোকের মধ্যেও সে ভয়ে যেন শিউরে উঠল। কিন্তু তারপরে? তার সময়ে সংসারের কেমন ব্যবস্থা ছিল কে জানে! আর ঐ পাঁচু .....? ও তো তারই ভাইপো। শোনা যায় ওর পিসি বড় বুদ্ধিমতী ছিল, কিন্তু ওর তো বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। কেন?

পাঁচুর সম্মুখে সে মুখের ঘোমটা খোলে না, কথাও কয়না বটে, কিন্তু আড়াল থেকে বলে। কিন্তু দেখে, পাঁচু মুখ তোলে না, কথার উত্তরও দেয়না, নির্ব্বাক হয়ে শুধু কথাগুলি মেনে নেয়; যেন কোথায় তার অতি বড় লজ্জা ও সঙ্কোচ দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

সে যাক্; কিন্তু ঐ ভূতগুলো?...যারা ওর ঘাড়ে ভর করেছে, ওরা?...

কিসের একটা অজানা আশঙ্কা ও ভয়ে পদ্ম শিউরে উঠল। বাঁধানো পুকুর ঘাট; অনেক মেয়েই গৃহকাজ সারতে এসেছে; তাদের মধ্য থেকেই একটি প্রৌঢ়া কর্কশ স্বরে বলে উঠল,

"বলি, চোখের মাথা তো একেবারে খাওনি বাছা, দেখতে তো পাচ্ছ যে তোমার মত আরও সবাই কাজ সারতেই ঘাটে এসেছে।"

পদ্মর মনটা ভালো ছিল না; হাতের কাজ থামিয়ে কর্ক্শ স্বরে সেও উত্তর দিলে,

"জল লেগে থাকে, ডুব দিয়ে শুদ্ধ হও; তা বলে গালাগালি দেবার তুমি কে গো? ঘাট সবার; আসবেও সকলেই, যার না বনবে সে—"

হাত নেড়ে, প্রৌঢ়া চীৎকার করে উঠল,

"আসবে সবাই যাবে সবাই একথা আমিও জানি, ঘাটও যে কারো অমুক কিনে রেখে যায়নি তাও জানি, কিন্তু তা-ব'লে তো কেউ সতীনের ভাইপোর সঙ্গে হাসি-তামাসা করে রং করতে ঘাটে আসে না!"

"সতীনের ভাইপোর সঙ্গে হাসি-তামাসা!" ..

পদ্মর মাথাটা ঘুরে উঠে চোখের সুমুখে জলস্থল যেন সব একাকার হয়ে গেল।

কোনও রকমে, নির্ব্বাক ভাবে হাতের কাজ সেরে সে যখন উঠে গেল, তখনও ঘাটে তারই নামে আলোচনা হচ্ছে।

কাজ সেরে ফিরতে নিমাইয়ের রোজ যেমন বেলা হয়, সেদিনও তেমনি বেলা হয়েছিল।

বাড়ী ফিরে দেখলে পদ্মর মুখটা ভার, যেন শ্রাবণের আকাশের মত জল-থম্‌থমে।

নিমাই কি একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে গেল; কান পেতে শুনলে পাঁচুর ঘর তখন গুলজার!

ঘন ঘন 'বিস্তি কাবারে'র ধ্বনিও ভেসে আসছে।

নিমাই একটুখানি চুপ করে থেকে কি ভাবলে, তারপরে উঠে গিয়ে, উঠোনের একপাশে বাঁধা গাইটার গলায় নির্ব্বাক দরদীর মত পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

রাত্রে, শোওয়ার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে পদ্ম মেঝের ওপোরে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

নিমাইয়ের খাটা-খাটনীর শরীর, তাই খেয়ে শুয়েই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

অর্দ্ধেক রাত্রে হঠাৎ কিসের একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে শুনলে কে যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে।

পাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে পদ্ম বিছানায় নাই, খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মেঝের যেখানটায় খানিকটা জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল সেইখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বিস্মিতে নিমাই উঠে এসে তার পাশে বসে পড়ল; মাথাটা কোলের ওপোরে তুলে নিয়ে, অসংযত চুলগুলো কপালের ওপোর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে ডাকলে, "ওগো!"

পদ্ম তখনও ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। উত্তর দিলে না। নিমাইও যেন এ অজানা শোকের সান্ত্বনার বাণী খুঁজে পেলে না। শুধু পদ্মর মাথার ওপোরে হাত রেখে নিস্তব্ধ ভাবে বসে রইল। কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পরে আঁচলে চোখ মুখ মুছে উঠে পদ্ম বসল, তীব্র দৃষ্টিতে নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে যেন কি দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বললে,

"আমার একটা কথা রাখবে, বল!"

কি একটা অজানা আশঙ্কায় নিমাইয়ের মনটা একবার দোলা খেলে।

পদ্ম নিমাইয়ের হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়েছিল; সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে আহত স্বরে বলে উঠল,

"কবেই বা তোমার কোন্ কথা রাখিনি বৌ?"

পদ্ম একটু চুপ করে থেকে বললে,

"কিন্তু, অন্য কথা রাখার চেয়ে এ কঠিন; তবু তোমায় করতে হবে, আমার এই কথাটা শুধু রাখতে হবে।"

তার কথার শেষ দিকটা কেঁপে উঠল।

নিমাই কিছু বুঝতে পারলে না, তবু বললে,

"বল।"

"পাঁচুকে তোমার এ বাড়ীতে রাখা চলবে না।"

নিমাই বোধ হয় এতটা আশা করেনি, তাই চমকে উঠল। প্রথমে মুখে কথা ফুটল না, তারপরে প্রশ্ন করলে,

"কিন্তু কেন ?—"

"আমি বলছি—"

"তবু—"

"তবুর কিছু নেই। অন্ততঃ যদি আমায় এ বাড়ীতে রাখতে চাও তো তোমার ঐ পোষ্যপুত্রকে বিদায় দাও, নইলে আমাকেও স্পষ্ট বল।"

তার কণ্ঠস্বর যেন অন্য কারো; তাতে কোমলতার লেশও নাই, আছে শুধু আদেশের ভঙ্গী।

যেন শিউরে উঠে, নিমাই বিমর্ষ হয়ে পড়ল, বললে,

"কিন্তু ওর তো আর কেউ নেই,—পিসি ছিল, সেও মারা গেছে; থাকবে কোথায় ?"

চকিতে পদ্ম মনের মধ্যে যেন একটা কাঁটা অনুভব করলে; যেন ওর পিসির মরণের জন্যে সেই দায়ী, এই কথাটাই নিমাই কথান্তরে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় মনে করে সে শক্ত হয়ে উঠল, বললে,

"কিন্তু সবারই তো সব কেউ চিরকাল বেঁচে আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে বসে থাকতে জন্মায় না, যে পাঁচুরও সবাই বেঁচে থাকবে! যারা জন্মাবে তারা মরবেও; কিন্তু মরবে বলে তো বাড়ীঘর, বিষয়সম্পত্তি সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাবে না! পাঁচুরও তো থাকবার জায়গার অভাব নেই; বাড়ীঘর,

সবই আছে। জীবন-ভোর যে তোমার বাড়ীতেই থাকতে হবে তারও তো কোন নথীপত্র নাই।”

খানিকটা স্তব্ধ হয়ে থেকে নিমাই বললে,

“আচ্ছা ভেবে দেখব।”

কেমন একটা অস্বস্তি যে মনের মধ্যে পোষণ করে নিমাই উঠে গিয়ে শুয়ে পড়ল তা বুঝতে পদ্মর বিলম্ব হ’ল না। কিন্তু সে শুধু চুপ ক’রে হাত দুটো কোলের ওপোর জড় করে বসে রইল, কোনও কথা কইলে না।

ভাবতে কিছু একটা হ’লই। এবং মনের মধ্যে অস্বস্তি থাকলেও একদিন পাঁচুকে ডেকে নিমাইকে বলতেও হ’ল,

“এবার তোমার যাহোক একটা ব্যবস্থা কর বাবাজী।”

পাঁচু ব্যবস্থার কিছুই না বুঝতে পেরে বিস্ফারিত-চোখে নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে নিমাই মুখের ওপোরে একটু শুষ্ক হাসি টেনে আনলে। কি করে কথাটা বোঝায় হঠাৎ ভেবে পেলে না। হাতের হুঁকোয় গোটাকয়েক টান দিয়ে একবার হাই তুলে তার পর রেখে রেখে বললে,

“এই বলছিলাম কি যে তোমার বাপ-পিতেমোর ভিটে, নিজের ঘরবাড়ী সবই তো প’ড়ো হয়ে যেতে বসেছে ; তাই বলছিলাম এইবেলা থেকে যদি ওখানে বসবাস কর তো ওটাও থাকে, আর তোমারও সুবিধে ; বুঝলে না!”

মৃদুহাস্যে ঘাড় নেড়ে পাঁচু শুধু বললে,

"হুঁ।"

আবার হুঁকায় গোটা কতক টান দিয়ে নিয়ে নিমাই বললে

"তবে তোমার পিসি বেঁচে নেই বলে যে আজ আমি তোমায় একথা বলছি, তা স্বপ্নেও ভেব না বাবাজী, আমি বলছি তোমারই ভালোর জন্যে, একথা জেনে রেখ।"

আবার সেই ছোট একটি উত্তর 'হুঁ' বলে পাঁচু একটু হাসলে, তার পরে উঠোনে নেমে তার ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল। তার সুদীর্ঘ সবল দেহখানি যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ নিমাই সেইদিকে চেয়ে রইল, তার পরে একটা নিশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

খাওয়ার সময়, পাতের কাছে এসেই পাঁচুর মনে হ'ল, অন্যদিনের চেয়ে আজকের আয়োজনে যেন একটু বৈশিষ্ট্য আছে।

পিঁড়ির স্থানে পদ্মর হাতে বোনা চটের আসন পাতা, ডালের জন্য আজ একটা বাটিও পাতের কাছে দেখা যাচ্ছে। তরকারী, ভাজার প্রাচুর্য্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

একটু ইতস্ততঃ করে আসন উঠিয়ে রেখে পিঁড়ি পেতে বসতে যেতেই ঘোমটার ভেতর থেকে আদেশের স্বরে পদ্ম বলে উঠল, "থাক্।"

পাঁচু আসন পেতে সঙ্কুচিতভাবে বসে পড়ল।

একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে, ঘোমটা টেনে অদূরে পদ্ম বসে আছে।

অনেক দিনের চাবিবন্ধ বাড়ীটার দরজা খুলতেই কতকগুলো চামচিকে পাখা মেলে উড়ে গেল; কয়েকটা ছুঁচোও আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে পাশ কাটিয়ে দৌড় দিলে; ঘরভরা মাকড়শার জাল, একটা স্যাঁতানি দুর্গন্ধও আছে। পাঁচু প্রথমে অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখতে পেলে না, তার পরে দৃষ্টি পড়ল জানালা থেকে কড়িকাঠ পর্য্যন্ত লম্বমান মাকড়সার জালের দিকে। তার পরে দেখলে মেঝের খানিক খানিক জায়গায় এবং হাত খানেক ওপর পর্য্যন্ত চুণবালি-খসা স্থানে সবুজ শেওলার দল ও ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দরজার ওপোরে বসে পড়ে পাঁচু ভাবতে লাগল, কেমন করে সে এসব পরিষ্কার ক'রে অন্ততঃ একখানা ঘরও বাসোপযোগী করে তুলবে! চিরদিন সে এসব বিষয়ে অনভ্যস্ত, শুধু বাজার করাটুকু ছাড়া সাংসারিক বিষয়ে সে অজ্ঞ বললেও অত্যুক্তি হয় না, তবু আজ তাকে এ সমস্ত করতেই হবে, কারণ আজ তার ও-বাড়ীতে থাকার দিন ফুরিয়েছে শুধু আন্নাকালীর অভাবে।

পদ্মর বিবাহ অবধি আজ পর্য্যন্ত প্রতিদিনের প্রত্যেক ঘটনাটি ভাবতে ভাবতে শরীরের সমস্ত রক্ত যেন গরম হয়ে উঠল।

ঐ বৌ-টা যে কোথা থেকে কেমন করে হঠাৎ এসেই তার পিসিকে সরিয়ে দিলে সে কথা মনে হতে প্রথমে চোখ দুটো রাগে প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠল, তার পরে গড়িয়ে পড়ল দুফোঁটা জল।

বৌ-টার সঙ্গে সে কোনও দিন কথা বলেনি, ডাকেওনি ; সে যা বলেছে, নির্ব্বাক ভাবে তাই প্রতিপালন করে গেছে ; সে যা দিয়েছে তাই নির্ব্বিচারে খেয়েছে, এই পর্য্যন্ত ওর সঙ্গে সম্বন্ধ।

কিন্তু এটুকু তার বেশ মনে হয়, পিসির মত আন্তরিকতা ওর কোনও কাজে না থাকলেও, অযত্নও যে পেয়েছে তাও নয়।

কঠোর মনটা একটু নরম হয়েছিল, আবার ঘরের দিকে চাইতেই শক্ত হয়ে উঠল।

এখানে, এই নির্ব্বাসনে ঐ বৌ-টা ছাড়া তাকে যে আর কেউ পাঠায়নি একথা স্মরণ হতেই, ইচ্ছে হ'লো ওর চুলের মুঠি ধরে বেশ ঘা কতক দিয়ে গায়ের সব জ্বালা মিটিয়ে আসে।

কিন্তু ছিঃ—

গভীর ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে সে উঠে দাঁড়াল, নিমাইয়ের বাড়ী খুব দূরে নয়।

লম্বা লম্বা পা ফেলে চেঁচিয়ে ডাকলে,

"কে আছ, শোন।"

পদ্ম রান্নাঘরে ছিল; দরজার পাশে দাঁড়িয়ে, চাবি বাজিয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করতেই পাঁচু কর্কশ স্বরে বলে উঠল,

"পিসেকে বলে দিও, আমি নিজের বাড়ীতে নিজেই রেঁধে খাব, এখানে খেতে আসতে চাইনে।"

বলা শেষ করে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদশব্দ মিলিয়ে গেল। শুধু চারিদিকের স্তব্ধতায় মধ্যে নীরব ভাষায় ঘুরতে লাগলো পাঁচুর অভিমানহত স্বরের কথাগুলো।

নিমাই বাড়ী ছিল না। প্রাণীর মধ্যে অতবড় বাড়ীটায় ছিল মাত্র তিনজন। একটি গাভী, পদ্ম, আর প্রাচীরের ভাঙ্গা স্থানটিতে কুণ্ডলাকারে শায়িত মিনি বিড়ালটা।

কিছুক্ষণ দরজার পাশে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে পদ্ম আবার ফিরে এসে নিজের কাজে বসল; কিন্তু মুখের ওপোরে তার এতটুকু হর্ষের আভাসও দেখা দিলে না।

ভাত খেতে বসে নিমাই যখন পাঁচুর খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে, তখন সে শুষ্কস্বরে পাঁচুর কথাগুলোই পুনরুক্তি করে গেল মাত্র।

এখানে আসবার পরে, প্রথম পাঁচুকে না খাইয়ে পদ্মর জীবনে খাওয়ার দিন।

ভাত যে কেন মুখে উঠতে চায় না, কে জানে!

কিন্তু অপরাধ যে পাঁচুর নয়, তারই, একথা মনে হতেই চোখের সম্মুখে ভাত তরকারী জলের আলপনায় মুছে যেন একাকার হয়ে গেল।

প্রত্যেক দিনের মত নিমাই আজও ভাত খেয়েই শুয়ে পড়েছিল। দিবানিদ্রাটুকু তার প্রতিদিনের, তাই সেটাকে বাদ দিলে তার চলত না।

এখানে এসে পর্য্যন্ত পদ্মর খাওয়ার তত্ত্বাবধান করতে কেউ ছিল না, একথা ভেবে সে আগে দুঃখ করেছে সত্য কিন্তু আজ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল; তারপরে হাত মুখ ধুয়ে, দরজায় শিকল তুলে দিয়ে, খিড়কীর পথ ধরে নিঃশব্দে পাঁচুর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'ল। ছোট একটা ঘর আর তারই কোলের একটু বারন্দা পরিষ্কার করে পাঁচু বাসোপযোগী করে তুলেছিল। বারান্দাটা দূর থেকেও দেখা যায়; তাই অদূরে একটা ভাঙ্গা প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়িয়ে পদ্ম দেখলে চিড়ে ভিজে, দুধ কলা ও খানিকটা গুড় নিয়ে পাঁচু খেতে বসেছে।

যেমন নিঃশব্দে সে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল। কেউ জানতেও পারলে না, এক অন্তর্যামী ছাড়া।

পরেরদিন পাঁচুর সামান্য একটু জ্বর হযেছিল। সকালে উঠে অনুভব করলে মাথাটা যেন ভার, গা হাত পায়েও বেদনা বোধ হচ্ছে।

কোনও রকমে বাসি ঘরটা পরিষ্কার ক'রে আর দু'একটা কাজ সেরে সে উনুন জ্বেলে রাঁধতে বসল। রান্না শেষ হতে বেশীক্ষণ দেরী হ'ল না, কারণ, আলু, বেগুন, ডাল ভাতে আর ভাত। এ রাঁধতে বেশী সময় যেতে পারে না।

থেকে থেকে মনের মধ্যে অসুস্থতার কথাটাও হানা দিচ্ছিল, কিন্তু দিলেও আজ সে তা অগ্রাহ্য ক'রে—রাঁধবে, স্নান করবে, খাবেও।—

এতদিন যত্নে ও নিয়মে থাকলেও তার শরীর যে শুধু ঐ নিয়ম ছাড়াও চলতে পারে, অযত্ন সহ্য করবার ক্ষমতা তার আছে, এটা সে প্রতিপন্ন করতে চায়, তাতে দুদিন ভুগলে তার ক্ষতি নাই।

রান্না শেষে স্নানের জন্য তেল মাখতে বসতেই মনে হ'ল যেন শীত করছে।

শীতকাল নয়; তবে শীতের লেশ একটু আছে বটে, কারণ ফাল্গুন মাস।

তেলের বাটিটা সরিয়ে রেখে, পাঁচু রোদে থাম ঠেস দিয়ে বসল।

মাঝে মাঝে হুঃ হুঃ করে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। আমগাছগুলো এবারে যেন মুকুলের ভারে ভেঙ্গে পড়ছে। ওপাশের দেব্‌দার গাছের ডালে বসে কি একটা পাখী আর্ত্তস্বরে ডেকে উঠলো, বোধ হয় ডাহুক।

হঠাৎ একটা শব্দে মুখ ফিরিয়ে পাঁচু দেখলে একটি বৌ নিঃশব্দে প্রাচীরের এদিক থেকে সরে যাচ্ছে।

চিনতে দেরী হ'ল না যে ও সেই বৌ-টা!

ও আবার এখানে কি দেখতে এসেছিল ?...

রাগে বিস্ময়ে পাঁচু যেন নিমেষের মধ্যে কেমন হয়ে গেল; তারপরেই চীৎকার করে ডাকলে,

"শুনে যাও—।"

পাঁচুকে মুখ ফেরাতে দেখেই পদ্মর পা যেন আটকে গিয়েছিল, ভয়ে লজ্জায় সে কাঠের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পাঁচু তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল,

"কি দেখতে এসেছ ? জ্বরের ওপোরে রেঁধেছি, স্নান করতে যাচ্ছি, আবার এসে ভাত খাব, এই সব দেখতে এসেছো ? কিন্তু না দেখেই বা চলে যাচ্ছ কেন ?"

কণ্ঠস্বরে আজ যেন বিদ্রূপের আভাস আছে।

পদ্ম খানিকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে দৃঢ় পদে এসে ঘরে ঢুকল, পরে দরজায় তালা বন্ধ ক'রে চাবি আঁচলে বেঁধে পথের দিকে অগ্রসর হতেই পাঁচু বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল "আরে, আমি তা হলে থাকব কোথায়!"

মুখ ফিরিয়ে ঘোমটার ভেতর থেকে মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে পদ্ম বলে গেল, "আমার বাড়ী।"

একটু পরেই নিমাইকে দেখা গেল,—নিমাই আসছে।

"শুনলাম, বাবাজীর নাকি অসুখ করেছে ?"

বিকৃতস্বরে পাঁচু শুধু উত্তর দিলে, "হুঁ ।"

নিমাই কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিল ; ডানহাতের উল্টো পিঠে পাঁচুর গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করে বললে,

"এমন করে এই অসুখ অবস্থায় তো তোমায় এতদূরে ফেলে রাখতে পারিনে পাঁচু !"

একটু থেমে বললে,

"আর তোমার পিসি নেই বলে তো আমিও মরিনি, যে তোমার সব সম্বন্ধ ওবাড়ী থেকে মুছে যাবে। আমি তোমায় এখানে এই অসুখ নিয়ে কিছুতেই পড়ে থাকতে দেব না, তাতে তুমি যাই-ই ভাব। ও-বাড়ীতে তোমায় যেতেই হবে, আমার দিব্যি।"

পাঁচুকে ওবাড়ীতে যেতে হ'লই। কিন্তু অসুখ দুদিনের, সেরেও গেল দু'দিনে, কিন্তু কি জানি কেন নিমাই কি ভেবে পাঁচুকে ওবাড়ী থেকে আসতে দিলে না ; তবুও পাঁচুকে যেন এতদিন পরে পূর্ব্বপুরুষের ঐ ভিটার মায়াই পেয়ে বসল ; তাই কথায় কথায় বললে,

"ও-বাড়ীটাও তো দেখতে হবে ; সময়ে অসময়ের দরকার—"

'অসময়ের দরকার' কথাটা নিমাই আর পদ্মর মনের মধ্যে গিয়ে যেন হাতুড়ীর ঘা দিলে। কিন্তু দু'জনের একজনও উত্তর দিলে না, নীরবে মুখ নীচু করে রইল।

আবার সেই কাজ, কাজ, আর কাজ !

এ কাজের মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য নাই, নূতনত্ব নাই, শুধু গতানুগতিক ভাবে কাজ করে যাওয়া।

নিমাই আগের মতই প্রতিদিন সকালে স্নান করে পূজো করতে যায়,—পাঁচু বাজার এনে দিয়ে নিজের ঘরে আশ্রয় নেয়, আর পদ্ম একমনে ঘর-সংসারের কাজ করে, মাঝে মাঝে ভাষাহীন জীব ঐ গাইগরুটা আর মেনী বেড়ালটাকে উদ্দেশ করে কথাও কয় বটে, কিন্তু উত্তর পায় না।

একটা কান্নার ঢেউ যেন গলা পর্য্যন্ত ঠেলে আসে বিনা কারণেই, পদ্ম খোঁজ করে তার হেতু পায় না, শুধু অনুভব করে দিন দিন দেহ-মনে যেন একটা শ্রান্তি, অবসাদ ভারি পাথরের মত চেপে বসছে।

রাত্রি খুব বেশী না হলেও, সম্ভব সাড়ে নয় কি দশটা হবে। গ্রামের বুক নিস্তব্ধ, শুধু আকাশের বুকে শুক্লা নবমীর চাঁদ ভাসছে। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু ক'রে নারকেল গাছগুলো দুলে পাতার শব্দ করছিল—সর্ সর্ সর্ .....

রান্নাঘরের কাজ, খাওয়াদাওয়ার পাট সারা হয়ে গিয়েছিল। কেরোসিনের ডিবের আলো নিয়ে বারান্দার এককোণে রেখে পদ্ম ধীরে ধীরে উঠে বারান্দায় দাঁড়াল।

ঘরের ভেতর খাটের ওপোরে নিমাই তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কোণে মিটি মিটি করে একটা হ্যারিকেন জ্বলছিল মাত্র, তার আলো বাইরে আসে না, ঘরেরও বিশেষ কিছু দেখা যায় না। উঠোনের ওপাশের ঘরে পাঁচু বসে তবলায় বোল সাধছে; এদিকের যে জানালাটা খোলা আছে সেটা দিয়ে বেশ পষ্ট দেখা যায়।

পদ্মর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তার ওপোরে, একাগ্র চিত্তে সে সাধনা করছে, আর হাত নাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ওর নিটোল পেশীবহুল বাহুদ্বয়ে আলো অন্ধকারের লীলা দেখা যাচ্ছে। মুখের একটা পাশও দেখা যাচ্ছে, অন্য পাশ ছায়ায় ঢাকা। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে পদ্ম তা আকাশের দিকে তুলে ধরল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে অষ্পষ্টস্বরে উচ্চারণ করলে, "ছাই!"

ঠিক এমন সময়ে ঘুম ভেঙ্গে নিমাই ডাকলে, "ওগো!"

বারান্দা থেকেই পদ্ম উত্তর দিলে, "কেন?"

"এখনও শোওনি?"

"না, যাই।"

বলেও পদ্ম নিশ্চলের মত বারান্দার থামে হেলান দিয়ে, আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।—

সেদিন দুপুর বেলা…

নিমাইকে ভাত দিয়ে সুমুখে বসে পদ্ম হাতপাখা-খানাকে ঘন ঘন নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছিল।

নিমাই স্ত্রীর শুষ্ক মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে একবার বললে, "থাক্, আর হাওয়া করতে হবে না, মাছিও তেমন নেই।"

পদ্ম মুখ তুলে একবার তাকালে, তারপরে উত্তর করলে, "কষ্টও তো তেমন কিছু হচ্ছে না।"

"কিন্তু—"

নিমাইয়ের কুণ্ঠা যে কোন্‌খানে তা বুঝতে পদ্মর দেরী হ'ল না; তাই নিজের দিক থেকে সে সঙ্কোচ-কুণ্ঠাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে একটু হেসে বলে উঠল,

"এর মধ্যে কিন্তুর তো কিছু নেই!"

"তা বটে, তা বটে।"

নিজের আশঙ্কাটা সামলাতে নিমাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নিমাইয়ের খাওয়া প্রায় শেষ শেষ হয়ে এসেছিস। পদ্ম বললে, "একটা কথা—"

"কি, বল!"

হাত উঠিয়ে নিমাই পদ্মর মুখের দিকে তাকাতেই পদ্ম আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল, "ভাইপোর বিয়ে দাও......"

নিমাই খানিকক্ষণ চুপ ক'রে পদ্মর মুখের দিকে চেয়ে থেকে কি দেখলে কে জানে, তারপরে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে,

"কথাটা ভাববার মতই বলেছ বটে। তা, এতদিন ওর পিসি থাকলে বিয়ে দিয়ে বৌ আনত। আর বিয়ের বয়েসও তো হয়েছে।

পদ্ম মুখ নীচু করে বসেছিল, উত্তর দিলে না।

নিমাই একবার উত্তরের প্রত্যাশায় পদ্মর মুখের দিকে তাকালে, কিন্তু কোনও উত্তর না পেয়ে নিজের মনেই যেন অতীতের ছবিগুলো স্মরণ করে একবার চমকে উঠল, তার পরে বলে উঠল,

"ও বয়সে তো আমারও বিয়ে হয়েছিল।"

চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন মলিন হয়ে এল, কিন্তু পদ্ম সেদিকে লক্ষ্য না রেখে বলে উঠল,

"পিসি না হলেও আমার কি ওর সম্বন্ধে কোনও একটা অধিকার নেই—এমন কি কথা বলারও ?—আমি কি......"

তার কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে উঠলো ; একটা ঢোক গিলে গলাটা পরিস্কার করে বললে,

"কিন্তু আমার ইচ্ছে—"

"কিন্তু সেদিন তো বলেছি, তোমার কোনও সাধ আমি অপূর্ণ রাখব না।"

পদ্ম কি একটা উত্তর দিতে থেমে গিয়ে উঠে গেল।

দিন কয়েকের মধ্যে পাঁচুও জানলে তার বিয়ে, পাত্রীও ঠিক হয়ে গেছে।

খোলা জানলা দিয়ে দেখলে অদূরে দণ্ডায়মান তার পিতা-পিতামহের চূণবালি-খসা বাড়ীটার গায়ে নিমাইয়ের তদারকে চুণ বালি দেওয়া হচ্ছে।

এ বাড়ীতেও উৎসবের যে আয়োজন চলছে তা বুঝতেও তার বিলম্ব হলো না।

পাঁচু শুনলেও সব, বুঝলেও সবই, কিন্তু এ সমস্তই তার কাছে কেমন যেন মাধুর্য্যহীন ব'লে মনে হ'ল।

অবসর সময়ে চোখের সম্মুখে ভাসতে লাগল একটি বালিকা-বধূর অবগুণ্ঠনাবৃত মূর্ত্তি।

সে মূর্ত্তি কল্পনার,—তাই মানসচক্ষে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বধূর আচার-ব্যবহারে পদ্মর সঙ্গে যেন অনেকটা মিল আছে। দেখতে তাও যেন অনেকটা ঐ রকম,—ঐ রকম একহারা দীর্ঘ দেহ, শ্যামবর্ণ, বড় চোখ ..সব সব ; সব যেন ওরই মত।

পাঁচু চমকে উঠল।—

সেদিন, মৃতা পিসিকে ভাবতে ভাবতে সে গভীর রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ল, ঘুম ভাঙ্গল পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যের আলো প্রকাশ হলে। ঘরের পাশের আমবাগানে, আশ্‌শ্যাওড়ার ঝোপে তখনও একটা দোয়েল শীস দিয়ে দিয়ে ঘুরছিল।

বিছানায় শুয়েই সে শুনলে, পদ্ম উঠে উঠোন ঝাঁট ছড়া দিচ্ছে. গরু বার করে গোয়াল পরিস্কার করছে। আরও কত কাজ .।

এমনি খবর প্রতিদিনের।

পাঁচু উৎসুক হয়ে পদ্মর প্রতি পদক্ষেপ শোনে আর ভাবে সংসার! এমনি একটি সাজানো সংসার হয়তো ভবিষ্যতে তার জন্যেও অপেক্ষা করছে।... ..

ভুলে যায়, "ধা কেটে তেরে কেটে তিন তা...?"

—বিয়ে হয়ে গেল।

বৌ দেখে প্রশংসাও করলে সবাই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রশংসা পেলে পদ্ম। লোকে বললে,

"হ্যাঁ, নিজের পিসি থাকলে এর চেয়ে আর বেশী কিছু করত না বটে!"

পাঁচুর পৈতৃক ভিটায় বৌ বরণ করে ঘরে তুললে পদ্ম। একদিন যে তাকে তারই শ্বশুরের ভিটায় অন্যজন এয়ো-বরণ ক'রে তুলেছিল, একথা স্মরণ করে সে আজ শুধু একটু হাসল।

বৌ দেখে, নিজের গলার মোটা বিছে হারটা তার গলায় পরিয়ে দিয়ে সে যখন বাড়ী ফিরল তখন রাত হয়েছে।

অনেক দূরে একটা পাখী ডাকছিল,

"চোখ গেল।"

যে ঘরটায় আজ কয়েক বৎসর আগে আন্নাকালী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল. সেই ঘরটায় প্রবেশ করে সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

চিত্র ও চরিত্র

পুরাণের অশ্বিনীকুমারযুগল অথবা বেদের নাসত্যদ্বয়ের মত হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের নাম একত্রে উচ্চারিত হয়। সমসাময়িক বলিয়াই যে ইহা সম্ভব হইয়াছে তাহা নহে. দুই কবিপ্রতিভার মধ্যে কিছু মিল আছে।

নবীনচন্দ্র ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বয়সে তিনি হেমচন্দ্রের নয় দশ বৎসরের ছোট হইলেও, হেমচন্দ্রের কাব্যের যে যুগ, সেই যুগপ্রভাব নবীনচন্দ্রকেও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। উভয়েই তীব্র দেশাত্মবোধের কবি। কাব্যরচনায় উভয়ের রীতি বিভিন্ন হইলেও, দুই কবির গীতিকাব্যে সময়ে সময়ে একই সুর বাজিয়াছে। কিন্তু কথাকাব্যে নবীনচন্দ্র একান্তভাবে স্বতন্ত্র।

'পলাশীর যুদ্ধে' যে কাব্যশক্তি স্ফুরিত হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ দুর্লভ। গভীর দেশপ্রেম এবং সহানুভূতির প্রেরণা এই কাব্যখানিকে সজীব এবং তেজোময় করিয়া তুলিয়াছে। পৌরাণিক কাব্যগুলিতে নবীনচন্দ্রের আবেগ বিভিন্নমুখী গতি পাইয়াছে। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাস' —এই তিনখানি লইয়া তিনি এক মহাকাব্য রচনা করিতে

চাহিয়াছেন। এ কাল মহাকাব্যের উপযোগী নহে বলিয়াই হয়ত তাঁহার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে নাই, কিন্তু যে ভাব কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং যে রূপ সে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা কাব্যমোদীর আকর্ষণের কারণ হইয়া থাকিবে।

নবীনচন্দ্র এক অপূর্ব্ব, অখণ্ড মহা-ভারতের কল্পনা করিয়াছেন। ধর্ম্মে কর্ম্মে বিদ্যায় জ্ঞানে সে ভারত মহান্, শিল্পে সৌন্দর্য্যে সঙ্গীতে সে ভারত শ্রেষ্ঠ, পূর্ণতায় তাহা বিরাট, ঐক্যে তাহা সার্থক, মনুষ্যত্বে তাহা প্রধান। শ্রীকৃষ্ণ মানব-দেবতা। সেই আদর্শ-মানব আদর্শ-ভারত গড়িতে অভিলাষী। সেই ভারত-মহারাজ্যে এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন। ইহা অতীতের স্মৃতি নহে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

দেশপ্রেম তাঁহাকে প্রেরিত করিয়াছে, কিন্তু তিনি পূজা করিয়াছেন—মানবতার। জগৎ শুধু মানুষের খেলাঘর নয়। এখানে সমগ্র মানব প্রজা, নারায়ণ—রাজা। বিশ্ব ধর্ম্মের মন্দির।

মানবধর্ম্মের পূজারী বলিয়াই তাঁহার সহমর্ম্মিতা গভীর। ‘কুরুক্ষেত্রে’র করুণরস কবিকেও কাঁদাইয়াছে।

কাব্যের ন্যায়, ভাবুকতা ও ভাবপ্রবণতার সংমিশ্রণে তাঁহার জীবনও কৌতুহলের বস্তু। আত্মহারা নবীনচন্দ্র

সৌন্দর্য্যের উপাসক। তাঁহার জীবনের উত্তাপ কাব্যেও সঞ্চারিত হইয়াছে। তাঁহার কবিসুলভ প্রকৃতি সংসারের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

১৯০৯ সালে, বাষট্টি বৎসর বয়সে 'শৈলকাননকুন্তলা চট্টলভূমির বরপুত্র' নবীনচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন।

এই আদর্শবাদী, ভাবপ্রবণ, আবেগশীল, কার্য্যনিপুণ, বুদ্ধিমান, সৌন্দর্য্যপ্রিয় সহৃদয়, সুশ্রী পুরুষের স্বভাব ও জীবন কাব্যধর্ম্মী ছিল।

সমালোচনা

একটি কথা—শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত,

আমরা—শ্রীঅচিন্তকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত,

এবং ৪৬।১, রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর হইতে গ্রন্থকার মণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম—প্রত্যেকখানি চার আনা।

দুখানিই কবিতা পুস্তিকা। ডিমাই সাইজ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ষোল।

একটি কথায়—আটটি কবিতা আছে।

'একবার মুখ তুলে ডাকিয়ো আমার নাম বাতাসের কানে।'

ভাল,—কিন্তু

'একবার মুখ খুলে ডাকিয়ো আমার নাম বালিসের কানে'...?

'চোখে চোখ পড়েই যদি, নিয়ো না চোখ ফিরিয়ে'

ভাল,—কিন্তু

'খুলে দাও চুলের বোঝা ঝপাঝপ ইতস্তত' . ?

'গড়িয়ে পায়ের নীচে বয়ে যায় অসীম সময়'

বইয়ের মধ্যে এই লাইনটিই সব-চেয়ে ভাল লাগিল।

আমরা—নয়টি কবিতার সমষ্টি।

'আমার মুহূর্ত্তগুলি উড়ে চলে লঘুপক্ষ বকের মতন !'

লাইনটির মধ্যে রূপ আছে।

'জীবনের দাবদাহে মিলে নাই যার স্নেহ-সন্ধ্যার সন্ধান
রচিতেছি আমি তার গান।'

কথাগুলি আবেগবান। কিন্তু—

'তৃষ্ণা মিটে যদি পাই দুটি ক্ষীণ ক্ষীণ'

অর্থ কি ?

একখানিতে প্রেম-নিবেদন এবং আর একখানিতে প্রেমের নৈরাশ্যের সুর বাজিয়াছে।

একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। বই দুখানি ছাপা হইবে বলিয়া কবিতাগুলি লেখা হইয়াছে, না, কবিতাগুলি লেখা হইয়াছে বলিয়া বই ছাপানো হইয়াছে ?

—আগামী সংখ্যায়—

শ্রীসুবোধ রায়ের

ডুব-সাঁতার

সাময়িকী ও অসাময়িকী

কবিতাকে দুই দিক দিয়া বিচার করা চলে—এক তার রসের দিক দিয়া, আর এক তার রূপের দিক দিয়া। এই রস ও রূপ, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের মিলনেই কাব্য সম্পূর্ণ, সুসঙ্গত, সজীব। ভাবই রসে পরিণত হয়। যাঁহারা রসের ভক্ত তাঁহারা বলেন—কবি প্রধানতঃ ভাবুক, রসই কবিতার প্রাণ ও আত্মা, এই আত্মা আপনিই আপনার রূপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইবে, রূপের জন্য ভাবিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা রূপের অনুরাগী, তাঁহারা বলেন—কবি প্রথমতঃ কলাবিৎ, ভাব যেমনই হোক না কেন—গুরু হোক, লঘু হোক, গভীর হোক, আবেগময় হোক, দেখিতে হইবে কবি তাঁহার কাব্যের অন্তর্বর্ত্তী ভাবটিকে প্রকৃত রূপ, যথার্থ আকৃতি দিতে পারিলেন কিনা। এই গুণপনা, এই কলা-নৈপুণ্যেই কবির কবিত্ব।

* * *

সাহিত্যে আর্টের গৌরব অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহার জন্য আর্ট, দেখিতে হইবে কাব্যের অন্তর্গত সেই ভাবপুঞ্জের প্রকৃতি, শক্তি, প্রখরতা অথবা গাম্ভীর্য্য কিরূপ, দেখিতে হইবে নব-ভাব-সৃষ্টির ক্ষমতা কবির কতটা, দেখিতে হইবে মানব-জীবনের কতগুলি রহস্য-কথা ভাব-কল্পনার

আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ভাবের দিক দিয়া কাব্য একটি সৃষ্টি, আর্টের দিক দিয়া তাহা রচনা মাত্র। ভাব ও রূপের সামঞ্জস্যের মধ্যেই রসের পরিপূর্ণতা।

*　　　*　　　*

তাই, শকুন্তলা কবির এক পরমসুন্দর সৃষ্টি। কালিদাসের কল্পনা যেমন একদিকে বিরহের ভিতর দিয়া প্রেমের পরিণতি ও কৃতার্থতাকে কিশোরী ও যুবতী শকুন্তলায় মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিয়াছে, একখানি অতুলনীয় সঙ্গীতের মত তেমনি আবার নিতান্ত বাহুল্যহীন একটি পরিপূর্ণ সঙ্গতি সমগ্র নাটকখানিকে নিরুপম সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। আর্টের সুষমায় শকুন্তলার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে, এমন কাব্য অথবা নাটক আজ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই, এবং দ্বিতীয় কালিদাস না জন্মিলে যে রচিত হইবে এমন সম্ভাবনা নাই। সেক্সপীয়র সকল অবস্থায় রোমান্টিক, ক্ল্যাসিকের এই সমাহিত মহিমা সেক্সপীয়র কোনো দিন আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সাধারণত কল্পনাকে 'কোমলে' রাখিয়া চলিতে পারেন বলিয়া 'কড়িতে' উঠিবার সময় কালিদাসকে কোনো বিকট প্রয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই।

*　　　*　　　*

কল্পনার বিপুলতায় অথবা আবেগের তীব্রতায় ভবভূতি কোন কোন স্থানে কালিদাসকে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু

সমগ্রের সুষমায় ভবভূতি কখনও কালিদাসের নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন নাই।

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ।

এমন একটি আবেগ-স্পন্দিত শ্লোক সারা মেঘদূতখানা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও মিলিবে না। কিন্তু মেঘদূতের সমগ্রতার ভিতর দিয়া বিরহীজনের উৎকণ্ঠার যে অনুপম অনুভূতি প্রকাশ পাইতেছে, সুষমা এবং সৌকুমার্য্যে তাহা চির-মধুর।

দিন-পঞ্জী

১৮ই মার্চ্চ—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ভারতশাসনসংস্কার প্রস্তাব অর্থাৎ 'হোয়াইট পেপার' প্রকাশিত হইল। এই দলিলখানা মোট ১২৫ পৃষ্ঠা এবং ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ উপক্রমণিকা, ইহাতে হোয়াইট পেপারের অন্তর্ভূত বিবিধ সংজ্ঞার ব্যাখ্যা আছে। দ্বিতীয় ভাগে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সংস্কার প্রস্তাব বর্ণিত হইয়াছে, এই অংশে মোট ২০২টি অনুচ্ছেদ। তৃতীয় অংশ পরিশিষ্ট, ইহাতে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদের বর্ণনা।

১৮ই মার্চ্চ, নিফেংকাউ—জাপানের সরকারী স্থত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, জেহল লইয়া ৪৫টা সংগ্রাম হইয়াছে, তাহাতে জাপানীদের তিন সহস্র সৈন্য নিহত এবং ছয় হাজার সৈন্য আহত হইয়াছে।

ভিয়েনা, ২০শে মার্চ্চ—শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এক্ষণে সিমিডগ্যাসিয় অন্তর্গত ফয়ার্থের এক স্বাস্থ্যনিবাসে রোগীরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সম্ভবতঃ ভিয়েনায় এক মাস থাকিবেন। শ্রীযুক্ত বসুর নিকট তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রহিয়াছেন।

১৯শে মার্চ্চ, কাশী—কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি মিঃ এম্-এস্-আণে কর্ত্তৃক পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

রোম, ১৮ই মার্চ্চ—প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, তদীয় কন্যা মিস্ ইসাবেল ম্যাকডোনাল্ড এবং পররাষ্ট্র সচিব স্যার জন সাইমন সীপ্লেনযোগে রোমে পৌঁছান। সিনর মুসোলিনী এবং ব্রিটিশ রাজদূত তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। (এই সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এবং ইটালীর সর্ব্বময় প্রভু পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়াইলেন।—বর্ত্তমান ইতিহাসে ইহা একটি নাটকীয় ঘটনা)।

২২শে মার্চ্চ—বুধবার প্রাতে বে-আইনী ঘোষিত কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বসুকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাঁহাদের তিন মাস করিয়া কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে
আর ইনজেক্সান লইতে হইবে না
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

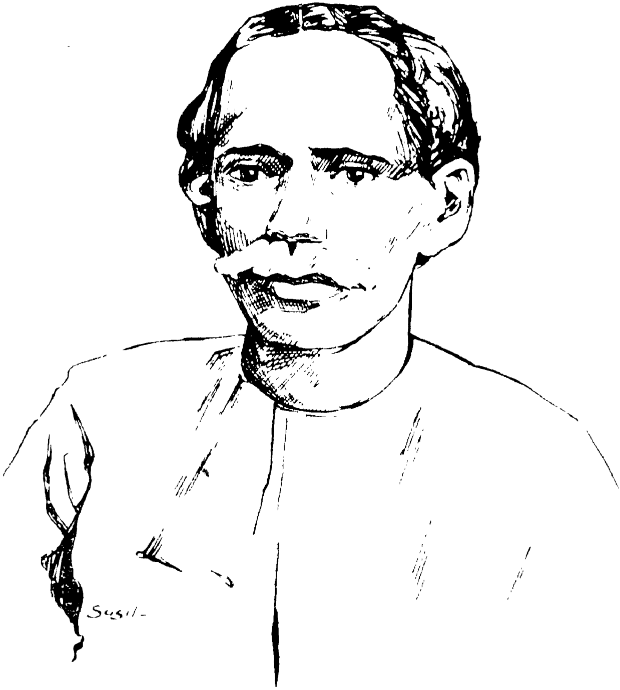

অক্ষয়কুমার দত্ত

ছোট গল্প

১ম বর্ষ] ১৮ই চৈত্র ১৩৩৯ [৩৮শ সংখ্যা

ডুব-সাঁতার

শ্রীসুবোধ রায়

তখন বর্ষাকাল। সেবার কুমীরের ভয়ে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা জড়সড়। কেউ আর নির্ভয়ে প্রাণ ভ'রে স্নান করতে পারে না। একটা বড় মানুষখেকো কুমীর এসে ভয়ানক উপদ্রব বাধিয়েছে, নদীর তীরে চড়া থেকে বাছুর ছাগল নিয়ে গেছে, এই সেদিন ভিন্‌গাঁয়ের এক চাষার মেয়েকে এক ঝট্‌কায় ডুবিয়ে নিয়ে মাঝ-গঙ্গায় মাত্র তিনবার তুলে সুয্যিদেবকে সাক্ষী রেখে কোথায় যে ডুবিয়ে নিয়ে গেল তার কোন পাত্তাই মিলল না,—এই রকম বহু

ঘটনা নরনারীর মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে লোকের মনে কুমীরের বিভীষিকার ছায়া এমনভাবে বিস্তার ক'রে দিলে যে, কয়েক দিন পরে আর বোঝা গেল না এই কুমীরটাকে কে দেখেছে, আর কে দেখেনি। যে দেখেনি তারও ধারণা জন্মাল বোধ হয় সে দেখেছে। এমন-কি কুমীরটা দৈর্ঘ্যে বার ফুট কি ষোল ফুট এই নিয়ে একদিন আমাদের পাড়ার যদু ও হারাধনের মধ্যে তর্ক অবশেষে হাতাহাতিতে গিয়ে পৌঁছল, যদিও সকলেই জানে এই দু'জনের কেউই নদীর দিকে ভুলেও যায় না।

কিন্তু অদ্ভুত ছেলে বীরেন। সারা গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র সেই বিশ্বাস করতে চায় না যে নদীতে বড় কুমীর এসেছে। তাকে কিছু বলতে গেলে এক ধমক দিয়ে সে বলে, "চুপ কর্, বাজে বকিসনি। কুমীর না হাতী! গঙ্গায় আবার মানুষখেকো কুমীর! আসে বটে বছর বছর এই সময়ে দু'একটা মেছো কুমীর। তাতে তোরই বা কি আর আমারই বা কি?" যেমন স্বভাব, তেমনি কথা বলার ভঙ্গী। ভয় কাকে বলে সে জানে না, সেইজন্যে তার কথার মধ্যে এমন একটা জোর আছে যা তার শ্রোতাদের মনে সহজেই সঞ্চারিত হয়। বীরেনের কাছে যখন থাকি, তার কথা শুনি, তখন মনে হয় কুমীরের উপদ্রব, স্রেফ একটা গল্পকথা। কিন্তু একলা থাকলেই মনে হয়—এতগুলো লোক কি বাজে কথা বলে?

বীরেন আমাদের সহপাঠী হলেও আমাদের চেয়ে তিন চার বছরের বড় ছিল। সে ছিল আমাদের কুস্তীর আখ্ড়ার মাষ্টার। দৌড়, ঝাঁপ, খেলা-ধূলায় গ্রামের মধ্যে বীরেন অদ্বিতীয়। সবচেয়ে ওস্তাদ ছিল সে ডুব-সাঁতারে। তাকে কেন্দ্র করে আমরা একদল ছেলে রোজ নদীতে স্নান করতে যেতাম। কিন্তু এই সময়ে সকলের বাড়ী থেকেই নদীতে যাওয়া বারণ হয়ে গেল। প্রথম দিন আমাদের ডাকতে এসে যখন সে হতাশ হয়ে ফিরল, তখন রাগে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে বলে গেল, "Cowards!" অথচ বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান বীরেন। সে গালাগালি দেওয়া সত্ত্বেও মনে হ'ল তাকে ডেকে যেতে বারণ করি, কিন্তু সাহসে কুললো না। সেইদিন থেকে বীরেন আমাদের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলে। আখ্ড়ায় সেও যায়, আমরাও যাই। কিন্তু সে কথাও বলে না, কুস্তীর প্যাঁচও শেখায় না। আমাদের স্পষ্ট বলে দিলে, "যবে থেকে আবার নদীতে নাইতে যাবি তবে থেকে কথা।" আমরা পড়লাম উভয় সঙ্কটে। প্রাণের মায়া ছাড়তে পারি না, এ দিকে বীরেনের বন্ধুত্বের মায়া—সেও তো কম নয়। সপ্তাহখানেক এই ভাবেই কেটে গেল। দেখি, বীরেন অক্ষত-শরীরে বাহাল-তবিয়তে রোজই নদী থেকে স্নান করে আসে। শুধু তাই নয়। শুনতে পাই, সে যেমন আগে সাঁতার কাট্‌ত, একদিনের জন্যও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। তখন আমরা সকলে পরমর্শ

করে বাড়ীতে রীতিমত গোলযোগ সুরু করে দিলাম। ততদিনে কুমীরের উপদ্রবের গুজবও কিছু কমে আসাতে বাড়ীর লোকেরা আর বিশেষ আপত্তি করলেন না। সোল্লাসে আমরা দল বেঁধে যথারীতি পূর্ব্ববৎ নদীতে হাজির হলাম। কিন্তু প্রথমদিন কেউই সাহস ক'রে সাঁতরাতে পারলাম না। আমাদের পেয়ে বীরেনের উৎসাহ সেদিন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। সে যেন একলা আমাদের সকলের হয়ে সাঁতরাতে লাগল।'

এমন সময়ে ঘাটে স্নান করতে এলেন ন্যায়রত্ন মশাই। নিষ্ঠাবান্ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব'লে গ্রামে তাঁর নামডাক ছিল। বীরেনকে ঝাঁপাই ঝুড়তে দেখেই তিনি চ'টে উঠে বললেন "নাঃ, এ ছোঁড়া একদিন কাল করবে দেখছি। এই ক-দিন আর সাঁতার না কাটলেই নয়? এই তো বাবা, এরাও স্নান করছে। ওরে, তোর জন্যে কি আর বলি, দুঃখী মা-টাকে অকারণ কাঁদিয়ে যাবি, তাই না বলা!" বীরেন তদবস্থভাবেই উত্তর দিলে, "আমিও তো ঠিক সেই কারণেই আপনাকে গঙ্গাস্নানে আসতে বারণ করি। কোন্ দিন কি ফ্যাসাদ্ ঘটবে, কুমীরটা শেষকালে বুড়ো মেরে খুনের দায়ে পড়বে।" ছেলেরদল হো হো ক'রে হেসে উঠল। ন্যায়রত্ন মশাই মনে মনে বিরক্ত হ'লেও হাসিমুখেই বললেন, "আমাকে ভয় দেখানো বৃথা। একে তো আমি জীবনের একরকম শেষ সীমায় এসেছি। তা-ছাড়া. কয়েকটা ডুব

দিয়েই আমি আহ্নিকে রত হই। সে অবস্থায় যদি আমাকে কুমীরে ধরে সে তো কাম্য মৃত্যু বলতে হবে।”

মিনিট পাঁচেক পরে দেখা গেল ন্যায়রত্ন মশাই বুকের উপর ভিজা গামছা ফেলে পূর্ব্বদিকে মুখ ক’রে আহ্নিক-পূজা আরম্ভ করেছেন। বেলা হয়েছিল। আমরা বীরেনকে ডাক দিলাম। “এই যাই” ব’লে সে তীরের দিকে আসতে লাগল। আমরা সবাই ওঠবার যোগাড় করছি এমন সময়ে একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে গেল। ন্যায়রত্ন মশাই পূজা করতে করতে হঠাৎ বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, “ওরে বাপরে. ধরলে রে!” এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই ঝটকা মেরে একরকম ডিগবাজী খেতে খেতে তীরে এসে পড়লেন। ও রকম বিকট আর্ত্তনাদ আমরা জীবনে কখনও শুনিনি। তাই হঠাৎ চম্‌কে উঠে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক আকর্ষণ বলে আমরাও যে কেমন করে চক্ষের নিমেষে তীরে উঠে এসেছি, তা বুঝতে পারি নি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, বীরেন, বীরেন কোথায়? সকলের একসঙ্গেই বোধ হয় একথাটা মনে হয়েছিল, কারণ, সকলে একই মুহূর্ত্তে পিছনের দিকে চেয়ে দেখি বীরেন নেই। “যাঃ, তাকেও নিয়েছে।” ক্ষীণ আর্ত্তনাদের মত এই একটি মাত্র কথা আমাদের মুখ থেকে বাহির হ’ল এবং তারপর ভয়ে, শোকে, দুঃখে আমরা প্রস্তর-মূর্ত্তির মত আড়ষ্ট ও হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ন্যায়রত্ন মশাই তখন ভয়ানক হাঁপাচ্ছেন এবং ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে গভীর জলের দিকে চেয়ে আছেন।

এইভাবে আমাদের প্রায় মিনিট খানেক কেটে গেল। এদিকে ঘাটের আর সকলে গোড়া থেকেই চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। তাদের চীৎকারে যখন আমাদের চমক ভাঙ্গল এবং আমরাও তাদের সুরে সুর মিলিয়েছি, এমন সময় অদূরে একটা যেন হাত দেখা গেল। ওই যে, হাতই তো! সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাত, তারপর একটা ধস্তাধস্তি, তারপর এক ঝটকায় একটা সম্পূর্ণ মানুষ জলের উপরে ভেসে উঠল। ওই তো বীরেন! শুধু আমরা নয়, ঘাটের সমবেত নরনারী সোল্লাস ধ্বনি করে উঠল! কিছু দুর দিয়ে একটা নৌকা যাচ্ছিল। আমাদের চীৎকারে সে জোর কমিয়েছিল। আমাদের চোখ হঠাৎ সেদিকে পড়ায় চেঁচিয়ে উঠলাম, "এই মাঝি, নৌকো, নৌকো, ইধার, জলদি!" নৌকার মুখ এদিকে ঘুরতে দেখা গেল, কিন্তু বীরেন একবার মাত্র ঘুরে নৌকাটাকে হাত নেড়ে জানালে—দরকার নেই, তারপর লম্বা হাতে প্রবল বেগে সাঁতার কেটে আধ মিনিটের মধ্যেই তীরে এসে পড়ল। সে কোমর-জলে পৌঁছতে না পৌঁছতে আমরা ছুটে গিয়ে তাকে জাপটে ধরে তুলে নিয়ে এলাম। সে তখন শুধু হাঁপাচ্ছে, তার অন্য কোন রকম ব্যতিক্রম চোখে পড়ল না। চারিদিক থেকে অজস্র প্রশ্নবান বর্ষিত হতে লাগল কিন্তু বীরেন অবিচলিত। শেষ পর্য্যন্ত থাকতে না পেরে আমিও জিজ্ঞাসা করলাম,

"কি করে ছাড়া পেলি?"

"চোখে আঙ্গুল দিয়ে।"

"কই, কোথাও দাঁতের দাগ কি রক্ত দেখছি না তো!"

গম্ভীরভাবে বীরেন উত্তর দিলে,

"ওঃ, কুমীর যে আমায় আলগোছে ধরেছিল।"

ন্যায়রত্ন মশাই এতক্ষণ তার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তার এই উত্তর শুনে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, "তবে নারে পাষণ্ড, অর্ব্বাচীন!" এবং ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হয়ে অভ্যাস বশতঃ এক পা তুলে সেই খালি পায়ে হাত বুলিয়ে খড়মের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এতক্ষণে একটা কথা আমাদের মনের কোণেও উঁকি দিলে। কিন্তু সেটাকে চাপা দিয়ে বললাম "ওকি ন্যায়রত্ন মশাই হঠাৎ অত চটলেন কেন?"

"চটব না? চটব না কেন তা বলতে পারিস? আমি নিশ্চিত বলতে পারি, কুমীর নয়, ঐ ছোঁড়া—ঐ ছোঁড়াই ডুবো সাঁতার দিয়ে আমার পা খাব্‌লেছে।"

সে বিষয়ে আমাদের আর কোনো সন্দেহ ছিল না। তাই সোৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমরা বীরেনের দিকে চাইলাম। উত্তরে সে শুধু বললে, "চল্, চল্, বাড়ী চল্, বেলা হয়েছে।"

তারপর ন্যায়রত্ন মশাইয়ের দিকে ফিরে সহাস্যে বললে, "তবে যে এই মাত্র বড়াই করলেন পূজা-আহ্নিক করতে করতে কুমীরের হাতে মৃত্যু কাম্য।"

অস্বাভাবিক রকম মুখ বিকৃত করে ন্যায়রত্ন মশাই জবাব দিলেন, "বড়াই করলেন, বড়াই করলেন,—বেশ করলেন! তোর কিরে পাজী নচ্ছার? চল তোর মার কাছে, দেখছি একবার!"

রাগে দুঃখে ন্যায়রত্ন মশাই যেন আর কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বেগতিক দেখে বীরেনকে নিয়ে আমরা চটপট বাড়ীর দিকে সরে পড়লাম। কিন্তু দু-পা যেতে না যেতেই আবার ন্যায়রত্ন মশাইয়ের আর্ত্তস্বর কাণে এল, "যা, আমার গামছা, আমার চাঁদের আলো গামছা—এই তিন দিন হল হাট থেকে ছ-আনা দিয়ে কিনে এনেছি।"

২

বীরেনের মাকে না দেখলে না জানলে বীরেনকে ঠিক বোঝা যায় না। জলভরা কালো মেঘের মত শান্ত, স্তব্ধ, সংহত; কিন্তু বেশ মনে হ'ত তাঁর মধ্যে শুধু বৃষ্টিধারা নয়, বজ্রও লুকানো আছে। তাঁর নম্র স্বভাবের মধ্যে মতের এবং ইচ্ছার বেশ একটা সহজ দৃঢ়তা ছিল। একবার তাঁকে রাগতে দেখেছিলাম। পাশের গ্রামের কোন এক অসহায়া স্ত্রীর উপর তার স্বামীর অত্যাচারের কথা শুনে। নমনীয় ইস্পাতে গড়া খরধার খাঁড়ার রৌদ্রবিচ্ছুরিত দীপ্তির মত সেই সময়ে তাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল। আর একবার তাঁর

চোখে বিষাদের ছায়া দেখেছিলাম, যখন বীরেন পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক মাস পরেই স্কুলের পাঠ শেষ করে কলকাতায় যায় কলেজে পড়তে।

তিনি তো শুধু বীরেনের মা ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমাদের সকলেরই মা। যে কয়জন আমরা কলকাতায় চলেছিলাম কলেজে পড়তে, বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে সবাই জড় হয়েছিলাম বীরেনের বাড়ীতে। যখন আমরা সকলে তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিচ্ছি, ঠিক সেই সময়ে তাঁর মুখে একটা বিষাদের ছায়া দেখেছিলাম—শরৎ-আলোক-উদ্ভাসিত ধরণীর উপর চলন্ত মেঘের ছায়ার মত। কিন্তু তারপরেই আবার তাঁর চোখে আনন্দের দীপ্তি, মুখে স্বাভাবিক স্মিত হাস্য ফুটে উঠল। তিনি সকলের ললাট চুম্বন করে বললেন, "প্রার্থনা করি তোমরা সকলে মানুষ হও।"

বোধ হয় বীরেন ভিন্ন তাঁর এ প্রার্থনার মর্য্যাদা আমরা কেউ রাখতে পারিনি।

এর পরে চার বৎসরের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। কেবল বীরেন আমাদের চেয়ে গ্রামের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা রেখেছিল। আমরা অনেকটা শহুরে হয়ে পড়েছিলাম, লম্বা ছুটি ভিন্ন গ্রামে আসতাম না। কিন্তু বীরেন অন্ততঃ তিন দিনের ফাঁক পেলেই গ্রামে আসত। কোনোদিন মুখ ফুটে না বললেও আমাদের মনে হ'ত মাকে একলা ফেলে সে বেশীদিন থাকতে পারে না। কিন্তু

তা ছাড়াও আর একটা কথা ছিল, সে তার গ্রামকে ও গ্রামবাসীদের অসম্ভব রকম ভালবাসত। চার বৎসর কলেজ জীবনের মধ্যে একদিনের জন্যও বোধ হয় গ্রামের সঙ্গে তার একান্ত নাড়ীর যোগ ছিন্ন হয়নি। যে ভাবে মাতাপুত্রে মিলে তারা ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষে গ্রামের সেবা করত, তা দেখলে বিস্মিত হতে হ'ত।

বীরেনের বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন তাতে বীরেনের জীবন বোধ হয় স্বচ্ছন্দেই কেটে যেতে পারত। কিন্তু সে ব'সে থাকবার ছেলে নয়। তাই বি-এ পাশ করার পর গ্রামের স্কুলেই সে মাষ্টারী নিলে এবং এর উপর ব্যায়াম শিক্ষাদান, নাইট্ স্কুল, দরিদ্র ভাণ্ডার, স্বদেশী সভা-সমিতি প্রভৃতি নিয়ে সে এমন মেতে উঠল যে, মনে হ'ল তার গ্রামকে যতক্ষণ না সে একটা আদর্শ গ্রামে পরিণত করবে ততক্ষণ যেন তার আর বিশ্রাম নেই।

এই সময়ে একদিন ন্যায়রত্ন মশাই বীরেনের মার কাছে হাজির। বীরেনের মা প্রণাম ক'রে তাড়াতাড়ি আসন পেতে দিলেন। ন্যায়রত্ন মশাই আসন পরিগ্রহ ক'রেই বললেন, "শুনেছ তো মা?"

"কি?"

"তোমার ছেলে পাড়ার আর সব ছেলেদের জুটিয়ে একটা অজাতের মেয়ের মড়া পুড়িয়েছে।"

"জানি বৈকি। সে তো আমার অনুমতি না নিয়ে কোনো কাজ করে না।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ন্যায়রত্ন মশাই বললেন, "তুমি অনুমতি দিলে ?"

সহজ সুরেই বীরেনের মা উত্তর দিলেন. "হ্যাঁ. এ তো কোনো অন্যায় কাজ ব'লে মনে হয়নি।"

আমৃতা আমৃতা ক'রে ন্যায়রত্ন মশাই বললেন, "না, না, অন্যায় নয়, তবে কিনা—অসঙ্গত। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে একটা অজাতের মড়া ছোঁয়া !"

"গ্রামের মধ্যে মড়াটা প'চে একটা বীভৎস কাণ্ড হলে কি ভাল হ'ত, ন্যায়রত্ন মশাই ?"

বীরেনের মার এই প্রশ্নে একটু অপ্রস্তুত হয়েই ন্যায়রত্ন মশাই জবাব দিলেন, "না, তা বল্‌ছিনা, তবে কিনা অজাতদের দিয়ে মড়াটা ফেলালেই হ'ত।"

"অজাত খুঁজে কে বার করে, বলুন ? তা ছাড়া কতকগুলো টাকা তো তা হ'লে এর জন্যে আপনাদেরই খরচ করতে হত।" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে বীরেনের মার মুখে একটি স্মিতকৌতুকহাস্য ফুটে উঠল।

কৃপণ ন্যায়রত্ন বোধ হয় এই খরচের দিকটা এতক্ষণ দেখেন নি। তাই তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন, "তা তো

বটেই। হ্যাঁ, বীরেন যা করেছে ভালই করেছে। অবশ্য পরোপকার নিশ্চয়ই ভাল কাজ। তবে কি জানো মা, আমরা সেকেলে লোক, তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, ভালর বুঝি এতটা ভাল নয়।”

অতঃপর তিনি “দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি” বলতে বলতে বিদায় নিলেন। বীরেনের মাও আর কোন কথা না বলে তাঁর চিরন্তন স্মিতহাস্যের সঙ্গে ন্যায়রত্ন মশাইয়ের পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলেন।

ক্রমে এই ন্যায়রত্নের দল বীরেনের ভীষণ বিরোধী হয়ে উঠল এবং ভিতরে ভিতরে তাকে জব্দ করবার ফন্দী আঁটতে লাগল, কিন্তু গ্রামের যুবক ও ছেলের দল বীরেনের বিশেষ অনুগত হওয়ায় প্রকাশ্যভাবে কিছু করতে সাহস পেলেনা।

৩

এই গ্রামের জমিদার চৌধুরীরা এক সময়ে বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। বর্ত্তমান বংশধরদের সে প্রভাবও নেই, প্রতিপত্তিও নেই, তবে নির্ব্বাণোন্মুখ অঙ্গারের মত কিছু উত্তাপ আছে। এই জমিদারদের যখন উঠ্তির দিন ছিল, সেই সময়ে এঁদের কোন এক পূর্ব্বপুরুষ জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একদল বাগ্দী পাইক আনিয়েছিলেন এবং গ্রামের প্রান্তে বসবাসের জন্য খানিকটা নিষ্কর জমি তাদের

দিয়েছিলেন। সেই থেকে সেই নিষ্কর জমিতে তারা বংশপরম্পরা বাস করে আসছে। এখন আর পালপার্ব্বণ ভিন্ন জমিদার বাড়ীতে তাদের ডাক পড়ে না। তারা সবাই অন্যত্র খেটে খায়। কিন্তু এখনও তাদের মধ্যে দু' চারজন এমন আছে যে লাঠি-হাতে দশ-বিশজনের মওড়া অনায়াসেই নিতে পারে।

হরিসভার বাড়ীর জন্য জমি খুঁজতে হঠাৎ ন্যায়রত্ন মণ্ডলীর শ্যেনদৃষ্টি পড়ল বাগ্দীদের এই জমিটার উপর। তাঁরা বাগ্দীদের সেখান থেকে সরাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সুবিধা হল না। বাপ-পিতামহের ভিটে ছাড়বে না বলে তারা বেঁকে বসল।

বীরেন তাদের কাছ থেকে লাঠিখেলা শিখেছিল। প্রতিদানে সময়ে অসময়ে অনেক উপকার তারা বীরেনের কাছ থেকে পেয়েছে। বিপদে আপদে সেই ছিল তাদের পরামর্শদাতা। এই সদ্ব্রাহ্মণের ছেলেকে তাই তারা বিশেষ মানত এবং তাকে 'দেবতা' বলে ডাকত। ন্যায়রত্ন মশাই একথা জানতেন। তিনি গিয়ে বীরেনকে ধরে বসলেন, "বাবা, গ্রামের হরিসভার জন্যে এইটুকু তোমায় করতে হবে।"

বীরেন বললে, "দেখুন, পৈতৃক ভিটে ওদের কাছে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। তবু আমার কথায় ওরা অন্যত্র যেতে পারে, যদি সে জমি নিষ্কর হয় আর ওদের ঘরের পূরো দাম ওরা পায়।"

কিঞ্চিৎ উষ্মার সঙ্গে ন্যায়রত্ন মশাই বললেন, "এ যে বড় বেজায় বলছ বীরেন; নিষ্কর জমি আমি কোথা থেকে পাব?"

"তাহলে ওরা যাবে না।"

ন্যায়রত্ন দেখলেন এক ঢিলে দুই পাখী মারার এই সুযোগ। তিনি জমিদারের শরণাপন্ন হলেন। জমিদার প্রথমে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে রাজী হন্‌নি, কিন্তু চতুর ন্যায়রত্ন মশাই জানালেন যে, সেদিনের অর্ব্বাচীন ছোঁড়া বীরেনটা ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে বাগ্দীদের ক্ষ্যাপাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সে আরও বলেছে জমিদারের সাধ্য নেই যে বাগ্দীদের ওখান থেকে এক পা নড়ায়।

জমিদারবাবু এতক্ষণ তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে গড়গড়ার সটকা টানছিলেন। এই কথা শুনে তিনি চোখ চেয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, "তাই নাকি? তাহলে তো একটা কিছু করতে হয়।"

পরম হিতৈষীর মত ন্যায়রত্ন বললেন, "আপনার সম্মান—ব্রাহ্মণের সম্মান বিপন্ন, তাইতো আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। একটা বিহিত না করলে তো আর মান থাকে না। ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ রক্ষা না করলে আর কে করবে?"

জমিদার বললেন—"তা তো বটেই।" তাঁর সুর আত্মতৃপ্ত অহঙ্কারের খুসীতে ভরা।

উৎসাহিত হয়ে ন্যায়রত্ন বলে চললেন, "তার উপর আমি যতদূর জানি আপনার প্রপিতামহ ওদের দয়া করে ওখানে থাকতে দিয়েছিলেন, কোনো দানপত্র লিখে দেননি। তখনকার স্বচ্ছল দিনে যা চলত এখনকার টানাটানির সময়ে কি তা চলে? অতটা জমি থেকে আয় তো নেই-ই, বরং আপনাকে উল্টে সরকারে তার খাজনা গুঁজতে হচ্ছে।"

জমিদার বললেন, "ঠিক বলেছেন। আপনি বাড়ী যান। ব্যবস্থা একটা হবে।"

ব্যবস্থা একটা হলও, কিন্তু সেটা যেমন আকস্মিক তেমনি অভাবিত। ব্যাপারটা এই।—হঠাৎ একদিন রাত্রে জমিদারের নায়েব কয়েকজন লোক নিয়ে বাগ্দীদের উদ্বাস্তু করতে যায়। বাগ্দীরা গিয়ে বীরেনকে খবর দেয়। বীরেন নায়েবকে নিরস্ত করবার বিধিমত চেষ্টা করে কিন্তু নায়েব সে সমস্ত অনুনয় অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে লোকদের হুকুম দেয় বলপ্রয়োগ করতে। ফলে একটা মারামারি এবং উভয়পক্ষের দু'একজন জখম হয়। নায়েব এর জন্য প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিল, কারণ সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয় এবং বীরেন ও কয়েকজন বাগ্দীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

পরদিন সকালে গ্রামের লোক সমস্ত ব্যাপার শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বীরেন জামিনে খালাস হয়ে বাড়ী এল। যে ক-দিন ছিল তার মধ্যে একদিনও কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ সে করেনি। আমরা কিছু বলতে গেলে বরং তিরস্কৃত হয়েছি। সদরে মোকদ্দমা হল। বীরেন আদ্যোপান্ত খুলে ব'লে সমস্ত দোষই স্বীকার করে নিলে। বাগ্দীদের পক্ষে Right of Private Defence ছিল, কিন্তু প্রমাণ হল বীরেন সে সীমা অতিক্রম করেছে। নিঃস্বার্থ পরোপকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনের সীমার বাইরে পড়ে, অতএব তা দণ্ডনীয়। তাই বাগ্দীরা খালাস পেলে কিন্তু বীরেনের প্রতি ছ-মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল!

পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করতে যাবার সময় বীরেন মায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে যখন প্রণাম করলে তখন তার মা তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে সস্নেহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে, মন কেমন করছে?"

তার নিজস্ব ভঙ্গীতে ঘাড় বেঁকিয়ে বীরেন উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, ছ-মাসের জন্যে আবার মন কেমন! এই ফাঁকে সতরঞ্চি বোনা শিখে নেব মা। গিয়েই সেখানকার কাজে ডুব দেব, আর ছ-মাস কাবার হয়ে যাবে।"

যেমন মা, তেমনি ছেলে। অদ্ভুত ধাতু দিয়ে গড়া! আমরা কয়েকজন বীরেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিন্তু চোখের জল রাখতে পারিনি। আমাদের কাঁদতে দেখে পিঠ চাপড়ে বললে, "কাঁদছিস কিরে! Cowards!"

আর কেঁদেছিল বাগ্দীরা। সে কি ফুলে ফুলে কান্না! বীরেনের পা আর তারা ছাড়তে চায় না। বলে, "তুমি শুধু একবারটি হুকুম দিয়ে যাও দেব্‌তা। ঐ বিট্‌লে বামুন ন্যায়রত্ন আর নায়েবের মাথা দুটো চার ফাঁক করে দিই।" তারা শান্ত হয়ে থাকবে এই সত্য করিয়ে নিতে বীরেনকে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল। সেদিন তাদের দেখে মনে হয়েছিল পল্লীর বামুন কায়েতের মন যদি এই বাগ্দীদের মত সরল ও সবল হত, তাহলে এতদিনে দেশের চেহারা বোধ হয় বদলে যেত।

৪

গ্রামের অধিকাংশ লোকই এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হয়েছিল। কিন্তু কারও বিশেষ কিছু করবার ছিল না। কারণ অন্যায়ের প্রতীকার করবার মত সাহস ও শক্তি অধিকাংশেরই ছিল না। যাদের ছিল, তারা জানত এর প্রতিশোধ যদি কেউ নেয়, বীরেন তাকে কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারবে না। সে বলত, সব চেয়ে ঘৃণার্হ কাজ অজ্ঞ ও অসহায়ের উপর বলপ্রয়োগ করা। তবু আমাদের মধ্যে স্থির হয়ে গেল বীরেন ফিরে এলে তার অনুমতি নিয়ে এর একটা বিহিত করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে গ্রামে

এ-রকম অন্যায় ও লজ্জাকর কাণ্ড আর ঘটতে না পারে।

এর মাস দুই পরেই বীরেনের মার হঠাৎ জ্বর হল এবং তা উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। আমরা কয়েকজন পালা করে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলাম। একদিন তিনি আমাকে একলা পেয়ে বললেন, "দেখ সুরেন, তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। পরে হয় তো আর সময় হবে না।"

"সে কি কথা মা?"

"হ্যাঁ, মনে হচ্ছে আমার দিন বোধ হয় ফুরিয়ে এসেছে।"

কাতর স্বরে আমি বললাম, "ওসব কথা বোলো না মা। তুমি একটু চুপ কর।"

ক্ষীণহাসি হেসে তিনি বললেন, "চুপ করলেই কি ভবিতব্য বন্ধ হবে, বাবা? হ্যাঁ, বলছিলাম কি, আমি মারা গেলে বীরেনকে এখন সে খবর দিও না। সে ফিরে এসে যা হয় শুনবে।"

তাঁর এই কথা আমার বুকে যেন শেলের মত বিঁধল। আমি ব্যথা-বিহ্বল হয়ে বলে ফেললাম, "মা তুমি বড় নিষ্ঠুর! এসব কথা বলতে তোমার কি একটুও কষ্ট হয় না?"

কথাটা বলেই মনে হল আমিই বোধ হয় এই কথা ব'লে অধিকতর নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছি। কারণ কথাটা শুনেই তিনি কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন এবং যেন আপন মনে বলতে লাগলেন, "নিষ্ঠুর, আমি নিষ্ঠুর, হয় তো সত্যি!"

তারপর আমার দিকে ফিরে ব্যথিতকণ্ঠে বললেন, "কিন্তু কষ্ট আমারও হয়, বাবা! এই তো বীরেনের জেলের পর থেকে কিছুই আর বিশেষ খেতে পারিনে। চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। যখনই মনে হয় সে লপসী খাচ্ছে, তখনই আমার মুখে অমৃতও বিষ হয়ে ওঠে।"

একটু থেমে আবার বললেন, "কিন্তু সত্যি বলছি বাবা, বীরেন যে আমার মানুষ হয়েছে, আমার এই আনন্দ আমার সমস্ত কষ্টকে ছাপিয়ে ওঠে। বীরেন জেলে গেছে, কষ্ট হয় বই কি। কিন্তু সে কষ্ট বীরেনের জন্যে তত নয় যত এই অন্ধ অসহায় গ্রামবাসীদের জন্যে। এরা তাকে সইতে পারলে না, শুধু আজ পারলে না তা নয়, মনে হয় কোনোদিনই পারবে না, কিন্তু তা পারলে বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত এদের ভালই হত।"

বিরুদ্ধ চেষ্টা সত্ত্বেও আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আমার হাতের উপর আস্তে হাত বুলিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন, "ছি বাবা, কাঁদতে আছে? দেখ, বীরেন

তোমায় ভালবাসে। ফিরে এসে অন্ততঃ তোমার কাছে সে একবার যাবেই। তাকে বোলো, মরবার সময় তার মার মনে কোনো দুঃখ ছিল না।”

সেই তেজস্বিনী, শক্তিময়ী, সত্যব্রতা নারীর কথা মিথ্যা হল না। তাঁর অসুখ ক্রমে নিউমোনিয়ায় দাঁড়াল এবং কয়েকদিন পরেই তিনি মারা গেলেন।

৮

যথাসময়ের কয়েক দিন পূর্ব্বে একদিন দুপুর নাগাদ্ হঠাৎ বীরেন এসে উপস্থিত. চেহারা একটু কৃশ ও কালো, একমুখ দাড়িগোঁফ। তাকে দেখে চম্‌কে উঠলাম এবং যুগপৎ আনন্দে ও শোকে নির্ব্বাক্ হয়ে যেমন ছিলাম তেমনি রইলাম।

একটু ম্লান হাসি হেসে সে বললে “অবাক হয়েছিস না? কি রকম surprise দিয়েছি! ভাল হয়ে ছিলাম বলে কয়েকদিন বেশি মাপ দিয়েছে, তাই আগেই এসে হাজির! আমি সত্যিই ভাল ছেলে রে, কেবল তোরাই বুঝলিনে, এই যা দুঃখ।”

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “খবর জানিস?”

প্রশ্ন শুনেই তার হাসি মিলিয়ে গেল এবং মুখের ম্লান ছায়া আরও গাঢ় হয়ে উঠল। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। তারপরই তার চিরপরিচিত স্মিতহাস্যের সঙ্গে উত্তর দিলে, "না, তুই চিরকালই কি এই রকম বেয়াকুব থাকবি? বাড়ী না ঘুরে, আর সব খবর না নিয়ে আমি আগে এখানে এসেছি, এই তোর ধারণা?"

আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। এতক্ষণে আমার খেয়াল হল বীরেন পথশ্রান্ত, হয়ত ক্ষুধার্ত্ত।

দেখতে দেখতে গ্রামে সংবাদ ছড়িয়ে গেল এবং বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অনেকেই এসে হাজির হল। হাত মুখ ধুয়ে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে সে শান্তভাবে তার মায়ের অসুখ থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কথা শুনলে। তার মা যে শেষ কথাটি তাকে বলবার জন্য আমাকে বিশেষ করে আদেশ করেছিলেন, তা শুনে সে ধীর ব্যথিত কণ্ঠে উত্তর দিলে, "একথা তিনি না বললেও আমি বুঝতাম।"

বেলা হয়ে গিয়েছিল। তার খাবার কথা জিজ্ঞাসা করাতে বললে, হবিষ্য করবে। জিনিষপত্র সব যোগাড় করে দিলাম। সে নিজের বাড়ীতে গিয়ে মালসা পুড়িয়ে হবিষ্য করলে। রাত্রে দুধ গঙ্গাজল খেয়ে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে ভূমিশয্যায় শুয়ে রইল এবং পরদিন অতি প্রত্যুষে আমার কাছ থেকে মাত্র একশো টাকা নিয়ে গয়া যাত্রা করলে। তার টাকাকড়ি জিনিষপত্র যা আমাদের কাছে ছিল সে সম্বন্ধে

কথা বলতে গেলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "থাক্‌না এখন। আমি কি আর অগস্ত্যযাত্রা করছি?"

কিন্তু সত্যিই সে অগস্ত্যযাত্রা করলে। সে যাবার কয়েক দিনের মধ্যেই গয়ায় ভীষণ প্লেগ ও মড়ক আরম্ভ হল। প্রথমেই সংবাদপত্রে চোখ পড়ল বীরেনের নাম—প্লেগ হাসপাতালে রোগীদের শুশ্রূষার জন্য সেবকসঙ্ঘ গড়েছে। কিন্তু ওই একবার মাত্র। তারপর কেই বা সংবাদ দেয়, কেই বা সংবাদ নেয়। মড়ার গাদায় গয়ার সকল সংবাদই চাপা পড়ে গেল।

যখন তিন মাসের মধ্যে সে ফিরে এল না এবং খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দিয়েও কোনো ফল হল না, তখন আমাদের মনে কোনো সন্দেহই রইল না যে বীরেন আর্ত্তের সেবা করতে করতে বীরের মত প্রাণ দিয়েছে। তবু এক বৎসর পর্য্যন্ত আমরা প্রতীক্ষা ছাড়িনি। এক বৎসর পরে গ্রামে তার নামে একটি পল্লী-সংগঠন-সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তার সমস্ত টাকাকড়ি সেই সমিতির 'ট্রাষ্ট ফাণ্ড'এ জমা দেওয়া হল।

এই সমিতি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, সংবাদপত্রের ভাষায়, 'এক মহতী শোক-সভার অধিবেশন' হল। বলা বাহুল্য, এই সভায় সব চেয়ে বেশি মায়া-কান্না কাঁদলেন আমাদের ন্যায়রত্ন মশাই। সভার প্রারম্ভে বেশ একটা আত্মতৃপ্তি বোধ করেছিলাম যেহেতু সভার আয়োজন আমিই করেছিলাম।

কিন্তু ন্যায়রত্নের চোখের জল দেখে হঠাৎ মনে হল, এ বীরেনের স্মৃতির সম্মান নয়, নিদারুণ অপমান। সে বেঁচে থাকতে কেউ তাকে ব্যঙ্গ করতে সাহস পায়নি, তাই এই নীচ কাপুরুষেরা সেই মৃত বীর পুরুষকে চোখের জল দিয়ে ভ্যাংচাচ্চে। নিজের অজ্ঞাতসারে এত বড় হীন প্রহসনের উপলক্ষ্য হয়েছি বলে নিজেকে বারবার ধিক্কার দিলাম।

তারপর দীর্ঘ দশ বৎসর কেটে গেছে। এই দশ বৎসরের ইতিহাস যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি মর্ম্মন্তুদ। রোগে, দৈন্যে, গৃহবিবাদে, মৃত্যুতে আমাদের গ্রাম এখন প্রায় শ্মশানে পরিণত। যাদের অর্থ-সামর্থ্য আছে সবাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। আমি কলকাতায় এসেছি। গ্রাম ছেড়ে যখন কলকাতায় আসি, তখন মৃত্যুশয্যাশায়িনী বীরেনের মার কথাগুলি বারবার মনে হল, "এরা তাকে সইতে পারলে না, শুধু আজ পারলে না তা নয়, মনে হয় কোনো দিনই পারবে না, কিন্তু তা পারলে বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত এদের ভালই হত।" স্বর্গগতা সেই মহীয়সী নারীকে তখন মনে মনে প্রণাম করে বলেছি, "মা, তুমি ছিলে সত্যদ্রষ্টা। এই দুর্ভাগা ছন্নছাড়া গ্রামের ভীষণ পরিণতি তুমি বোধ হয় তোমার মানসচক্ষে দেখেছিলে। তাই তোমার একমাত্র সন্তানের ব্যথাকে অতিক্রম করেও এই শত শত অজ্ঞ অসহায় গ্রামবাসীর ব্যথাই তোমার বুকে অধিক বেজেছিল।"

কালের নিশ্বাসে স্মৃতির ছবিও মলিন হয়ে যায়। বীরেনের কথাও ভুলতে বসেছিলাম। কিন্তু সেদিন একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ক্ষণিকের জন্য আবার তার দেখা পেলাম। কুম্ভমেলা উপলক্ষে প্রয়াগে গিয়েছিলাম। সাধুদের শিবিরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় অবধূতদের আড্ডায় হঠাৎ একজনকে দেখেই মনে হল বীরেন। সেই চোখ, সেই মুখ,—সে কি ভোলবার ? সে একজন প্রধানের পদাধিষ্ঠিত বলেই মনে হ'ল, কারণ আড্ডায় অন্যান্য সাধুরা হরদম তার কাছ থেকে আদেশ উপদেশ নিয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ দুর থেকে লক্ষ্য করে অপর একজন সাধুর কাছ থেকে নাম জেনে নিলাম—'বীরানন্দ'। বীরানন্দও আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন কিন্তু সে দৃষ্টিতে কোনো কৌতুহল ছিল না।

একটু ফাঁক পেয়ে সাহস করে এগিয়ে গিয়ে একেবারে প্রশ্ন করে বসলাম, "বীরেন না ?"

মুখে সেই পরিচিত দুষ্ট হাসি—বীরানন্দ উত্তর দিলেন, "বীরেন ? সে তো অনেক দিন মারা গেছে। নিজ হাতেই তো তার শ্রাদ্ধ করেছি।"

চমকে উঠলাম। মারা গেছে তাহলে! কিন্তু সেই কণ্ঠস্বরই তো! চমক কেটে গেল, সব বুঝলাম। কিন্তু আর কিছু বলবার আগেই তাঁর কাছে একদল সাধু এসে উপস্থিত হ'ল। তিনি সহাস্যে কপালে যুক্তকর ঠেকিয়ে আমাকে

বললেন, "নমস্কার, ভগবান তোমার কল্যাণ করুন" এবং আগন্তুকদের সঙ্গে হিন্দীতে কথাবার্ত্তা সুরু করে দিলেন।

বাড়ী ফেরার পথে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম। যেদিন সে ন্যায়রত্ন মশাইকে ডুব-সাঁতার কেটে জব্দ করেছিল, সেদিন থেকে তার জীবনের সমস্ত ঘটনা চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল। মনে হ'ল, জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সকল নদীই সে অবলীলাক্রমে ডুব-সাঁতার কেটে পার হয়েছে। মরণের কালো নদীও কি সে ঠিক এমনি সহজে একডুবে পার হয়ে পরপারে কূলে উঠবে? কে জানে!

প্রসঙ্গ

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

—২—

হিপ্‌নটিজ্‌ম বা সংবেশন

পূর্ব্বে বলিয়াছি সংবেশকের মুখে বারবার একই কথা শুনিলে অভিভাব্যতা (suggestibility) বৃদ্ধি পাইয়া সংবেশিত অবস্থার উৎপত্তি হয়। পুনরুক্তি অভিভাব্যতা বৃদ্ধি করিবার এক প্রধান উপায়। বিপদে আপদেও আমরা সহজে অপরের দ্বারা অভিভাবিত হই ও নিজের বিচার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরের পরামর্শে চলি। সভাসমিতিতে বা অপর স্থলে বহু ব্যক্তি একত্রিত হইলে দেখা যায় যে সকলেরই অভিভাব্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণেই সুবক্তা বিনা আয়াসে জনসাধারণকে নিজ মতানুযায়ী চালাইতে পারেন। জনতার সংস্পর্শে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও বিচারবুদ্ধি অনেকটা খর্ব্ব হয়, ইহা অতি বিচিত্র ব্যাপার।

* * *

নিদ্রাকালে বা তন্দ্রাবস্থাতেও অভিভাব সহজেই ফলপ্রদ হয়। যে বালক ধূমপানে অভ্যস্ত হইয়াছে তাহাকে যদি প্রতিরাত্রে নিদ্রাকালে বলা যায় যে তাহার ধূমপানে বিরক্তি জন্মিবে তবে অনেক সময়েই তাহার কুঅভ্যাস ছাড়িয়া যায়। নিদ্রার সময় এরূপ জোরে কথা বলিতে হইবে যে ঘুম পূরা ভাঙ্গিয়া না যায় অথচ নিদ্রাঘোরে সে যেন শুনিতে পায়।

যে সব প্রক্রিয়ার দ্বারা তন্দ্রা বা নিদ্রার উদ্রেক হয় সে সকলই অভিভাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে সহায়তা করে। গায়ে হাত বুলানো, ধীরে মাথা চাপড়ানো, একঘেয়ে ঘুমপাড়ানি সুর, শায়িত অবস্থা, অন্ধকার ঘর ইত্যাদি সংবেশনের সহায়ক। মোরগকে ধরিয়া জোর করিয়া তাহার ঠোঁট মাটিতে খানিকক্ষণ ঠেকাইয়া রাখিয়া যদি সন্তর্পণে হাত তুলিয়া লওয়া যায় তবে মোরগ স্তম্ভিত অবস্থায় থাকিয়া যায়, নড়ে চড়ে না। পারাবতকেও এইভাবে আড়ষ্ট করিয়া রাখা যাইতে পারে। অসহায় ভাব হইতে এই অবস্থার উৎপত্তি। এই স্তম্ভিত অবস্থা সংবেশিত অবস্থারই অনুরূপ। শশক, ছাগল, ব্যাং, সাপ প্রভৃতি অনেক প্রাণীকেই এইরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা সংবেশিত করা যায়। জোর করিয়া এই অবস্থা হইতে না উঠাইলে পারাবত প্রভৃতি কোন কোন প্রাণী বহুকাল অবধি নড়ে চড়ে না, এবং অনাহারের ফলে কখন কখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মানুষকেও সংবেশিত অবস্থায় বহুকাল রাখা যায়। কোন কোন চিকিৎসকের মতে গুরুতর ব্যাধিতে মাসাধিক কালব্যাপী সংবেশন অতিশয় ফলপ্রদ। সংবেশিত অবস্থার ও স্বাভাবিক নিদ্রার মধ্যে পার্থক্য আছে। নিদ্রিত ব্যক্তি পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন নহে, তবে উচ্চশব্দে বা ধাক্কা দিলে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার অন্য কোন গুরুতর ব্যতিক্রম ঘটিলে নিদ্রাভঙ্গ হয়। সংবেশক ইচ্ছা করিলে সংবেশিত ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় রাখিতে পারেন যে, ডাকাডাকি ঠেলাঠেলি

করিলেও সে বিচলিত হইবে না, কিন্তু সংবেশকের সামান্য ইঙ্গিতেই সে তাহার আদেশ পালন করিবে। সংবেশিত ব্যক্তির চিত্তে সংবেশক ব্যতীত অপর কাহারও বা পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রভাব কার্য্যকর হয় না। সংবেশক ইচ্ছা করিলে সংবেশিত ব্যক্তির মনে নানা প্রকার ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারেন। সংবেশক বাঘ আসিয়াছে বলিলে সংবেশিত ব্যক্তি ভয় পায়, হাসিতে বলিলে হাসে কাঁদিতে, বলিলে কাঁদে, যেখানে জল নাই সেখানে জল দেখে ইত্যাদি। সংবেশিত অবস্থায় দৌড়িয়া বেড়ানও সম্ভব। সংবেশিত ব্যক্তিকে কিছুক্ষণ ছাড়িয়া দিলে আপনা আপনি সংবেশনের প্রভাব কাটিয়া যায় কিম্বা সে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। সংবেশকের আদেশেও সংবেশিত অবস্থা অপনীত হয়।

* * *

সংবেশিত অবস্থায় যদি সংবেশক বলেন যে তুমি জাগিয়া উঠিবার এত ঘণ্টা এত মিনিট পরে অমুক কাজ করিবে, তবে দেখা যায় যে সংবেশিত ব্যক্তি সেই আদেশ পালন করে। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে কেন সে ঐ প্রকার কার্য্য করিল তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারে না। সংবেশিত অবস্থার ঘটনাবলী স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় প্রায় মনে থাকে না, তবে বিশেষ চেষ্টা করিলে এই স্মৃতি ফিরিয়া আসিতে পারে।

* * *

সংবেশিত ব্যক্তি কি সংবেশকের সকল আদেশই পালন করে, বা সকল কথা বিশ্বাস করে? বহু পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ধর্ম্ম ও নৈতিক বিশ্বাস বা কোন বিষয়ের দৃঢ় ধারণা সংবেশিত অবস্থাতেও নষ্ট করা যায় না। সংবেশিত অবস্থাতেও চোর নিজ অপরাধ স্বীকার করিবে না বা গোঁড়া হিন্দুকে অভক্ষ্য ভোজন করানো যাইবে না। আমার এক বন্ধু সংবেশিত অবস্থায় শুকনা ডাঙ্গায় মাছ ধরিতেন, নিজেকে চিকিৎসক মনে করিয়া কৃত্রিম অস্ত্রোপচার করিতেন, কাঁচা আলু পেয়ারা বলিয়া খাইতেন, দুর্গন্ধকে সুগন্ধ বলিতেন, কিন্তু তাঁহাকে কিছুতেই নাচ করাইতে পারি নাই। বেশী পেড়াপিড়ি করিলে সংবেশনের ঘোর কাটিয়া যাইত। অপর এক বন্ধুর হাতে কাগজের কৃত্রিম ছুরি দিয়া কাহাকেও খুন করিতে বলিলে তিনি খুন করিবার অভিনয় করিতেন। হাবভাবে মনে হইত তিনি সত্যই হত্যা করিতেছেন, কিন্তু যেদিন তাঁহার হাতে সত্য ছোরা দিয়া খুন করিতে বলিলাম সেদিন তিনি একপদও নড়িলেন না। অপর এক পরিচিত ব্যক্তিকে সংবেশিত করিয়া বলিলাম, তিনি তিন দিন পরে ঠিক বেলা চারিটার সময় তাঁহার মণিব্যাগ আমাকে দিয়া যাইবেন, এবং পরে সে কথা তাঁহার মনে থাকিবে না। তিনি অক্ষরে অক্ষরে এই আদেশ পালন করিলেন। অপরিচিত ব্যক্তির উপর এই পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইল। পরিচিত ব্যক্তি মনে মনে জানিতেন

যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার টাকা আমি ফেরৎ দিব। এই সকল পরীক্ষা হইতে বোঝা যায় যে সংবেশিত অবস্থাতেও বিচার বুদ্ধি সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না।

* * *

যতক্ষণ সংবেশনের প্রভাব থাকে ততক্ষণ সংবেশিত ব্যক্তির হাবভাব অনেকটা নিদ্রালু ব্যক্তির মত দেখা যায়। চোখের ভাব স্বাভাবিক থাকে না, অঙ্গ সঞ্চালনে জড়তা দৃষ্ট হয়। সংবেশিত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তির ন্যায় চোখ খুলিয়া কথাবার্ত্তা ও চলাফেরা করিতে পারে। সংবেশকের অভিভাবের ফলে অনেক সময় লুপ্তস্মৃতি ফিরিয়া আসে, স্মৃতিশক্তি, শ্রবণশক্তি ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। অভিভাবের দ্বারা বিপরীত ফলও হইতে পারে। কোন কোন ব্যক্তির সমস্ত দেহের মাংসপেশী অভিভাব দ্বারা কাষ্ঠবৎ শক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় মস্তক ও পায়ের গোড়ালি ধরিয়া দণ্ডবৎ ঋজুভাবে তাহাকে শূন্যে তোলা যাইতে পারে। এই পরীক্ষা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও করা উচিত নয়, কারণ ইহাতে শারীরিক হানির সম্ভাবনা আছে। সংবেশন প্রভাবে কোন বিশেষ অঙ্গে রক্ত চলাচল বাড়ানো কিম্বা কমানো যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন ত্বকে ফোস্কা ওঠানো যায়, আমি কিন্তু এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হই নাই। সংবেশিত ব্যক্তির কোন দিব্যদৃষ্টি লাভ হয় না বা তাহার মনে কোন অলৌকিক জ্ঞানও প্রতিভাসিত হয় না। জিজ্ঞাসা করিলে সংবেশিত ব্যক্তি অনেক সময় দূরদেশে কি হইতেছে না হইতেছে বর্ণনা করে সত্য, কিন্তু এই সমস্ত বর্ণনাই মনগড়া॥

চিত্র ও চরিত্র

অক্ষয়কুমার দত্ত

যে দুই মনীষী প্রথমে ভাষার রীতিতে ওজস্বিতা এবং গদ্যের গতিতে ছন্দের সঞ্চার করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সুপাঠ্য ও ফলপ্রদ করিয়া তোলেন, অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহাদের অন্যতম।

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার একই বৎসরে—১৮২০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ভাষার প্রয়োগ-পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে না পারিলে বাঙালীর ছেলের শিক্ষা সার্থক হইবে না বুঝিয়া বিদ্যাসাগর প্রধানতঃ বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত দেখিলেন, পৃথিবীর পরিপূর্ণ জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে রত্ন আহরণ করিতে না পারিলে বাঙালীর সাহিত্য ও মানসিক অনুশীলন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই তিনি শুধু ছাত্রদের জন্য তিনি ভাগ 'চারু পাঠ' লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, জ্ঞান-সাহিত্যকে নানাদিক দিয়া ঐশ্বর্য্যশালী করিবার নিমিত্ত বিচিত্র বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন।

অক্ষয়কুমার আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার তর্ক সর্ব্বজনবিদিত। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার বহু বিখ্যাত এবং কোন কোন অধুনা-বিস্মৃত রচনা এই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র-যাত্রা ও বাণিজ্য-বিস্তার' অক্ষয়কুমারের অপূর্ব্ব গবেষণার ফল।

‘বাহ্য-বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার’ এবং ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বহুমুখী শক্তির পরিচয় প্রদান করে। তিনি সাহিত্যে নব নব বিষয়ের অবতারণা করিয়া বাঙালী-চিত্তকে কৌতূহলী হইতে শিখাইয়াছেন।

তাঁহার শক্তি তাঁহার উত্তর পুরুষে সঞ্চারিত হইয়াছে দেখিতে পাই। অক্ষয়কুমার দত্ত কবি-সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ।

অক্ষয়কুমারের রচনা প্রাঞ্জল ও প্রাণবান্। তিনি বঙ্গসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক আলোচনার নবীন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করেন।

প্রজ্ঞা ও চিন্তা তাঁহার জীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। একদিকে তিনি ধর্ম্মনৈতিক, আর একদিকে কঠোর যুক্তিবাদী ছিলেন। বাক্যে ও মনে তাঁহার সাহসের অভাব ছিল না। চরিত্রের দৃঢ়তায় এবং চিত্তের উৎকর্ষে তিনি অসাধারণ পুরুষ ছিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার পরলোক গমন করেন।

এই চিন্তাশীল, আত্মহারা, জ্ঞানবীর, মনস্বী পুরুষের আবির্ভাবের ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রতিষ্ঠা ও বাংলা সাহিত্যের দ্রুত সমৃদ্ধি সম্ভবপর হইয়াছে।

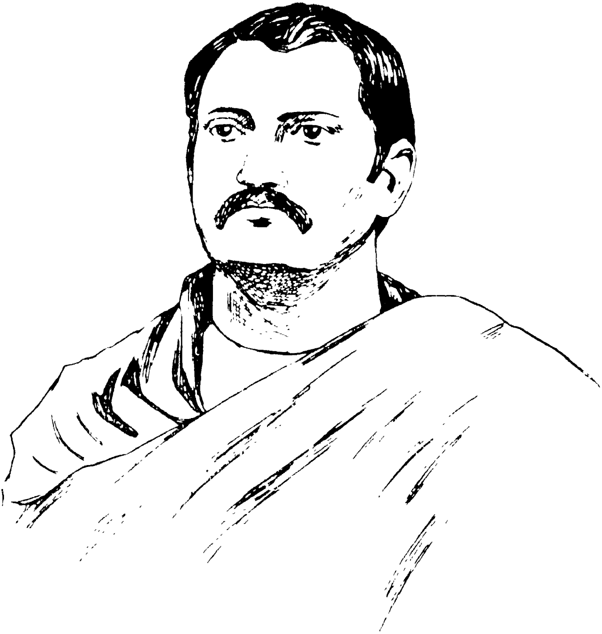

কেশবচন্দ্র সেন

ছোট গল্প

১ম বর্ষ] ২৫শে চৈত্র ১৩৩৯ [৩৯শ সংখ্যা

বাষ্প

শ্রীসুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ একটি প্রেমের কাহিনী বলিব।

বসন্তকাল, দক্ষিণ পবন, যৌবনের কম্পন, চাঁদের হাসি, পাখীর ডাক, কবির গান, প্রিয়ার কণ্ঠকাকলী......

জীবনের বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি।

ও-সব কাব্যগুঞ্জন কবে যে আমি নিঃশেষে বিদায় দিয়াছি, সে-কথা আজ মনেও পড়ে না।

তরুণ যুবা, সুন্দর সুঠাম গৌরকান্তি বলিষ্ঠ দেহ,—হইলে ভালো হইত।

কিন্তু যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ দেহভঙ্গে ভাঙ্গিয়া গেছে।

মৃত্যুর পদধ্বনি যেন আজ কাণ পাতিলেই শুনিতে পাই।

জীবনান্তের 'হরি-বোল' কলরবে যেন দেহ, মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি একই সঙ্গে হিম হইয়া আসে।

নিষ্প্রতিভ ও নিরাগ্রহ জীবনের শেষ দিনটির প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি—এই মাত্র।

এই হইল আমার জীবন-নাট্যের পটভূমি।

বয়স আমার চৌষট্টি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি বিশেষত্বহীন মানুষ।

অথচ এই মানুষটির জীবনেই একদিন একটি বিচলিত মুহূর্ত্তকে অবলম্বন করিয়া যে নিষ্কাম বিরহ-কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাকেই বলিতেছিলাম প্রেমের কাহিনী!

কিন্তু এই পড়ন্ত বয়সে কেমন করিয়াই বা সে কাহিনী বলি? তবু বলা আমার চাই-ই! নইলে বলা আর আমার হইবে না। কে জানে, কবে—এই দেহের উপর চিতার আগুন জ্বালিয়া উঠিবে! সুতরাং বলিব। মুখ টিপিয়া যদি একটু হাসো ত হাসিও—কিন্তু করুণা করিয়া একটু শুনিবে বৈ কি! এ বৃদ্ধের বচন তোমরা অগ্রাহ্য করিবে না—জানি।

শিলঙ্ পাহাড়ে বসিয়া তখন পেন্সনের দিনগুলি জোর করিয়া সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়াছি। যৌবনের কোথায় কতটুকু দাগ পড়িয়াছিল—তাহার এতটুকুও মনে নাই।

কোনো আকস্মিক মুহূর্ত্তে কোথায় একটুখানি রঙিন তুলির স্পর্শ পড়িয়াছিল কি না—তাহাও মনে নাই।

কিন্তু স্মারকলিপি আসিল।

আসিল—এক বিস্মৃত দিবসের অতি ক্ষুদ্র একটুখানি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া।

সবে মাত্র আহার সমাপন করিয়া বালাপোষটি গায়ে জড়াইয়া আলবোলার নলটি মুখে তুলিয়া ধরিব—ঠিক এমনি সময়ে টেলিগ্রাফ-পিয়ন আসিয়া আমার হাতে একটি তার গুঁজিয়া দিয়া গেল।

খুলিয়া দেখি, তাহাতে লেখা আছে—

'মৃত্যু শয্যায়, দেখিতে চাই, ঠিকানা......নং কারবোলা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা'—শৈবলিনী।

কারবোলা ট্যাঙ্ক লেন! শৈবলিনী!

কিন্তু এমন নাম, এমন ঠিকানার ত কিছুই মনে পড়ে না। স্মরণশক্তির বিপুল ক্ষেত্রটিকে সম্মুখে উদ্ঘাটন করিয়া বসিলাম।

তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও সেখানে কারবোলা ট্যাঙ্ক লেনের সন্ধান পাইলাম না। কিন্তু মানুষটির ঠিকানা যেন ঘন কুয়াসা ভেদ করিয়া একটু একটু করিয়া উঁকি মারিতে চায়। চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে যেন পারি না।

শৈবলিনী—শৈবলিনী—শৈবলিনী!

ওই একই নাম বার বার নীরবে আবৃত্তি করিয়া, মনে মনে বহুবার প্রশ্ন করিয়া যখন স্মরণশক্তিকে একেবারে উদ্‌ব্যস্ত

করিয়া তুলিয়াছি, তখন ধীরে ধীরে বহু পুরাতন দিনের একখানি শোকাচ্ছন্ন মলিন বিষণ্ণ মুখ আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

বুঝিতে পারিলাম—কে এই শৈবলিনী!

বিলম্ব করা আর চলে না। নেপালী চাকরটাকে সঙ্গে করিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম কারবোলা ট্যাঙ্ক লেনের উদ্দেশে।

আমার বয়স চৌষট্টি, শৈবলিনীর বয়স পঞ্চান্ন!

বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা!

চৌষট্টি আর পঞ্চান্নর এক হাস্যোদ্দীপক মিলন!

কিন্তু হেসো না,—আগেই ত কথা দিয়াছ—করুণা করিয়া শুনিবে।

চল্লিশ বৎসর পরে দেখা!

সে দেখা যে প্রেমের রসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে না, সে আমি জানি; কিন্তু তাহা যে এমন বিগলিত করুণ সুরে অভিবাদন করিবে, তাহাও আমি ভাবি নাই!

মর্ম্মবেদনার যে করুণ আত্মনিবেদন,—

সুদীর্ঘ বিরহী-জীবনের দীর্ঘশ্বাস-সঞ্চিত যে অর্ঘ্যের ডালা, সে এই দুর্ব্বল স্থবিরের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল, সে ভার সে বহন করিবে কি করিয়া।

আমি পৌঁছিবার ঘণ্টা দুই বাদেই শৈবলিনী তাহার এ যাত্রার পাট তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

আমার তরেই যেন তাহার প্রতীক্ষমান জীবনটুকু স্থির হইয়াছিল।

যাবার আগে তাহার কত কথা বলিবার ছিল—কে জানে?

আমি যাবার পর যতক্ষণ বাঁচিয়া ছিল, নিষ্পলক স্থির দৃষ্টিতে শৈব আমার পানেই চাহিয়াছিল।

কী বলিষ্ঠ তাহার ভাব! কী ঐকান্তিক তাহার দৃষ্টির প্রসারতা! অব্যক্ত ভাষায় দুইটি চক্ষু কত কথা বলিয়া গেল—হয়ত তাহার কতক বুঝিলাম; অনেকটাই বুঝিলাম না।

কথা বলিতে গিয়া কম্পিত ওষ্ঠ দু'খানি বার বার করিয়া কি বলিতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল। ফুটি ফুটি করিয়াও কথা আর তাহার মুখ দিয়া ফুটিল না।

দুইটি কথা কেবল মাত্র বহু কষ্টে সে উচ্চারণ করিল—

—চিঠিখানি রেখে গেলাম প'ড়ো। আমার মুখে আগুন তুমিই দিও। তুমিই আমার......

কিন্তু বাকী কথাটুকুর সে আর নাগাল পায় নাই। কথা তাহার অসমাপ্ত হইয়াই রহিল।

শৈবলিনী চলিয়া গেল!

শৈবর শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া কত কথাই না মনে জাগিয়া উঠিল।

শৈবলিনীর শবদাহের বহ্নিশিখা কী আর্ত্ত-ভাষা বহন করিয়া ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, কে বলিতে পারে ?

এক একবার মনে হইল—ওই প্রজ্জ্বলিত চিতার ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়ি ! জীবনের আর কতই বা বাকি ? জুলুম করিয়া কয়টি দিন আর বাচা চলে ? মরা-মানুষ বাঁচিয়া আছি—এই ত !

কিন্তু মনেই হইল—পারিলাম না ঝাঁপাইয়া পড়িতে। রহিলাম—

হয়ত উহার চিঠিখানি পড়িবার লোভেই বা আরো কয়দিন আমার সাতটি যুগের চিরপরিচিত বান্ধবী ধরিত্রীর কোলে বিচরণ করিয়া যাইতে। যাহাই হউক, কোন্ লোভে পড়িয়া রহিলাম—সে আমিই জানি না।

ফিরিয়া আসিসাম।

কিন্তু সে রাত্রিতে আর চিঠি খোলা হইল না।

পরের দিনের উৎকণ্ঠিত প্রভাতে ও-চিঠি যে ভাষা বহন করিয়া আনিবে—তাহারি প্রতীক্ষায় রহিলাম।

* * *

চিঠি :

বন্ধু,

শাস্ত্রকারেরা ব্যাখ্যা ক'রে গেছেন,—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে
ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং
পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

কিন্তু ব্যবহারিক শাস্ত্রে ওর কোন দাম নেই।

ঋষি পরাশরের সেই অমূল্যতপঃসম্ভূত বাণী কয়টি চির-নিদ্রিত। কত দীর্ঘশ্বাস, কত আর্ত্তধ্বনি, কত সহস্র বাংলার মেয়ের চোখের জলে ঐ ক-টি অক্ষর ভেসে গেছে, তবু ওর ঘুম ভাঙ্গেনি।

আর হয়তো ভাঙ্গবেও না।

ভট্টপল্লীর যক্ষের ধন হয়ে, কীটাণুদের ভক্ষণীয় হয়ে ও দু'টি ছত্র এমনিই থাকবে।

ভাবছ—এত কথা আমি শিখলেম কোথেকে ?

জানো ত বাঙালীর ঘরের বালবিধবাদের এ-সব জানতে বিশেষ কিছু বেগ পেতে হয় না।

কিন্তু লাভ আমার ওতে হয়নি কিছু।

ও-সব নীতিবাক্য চিরস্থায়ী হয়ে আমার মনের কোণে বাসা বাঁধতে পারেনি। কারণ, ও আমার প্রাণের নিগূঢ় তত্ত্ব কথা নয়।

যে তত্ত্ববাণী তুমি একদিন অতর্কিতে আমার কাণে তুলে দিয়ে গেলে, সেই মধুরাস্ফুটধ্বনি আমি হৃদয়স্থ করেছি কিন্তু ব্যক্ত করতে পারিনি !

সমাজের শ্লেষবাক্যকেও উপেক্ষা করতে পারিনি, নিজের জন্মগত সংস্কারকেও এতটুকু অবহেলা করতে পারিনি, তাই হয়তো সামাজিক বাহ্য আড়ম্বর মাত্র নিয়েই বেঁচে ছিলাম। কিন্তু মনে প্রাণে যে ওর এতটুকু সত্যও আমি গ্রহণ করতে পারিনি, এ-কথা আমি মুক্ত কণ্ঠে আজ স্বীকার করে যাচ্ছি।

তুমি বলবে—পরকালের ভয় !

শেষ পর্য্যন্ত তা হতেও আমি মুক্তি লাভ করেছিলাম—নইলে তোমায় আমার এ-চিঠি দিতে সাহস হ'ত না।

১২৯৮ সালের শ্রাবণ মাসের এক স্মরণীয় রাত্রিতে—আমার অন্তরে সব চেয়ে বড়ো সত্য এসে বাসা বেঁধেছিল।

আর পরকাল ত আমার অদেখা স্থান !

সে কোথায়—কোথায় তার ঠিকানা, কেমন তার রূপ... কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না পেলে ওর ওপর আমার শ্রদ্ধাই বা কি ক'রে আসে, বল !

মুনিঋষিদের বাক্য ?—কিন্তু ও ত আমার কাছে অর্থহীন !

কী দুর্দ্দান্ত স্পর্দ্ধা আমার ! নয় ?

আশ্চর্য্যই বটে !

কিন্তু আমার কাছে যা সত্য, অন্যের কাছেও যে তা সত্য হতে হবে তার কি মানে আছে? আমার কাছে আমার সত্যই সব চেয়ে বড়। নইলে বার্দ্ধক্যের প্রায় শেষ সীমান্তে এসেও আমার মত বদলালো না কেন? কোথায় মৃত্যুকালে হরিনাম পান করব—তা নয়, তোমার নাম গান করেই যে চলে গেলাম!

থেকে থেকে পরকালের ভয়ে হয়ত তুমি শিউরে উঠছ, নয়? কিন্তু আমি বলি, সজ্ঞানে পরকালটা যদি একবার ঘুরে এসে ফের জন্ম নিতে পারতাম—তা হ'লে না হয় প্রতিটি পদক্ষেপ গুনে গুনে চলা যেত! কিন্তু তা যখন সম্ভব হয়নি; তখন আমি ভয়-ডরের সমস্ত বাঁধন ডিঙ্গিয়েই চলে যাব।

বাক্যের গাঁথুনির ওপর আমার শ্রদ্ধা আর নেই। ওর এক একটি ঝঙ্কার এসে যেন আমার বুকের ওপর হাতুড়ী পিটিয়ে আমার ভেতরের অস্থিপঞ্জরগুলো ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। এই যে জীবন-ভোর কেঁদে কেঁদে আমার শিয়রের বালিস ভিজে সেঁতিয়ে গেলো—কৈ তার একটি মৃদু বাণী এসেও ত আমার চক্ষু বুলিয়ে গেল না। সৃষ্টিপুরুষের এমন বিচিত্র ঐশ্বর্য্যশালিনী পৃথিবী—সে শুধু আমারি জন্যে নয়! তার সূচাগ্র সুবিধে হতেও আমি বঞ্চিতা! তার শ্যামল বুক বিছিয়ে দিয়ে আছে—ওদের জন্য—আমার তরে নয়! তার এক ফোটা রসও আমি পান করতে পারব না! জীবন-ভোর দুটি চক্ষে আমার জলের বাসা, বুকে আমার অসহ্য প্রদাহ, কথা বলতে দম হয়ে

আসে বন্ধ! কিন্তু কেন আসে, বলতে পার কেন? ওঁদের অমূল্য বচনের ভেতর নিঃস্বার্থতার বাষ্পও যেখানে ঠাঁই পায় না—সেখানকার সবই যে হেঁয়ালি!

এই সব যখন ভাবি, তখনি মিথ্যাচারের বিরাট পর্ব্বত আমার চোখের সম্মুখে আঁধার হয়ে নেমে আসে।

সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের আবর্ত্তে ঝাঁপিয়ে পড়বার মতো জ্ঞানবিদ্যাও আমার নেই, ও আমি চাইও না। পুঁথির ভাষা থেকে আমি শাস্ত্র আয়ত্ত করিনি, আমার শাস্ত্র আমার প্রাণের কথা। সেখান থেকেই শেখা বুলি আমি যেন ভগবানের মুখ দিয়ে শুনতে পাই।

তাই আমি সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব প্রাণে প্রাণে অনুভব করি।

আর তা করি বলেই—এই সব মর্ত্তলোকে যে-সব মনু পরাশর সুস্থ দেহে বিরাজ করছেন,—তাঁদের বিচারের বাইরে আমি চলে গেছি। সমাজের নিন্দা প্রশংসার বহু ঊর্দ্ধে উঠে গেছি।

আমার বিচার করবেন, আমার অন্তরের বেদীমূলে যিনি নিয়ত বাস করছেন, সেই অন্তর্য্যামী ভগবান।

যাবার বেলায় যে-কথাটি বলতে কলম ধরেছি, সেটুকু শেষ করা চাই। জীবনীশক্তি ফুরিয়ে এসেছে; খেয়াঘাটে পা বাড়িয়েছি; এই মুহূর্ত্তে বলা না হলে, আর বলা হয়ে উঠবে না।

আমার শয়ন-ঘরের শিয়রে আয়নায় বাঁধানো আমার নিজের হাতের লাল-কালো-বেগ্‌নী কালীতে আঁকা লতাপাতার ভেতর একটি ছত্র বিরাজ করছে। ওটি তোমার চোখে পড়েছে কিনা জানি না; যদি না পড়ে থাকে ত লক্ষ্য ক'রে দেখো, ওতে লেখা আছে, "১২৯৮ সাল, শ্রাবণ মাস, ২১ তারিখ, মধ্য রাত্রি।"

পৃথিবীর অতুল ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও ওই ক্ষণটি আমি বিকিয়ে দিতে পারি না। আমার জীবনে ওই ছত্রটিই ছিল বেঁচে থাকবার একমাত্র পাথেয়। শিয়রের বালিসের ওয়াড়ের ভেতর ওই কটি অক্ষর লাল সুতো দিয়ে আমি গেঁথে রেখেছিলাম।

ওরি ওপর মাথা দিয়ে আমি নিদ্রা যেতাম।

রান্নাঘরের সাদা দেওয়ালের গায়ে কয়লার কালো আঁচড় দিয়ে ওই কটি অক্ষর লিখে রেখেছিলাম!

ওই দিকে চেয়ে চেয়ে আমি অন্ন মুখে তুলে দিতাম।

এমন পাগল মানুষও যে এই ভূ-ভারতে এক-আধজন আছে, আমিই তার এক প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত।

যাবার আগে তোমায় শত শত নমস্কার করে যাচ্ছি। গ্রহণ কোরো। জীবনে তোমায় পেলাম না—কেবল মাত্র এই সামান্য কয়টি কথা ব্যক্ত করতেই আমার ভাষা যায় হারিয়ে, কলম যায় থেমে!

বুক ফেটে গেছে—মুখ ফোটেনি।

কেন ফোটেনি, জানো ? লজ্জা, ভীরুতা, সঙ্কোচ...... কিছু নয়।

যদি আমি মুখ ফুটে বলতাম, আর তুমি যদি প্রত্যাখান করতে,—তা হলে বন্ধু সে ব্যথা সহ্য করবার শক্তি আমি পেতাম কোথায় ? তাই হয়ত আমার ভিতরে অন্তর্য্যামী গতির মুখে দু'বাহু বাড়িয়ে পথ আগ্‌লে বসে ছিলেন।

তা ছাড়া—তুমি তখন তোমার জীবন অপরের হাতে তুলে দিয়েছ।

তারপর সমাজের রক্তচক্ষু।

তাই, চতুর্দ্দিক হতে যে লাঞ্ছনা গঞ্জনার বাণ ডেকে উঠত—তাতে জীবন আমার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত না। সুতরাং এই ভালো হ'ল। যাবার আগে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে, আমার সকল অন্তর দিয়ে, মুক্ত আনন্দে স্বীকার করে যাচ্ছি, তোমাকে আমি পরিপূর্ণরূপে ভালোবাসতাম। জীবনে একজন মাত্র আমার অন্তরে স্বামীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। সে তুমি! আর দ্বিতীয় পুরুষের ছায়াও এখানে পড়েনি। পূর্ব্বাহ্নে যাঁর সঙ্গে শাস্ত্রের বচন আবৃত্তি করে অভিনয় করেছিলাম—তাঁর ছিটে-ফোঁটা স্মৃতিও আমার মনে নেই।

জীবনের সায়ংকালে এই ব্যর্থ বিলাপের হয়ত কিছুই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও নিজেকে আর দমন করে রাখা গেল না। আমার অন্তরের অবরুদ্ধ বাণী যে এমন ক'রে আমার কণ্ঠকে উদ্বেলিত করে বেরিয়ে আসবে

এ আমি পূর্ব্বে কখনো কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে সংযম গেলো ভেসে।

জীবনে তুমিই ছিলে আমার দেবতা।

আমার শেষ প্রণাম গ্রহণ কর। ইতি

তোমার

রাক্ষুসী

রাক্ষুসী!

বহুদিন পরে নামটি মনে পড়িল।

শৈবর ডাক-নাম ছিল রাক্ষুসী।

আদর করিয়া বাপ-মা মেয়েকে ডাকিত—রাক্ষুসী!

কিন্তু এ আদর-সম্ভাষণ পিতামাতার আন্তরিকতার পূর্ণভাণ্ডার হইতে উপচিত বাক্য কিনা জানি না। হয়ত বা ব্যঙ্গেরই নামান্তর! নইলে এমন অপভাষায় আদর করিয়া কে ডাকে?

যাহাই হউক সকলেই উহাকে ডাকিত রাক্ষুসী বলিয়া; আমিও ডাকিতাম রাক্ষুসী।

রাক্ষুসীর স্বহস্তলিখিত পত্র পড়িলাম।

মর্ম্মার্থ হৃদয়স্থ করিলাম। কিন্তু সম্বরণ করিতে পারিলাম না; দুই চক্ষু দিয়া জল উপচাইয়া আসিল।

আমার জীবনেরই এক অন্ধকার প্রদেশে এমন মর্ম্মান্তিক বেদনার সমুদ্র সৃষ্টি হইয়াছিল—ইহা আমি জানিতাম না।

গুণীলোকেরা হয়ত বলিবেন—মস্তিষ্কের উদ্‌ভ্রান্তিজনক ভাব বা বিকার।

শাস্ত্রকারেরা হয়ত বলিবেন—ব্যাভিচার।

আমি বলিব—একটি আদর্শ।

কী পরমাশ্চর্য্য অনুভূতি!

একটি জীবনের একটি মুহূর্ত্তের মূল্য যে সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়ে ধার্য্য হইতে পারে, ইহা যে আমি কল্পনাই করিতে পারি না।

পঞ্চান্ন বৎসরের মধ্যে ওই ক্ষণটুকুই ছিল তাহার একমাত্র সঞ্চয়। ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া সে পৃথিবীতে জন্ম লইয়াছিল, তাই মুষ্টিভিক্ষা পাইয়াই তাহার আর আনন্দের সীমা নাই।

কিন্তু তাহার জীবনে যে সময়টুকু ছিল অমূল্য, আমার দিক দিয়া এ যাবৎ-কাল তাহার মূল্য ছিল না একটি কাণা কড়িও।

আমি কি জানিতাম কেবল সাল-তারিখ-মাস-ক্ষণ গণিয়াই একটি মানুষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে; পারে—ওই সময়টুকুকে লইয়া অব্যক্ত নির্দ্দয় জীবনটাকে এক অখণ্ড মাধুর্য্যে ভরিয়া তুলিতে।

মুহূর্ত্তের দাম! কী পরিহাস!

এতটুকু ক্ষণ লইয়া কী বিপুল সমস্যা!

এ কি সত্যই সত্য, না একটা প্রকাণ্ড তামাসা!
বলি তাহা হইলে—সেই পুরাকালের রূপকথা।

একদিন প্রেমের কাহিনী বলিতে গিয়া নিজের দীর্ঘ জীবনটাকে যে আবার এমন করিয়া খাটো করিয়া আনিতে হইবে এবং যৌবরাজ্যের মূলধন যাহা কিছু টানিয়া আনিয়া এমন করিয়া প্রকাশ্য দরবারে উন্মুক্ত করিতে হইবে, ইহা আমার সম্পূর্ণরূপেই অগোচর ছিল।

কিন্তু উপায় নাই; বলিতে হইবে।

কারবোলা ট্যাঙ্ক লেনে নয়,—তখন আমরা ছিলাম আমাদের বসতবাটি গোয়াবাগানে।

আমাদের বাড়ীর একটি নীচের অংশ ভাড়া লইয়া শৈবদের ছোট্ট পরিবার বহুদিন ওইখানেই বাস করিয়া গেছে।

আর সেই সূত্রেই তাহার সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয়।

প্রথম পরিচয়েই লক্ষ্য করিলাম, পরণে উহার সাদা কাপড়ের থান। আর লক্ষ্য করিলাম, দেহে নাই অলঙ্কার, মুখে নাই হাসি।

বয়স তখন উহার মাত্র দশ কি বারো।

সেই শৈব দেখিতে দেখিতে একদিন আমাদের চক্ষের সম্মুখে বড় হইয়া উঠিল।

কৈশোর চলিয়া গেল, যৌবনের সুরু হইল।

অপরিণত দেহ নব নব উন্মেষে রূপান্তরিত হইয়া উঠিল।

নতুন সমারোহের সেই বিচিত্র শোভা, সেই অপরূপ কান্তি হয়ত বা অপরের মন ও চক্ষুকে সার্থক করিয়া তোলে, কিন্তু শৈবর মনের কোণে কি এতটুকু মৃদু শিহরণও জাগায় না?

উহার যৌবনের সৌগন্ধ্য কোন্ দুঃখের অতল গুহায় বন্দী হইয়া লুকাইয়া আছে কে জানে?

শৈবর অচঞ্চল গম্ভীর ভাব তাহার কোন সাক্ষ্যই যে দিতে চায় না!

জীবনের কোন প্রকার উদ্বেগ, বর্ত্তমান কালের কোনরূপ চাঞ্চল্য বা ভাবীকালের একান্ত নিরবলম্বতার জন্য উহার এতটুকুও উৎকণ্ঠা ছিল বলিয়া আমি ধারণা করিতে পারি নাই!

মুখে তাহার না আছে হাসি, না আছে বেদনার চিহ্ন। নির্ব্বিকার চিত্তে শৈব তাহার গৃহস্থালীর সুনির্দ্দিষ্ট দিনগুলি কেমন অবলীলাক্রমে টানিয়া চলিয়াছে। এতটুকু বোধশক্তিও যেন তাহার নাই।

নীচের দিকে চোখ পড়িলেই শৈবকে দেখিতাম—কখনো কলতলায়, কখনো রান্নাঘরে, কখনো বা ঐ থালাবাসনের স্তূপের মধ্যে। সংসারের নিত্যকার কার্য্যের মধ্যে এমনি করিয়াই জড়াইয়া থাকিত।

অবসর-সময়ের অলস মধ্যাহ্নটি শৈবর রামায়ণের পাঠধ্বনিতে ভরিয়া উঠিত। উপরে থাকিয়াই তাহার রেশ আমার কাণে আসিয়া পৌঁছিত। ঐ অমন সুন্দর সুর করিয়া শৈব যাহা পাঠ করিত, মন তাহার ভিতর সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া দিতে পারিত কিনা—জানি না। তখন হয়ত পারিত, পরে হয়ত পারে নাই।

প্রথম কিছুদিন মেয়েটিকে বোবা বলিয়াই ধারণা করিয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু যখন উহার মুখ দিয়া—বাবা খেতে এসো,—ঘরে তেল নেই মা,—খোকা যা ত ভাই ছুটে এক পয়সার নুন নিয়ে আয়......এমনি সব একান্ত প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন কথা মাঝে মাঝে বাহির হইতে লাগিল, তখন বুঝিলাম বোবা না হইলেও তাহারি নামান্তর বটে।

আমি শৈবর সঙ্গে যত কথা বলিতাম, তাহার উত্তর একটি দুইটি কথায় শেষ হইয়া যাইত।

তাহা হউক, কিন্তু ভবিষ্যতের ফাঁকা জীবনটার জন্য যে তাহার এতটুকু চিন্তা বা অদৃষ্টের এই নিদারুণ আঘাতের জন্য এতটুকু দুঃখ নাই, এই কথাটাই আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

গৃহস্থ-নারীর জীবনের এমন ব্যর্থতা আর কি আছে?

অসমাপ্ত জীবনের রিক্ততা শৈবর মনের পাতায় এতটুকুও রেখাপাত করে নাই, ইহাই কি সম্ভব? উচ্ছল যৌবনের

জন্য উহার এতটুকু উদ্বেগ নাই, ইহাই বা কি করিয়া বিশ্বাস করি?

কিন্তু বাহিরে তাহার এতটুকুও প্রকাশ ছিল না।

কৌতূহলচ্ছলে একদিন শৈবকে কাছে ডাকিয়া নেহাৎ ছেলে-মানুষের মতই প্রশ্ন করিয়া বসিলাম—আচ্ছা রাক্ষুসী তোর কোন দুঃখ নেই, না?

শৈব বলিল—না।

বলিলাম—কোনো দুঃখ নেই, তোর?

—কিসের দুঃখ তুমি বলছ পরেশদা?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া যেন এক মহাসঙ্কটে পড়িয়া গেলাম। কেনই বা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এখন উত্তরই বা কি দিই?

কিছু ভাবিয়া না পাইয়া কথার পৃষ্ঠেই বলিয়া ফেলিলাম—এই ধর্, ভাল ভাল জামা কাপড় পরতে পারিস্‌নে, ভাল কিছু খেতে পারিস্‌নে, তারপর......এমনি সব অনেক জিনিষ।

—কই, তাতে কিছু দুঃখ ত আমি পাই না।

আশ্চর্য্য হইলাম।

এই মেয়েটির দুর্ব্বোধ্য চরিত্রটি আবিষ্কার করিবার জন্য আমার মাথায় যেন আরো বেশী করিয়া ভূত চাপিয়া বসিল। কোন ফলাফলের কথাও চিন্তা করিলাম না। কিন্তু কেমন করিয়া যে এই দুজ্ঞের্য় রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়, সেই বুদ্ধিটুকু কিছুতেই আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারিলাম না। সমস্যাটি

এমনই চাপা যে আবিষ্কারের সোজা পথও আমি আর দেখিলাম না। কিন্তু এই গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিবার জন্য আমারই বা এত মাথা ব্যথা কেন? হয়ত বা কৌতূহল! না হয় ত, কোন অবচেতন ভাব আমার ভিতর আত্মগোপন করিয়াছিল। তা-ই কিনা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না, কারণ আমি নিজেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শৈবর সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন থাকিতে পারিলাম না।

আর একদিন কাছে ডাকিয়া শৈবকে জিজ্ঞাসা করিলাম—রাক্ষুসী, যাবি বেড়াতে আমার সঙ্গে? চল্ যাই, মাসীমাকে বলে আয়, গাড়ী করে বেড়িয়ে নিয়ে আসব, যাবি?

—কিন্তু আমার যে সময় নেই পরেশদা, কতো কাজ!

—আচ্ছা, তোর বেড়াতে কি কোন তামাসা দেখতে সখ যায় না?

—কেন যাবে না, কিন্তু সংসারের কাজ সেরে ছুটি পেলে ত?

—তোর কাছে আজ একটি কথা জিজ্ঞেস করব রাক্ষুসী, ঠিক উত্তর দিবি?

—কেন দেবো না?

—তোর বিয়ে হয়েছিল, মনে আছে?

—না।

অনুবীক্ষণ দিয়া উহার মুখটি দেখিতে পাইলে কি দেখা যাইত জানি না কিন্তু আমার দুইটি সতর্ক চক্ষু দিয়া লক্ষ্য করিয়া ঐ মুখের ভিতর কোনরূপ ভাবের ব্যতিক্রম খুঁজিয়া পাইলাম না।

পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—

—আচ্ছা, তোর স্বামীর জন্য খুব কষ্ট হয়, নারে, হয়?

দিব্য সহজকণ্ঠ না হইলেও কোন গভীর ব্যথার ঝঙ্কার লইয়া শব্দ বাহির হইয়া আসিল না। তবে অস্পষ্ট ভাবে শৈব যাহা বলিল, তাহার অর্থ হয়ত সে নিজেই কিছু বুঝিতে পারিল না।

বুঝিলাম, শৈব তাহার স্বামী বা তাহার বিবাহিত জীবনের খুটিনাটি রহস্যের কোন সন্ধানই একরূপ রাখে না।

সেইদিন হইতে তাহার সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা করিয়া লইলাম, শৈব নিতান্তই অজ্ঞ, অথবা অসম্ভব রকমে চাপা! কিন্তু এমন সৃষ্টিছাড়া চাপা মেয়ে ত আমি আর দেখি নাই!

শৈবর পরিপূর্ণ যৌবনেরও কি একটু ছন্দ নাই?

ভিতর হইতে প্রকৃতিও কি এক আধবার ভুলচুক করিয়া তাহাকে নাড়া দেয় না? স্বাভাবিক গতি এমন করিয়া পাথর চাপার মতো রুদ্ধ হইয়া থাকে কি করিয়া?

ইতিমধ্যে আমার জীবনের আর এক পর্ব্ব সুরু হইল।

সবে মাত্র বিবাহ করিয়াছি।

নূতন জীবন-যৌবন কালস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে।

উদ্দাম তাহার গতি, ভাব তাহার অতল গভীর।

নিরানন্দ, দুঃখ, অশান্তি বলিয়া যে পৃথিবীর মধ্যে এক প্রকাণ্ড বড় সত্য তাহার অজস্র শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া রাজত্ব করিতেছে, এ-কথাটি যেন একেবারে ভুলিয়াই গেলাম।

তাহার পর আমার নবীনা সহচরীটি ছিল বেশ একটু রসিকা। আজকালকার দিনে যাহাকে বলে flirtation, আমাদের সত্যযুগেও তাহার কিছু কিছু স্বাদ-গন্ধ ছিল। ইহার প্রমাণ খুঁজিতে বাহিরে যাওয়া একান্ত নিষ্প্রয়োজন। তাহার যথার্থ নজীর ছিল—আমার ঘরেই। সুতরাং যাহার ঘরে এমন একটি কোহিনূর—বাহিরের পৃথিবীতে তাহার কি দরকার!

এমন কি শৈবলিনীর মনস্তত্ত্ব লইয়া ঘাটাঘাটি করিতেও আর সময় পাইতাম না।

তবু শৈব ছিল ধরিতে গেলে একই বাড়ীর লোক। তাই, না হইলেও দিনান্তে একবার দুইবার দেখা না হইয়া যাইত না। বাক্যালাপও চলিত, তবে পূর্ব্ব হইতে অনেকটা সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছিল। এখন আর তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বড় একটা জিজ্ঞাসা করিতাম না। বরং আমারি নবজীবনের চঞ্চল মোহাচ্ছন্ন দিনগুলিকে সুচিত্রিত করিয়া মাঝে মাঝে শৈবকে বলিতাম।

বলিয়া যাইতাম, কিন্তু অপর একজনের তাহাতে কি ভাবের সৃষ্টি হইত বা কতটুকু সে উপভোগ করিত, তাহা আদৌ আমি লক্ষ্য করি নাই। লক্ষ্য করিবার মত তখন আমার সময় নয়; নিজের স্বপ্ন লইয়া নিজেই বিভোর ছিলাম। পূর্ব্বের দিন হইলে হয়ত ভাবের এতটুকু অসামঞ্জস্যও চোখে পড়িয়া যাইত।

এমন একঘেয়ে জীবনের মাঝখানে হঠাৎ যেন সে আমার চোখের সুমুখে নূতন একটি ধাঁধা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইতিমধ্যে শৈব একদিন নিজে হইতেই ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিরাছিল, কালকের রাত্রির কথা একটু বল পরেশদা, শুনি।

হঠাৎ যেন বোবা মেয়ের মুখে ভাষা ফুটিয়াছে!

শৈব অমন চাপা, আর তাহারি মুখ দিয়া যে-কথা, যে-আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতেই আমার বোঝা উচিত ছিল যে খাচার পাখী আজ বুলি পড়িতে চায়।

কিন্তু আমি ছিলাম অন্ধ। তাই সেদিনও আমার চৈতন্য হয় নাই! ইহা নীরস শুষ্ক ঘরোয়া কথা নয়, ইহার ভিতর আছে নেশা। সেই আলাপনের মাদকতা হয়ত বা অনেককেই একটু আধটু বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে, কিন্তু অমন পাথর দিয়া গড়া একটি মেয়ের তমসাচ্ছন্ন চিত্তকে যে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে, তাহা আমি ভাবিতে পারি নাই, সময়ও পাই নাই।

আমার নবীনা কিশোরীটির পায়ে আমি এমন করিয়া দাসখৎ লিখিয়া দিয়া ভেড়া বনিয়া গিয়াছিলাম যে, তাহা পুরাকালের পুরুষের পক্ষেই শোভা পাইত। আর, এমনি উন্মাদনায় আমার কি ছাই কোন দিকে এতটুকু স্থূলদৃষ্টিও ছিল?

কিন্তু সে-দিন যেন অকস্মাৎ চক্ষের সম্মুখ হইতে অন্ধকারের কালো পর্দ্দাটি একটুখানি সরিয়া গেল। কথায় কথায় শৈব সেদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—আচ্ছা পরেশদা, তুমি ত এত গল্প কর, একদিন শোনাতে পার, তোমাদের কি এত কথা যে ফুরোয় না। আমি একটু শুনব, পার শোনাতে?

বলিলাম—কেন পারব না, তুই আজ রাত্রে খেয়ে দেয়ে আমার ঘরের দোরগোড়ায় গিয়ে আড়ি পেতে থাকিস্, সবই শুন্‌তে পাবি।

—আচ্ছা বেশ, কথা রইল। আমি যাব আজ ওখানে, শুনব তোমরা কি বল।

চিরদিনই কার্য্যের পরিণতির কথা ভাবিয়া কোনো কার্য্য করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তাহা না হইলে হয়ত শৈবর অনুরোধ রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করিতাম।

আমার এই দুর্ব্বলতার জন্য জীবনে বহুবার আপশোষ করিতে হইয়াছে। সে-কথা আজ অভিজ্ঞতার সমস্ত নথিপত্র খুলিয়া স্বীকার করিতে এতটুকু দ্বিধা নাই।

* * *

আমি-মাত্র জানিতাম বাহিরে দাঁড়াইয়া শৈব আমাদের স্বামী-স্ত্রীর প্রেমালাপ শুনিতেছে। কিন্তু আমার স্ত্রী ইহার বাষ্পও জানিত না। তাহার কারণ, আমি ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। যদি বলিতাম তাহা হইলে আমাদের সহজ স্বচ্ছন্দ আলাপনের সমস্ত লাবণ্যই নষ্ট হইয়া যাইত। যে গোপন দুইটি কৌতূহলী কাণ বাহিরে উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল, তাহার সঙ্কোচে আমি পর্য্যন্ত অল্পবিস্তর বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার বাক্‌চাতুর্য্য অভিনয়ে রূপান্তরিত হইয়াছিল। একটা সঙ্কোচের বাধা সৃষ্টি করিয়া যেন আমাদের অবাধ ও সাবলীল গতিটাকে মাঝে মাঝে রুদ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল।

নারীচরিত্রের দুর্ব্বলতা আরো বেশী।

আমার স্ত্রী জানিত না বটে, কিন্তু আমার অভিনয়ে তাহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবটা থাকিয়া গেল চাপা পড়িয়া। মাঝখানে আমিও রহিতাম বিকল হইয়া। আর বাহিরে যে দাঁড়াইয়া আছে তাহার ত কথাই নাই। সমস্ত উৎসাহই তাহার পণ্ড হইয়া গেল।

এমনি হইলেই ভালো হইত।

আমার চটুলা স্ত্রী তাহার দৈনন্দিন ভাবের পালা সুরু করিয়া দিল। তাহার প্রগল্‌ভ আচরণ আমাকে যতই ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিল, ততই যেন কি এক অজ্ঞাত ভয়ে বা সঙ্কোচে আমি কুঞ্চিত হইয়া পড়িতেছিলাম।

আমার সমস্ত আনন্দ, আমার সমস্ত মাদকতা যেন কোন্ পাহাড়ের চাপে পিষ্ট হইয়া গেল। বহু কষ্টে বাহিরের মুখোসটুকু বজায় রাখিলাম। কিন্তু তথাপি স্ত্রীর কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছিলাম আর কি? মাঝে মাঝে এমনি অন্যমনস্কতা সত্ত্বেও তাহার কাছে আমার লুকোচুরি যে প্রকাশ হইল না, সে শুধু আমারি দক্ষতায়। কুশলী অভিনেতা, তাই টিকিয়া গেলাম।

কথার উপর কথা সাজাইয়া কথার নক্সা কাটিয়া কোন প্রকারে সময় কাটাইয়া দিলাম।

রাত্রি তখন গভীর।

একটি দুইটি করিয়া অনেকগুলি ঘণ্টার কাঁটা সরিয়া গেছে। ঘড়ির দিকে চাহিয়া মনটা খুলিয়া গেল। বক্ষস্থলের গ্রন্থিগুলি এতক্ষণ জোট পাকাইয়াছিল, এইবার যেন একটা একটা করিয়া খুলিয়া গিয়া বুকটাকে হাল্‌কা করিয়া দিল।

একটি প্রশান্ত নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাহিরে নিশ্চয়ই এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ দাঁড়াইয়া নাই। ইহা সহজেই অনুমান করিয়া লইলাম যে, এত রাত্রিতে ঐ অন্ধকারে মশকের তীব্র জ্বালা সহ্য করিয়া আর কেহ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না।

নিঃসঙ্কোচে নির্লজ্জের মতো স্বরূপ লইয়া স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলাম। নিশীথ রাত্রের মত্ত আসর

এইবার যথার্থরূপে জমিয়া উঠিল। সমাজ, ধর্ম্ম ও আচারের সমস্ত নীতি ও রীতি নতমস্তকে মানিয়া লইয়াই আমরা সেই রাত্রিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিলাম।

এতক্ষণ মিথ্যা যে সময়টুকু অপচয় করা গেল, তাহার সঙ্গে এই সময়ের এতটুকু মিল নাই। অভিনয়ের মধ্যে যথার্থ আনন্দ বলিতে কি এমন আছে? সম্পর্ক সত্য যেখানে, সেখানে আত্মগোপন করিয়া থাকা একটা মস্ত বড় বিড়ম্বনা। ইহা যেন আমি ঐ কয় মুহূর্ত্তের মধ্যেই স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিলাম।

সন্তৃপ্ত মন। উদ্বেগের লেশ মাত্র নাই।

অন্তর হইতে তখনো গত মুহূর্ত্তের মাধুর্য্য মুছিয়া যায় নাই।

অশুভ বা আকস্মিক কোন আঘাতের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু আমার প্রস্তুত-অপ্রস্তুতের জন্য কি আসে যায়!

স্বয়ং বিশ্বদেব, যিনি আমার এই ক্ষণটিকে বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া দিতে তাঁহার অঙ্গুলি ঠেলিয়া দিয়াছেন, তিনি প্রস্তুত ছিলেন। এই দুপুর রাত্রেও যে তিনি স্বর্গের জানালা খুলিয়া আমার শুভাশুভ মুহূর্ত্তটি বিচার করিবার জন্য বসিয়া আছেন, ইহা আমি কি করিয়া জানিব।

দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই চমকিয়া উঠিলাম।

দেখিলাম—অস্পষ্ট অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে একটি নারী মূর্ত্তি।

কথা বলিবার এতটুকু সময়ও আর পাইলাম না। মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন পৃথিবীটা উল্টাইয়া গেল। ক্ষত-বিক্ষত কর্ম্মক্লান্ত ধরণী যেন একটি মুহূর্ত্তকে ছুটি দিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। সংযম নিয়ম সরলতা ক্ষণেকের জন্য অভিধানের পাতায় ঘুমাইয়া পড়িল।

বুভুক্ষু দুইটি ব্যাকুল ওষ্ঠের করুণ অভিবাদন!

সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে বলে—চুম্বন!

পিপাসিত আত্মা উদ্বেল হইয়া একটি সংক্ষুব্ধ মুহূর্ত্তকে লাবণ্যে ভরিয়া তুলিল, না এক অবর্ণনীয় আশঙ্কায় আকুল করিয়া দিয়া গেল, কে বলিবে?

মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি—বুদ্ধিহীন বোবার মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

দৃঢ় আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া লক্ষ্য করিলাম, দেয়ালের গায়ে তাহার কম্পমান দেহখানির ভর রাখিয়া রাখিয়া টলিতে টলিতে শৈব দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এ-যেন ব্রহ্মার কল্প-কাল।

এতটুকু সময়ের মধ্যে যেন কত কি ঘটিয়া গেল।

হয়ত বা ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটাটিও তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময় পায় নাই! এই সময়টুকুর ভিতর যেন ভূমিকম্প হইয়া গেল।

বুঝিতে পারিলাম মুহূর্ত্তের জন্য শৈবর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। তাহার সমস্ত সম্বিত, অটল ধৈর্য্য একটি জটিল মুহূর্ত্তের আবর্ত্তে

পড়িয়া একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। না হইলে শৈবর মত এইরূপ সংস্থিত জীবন এমন করিয়া টলমল করিয়া উঠিল কিরূপে ?

* * *

দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল, কিন্তু শৈবর ছায়াও আর চোখে দেখিতে পাই না। সাতটি দিন ত তাহার কোন খোঁজই পাইলাম না।

স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—শৈব অসুস্থা; আজ সাত দিন হইল সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে চায় না।

সূর্য্যের আলোয় হয়ত হতভাগিনীর চক্ষু ঝলসিয়া যায়!

ঐ ক্ষণটুকু ছিল শৈবর জীবনে সঞ্চয়!

এই নীরন্ধ্র নিমেষটি শৈবর জীবনে ছিল অখণ্ড সম্পদ। তাই এই মিলন-মুহূর্ত্তটিকে পৃথিবীর বিনিময়েও সে বিকাইতে পারে নাই। এই আকস্মিক লগ্নটিকে সে কতই না যত্নে, সাল-মাস-তারিখ এমনি কত কি অঙ্কে চিহ্নিত করিয়া তাহার দিনান্ত কাল পর্য্যন্ত দুই হাত দিয়া আগলাইয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল।

সেই শৈব—

সেই রাক্ষুসী আজ চলিয়া গেছে।

একদিন যাঁহারা আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল—রাক্ষুসী, আজ তাঁহারাও ঊর্দ্ধে। কিন্তু সপ্তলোক ভেদ করিয়া যদি আজ ওই কাহিনী বা মৃত্যুকালের এই সরল স্বীকৃতি তাঁহাদের কাণে গিয়া পৌঁছিত, তাহা হইলে...... ?

কিন্তু তাঁহারা আজ নাই। রাক্ষুসীও নাই।

পড়িয়া রহিল শুধু এই স্থবির !

প্রসঙ্গ

রায় শ্রীসতীশচন্দ্র দে বাহাদুর, এম-এ, এম-বি

হার্টফেল

বাইবেলে লেখা আছে ঈশ্বর ছয়দিনে তাঁহার সৃষ্টিকার্য্য শেষ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম লইয়াছিলেন। এই ঈশ্বর কোথায় থাকেন, আমরা জানি না ; সুতরাং তাঁহার একটি দিন কত বড় তাহাও আমাদের জানা নাই। হিন্দুশাস্ত্রে লেখে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ঘুম ভাঙ্গিলেই সকাল বেলা, ছোট একটি ছেলের মত, খেলাঘর পাতিয়া খেলা করিতে আরম্ভ করেন—সে খেলায় কত পুতুল, কত সুখদুঃখ, কত উৎসব-ব্যসন, কত রকম পরিবর্ত্তন! সন্ধ্যা হইলেই, এই ছোট ছেলেটি খেলাঘর ভাঙ্গিয়া সব সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করেন। তখন চারিদিকে কেবল মহাশূন্য ও জল। দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুও স্থান না পাইয়া একটা মৃত্যুহীন (অনন্ত) সাপকে আঁকড়ে ধরিয়া মহাশূন্যে বা সমুদ্রে ভাসিয়া থাকেন। তবে ব্রহ্মার দিন ও রাত্রি একটু বড়—এক এক কল্প অর্থাৎ চারি যুগ। সে অনেক সহস্র বৎসর।

* * *

সে সব বড় কথা ছাড়িয়া পৃথিবীর কথা ধরা যাউক। এখানেও কর্ম্মের মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম। যে সকল চাকুরিতে প্রতিদিন কায করিতে হয়—ডাক্তারি, রেলের, পোষ্ট আপিসের

বা পুলিসের চাকুরি—সেখানেও মধ্যে মধ্যে প্রিভিলেজ লিভ, ফর্লো প্রভৃতির দরকার হয়, এবং কর্ম্মশেষে পেন্সন লইয়া বিশ্রামলাভ ঘটে। ব্যবসায়ী ও দোকানদারগণও পার্ব্বণ উৎসবে ও পারিবারিক কারণে মধ্যে মধ্যে দোকান বন্ধ করিয়া বিশ্রাম করেন। বস্তুতঃ বিশ্রামহীন কর্ম্ম আমাদের চোখে বড় পড়ে না।

* * *

অচেতন কল-কারখানাতেও, বয়লারকে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দিতে হয়। যেখানে দিবারাত্রি কার্য্য, সেখানে দুই বা তিনটা বয়লার থাকে ও একটা মাত্র এক সময়ে কায করে। ঘড়ির কল যদি মধ্যে মধ্যে বন্ধ রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার কার্য্য ভাল চলে।

* * *

সব জিনিষেরই কর্ম্মের মধ্যে বিশ্রাম আবশ্যক। কিন্তু আমাদের শরীরের মধ্যে একটি যন্ত্র আছে, যাহার ছুটি নাই—যাহা বিশ্রাম জানে না। ইহার নাম 'হার্ট' বা হৃৎপিণ্ড। জন্মের পাঁচ ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে (জঠরে) ইহা কার্য্য করিতে আরম্ভ করে এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইহার কার্য্য চলে। যখন ইহার কার্য্য বন্ধ হয়, তখন, ইহার সহিত স্রষ্টার এমন সুন্দর সৃষ্টি—দেহও—চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায়।

ধাতার এমন সুন্দর 'সাজান বাগান' ইহার অভাবে, এক মুহূর্ত্তে শুকাইয়া যায়।

* * *

শরীরের অন্য যন্ত্রগুলির কার্য্য দেখ। বাড়ীর বড় কর্ত্তা মস্তিষ্কের ঠিক সময়ে বিশ্রাম চাই—নিদ্রার সময় নিদ্রা না গেলে চোখ ঢুলিয়া আসে। কাযকর্ম্ম বেশী না থাকিলে দিবাভাগেও ইনি একটু বিশ্রাম করেন। ইঁহার বিশ্রামের সময়ে শরীরের অন্য সকল যন্ত্রও বিশ্রাম করে—মনিব যদি ঘুমায়, চাকরেরা খাটিবে কেন? কেবল পরিপাকযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ড নিদ্রার সময়েও কায করিতে থাকে। তবে, যদি দু'একদিন না খাওয়া যায়, তাহা হইলে তখন পরিপাকযন্ত্রও বিশ্রাম লয়। শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়াও দু'চারি মিনিট বন্ধ থাকিলে ক্ষতি হয় না; জলে ডুবিলে বা অন্য কোন কারণে শ্বাসরোধ হইলে, কয়েক মিনিট কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-পরিচালনা করিলে, আবার শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া চলিতে পারে। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া একবার বন্ধ হইলে, তাহার পুনরুদ্দীপন একরকম অসম্ভব। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারোধেরই নাম 'মৃত্যু'।

* * *

যদি সকল মৃত্যুতেই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়—তাহা হইলে 'হার্ট ফেল' হইয়া মৃত্যুর মানে কি? ইহা বুঝিতে হইলে এই নীরবকর্ম্মী প্রভুবৎসল যন্ত্রটির বিষয় একটু জানিতে হইবে।

* * *

এই যন্ত্রটি যে কেবল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, নীরবকর্ম্মী ও পরোপকারী, তাহা নহে, ইহার লজ্জা ও অভিমান অনেকটা পূর্ব্বযুগের বাঙ্গালী বধূদের মত! প্রাণ ফাটিয়া যাইবে, তথাপি ইহা নিজের অসুখের কথা কাহাকেও বলিবে না। দেখ, মস্তিষ্কের সামান্য কিছু হইলে, অসহ্য মাথাব্যথা হয়। পরিপাক যন্ত্রের কোন রোগ হইলে, পেটে ভয়ানক ব্যথা হয়। শ্বাসযন্ত্রের কিছু হইলে, কাশি হাঁপানি প্রভৃতি হয়। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের নিজের কোনও রোগ হইলে, সে রোগী যদি ডাক্তারও হন, তাহা হইলেও নিজে বুঝিতে পারেন না। একটি প্রবচন আছে—'যদি পাকস্থলীর রোগের লক্ষণ সকল পাও—হার্ট পরীক্ষা কর; এবং যদি হার্টের কোন লক্ষণ (বুক ধড়্‌ফড়্‌ করা প্রভৃতি) পাও, তাহা হইলে, তাহার কারণ পরিপাক যন্ত্রের মধ্যে দেখ।' হৃৎপিণ্ডের রোগের লক্ষণ এতই গুপ্ত ও মৃদু! যখন রোগে আক্রান্ত হয়, হৃৎপিণ্ড আর কিছুই চায় না, একটু ভাল খাদ্য ও বিশ্রাম। ঠিক যেমন বাঙ্গালী বধূ অসুখে পড়িলে অসুখ লুকাইয়া রাখে, ঘরের কায যথাসাধ্য বিষাদমলিন মুখে করিয়া যায়, কিন্তু সুবিধা পাইলেই ঘরের মেঝেতে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়ে—তেমনি হৃৎপিণ্ডও নিজের রোগ লুকাইয়া রাখে, ঢাক ঢোল বাজাইয়া সকলকে বলে না, শ্রান্তিবোধ করার জন্য রোগী মাঝে মাঝে শোয়, কিন্তু তাহার মারাত্মক রোগের বিষয় সে কিছুই জানে না। যদি তাহার কায বেশী হয়,

কায করিতে থাকে, এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে, সেই বধূটির মত হৃৎপিণ্ড একদিন, চিরদিনের মত কায বন্ধ করিয়া শয্যা লয়। ইহাকেই 'হার্ট ফেল' হওয়া বলে।

* * *

অন্য রোগেও মৃত্যু হয়—হার্ট ফেল করিয়া। কিন্তু এ সকল স্থলে, সেই রোগের বিষ শরীরে সঞ্চারিত হইয়া হার্টকে দুর্ব্বল করিয়া আনে, এবং হার্টের নিজের কোন রোগ না থাকিলেও সেই বিষের জন্য মৃত্যু হয়। এখানে বাঙ্গালী বধূটির নিজের রোগ নাই, প্রত্যহ মার খাইয়া, নির্য্যাতিত হইয়া, আহারের অভাবে ও বিষ-ভক্ষণের প্রভাবে মারা পড়ে। টাইফয়েড্ জ্বরে বা নিউমোনিয়াতে এই সকল রোগের বিষ হৃৎপিণ্ডকে চাপিয়া মারে—তবুও ইহা যথাসাধ্য ইহার কার্য্য করিতে থাকে। এ সকল স্থলে আমরা 'হার্ট ফেল' হইয়া মৃত্যু হইয়াছে বলি না, টাইফয়েড্ জ্বর বা নিউমোনিয়ায় মৃত্যু হইয়াছে বলি। এখানে বধূর মৃত্যুর কারণ তাহার নিজের রোগ নয়—মৃত্যুর কারণ তাহার নির্য্যাতক! হার্ট ফেলে মৃত্যু স্বাভাবিক (রোগে) মৃত্যু; অন্য রোগে মৃত্যু—অপঘাতে—তিল তিল করিয়া বিষপানে মৃত্যু। আশ্চর্য্য সৃষ্টি এই যন্ত্রটি—হৃৎপিণ্ড!

চিত্র ও চরিত্র

কেশবচন্দ্র সেন

রামমোহন রায়ের তিরোভাবের পাঁচ বৎসর পরে যে দুই প্রতিভাবান পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া বাংলার চিন্তাজগতে যুগান্তর উপস্থিত করেন, তাঁহাদের একজন অসাধারণ লেখক, আর একজন অপূর্ব্ব বক্তা।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্রের জন্মবৎসর। সেই স্মরণীয় বৎসরে কবি হেমচন্দ্রও জন্মগ্রহণ করেন।

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মভাব যখন উদ্দীপ্ত হইল, প্রথম যৌবনের সেই সন্ধিক্ষণে রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তিনি নিজের আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইলেন। মহর্ষির সহিত যখন তাঁহার মিলন ঘটিল এবং কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার বয়স উনিশ কুড়ি, সবে এক বৎসর বিবাহ হইয়াছে।

প্রশান্ত গম্ভীর কেশবচন্দ্র যৌবনের সমস্ত উন্মাদনা ধর্ম্মোদ্দেশে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই আপাতপ্রশান্তির অন্তরে যে তেজোবেগ নিহিত ছিল, দিব্যদৃষ্টি দেবেন্দ্রনাথের কাছে তাহা অপরিজ্ঞাত রহিল না। তাই চব্বিশ বৎসরের যুবককে সমাজের আচার্য্যপদে বরণ করিয়া 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে মণ্ডিত করিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। 'পত্রাবলী'তে দেখিতে পাই কেশবচন্দ্রকে মহর্ষি লিখিতেছেন, "আমার জীবনে বঙ্গভূমি মধ্যে তোমার অপেক্ষা বিশুদ্ধচরিত্র ও মহৎ ব্যক্তি আমি দেখি নাই।"

মানবকণ্ঠে মোহিনী শক্তি আছে। কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা সেদিন তরুণ বাংলাকে অভাবিতরূপে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। সমাজ, স্নেহ ও স্বার্থকে দুই হাতে সরাইয়া দিয়া বন্ধুর পথে কেশবচন্দ্রকে অনুসরণ করিতে সেদিনের অনেকেরই বাধে নাই।

বিলাতযাত্রা কেশবচন্দ্রের জয়যাত্রা। তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা কুইন ভিক্টোরিয়াকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। রচনানিবদ্ধ চিন্তারাশি দেশের মনে অনুপ্রবিষ্ট হইতে দেরি লাগে। কণ্ঠোচ্চারিত বাক্য তড়িদ্বেগে সাড়া জাগাইয়া যায়। নব্য বাঙালী কেশবচন্দ্রের পিছনে ছুটিয়া চলিল। সমাজসংস্কারে তিনি ছিলেন অগ্রণী। 'নব-বিধান' তিনিই গড়িয়াছিলেন।

'যীশুখ্রীষ্ট—ইউরোপ ও এশিয়া' বক্তৃতা তাঁহার উপর বাইবেলের প্রভাবের ফল। প্রার্থনাতত্ত্ব তাঁহার দান। পূর্ব্বজীবনে একটু অধিকমাত্রায় পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত হইলেও উত্তরজীবনে কেশবচন্দ্র বিশেষভাবে প্রাচ্যভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। এই সময়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও কেশবচন্দ্র, এই দুই অসামান্য ভগদ্ভক্তের সাক্ষাৎকার হয়।

কেশবচন্দ্রপ্রবর্ত্তিত 'সুলভ সমাচার' সুলভ সংবাদপত্রের সূচনা করে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন।

এই ধর্ম্মভাবে ভাবুক, শান্তশ্রী, প্রিয়দর্শন, প্রতিভা-জ্যোতিঃসমুজ্জ্বলনেত্র, মধুকণ্ঠ বাগ্মী পুরুষের আবির্ভাবে একদা বাংলার সমাজ অভূতপূর্ব্বভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

সকলেই কিছু কবি নহে, অথচ অধিকাংশ লোকেরই কবি হইবার সাধ কিছু-না-কিছু আছে। কবির পক্ষে কল্পনা সহজ এবং স্বাভাবিক। সকলের পক্ষে তাহা নহে। তাই যাহারা সখের কবি সাজিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চায়, তাহারা কল্পনার অনুকরণে রচনার ভিতরে এমন একটি জিনিষের আমদানী করে যাহার সহিত কল্পনার আপাত সাদৃশ্য আছে মাত্র। সত্য অনেক সময় কাহিনীর চেয়েও বিচিত্র। তাই যাহারা কল্পনার নকলে কাব্যের ভিতর কাল্পনিকতা প্রকাশ করে, প্রায়ই তাহাদের অদ্ভুতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

* * *

এমন কি কবিও সব সময় দৈবী প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া কাব্য রচনা করেন না। কাব্যের যেখানে কুশলতা নাই, কাব্যের সেইখানে তিনি কাল্পনিক। হৃদয়-বীণার তার সর্ব্বদা সুরে বাঁধা থাকে না। শ্লথ-তন্ত্রী বীণার উপর আঙুল চালাইয়া অনধিকারী এবং কখনো কখনো খেয়ালী যন্ত্রী সুরের নকল বাজাইয়া প্রাকৃতজনের চিত্ত আকৃষ্ট করে—তাহা কিন্তু প্রকৃত সুর নয়। সমস্ত আবরণ ভেদ করিয় কল্পনা বস্তুর অন্তরের সত্যকে এক অজ্ঞাত উপায়ে প্রতিভাসিত

করিয়া মানুষের মনকে চমৎকৃত করিয়া তোলে। এদিকে কাব্যামোদীকে অপরূপের উপহার দিয়া অকবি সেই একই ফল লাভ করিতে চায়—অথচ কল্পনা ও কাল্পনিকতা চিরদিনই বিভিন্ন থাকিয়া যায়। কাল্পনিকতা আমাদিগকে খেলার পুতুল, অবসর-বিনোদনের উপায় মাত্র যোগাইয়া দেয়। কল্পনা হৃদয়-মন্দিরে সত্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করে। কাল্পনিকতা হয় ত বৈচিত্র্য দিতে পারে, কিন্তু কাব্যের বিষয়ের মধ্যে সুষমা আনিতে পারে কেবল কল্পনা।

—আগামী সংখ্যায়—

শ্রীমতী আশালতা দেবীর

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল

দিন-পঞ্জী

১লা এপ্রিল—কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহেরু ও যুক্ত প্রদেশের ৯ জন বিশিষ্ট কংগ্রেসের সেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে ৪ঠা এপ্রিল পর্য্যন্ত আটক রাখা হইবে।

কংগ্রেসের অধিবেশন সম্পর্কে কলিকাতায় ও হাওড়ায় এ পর্য্যন্ত মোট ৬০০জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৩১শে মার্চ্চ, লণ্ডন—অদ্য সন্ধ্যায় লণ্ডনস্থ ভারতবাসীদের এক সভায় মিঃ ভি-জে-প্যাটেল আমেরিকার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন যে, ব্রিটিশগণ আমেরিকায় প্রবল আন্দোলন চালাইতেছে। ইহার প্রতিকার কল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারিলে, অবহেলার দোষে ভারতবর্ষ সহানুভূতি হারাইবে। তিনি চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, কংগ্রেসের নীতি পরিবর্ত্তন আবশ্যক, কেন-না ভাবোদ্দীপক বাক্য বলার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন প্রয়োজন—সমস্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুকৌশল পরিচালনা।

২রা এপ্রিল—গত শনিবার বেলা ৩ ঘটিকায় এসপ্লানেড ট্রাম ডিপোর বিশ্রামাগারে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার সভানেতৃত্বে কলিকাতা কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন হয়। সভায় বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিল।

প্রায় ২০ মিনিট কাল সভার কার্য্য চলিবার পর পুলিস শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা, ৭০ জন মহিলা ও ৩০০ শত প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার করে।

বেলা ৪ ঘটিকার সময় চিৎপুর, বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে সিন্ধুর মিঃ পাঠকের সভাপতিত্বে পুনরায় অধিবেশনের চেষ্টা হয়। তথায় ১৫ জন মহিলা ও ১০০ শত প্রতিনিধি গ্রেপ্তার হয়।

নয়া দিল্লী, ২রা এপ্রিল—অদ্য নবনগরের জাম সাহেব, জগদ্বিখ্যাত ক্রীকেটবীর রঞ্জিৎসিংজী অকস্মাৎ জামনগরে পরোলোক গমন করিয়াছেন। জাম সাহেব ১৯৩২ সালের নরেন্দ্র-মণ্ডলের চ্যান্সেলার ছিলেন। ক্রীকেট-জগতে তিনি 'রঞ্জী' নামে বিখ্যাত ছিলেন।

আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে
আর ইনজেক্‌সান লইতে হইবে না
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

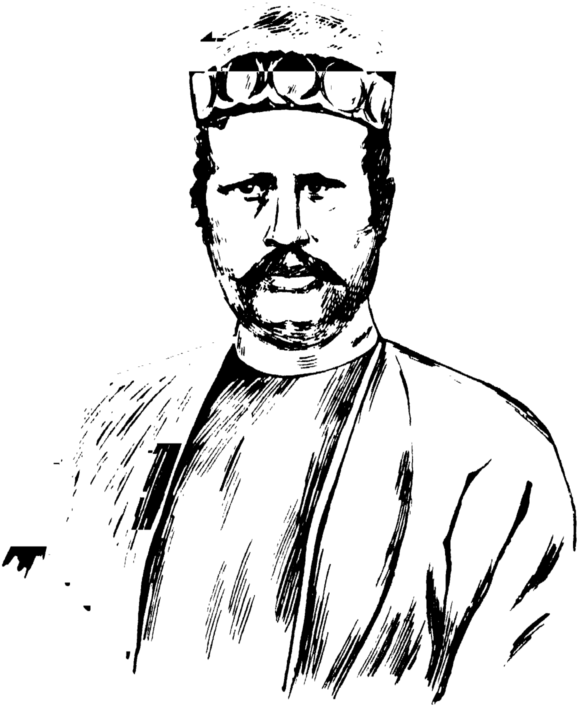

দীনবন্ধু মিত্র

ছোট গল্প

১ম বর্ষ]   ২রা বৈশাখ ১৩৪০   [৪১শ সংখ্যা

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল

শ্রীমতী আশালতা দেবী

ফাল্গুনের আঠারোই। এবং সন্ধ্যা ছটা। কলকাতায় এ-সময়ে বেশী গরমও পড়েনি, শীতের আমেজও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রাস্তায় আলোয় এবং গোলমালে কলকাতাটা গা নাড়া দিয়ে যেন পুরোপুরি জেগে উঠেচে। এই রকম সময়ে সিতাংশু তার একদল বন্ধু নিয়ে একটা ওয়ালফোর্ডের দোতলা বাসে সামনের দিকে বসে আড্ডা দিতে দিতে ভবানীপুর অঞ্চলের দিকে যাচ্ছিল। এরা সকলেই সাহিত্য আলোচনা

করে এবং রসবোদ্ধা, এবং সর্ব্বোপরি সকল প্রকার বিষয়বস্তু নিয়েই সুদীর্ঘ সমালোচনা করতে এদের বাধে না।

নীরেন, সিতাংশু, সত্যেন—এদের দেখলেই মনে হতে পারে এরা কালচারের স্বরূপ। বাহান্ন ইঞ্চি ধুতি এত বেশী পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়চে যে, মনে হয় পদে পদে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। ফাইন ধুতির অতি সূক্ষ্মতা ভেদ করে আণ্ডার ওয়্যারের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কীপকুলার গেঞ্জির ওপরে গলার-বোতাম-খোলা এবং ঢিলে-হাত সাদা গরদের পাঞ্জাবী, কিংবা কারো খুব পাৎলা সাদা আদ্দির। মাথার চুলের পালিশে মুখ দেখা যায়। কথাটা কি নিয়ে হচ্ছে তা এখনো আমরা অনুসরণ করবার সুযোগ পাইনি। ফ্রালিপ্‌পো লিপ্‌পি, রুবেন্‌স্‌, বত্তিচেল্লি, কম্যুনিজ্‌ম্‌, অতি-আধুনিক সাহিত্য, সাহিত্যের মাপকাঠি, বা ইকনমিক্‌ ডিপ্রেসন্‌ যে কোন বস্তু নিয়েই হতে পারে। ভবানীপুরের মোড়ে এসে ওরা নামল। সিতাংশু বললে, "চলনা আমার ওখানেই যাওয়া যাক।" সিতাংশুকে অনুসরণ করে ওর বন্ধুরা ভবানীপুরের একটা মাঝারিগোছের বাড়ীতে ঢুকল। সুইচটা টিপে দিয়ে সিতাংশু বললে, "নীরেন আমার নতুন উপন্যাস 'দূরের পরশ' পড়লে ; এখন তোমরা পাঁচজনে কিছু কিছু suggestion দাও, কিছু বদলাতে বা মাজা ঘষা করতে হবে কি না ?"

তারপর চলল নানা চরিত্র নিয়ে আলোচনা। কোনখানটা মার্ভ্‌লাস্‌ হয়েছে, কোনখানটা আশানুরূপ হয়নি।

সিতাংশু লোকটা বড্ড গোলমাল ভালবাসে। লেখকের ইতিহাসে নির্জ্জন তপস্যার যে একটা অংশ রয়েছে সেইটে ও কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। তাই যখনি যা কিছু লেখে, বন্ধুদের সভায় তাকে পেশ না করলেই ওর চলে না। লোকটি বড় ভালো—কেবল ভালো নয় এককথায় বলতে গেলে ভারি charming। তাই, ওর লেখার চেয়ে ওকে দেখতে, ওর সুন্দর কমনীয় চেহারার দিকে দু'দণ্ড তাকিয়ে থাকতে, আমাদের ঢের ভালোলাগে। নীরেন বললে, "মোটের উপর উপন্যাসটা তোমার ভালোই হয়েচে, একটু মেজে ঘষে ফিনিশিং টাচ্ দিয়ে এবার প্রেসে পাঠিয়ে দিতে পারো। কিন্তু এখন উপন্যাসের কথা থাক্, সেদিনের একটা ঘটনা বলি শোন। তোমার বাড়ীতে গত শুক্রবার যে গানের মজলিস হয়েছিল, জানইত সেদিন আমি কি রকম মার্ভেলাস্ সাক্সেস হয়েছিলুম,—হ্যাঁ গানটা সেদিন আমার ভয়ানক ভালো হয়েছিল। তা বোধ করি অস্বীকার করবে না।" সিতাংশু এবং সত্যেন একবাক্যে স্বীকার করলে, "খুবই ভাল হয়েছিল, আমরা ত অবাক হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু তারপর?" "তারপর বাড়ীতে গিয়ে পরদিন সকালের ডাকে একখানা নীলাভ খামের চিঠি পেলুম তাতে লেখা আছে—আচ্ছা তোমরা নিজেরাই পড়ে দেখ না।" নীরেন পকেট থেকে একখানা পুরু খাম বের করলে। দু'জনে ঝুঁকে পড়তে লাগল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

কাল আপনার গান শুনে মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়েচি। সে সভায় আরও দু'একজন খ্যাতনামা হিন্দুস্থানী ওস্তাদও ত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের গান শোনার পর, আপনার প্রাণবান্, সূক্ষ্মকারুকার্য্যময়, দরদে-ভরা মরমী গান শুনে বিস্ময়ের কূল-কিনারা দেখতে পেলুম না। আমার সেই গভীর ভালোলাগাই আজ আপনাকে এ প্রশস্তি দিতে প্রবৃত্ত করেচে। আশা করি কিছু মনে করবেন না। আমার কুণ্ঠাহীন শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন। এবং তার সাথে নম্র নমস্কারও। ইতি—

পুষ্পলতা।

নীরেন জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু এ গভীরচিত্ত মেয়েটি কে? তোমাদের বাড়ীতে সেদিন কারা আমন্ত্রিতা ছিলেন? সকলকেই জানো কি?" সিতাংশু বললে, "অনেকে এসেছিলেন, তাঁদের সকলকেই আমি চিনিনে, আমার বোনের আলাপী অনেককেই সে নিমন্ত্রণ করেছিল। এঁ-কে আমি চিনিনে।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নীরেন বললে, "তা হবে। আমি এর জবাব দিয়েচি: আপনাকে চোখে দেখিনি, আলাপ করতেও পারলুম না। সে সৌভাগ্য হ'ল না, কিন্তু আপনার শ্রদ্ধা দুর্ল্ভ সম্পদের মত মাথায় তুলে নিয়েচি। বাস্তবিক এতদিন আমার ধারণা ছিল, মেয়েরা গানের বোঝে কি, আজ সে ধারণায় ভূমিকম্প হয়ে গেছে।"

সত্যেন সহসা প্রশ্ন করলে, "আচ্ছা তিনি তোমার ঠিকানা জানলেন কি করে ?" তাই ত, এই সহজ প্রশ্নটা কেন আগে মনে পড়েনি ? এখন বিদ্যুৎচমকের মত তা মনে প'ড়ে যুগপৎ সকলকে ধাঁধিয়ে দিলে। এর জবাব দেবার কিছু ছিল না। নীরেনও দিতে পারলে না, নার্ভাস হয়ে শুধু বললে, "তাই ত !" বেশ বোঝা গেল, এদের অগোচরে নীরেনকে তিনি কোন সূত্রে চেনেন, কিন্তু এরা তাঁকে চেনে না। এরপর কথা আর জমল না, এক কাপ চা খেয়ে নীরেন বিদায় নিলে। বিদ্যুৎশিহরণের মত তার সারা মনে একটা আনন্দের চঞ্চলতা ঢেউ খেলে চলল, "তিনি আমাকে চেনেন। কি করে চিনলেন এবং কোথায় কি ঘটনায় চিনলেন তা আমি জানিনে, নাইবা জানলুম। না জেনেও সুখ আছে। আমার সুরের তরঙ্গ একজনকে প্রতিহত করে ফিরে এসেচে, এবং আসার সময় কোমল স্বরে তার নামটি সঙ্গে করে এনেচে। এই আমার সুখ, এটাই আমার সুখ।" যেন উচ্ছ্বাসের overdose প্রয়োগ করছি বলে সন্দেহ কেউ আমাদের না করেন। নীরেনের বয়েস মোটে চব্বিশ। চব্বিশ বছরে এমন মনে হয়।

সিতাংশুর সঙ্গে নীরেন এবং সত্যেনের বন্ধুত্ব ছিল—বন্ধুত্বের চাইতে আরও একটু বেশী। সিতাংশুর দিদি ছায়া নীরেনকে স্নেহ করত। সে নীরেনের সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছিল,

এবং তার শ্বশুরবাড়ী মুক্তারাম রো'তে ওর প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকত—গল্পগুজব করতে, গান শোনাতে। সেদিনও ছায়া নীরেনকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছিল দুপুর বেলায়। নীরেন বারোটার সময় সেখানে পৌঁছল। 'দিদি, দিদি'—বলে ডাকাডাকি বাধাতে ছায়া বেরিয়ে এল। তার হাতে বেসন মাখা, রান্নাঘরে নিযুক্ত ছিল চপ ভাজতে, এইমাত্র বেরিয়ে এসেচে আর কি।

"একটু বোস, আর আমার হ'ল বলে। একলাই বা বসে কি করবে, সিতাংশু এখনো এল না।" তারপর একটু উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, "মিনতি, মিনতি, এইখানে এসে একটু বোস না লক্ষ্মী মেয়েটি! অতিথ এসেচে, তাকে ফেলে যাই কি করে, অথচ কাজটা না সেরে ফেললেও উপায় নেই।" ত্বরিতপদে ছায়া রান্নাঘরের অভিমুখে চলে গেল। নীরেন চুপচাপ বসে সেই মাসের প্রবাসীর পাতা উলটোচ্ছে, মনে মনে ভাবছে মিনতি নামধারিণীটি কে। দিদির বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, যদি এখনই উক্ত ব্রীড়াসঙ্কুচিতা ঘরে এসে ঢোকেন এবং এসে ওই দূরে সোফাটায় বসে ক্রমান্বয়ে গোলাপী এবং গাঢ় লাল হতে সুরু করেন, অবিশ্যি নিরুত্তরে, তখন আমি করব কি? আমাদের দেশের মেয়েদের সাথে কথা বলে সুখ আছে? না কিছুই সুখ নেই, স্বস্তিও নেই। কথা কয়বার সময় অহরহ মনে করতে হবে এঁরা মেয়েমানুষ, এঁরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম ফুল, একটু ভুলেছ কি বিপদ। কিন্তু সব মেয়েই কি তাই? না,

অবিশ্যি না, পুষ্পলতা বাদে। বাস্তবিক, গভীরতার সঙ্গে কি তেজস্বিতা! প্রায় বিনা পরিচয়ে, কেবলমাত্র গুণের পরিচয়ে, এমন-একখানা নিঃশঙ্ক-দীপ্তিতে-ভরা অথচ নম্র চিঠি লিখতে পারে ক'জন মেয়ে? এই সব কথা সবে ভাবতে আরম্ভ করেছে এবং ভাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা নেশার আমেজ মধুর করে ঘনিয়ে আসছে, এমন সময়ে ছায়াদিদির মেয়ে উমা নির্দ্দয়ভাবে নাচতে নাচতে এসে ওর ঘাড়ের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং বলা বাহুল্য কল্পনার সূত্রকে নিমেষে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিল। এবং তার পিছনে ও কে? পেঁয়াজি-রঙের মাদ্রাজী শাড়ি পরে অত্যন্ত সুশ্রী একটি মেয়ে আস্তে আস্তে এসে সেই অদূরবর্ত্তী সোফায় বসল। নীরেন মনে মনে করছে এইবার তার বিভীষিকাময় কল্পনা ফলতে সুরু করবে। বিরক্তিতে তার মাথা ঝিম ঝিম করছে, উৎকণ্ঠায় মনটা অর্দ্ধ-আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, তারই মাঝে শুনতে পেলে উমার হাস্যঝঙ্কৃত কলস্বরের অনর্গল কথা। "মিনতিদিকে চেনোনা বুঝি। কি করেই বা চিনবে? আমাদের ইস্কুলে এইত সেদিন ও পড়ত। আজকাল কলেজে চলে গেছে। তুমি বুঝি ওর গান শোননি ছোটমামা। তোমার চেয়ে বোধ হয় ভালো গাইতে পারে না। কিন্তু তাও যদি শুনতে!" অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় অদূরবর্ত্তিনী একটুও গোলাপী বা লালের ধার দিয়ে গেল না। কেবল একটু হেসে বললে, "উমা একটু চুপ করে থাকতে পারে না, এই একটা ওর ভারি দোষ। সকল সময়েই কি অনর্গল বকে যেতে হয়?" এবং এর চেয়েও

শোচনীয় কথা, সোফার অধিকারিণীর বদলে নীরেনেরই কাণ দুটো টকটকে লাল হয়ে উঠল এবং ক্রমশঃ কাণ থেকে গালও লাল হয়ে ওঠবার উপক্রম করেছে। যাক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ঠিক এমনি সময়ে চপ-ভাজার কাজ শেষ হ'ল, সামনের দরজা দিয়ে ছায়াদি ঘরে ঢুকলেন এবং নীচে সিতাংশুর টুসীটারটার গর্জ্জন শোনা গেল।

সিতাংশু এবং নীরেনের পানে চেয়ে ছায়াদি বললেন, "টু সীটারটা কেন এনেচিস? ওটা আজ আমার গ্যারেজে বাজেয়াপ্ত থাকবে।" দুজনের দিকে চাইলেও সিতাংশুকেই উদ্দেশ্য করে কথাটা বলা হল। তাৎপর্য্য না বুঝতে পেরে সে চুপচাপ উমার সোনালী চুলগুলোর ভেতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে খেলা করতে লাগল।—"খেয়েই যে পালাবে সেই ফন্দী আঁটচ, তা হবে না। খেয়ে দেয়ে আমাদের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল নিয়ে যেতে হবে। সেদিন উর্মি ভারি বায়না ধরেছিল, তা ছাড়া সব চেয়ে আশ্চর্য্যি মিনতি এখনো এটা দেখেনি।"

সিতাংশুর মুখটা সকরুণ হয়ে উঠল। ও ভেবেছিল, খেয়ে উঠে ফ্যানের তলায় বসে বসে নতুন উপন্যাসখানায় মাজা ঘসা করে আর একটু রঙ ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করবে। এমন সময়ে এমনিতরো কঠিন আদেশ। যাক্, ভদ্রতা বলে একটা জিনিষ আছে তো, মুখের ভাব মনে বলা চলে না।

খাওয়া দাওয়ার পরে ওরা সবাই ছায়াদির গ্যারেজের প্রকাণ্ড মোটরখানায় করে বেরুলো। সিতাংশুই ড্রাইভ করছিল। যদি এত কষ্ট করে বেরুলোই তবে একেবারে চরম করে বেড়াবে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল গোড়াতেই না গিয়ে ও আগে চলল বালীর ব্রীজ দেখিয়ে নিতে, তারপর এপথ ওপথ নানাদিক ঘুরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালে যখন ওদের গাড়ী পৌছল তখন চারটে কুড়ি। রোদের আভা সতেজ থেকে ক্রমশঃ কোমল এবং সোনালী হয়ে আসচে। উমা লাফাতে লাফাতে নেমে পড়ল। মিনতি ইতিমধ্যেই তার পেঁয়াজী রঙের মাদ্রাজী ছেড়ে আরও ভালো করে ড্রেস করে নেবার সুযোগ পেয়েছিল। তাকে গ্রে-রঙের কাপড়ে এবং গলায় সোণার হারের তলায় একটি ছোট্ট লাল-এনামেল-করা ধুকধুকিতে বেশ লাগছিল, কানের লাল পাথরের দুল রোদ পড়ে আরও লাল আভায় রাঙিয়ে উঠেচে। সিঁড়ির আর শেষ নেই, চলতে চলতে ছায়া বললেন, "মিনতি আমার ভাইকে চিনিসনে, সিতাংশু রায়ের নাম জানে না এমন কেউ তোদের তরুণী-মহলে রয়েচে নাকি? যদি থাকে ত তার নাম ঠিকানা আমাকে এনে দিস।" সিতাংশু তার দিদির পরিচয় দেবার ভঙ্গীতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছিল। যেন মিনতি তাকে বড্ডই হ্যাংলা মনে করবে, মনে করবে দিদিকে মধ্যবর্ত্তী রেখে প্রোপাগাণ্ডা করছে। আজকালকার মেয়েরা না মনে করতে পারে কী! মিনতি সহজ সুরে বললে, "হাঁ

আমি ওঁর উপন্যাস পড়েচি বই কি। উনি বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন ধারা এনে দিয়েচেন। উপন্যাসের ভিতর দিয়েও যে চিন্তার খোরাক পরিবেষণ করা যায় তা তিনিই প্রমাণ করেচেন। এক কথায় ইনি ইনট্যালেকচুয়াল উপন্যাসও বেশ সরস করে লিখতে পারেন, এটা কম ক্ষমতা নয়।” সিতাংশু মুগ্ধ হয়ে শুনছিল, তারও যে মেয়েদের রসবিচারের ’পরে শ্রদ্ধা করবার মুহূর্ত্ত ঘনিয়ে আসছে। আগেকার ধারণার ভিত্তিগুলোর ওপর ভূমিকম্প শুধু নয়, একটা ভিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত হতে চলল। মিনতি সামনের হলটা দিয়ে যেতে যেতে বললে, “কিন্তু দিদি কি জানেন আমি সাহিত্যের বেশি কিছু বুঝিনে, গানই বুঝি তার চেয়ে ভালো করে।” কিছুর মধ্যেই কিছু হয়নি হঠাৎ নীরেনের নার্ভগুলো যেন একটা প্রচণ্ড শক্ খেলে। কিছুই দরকার নেই তবু পকেট থেকে রুমাল বার করে একবার মুখটা মুছে নিলে। গানের কথায় নীরেনের দিকে ফিরে চেয়ে ছায়ার যেন কি মনে পড়ল, “মিনতি, তুই নীরেনের গান ক’বারই শুনেচিস না? এই যে সেদিন সিতাংশুর বাসায় গানের বৈঠক হ’ল, কোন্ সব ওস্তাদদের গান, সুষেণ খাঁর স্বরোদ,—নীরেনও গেয়েছিল, তোকে ত নিয়ে গেছিলেম।” নীরেনের পা দুটো আর চলতেই চায় না, উত্তেজনায় তার রুমালটা হাতের তেলোয় গুটলি পাকিয়ে বলের মত হচ্ছে। হঠাৎ মরিয়া হয়ে সে জিজ্ঞাসা করে ফেললে, “এঁর নাম কি?” করে ফেলেই মনে

হ'ল তার প্রশ্নটা কোন রকম করে ঘুরিয়ে নেয়া যায় না। একশো-বার কি শুনচে না যে এঁর নাম মিনতি। সেকি কানে ছিপি এঁটে রয়েছে যে এত করে শোনা সত্ত্বেও আবার প্রশ্ন করে বসল, "এঁর নাম কি?" আর কি কিছু জিজ্ঞেস করবার ছিল না! উমা একবার কলস্বরে হেসে উঠল, "ঠিক বলেচ ছোট মামা, বলত এঁর নাম কি? তুমি নিশ্চয় বলবে মিনতি। কিন্তু মিনতিদিদির যে আর একটা খুব ভালো নাম আছে পুষ্পলতা দেবী, তা তো জানো না এখনও!" এবারে ঠিক নামটি ঠিক সময়ে যেয়ে মনে লাগল। নীরেন এতক্ষণ পরে ছু'চোখে কৃতজ্ঞতা ভ'রে মিনতির দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালো, কিন্তু মিনতি কি shallow, একটু ফিক করে হেসে ফেলেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। নীরেন শুনলে ছায়াদি বলছেন, "পুষ্প কি নাম বাপু, যত সব সেকেলে পছন্দ! মা দিয়েচে বলেই কি ও-নাম বাহাল রাখতে হবে নাকি? সই ছিল পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। ও-সব নাম আর মনে রাখিসনে, এখন এই মিনতি নামটাই চালিয়ে নে।" মায়ের কথায় মিনতির চোখ ছলছলিয়ে এল, কারণ তার মা বছর ছুই হল মারা গেছেন। এবং তিনি আর নেই বলেই তাঁর গড়া পুষ্পকে সে কিছুতেই মরতে দিতে পারে না। হালফ্যাশনের জাপানী ষ্টাইলে খোঁপা বাঁধা, হাতে রিষ্ট-ওয়াচ বাঁধা মিনতি দেবীর খাতিরেও নয়। দেখা গেল এর পর থেকে নীরেন এবং সিতাংশু ছু'জনেই পর্য্যায়ক্রমে যেন পাল্লা দিয়ে শিভ্যালরি

চর্চ্চা করতে করতে যাচ্ছে। উদাহরণতঃ, নীরেন বললে, "এবার একটু থামোনা দিদি, এতটা এক ষ্ট্রেচে যেতে ওঁর হয়ত কষ্ট হচ্ছে। এসো ওই সিঁড়ির ধাপে কিছুক্ষণ বসা যাক।" এবং তারপর তেতলার কাঁচের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের বহুদূর-আস্তীর্ণ সবুজ মাঠের 'পরে এবং কম্পাউণ্ডের ভিতরকার পুকুরটার উপরে বিকেল পাঁচটার সোনালী রোদ পড়েচে দেখে সিতাংশু বললে, "চেয়ে দেখুন বাইরেটা কী সুন্দর হয়েচে। আমাদের চেয়ে বেশী আপনারাই বুঝবেন। মেয়েদের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-বোধের কাছে আমরা আর কি! আনাতোল ফ্রাঁস বলেচেন—তাইত কি বলেচেন মনে পড়েনা কেন রে—" নীরেন যেন তার মুখের কথা লুফে নিলে, বললে, "আনাতোল ফ্রাঁস ঠিকই বলেচেন যে মেয়েদের সংস্পর্শে এসেই আমরা সভ্য হয়েচি। মানে সৌন্দর্য্যের অন্তঃপুরে ঢোকবার পাসপোর্ট পেয়েচি।" সিতাংশু একবার তীব্র দৃষ্টিতে নীরেনের দিকে তাকালো।

উমা বেশ কোথা থেকে সঙ্গের চাকর রামটহলকে দিয়ে চানাচুর ভাজা আনিয়েছে এবং তাই খাচ্ছে, আর অনর্গল যা তা বলতে বলতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। ছায়াও জিনিষটা দিব্য উপভোগ করছেন। কতরকম অস্ত্রশস্ত্র, নানা প্রতিমূর্ত্তি, তার ওপর কী গর্জ্জাস্ টাওয়ার, হাঁ যা উঁচু, মানে উঠতেই যে রকম রেটে হাঁপাতে হচ্ছে তাতে টাওয়ার বললেই বা দোষ কি? মিনতি বলছে সিতাংশুকে উদ্দেশ্য করে,

"আজকালকার এই বাজে মেকি সস্তা সাহিত্যের দিনে আপনার মত জিনিষ ক'জনে দিতে পেরেচে? কি আশ্চর্য্য, আপনি আমাদের এই ঘুমিয়ে-পড়া জাতকেও জোর করে ভাবাচ্চেন। হ্যাঁ জোর করেই ত। তাদের মনের অসাড়তা, ইচ্ছার শৈথিল্য সত্ত্বেও তাদের চিন্তা করতে বাধ্য করছেন। আপনার সঙ্গে যদি আরও আগে আলাপ হ'ত, হয়ত সাহিত্যের বিষয়ে আরও কত কীই না আমি শিখতে পারতুম।" মিনতি যেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত ফেললে। নীরেন আহত-দৃষ্টিতে ধূসর-রঙের শাড়ী-পড়া তন্বী দেহরেখার দিকে,—সঙ্গীতের তালের মত, কবিতার ছন্দের মত যে দেহ ভারি সুনির্দ্দিষ্ট একটি সুষমাময় গতিচ্ছন্দের সহিত একটি একটি করে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠছে সেই সুকুমার গতিলীলার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললে, "মিনতি দেবী, এই না তুমি বলেছিলে যে সাহিত্যের চেয়ে বেশি তুমি গান পছন্দ কর?" শুনতে পেলে, সিতাংশু পকেট থেকে তার ক্রীম রঙের আইরিশ লিনেনের রুমাল বার করে চশমা মুছতে মুছতে বলছে, "আপনার মত ছাত্রী পেলে তাকে সাহিত্যের ধারা বোঝাতে গিয়ে হয়ত আমি নিজেই নতুন করে কত কি সত্যই না আবিষ্কার করতুম!"

ছায়া এইবার শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। যাক, তাঁরা সর্ব্বোচ্চ তলায় পৌঁছেও গেছেন। সাড়ে পাঁচটা বাজে। আর আধ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সূর্য্যাস্ত হবে। প্রগাঢ় লাল আর সোনালী আভা সম্বলিত আলোয় ওপোরটা যেন ভরে গেছে।

নীরেন আর একবার একটু অভিমানাহত দৃষ্টি নিয়ে সূর্য্যাস্তাভায় স্নাত সুন্দরী নারীর দিকে তাকালে, "তুমিই না বলেছিলে—কতক্ষণই বা হবে বোধ হয় পঁচিশ মিনিট আগে—যে, সাহিত্য তুমি বোঝনা, গানই গাইতে পারো এবং গানই ভালোবাসো।" কিন্তু নীরেনের বয়েস মোটে চব্বিশ বছর; ও—জানে কি, যদি ছায়াকে জিজ্ঞাসা করা হ'ত, পঁচিশ মিনিট আগে যে মেয়ে এক রকম কথা বলে পঁচিশ মিনিট পরেই তার কথার মানে উলটে যায় কেন,—তিনি নিশ্চয়ই বলতেন যে তখন ও সিতাংশুর দিকে ভাল করে চেয়ে দেখেনি; তখনও ওর মনে সেই রাত্রির শোনা গানের গভীর ঝঙ্কার জাগছিল এবং ও যে একজনকে দীপ্ত ভাষায় প্রশস্তি জানিয়েছে, ওর স্তবগান যে একজনকে এখনও মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, (অবিশ্যি পুষ্পলতা ওরফে মিনতির এ প্রশস্তিপত্রের কথা তাদের ছায়াদি জানতেন না, যদি তাঁকে প্রশ্নের জবাব দিতে বলার সাথে এ সমস্ত কথাই জানানো যেত) সেই কথাটার স্পন্দন তখনো তার হৃৎস্পন্দনকে দ্রুততর করছে। কিন্তু এখন, তখন পাঁচটা বেজেছিল এখন সাড়ে পাঁচটা প্রায় বাজে, সূর্য্যের আলো আরও সোনালী হয়ে এসেছে; সিতাংশু যে নীরেনের চেয়ে অনেক ফর্সা এবং ওর ঠোঁটের রঙ অনেক বেশি ম্যাজেণ্টা; ওর শুভ্র গরদের পাঞ্জাবীতে, ম্যাজেণ্টা রঙের ঠোঁটে সূর্য্যাস্তের আলো পড়ে কী চমৎকার দেখতে হয়েছে। আমরা ত আগেই বলেছি, ওর এককথার পরিচয় হচ্ছে লোকটি ভারি

charming। ছায়া একটু বিশ্রাম করে বললেন, "চা খাবি? চা খাবার সময় ত হয়েচে। ওরে উমা, রামটহলকে ডেকে নিয়ে আয়, আমি ফ্লাস্কে করে চা আর চায়ের বাটি ওর জিম্মা করে দিয়েচি বাড়ী থেকে।"

মিনতি তারিফ করে বললে, "দিদি নইলে এমন গিন্নীপনা, আগের থেকে এতখানি ভাবনা, আর কার?"

উমা রামটহলকে ডাকতে গেল। ইত্যবসরে নীরেন একটা পূরবী সুর নিয়ে গুন্ গুন্ করে তান দিচ্ছিল, হঠাৎ ছায়ার দিকে ফিরে একটু যেন অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বললে, "জান দিদি, আমি কয়েকটা ভৈঁরো আর পূরবীতে এমন সুন্দর নতুন নতুন খোঁচ লাগিয়েছি!" ছায়া বললেন, "তাই নাকি? আচ্ছা একদিন সন্ধ্যেতে আমার বাড়ী গেয়ে শোনাস্। কিন্তু ওসব উঁচু দরের গানের আমরা আর কতটুকুই বুঝি।" "সত্যি, মন দিয়ে বোঝবার কেউ না থাকলে, কোনো জিনিষের সৃষ্টিতে তৃপ্তি নেই। তাই, আমার মনে হয় যে, ভালো শ্রোতা সে—যে গায়ককে তার গান যথার্থ করে শুনেই কেবল তৃপ্তি দেয় তাই নয়, তাকে সৃষ্টির প্রেরণা আর অবকাশ দিয়ে চরিতার্থ করে। এই কথা বলতে বলতে আমার মনে পড়চে শর্ম্মিষ্ঠাকে যদি আমার ছাত্রী-ভাবে না পেতুম, তাহলে আমার গানের আর আমার সুর তৈরীর এত নতুন ঢঙ বোধহয় নষ্ট হয়ে যেত। সে এমন করে বোঝে, এমন করে শেখে, আমি যা দিতে

পারি তা সর্ব্বোতোভাবে এমন করে নিতে পারে যে, তার ভিতর দিয়েই আমি অনেক নতুন সৌন্দর্য্য সুরে আনতে পেরেচি।"

মিনতি এবার রীতিমত চকিত হয়ে উঠল। ভাবল একবার জিজ্ঞেস করে, "শর্ম্মিষ্ঠা কে?" যদি না ঠিক এই সময়ে উমা রামটহলের হাত ধরে কলরব করতে করতে এসে পড়ত এবং ছায়া মিনতির 'পরে চা পরিবেশনের ভার দিয়ে তাকে কর্ম্মব্যস্ত করে তুলতেন, এককথায় যদি মিনতি বাইরের থেকে কোন বাধা না পেত বা ভেতরের সমস্ত বাধা কাটিয়ে উঠে মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলতে পারত, "শর্ম্মিষ্ঠা কে?" তবে নীরেন তার উত্তরে কি বলত? বলত কি যে শর্ম্মিষ্ঠা আমার পিসিমার একটি আট ন' বছরের ফুটফুটে মেয়ে, বাগবাজারে থাকে, তার মায়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাকে সা রে গা মা শেখাতে হচ্ছে এবং এরই ফলে রোজ আধ ঘণ্টার উপর তার horibble বেসুরো আওয়াজ দুই কাণ ভরে পান করতে হচ্ছে,—এই কথা বলত কি? একথা বলবার সাহস ছিল কি তার? যাক, ভাগ্যে মিনতি তাকে এ প্রশ্ন করে নি, করবার হাজার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও!

সিতাংশু বেশ উপভোগ করে চা পান করছিল। চায়ের স্বচ্ছ স্বর্ণবর্ণের মুকুরে যিনি চা বণ্টন করছিলেন তাঁর হাতের সরু সরু দুটি সোনার প্লেন ব্যাঙ্গেলের ছায়া পড়েছিল কি? চা খাওয়া শেষ হলে সকলে নীচে নামতে আরম্ভ করলে। বাইরের

কম্পাউণ্ডে এসে যখন পৌঁছনো গেল, তখন সূর্য্য অস্ত গেছে, সবে সন্ধ্যা সুরু হয়েছে। মোটর ষ্টার্ট দিল। মেমোরিয়্যালের উপর ধূসর ছায়া পড়েছে। গ্যাসের বাতিগুলো দু'একটা করে জ্বলতে সুরু হয়েছে। সবুজ ঘাসের ভিতর ছোট-গোছের পুকুরটার জলের 'পরেও গ্রে রঙের বিষণ্ণ ছায়া পড়েছে। মিনতির গ্রে রঙের শাড়ী জড়ানো মূর্ত্তিটিও যেন এই আসন্ন, অবসন্ন (কেন অবসন্ন—তা সীতাংশু বলতে পারে না, তার এই রকমই মনে হচ্ছিল যেন একটা প্রত্যাসন্ন বিদায়ের আভাসে সবই অবসাদগ্রস্ত লাগছে) সন্ধ্যায় ভারি করুণ বলে লাগছে সিতাংশুর কাছে। যাক, আর সে ভাববার সময় পেলে না। মোটরের ষ্টার্ট দিলে একবার গর্জ্জন করে উঠে মোটর চলতে লাগল।

বাড়ী ফিরে এসে খাবার টেবিলে বসে নীরেন বললে, “আজ সারাদিনটাই দিদির বাড়ী কাটল।” ছায়া বললে, “সন্ধ্যেটাও এইখানেই কাটবে। নীরেন খেয়ে উঠে একটা গান করিস, আজ মনটা আমার বড় ভালো নেই।” “কেন, মনের তোমার হ'ল কি? এত বেড়িয়ে নিয়ে আসা হ'ল।” “আমি কি নিজের জন্যে বেড়াতে গিয়েছিলুম না কি? মিনতি মেয়েটা আজ চলে যাবে, ঠিক নিজের মেয়ের মত মায়া পড়ে গিয়েছিল কি না, ওর জন্যেই একটু ঘুরে এলুম। আর কি ওর সহজে কলকাতা আসা হবে?” একটা ঘন নিঃশ্বাস পড়ল। বেশ বোঝা গেল ছায়াদির মন বিশেষ উতলা হয়ে গেছে। মিনতি কাপড় ছাড়তে অন্য ঘরে চলে গেছে।

নীরেন এবং সিতাংশু মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। কৌতূহলটা অদম্য। অথচ প্রশ্ন করে তা নিরসন করা সঙ্গত হবে কিনা তাও ঠিক করে উঠতে পারছে না। যাক, মিনতি যখন বেশ পরিবর্ত্তন করতে গেছে, আপাততঃ এ ঘরে উপস্থিত নেই, তখন সিতাংশু একটু জোর করেই বলে ফেললে, "কেন, উনি হঠাৎ কোথা চলে যাচ্ছেন?" "এই ত সবে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছিল। বেথুনে পড়ছিল। ওর বাবা সেণ্ট্রাল প্রভিন্স নাগপুরে ওকালতি করেন। মিনতির মা ছোটবেলা থেকে আমার বন্ধু, বলতে গেলে তার চেয়েও বেশি। ছোট থেকেই আমরা দুজনে সই। মেয়েকে যখন থেকে কলকাতায় পড়তে পাঠালে, আমার হাতেই যেন দিয়েছিল, প্রত্যেক চিঠিতে লিখত,—এতদূরে পাঠালুম, কলকাতায় তুমিই ওর মা। আমার বাসায় কিছুতেই রাখলে না। বোর্ডিঙেই থাকত বটে, তবে ফি শনিরোব্বারে নিয়ে আসতুম। উমাটাই কি ওর কম বশ হয়েচে। যাক, সে মাও আর নেই। সেই জন্যেই ত আরও বেশি করে মায়া পড়ে গেছে। তা ওর যে বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। সেও এক মজার ব্যাপার বলি শোন। এই ক্রিস্‌মাসের ছুটিতে ওর বাপ ভাই বোনরা সকলে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল। বেড়াতেও এসেছিল বটে, আর মিনতির বাপের খুব বড় এক মক্কেল অরবিন্দ দত্ত, সে-ই তার কলকাতার প্রকাণ্ড বাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল, এককথায় তারই কাজে সে-ই ওদেরকে নিয়ে এসেছিল। মিনতি দেখতে ত

বরাবরই চমৎকার সুন্দরী। একদিন অরবিন্দের মোটরে ওদের সবাইকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল এসেছিল। মিনতিও এসেছিল। ওকে দেখে ভয়ানক পছন্দ হয়েচে তার। পছন্দরও বেশি—মুগ্ধ হয়েচে। ওই ত তোড়জোড় করে বিয়ে করতে চায় তাড়াতাড়ি। তা না হলে মিনতির ইচ্ছে ছিল, এক বৎসরের জন্যে আই-এ'টা দিয়েই তবে বিয়ে হয়। এই ফাল্গুনেই বিয়ে হবে। আর দিন নেই। তাই ওর বাবা ওকে নিতে এসেছে। কাল সকালের ট্রেনেই চলে যাবে। যাক, আই-এ নাই বা দিলে, অরবিন্দর মত বড় লোক ক-টা আছে? কলকাতায় ওর কখানা বাড়ী গুনে শেষ করা যায় না।"

সিতাংশু নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলে, আবার সেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল। জিজ্ঞেস করলে, "তবে যে তুমি বললে, উনি এখনো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল দেখেন নি? খামোকা আমার সারাদিনটা আজ মাটি করলে।" "দেখেই নি ত। সেবারে কি হ'ল, সিঁড়িতে উঠতে উঠতে ওর সব চেয়ে ছোট ভাই কেমন করে পড়ে গেল। মাথায় চোট লাগে। মিনতি ভয়ে কেঁদেই ফেলে আর কি। আর দেখবে কি, হৈ চৈ করে তখনই মোটরে চলে আসতে হ'ল।"

নীরেন চোখ বুজে কল্পনা করতে লাগল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের সিঁড়ির তলায় ছোট একটি ছেলে আহত হয়ে পড়ে আছে, সেদিনও শীতের সূর্য্যের নরম সোনালী আলোয় ভীতা ত্রস্তা মিনতি আহত ভাইটির শুশ্রূষা করছে, আর দূরে দাঁড়িয়ে

অরবিন্দ দত্ত মুগ্ধ হয়ে দেখছে। পুডিংটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে নীরেন বললে, "কলকাতায় যখন অরবিন্দ দত্তর অগুণতি বাড়ী, তখন এ অঞ্চলে ওঁরা নিশ্চয় প্রায়ই আসবেন।" ছায়া বললেন, "অরবিন্দ মস্ত কারবারী মানুষ। কলকাতায় শুধু একটা শাখামাত্র আছে। বেশির ভাগ থাকে বম্বেতে। সেখানেই থাকবে। তবে আসবে না কি আর? ক্রিস্‌মাসে ভালো ফিল্ম্‌ দেখতে, কার্নিভ্যাল দেখতে, গয়না কি বেনারসী কিনতে, কিংবা মোটর কিনতে, আসতেও পারে কখনো কদাচিৎ।"

নীরেন আপেলের টুকরোগুলো আঙ্গুল দিয়ে নাড়তে লাগলো। তার মনের ভাবখানা তর্জ্জমা করে ফেললে এমনি দাঁড়ায়, "যদি অরবিন্দ দত্তর এত বাড়ী, এত অগুণতি মোটার, তবে—তবে কি? না হয় স্বীকার করেই ফেলো। তবে সেদিন অত ভনিতা করে প্রশস্তি জ্ঞাপন করতে গিয়েছিলে কেন?" এর উত্তরে নীরেনের মার্জ্জিত এবং উন্নততর মনের অংশটা বললে, "তাতে কি প্রমাণ হয় শুনি? তোমার গানকে অভিনন্দন করেছিলেন বলেই যে অসম্ভব একটা কিছু করতে হবে এমনতরো পাগলামি কেন?" Rationalised নীরেন এই কথা বললে বটে, কিন্তু সব জড়িয়ে যে নীরেন, সে ভাবতে লাগল, সেই দীপ্তভাষা, সেই সুগন্ধ গ্রে রঙের কাগজ, নীলাভ পুরু খাম, আর তারই ব্যাকগ্রাউণ্ডে অরবিন্দ দত্ত, যার বাড়ীর সংখ্যা নেই, মোটারের লেখাজোখা নেই, যার স্ত্রী কেবল বেনারসী কিনতে কাশী যায়, আর গয়না কিনতে এবং কার্নিভ্যাল

দেখতে কলকাতা আসে,—কি রকম অসঙ্গত, আকাশকুসুম গোছের ঠেকছে সমস্ত ঘটনাটা।

আর সিতাংশু কাঁচা সন্দেশের বরফি একটু ভেঙ্গে মুখে দিতে দিতে স্মরণ করছিল, কি যেন সে বলেছিল মিনতি দেবীকে, হ্যাঁ, বলেছিল কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে যে, আপনাকে আর্ট এবং সাহিত্যের ছাত্রীরূপে পেলে আপনাকে উপলক্ষ্য করে আমি নিজেকে নিজেই কত ভাবে হয় ত রচিত করে তুলতুম, কারণ, প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ করে দেওয়ার সুযোগই ইত্যাদি। যাক্‌গে ওসব বড় বড় কথা, কিন্তু কীই বা এমন বলেছিল যাতে নীরেনের চট করে কোন এক বেচারী শর্ম্মিষ্ঠাকে আনতে হ'ল? একদিন ত সে নীরেনের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বাগবাজারে শর্ম্মিষ্ঠাদের বাড়ী অবধি গিয়েছিল, নীরেন ঢুকে পড়ল, আর সে পাশের একটা পানের দোকান থেকে এক বাক্স সিগ্‌রেট কিনতে কিনতে কি সঙ্গীতধ্বনি শুনতে পেলে—তিনিই কি শর্ম্মিষ্ঠা দেবী? যাক্‌গে, নীরেনের এবং তারও আজ হয়েছে কি?

বাইরে মিনতির পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। হাত মুখ ধুয়ে একটি শাদাসিধে লালপাড় শাড়ী পরে এসেছে। এতেই ওকে কি চমৎকার দেখাচ্ছে! এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললে, "দিদি, বাবার ত আসার সময় হয়ে এল, আর মিনিট দশ দেরী আছে। তিনি বোধ করি এসেই চলে যাবেন, একটুও অপেক্ষা

করার ধৈর্য্য হবে না তাঁর। সঙ্গে থাকবে একরাশ কাপড় আর নানারকম জিনিষের প্যাকেট। সারাদিন বাজারে ঘুরচেন। আজ বোধ হয় আর গান শোনার সময় হবে না—” শেষের দিকে তার গলার আওয়াজ ক্ষীণ এবং করুণ হয়ে উঠল। যা বললে তার সাথে যেন আরও একটা লাইন উহ্য হয়ে জড়িয়ে রইল, গান-শোনার সময় হবে না আর সাহিত্য-আলোচনারও হবে না।

সিতাংশু নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বললে, আর কোন আলোচনারই দরকার নেই। এবং নীরেন ইলেকট্রিকের বাতির দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলে, তুমি মিনতি দেবী, তোমার জন্যে আটাশে ফাল্গুন, অরবিন্দ দত্ত, এতগুলো জিনিষ নির্দ্দিষ্ট হয়ে রয়েছে, আর তুমি পনরই ফাল্গুন কোন এক উষ্ণ বসন্ত-সন্ধ্যায় একটি গায়ককে তার সুরসৃষ্টির জন্যে একখানি নম্র স্তুতি পাঠিয়ে ফেললে! নারীকিরণ-বর্ষণের লোভটা কিছুতেই কাটাতে পারলে না? অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের বড় বড় স্যালঁ-সভার কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল তোমার মুখের সস্তা উচ্ছ্বাস তোমার দেহের দুর্লভ রূপের সাথে মিশে গুণী পুরুষের সৃষ্টির উপাদানে স্ফুলিঙ্গ জ্বালাবে।

বাইরে একটা ভারি মোটরের আওয়াজ পাওয়া গেল। স্লিপারে পা ঢুকিয়ে মিনতি উঠে দাঁড়ালো, বললে, “আসি, কাল নিশ্চয় ষ্টেশনে যাবেন দিদি।” উমাকেও

একটু আদর করলে এবং ওদের দুজনকে আলগোছে দুটি নমস্কার করে বেরিয়ে গেল। ছায়া একটা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন। এবং তাঁর ভারি মনকে কথঞ্চিৎ হাল্কা করতে নীরেনকে বসবার ঘরে উঠে গিয়ে একখানা গানও গাইতে হ'ল।

গানটা তার অজান্তেই তার মনের অনুভব দিয়ে ঘেরা হয়ে অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠল। একটা লাইন সে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইলে,

"আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো,
তুমি ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই কিছু নাই গো!"

এ গান কি সে এমন করে গাইতে চেয়েছিল? না, তা চায়নি। তবু তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও এমনই হয়ে পড়ল। যাক, মনের যা কিছু ভাবের বাষ্পকে গানের ভেতর দিয়ে আকার দিয়ে ফেলে নীরেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

গান শেষ হয়ে গেলে হার্ম্মোনিয়মের একটা পর্দ্দায় আঙ্গুল দিয়ে টিপতে টিপতে নীরেন জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা দিদি, এঁদের সঙ্গে তোমার বুঝি খুব বেশি আলাপ, আমার গান কবার শুনিয়েছিলে বলছিলে, আমাদের কথাও নিশ্চয় খুব করে গল্প করেছিলে?" "তা আর করিনি? সেদিন বিকেলের দিকে তোর বাড়ীতে আমরা গিয়েছিলুম, তোর মা'র সঙ্গে মিনতি দেখা করে এল। তুই তখন বাড়ী ছিলিনে। তোর পড়ার ঘরে গিয়ে ওতে আর

উমাতে কত বই ঘাঁটলে, একটু পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখলে, যা নোংরা থাকিস।" নীরেনের চট্ করে মনে পড়ে গেল, তার পড়ার টেবিলের উপরে তার নামঠিকানাসংযুক্ত চিঠির কাগজের প্যাডগুলো ছত্রিছন্ন হয়ে ছড়ানো থাকে, সকল সময়েই।

সিতাংশু এবার তার ট্যাক্সীটারটা ফেরত চাইলে। যেতে যেতে হঠাৎ সিতাংশু বললে, "সারাদিনটা কি করেই যে কাটল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল! যা নয় তাই। ওই কদর্য্য তাজমহলের নকলটা দেখতে আবার কেউ সময় নষ্ট করে! এই জন্যেই বলে মেয়েমানুষ—সে চিরকালই মেয়েমানুষ। যাক, গেল আজকের সন্ধ্যে এবং আজকের দিনটা গেল।"

নীরেনের বাংলাতে শানালো না, সে ইংরেজীতে বললে, "That accursed Victoria Memorial—" অর্দ্ধেকটা বলেই থামতে হ'ল। কারণ, এ্যলগিন রোডে নীরেনের বাড়ীর সুমুখে এসে ট্যাক্সীটারটা দাঁড়িয়েছে। ষ্টার্ট থামানো হয়নি বলে সগর্জ্জনে দাঁড়িয়েছে।

প্রসঙ্গ

শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার

শিশু-সাহিত্যের বাণান

তথাকথিত শিশু-সাহিত্যের বা কিশোর-সাহিত্যের বাণান-বিভ্রাট লইয়া ছেলে-বুড় সকলেই মহাবিড়ম্বিত ? এই বিড়ম্বনা বহুকাল হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। আমাকে আমার বাড়ীর অনেকগুলি ছোট-ছোট ছেলেমেয়েকে এবং পাড়ার দুই-পাঁচটি ছেলে মেয়েকে অক্ষর-পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের তিনচারখানি বই পর্য্যন্ত পড়াইতে হইয়াছে। প্রথম কথা, বাঙ্গালায় উচ্চারণ-বিভ্রাট ঘটায় বাণান লিখিতে সকল ছেলেমেয়েই যে বিশেষ কষ্ট পায় এবং শতকরা একজনও যে পরিণত বয়সেও বিশুদ্ধ বাণান লিখিতে পারে না, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। দ্বিতীয় কথা, সাধারণতঃ ছেলে মেয়েদের পাঠ্যপুস্তকগুলি অর্থাৎ যেসব বই তাহারা স্কুলে বা পাঠশালায় পড়ে সেগুলি সাধুভাষায় এবং কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত চল্‌তি শব্দ বর্জ্জিত হইয়াই লিখিত হয়; কিন্তু যে সকল বই তাহারা বাড়ীতে সখ করিয়া,—যাহাকে সচরাচর বলা হয় নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য,—পড়ে, সেগুলির

মধ্যে শতকরা নিরানব্বইখানি চল্‌তি ভাষায় লিখিত। স্কুলে পাঠ্যরূপে পড়া ছাড়া যে সকল পুস্তক ও পত্রিকা ছেলে মেয়েরা বাড়ীতে পড়ে, তাহাদের প্রায় সবগুলিই চল্‌তি ভাষায় লিখিত। এই পুস্তকাদিকেই আমি শিশু-সাহিত্য বা কিশোর-সাহিত্য বলিতেছি।

* * *

এই সব শিশু-সাহিত্যের লিখন-পদ্ধতি, শব্দ-বিন্যাস, বাণান প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শিশু-সাহিত্যের অগ্রদূত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার ভিন্ন আর সকল লেখকই আজ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া চল্‌তি ভাষায় এই সাহিত্যের পুষ্টি–সাধন করিয়া আসিতেছেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা হসন্ত-চিহ্ন এবং শব্দের মাথার উপর 'কমা'র ঠেলায় অস্থির হইয়া পড়ে। লক্ষ্য করিয়াছি, আট-দশ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েরা, যাহারা চার-পাঁচখানি সাহিত্য-পুস্তক পড়িয়াছে, তাহারাও এই তথাকথিত শিশু-সাহিত্য অনায়াসে রিডিং পড়িতে পারে না, অতিশয় কষ্ট অনুভব করে। এই দোটানায় পড়িয়া তাহারা দুকূল হারাইতেছে।

* * *

বোলপুরের শান্তিনিকেতনের আদর্শে কলিকাতায় আট-দশটি বিদ্যালয় হইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে এক এক শ্রেণীতে অল্প সংখ্যক ছাত্র লইয়া অধ্যাপনা হয়। কলিকাতার

এমনি একটি বিদ্যালয়ে আমার সাত বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র পড়ে। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' তাহার একখানি পাঠ্যপুস্তক। আমি যতদূর জানি, 'শিশু' বোধ হয় কখনও পাঠ্যপুস্তকরূপে সরকারী টেক্সট্-বুক-কমিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয় নাই। কিন্তু এই সকল ছোট ছোট বিদ্যালয় ডিরেক্টর অথবা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুমোদিত নয় বলিয়া, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত করেন।

* * *

ছেলেটি 'শিশু' হইতে 'বিচিত্র সাধ' নামক কবিতাটি পড়িতেছিল। ইহার প্রথম চার পঙ্‌ক্তি এই ঃ

> আমি যখন পাঠশালাতে যাই
> আমাদের এই বাড়ীর গলি দিয়ে,
> দশটা বেলায় রোজ দেখ্‌তে পাই
> ফেরি-ওলা যাচ্ছে ফেরি নিয়ে।

এই চার লাইন যতবার সে মুখস্থ বলিল, তত বারই সে 'পাঠশালাতে যাই' না বলিয়া বলিল—'পাঠশালায় যাই।' প্রত্যেক বারেই তাহার ভুল তাহাকে ধরাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু মনে খট্‌কা লাগিল,—'পাঠশালায়' না, 'পাঠশালাতে'—কোন্‌টা ঠিক? দুইটাই ঠিক হইতে পারে বটে, কিন্তু কোন্‌টা আমরা বেশীর ভাগ ব্যবহার করি? সে খট্‌কা এখনও মেটে নাই।

তারপর ছেলেটি নিজেই দেখাইয়া দিল যে, ঐ পদ্যের মধ্যেই 'বাড়ী' ও 'বাড়ি'—দুই রকম বানানই ছাপা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল কোন্ বানানটি ঠিক। উত্তরে বলিলাম, 'দুই ঠিক, তবে এক রকম বাণান লেখাই ভাল।' তারপর এই কবিতার অনেকগুলি শব্দের বানান লইয়া পিতাপুত্রে অনেক আলোচনা হইল,—আমার বক্তব্য কতক সে বুঝিল, কতক গুলাইয়া ফেলিল। দুই একটা উদাহরণ দিই।

* * *

(১) 'বেশী' ও 'বেশি'—দুই রকম বানানই লেখা হইয়াছে।

(২) 'ফেরি-ওলা' ও 'পাহার-ওলা' লেখা হইয়াছে। কিন্তু ছেলেরা বেশীর ভাগ ফেরিওয়ালা আর পাহারওয়ালার সঙ্গেই পরিচিত।

(৩) 'আমি যখন হাতে মেখে কালী'—'কালী' ঈকার দিয়া লেখা হইয়াছে। কালী ঠাকুরের দেখাদেখি লিখিবার 'কালি'তেও কি ঈকার হইবে? আচ্ছা, আমাদের 'কার্ত্তিক'ও ঠাকুর এবং 'কালী'ও ঠাকুর কেন?

(৪) 'ধূলো', 'ধূলি', 'ধূলা'—পুস্তকের মধ্যে তিন রকম বাণানই লক্ষ্য করিলাম। ছেলেমেয়েদের কি তিন রকম বাণানই শিখাইব?

(৫) 'সাফ জামা'—কলিকাতা, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা সাফ জামা বা সাফ কাপড় বলে না—বলে 'ফর্‌সা জামা', 'ফর্‌সা কাপড়'।

(৬) 'ইচ্ছে'—লেখা হইয়াছে।

(৭) 'হইতাম'-এর পরিবর্ত্তে না হয় চল্‌তি ক্রিয়াটি ছেলে শিখিল, তবে সে নিজে লিখিলে কাণমলা খাইবে। কিন্তু সে চল্‌তি রূপটি কি? 'হতেম' না—'হতুম',—না দুই-ই। ছেলেরা মহাগোলযোগে পড়িল না কি?

(৮) 'জান্‌লা'—লেখা হইয়াছে; কিন্তু ছেলেদের 'জানালা' বানানের সঙ্গেই বেশী পরিচয়।

(৯) আর সর্ব্বোপরি শব্দের মাথার উপর 'কমা' লইয়া ত মারামারি ব্যাপার, অথচ এই উপরে কমার সঙ্গে ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক-সূত্রে ঘনিষ্ঠতা খুবই কম। এই উপরে কমার তিন রকম প্রয়োগ আছে,—প্রথম, লুপ্তবর্ণ জ্ঞাপক, যেমন—তা'র, দু'হাত ইত্যাদি; দ্বিতীয়, অসমাপিকা ক্রিয়া জ্ঞাপক, যেমন—ক'রে, তুষি', নাবি' ইত্যাদি এবং তৃতীয় কোন বিশেষ বর্ণকে ওকারান্ত উচ্চারণ করিবার উদ্দেশ্যে, যেমন—হ'তে, চ'লে, প'রে ইত্যাদি। আর বিড়ম্বনার বহর বাড়াইব না। এই বইয়ের মধ্যেই—মুখচাঁদে, ভালোমন্দ, নূতন ও নতুন, দুষী, তৃণগাছা, খেলেনা (খেল্‌না অর্থে), মুখটিকে, বুড়ো, বুড় ও

বুড়া, রসারসি, আঙিয়া, বিলসি', ভালোবাসা, চোরাধন, আশীষ, চুরায়ে, লোভায়, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

* * * *

শিশু-সাহিত্যের যে কোনও পুস্তক অবলম্বনে এই বাণান বিভ্রাটের ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণ উদ্ধার করা যায়। আমার উদ্দেশ্য শুধু এই দিকে সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ছেলেমেয়েরা স্কুলে শিখিতেছে এক রকম বাণান, আর বাড়ীতে শিখিতেছে অন্য রকম বাণান—এটা কি ভাল ব্যবস্থা? রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাঙ্গালার বাণান ঠিক করিয়া দিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তাই এই বড় কথাটা সশ্রদ্ধভাবে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম।

—আগামী সংখ্যায়—
শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
'নির্ব্বচয়' মাভ্‌ বোলো ?

চিত্র ও চরিত্র

দীনবন্ধু মিত্র

বয়সে আট নয় বৎসরের বড় হইলেও দীনবন্ধু ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু। 'প্রভাকরে' যখন (সুধীরঞ্জন) দ্বারকানাথের সহিত দীনবন্ধুর 'কলেজীয় কবিতা যুদ্ধ' চলিতেছিল, হুগলি কলেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্রও তখন সে কাব্যসংগ্রামে যোগ দিয়াছিলেন। এইরূপে কৈশোর-যৌবনে যে বন্ধুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, সারাজীবন তাহা অটুট ছিল।

দীনবন্ধু মিত্র ১৮২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বর গুপ্তের উৎসাহে দীনবন্ধুর তরুণ হৃদয়ে যে সাহিত্য-প্রীতি সঞ্চারিত হয়, তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কলেজ ছাড়িয়া তিনি বড় চাকরি পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই চাকরি ও অর্থের মোহ তাঁহাকে সাহিত্যের সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। পোষ্ট-আপিসের চাকরি-সূত্রে তাঁহাকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে হয়। সেই অভিজ্ঞতা তিনি প্রচুরভাবে নাটকের মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছেন।

বাংলার নীল-হাঙ্গামা এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। প্রজাবর্গের সংহতি যে কার্য্য সাধন করিয়াছিল, তাহা অভূতপূর্ব্ব। দীনবন্ধু 'নীলদর্পণে'র নাট্যকার। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিতেছেন, "নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব না।...... ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহা উদ্দীপনার ফল স্বরূপ নীলকরের অত্যাচার জন্মের মত বঙ্গদেশ হইতে বিদায় হইল।" বিদায় হইল বটে, কিন্তু নিঃশব্দে নহে। বহু ইয়োরোপীয় ভাষায় নীলদর্পণ অনূদিত হয়। ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নীলকর-দল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন;

সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাঁহার জীবন নির্ব্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ”

‘নীলদর্পণ’ ট্রাজেডি। কিন্তু দীনবন্ধু মূলতঃ হাস্যরসের লেখক। তিনি মুখের কথায় লোককে যেমন হাসাইতে পারিতেন, তাঁহার লেখায়ও তেমনি হাসি ফুটিয়া উঠিত। পরিহাসে দীনবন্ধুর প্রতিষ্ঠা অপূর্ব্ব। সেদিনের শিক্ষিত মদ্যপায়ী ইংরেজীনবীশের আদর্শ অশ্রুজড়িত হাসির ভিতর দিয়া ‘নিমে দত্তে’র চরিত্রে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ‘সধবার একাদশী’ অমর হইয়া থাকিবে তাঁহার ‘লীলাবতী’, ‘নবীন তপস্বিনী’ প্রভৃতি নাটকের হাসির অংশগুলি আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। ‘যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ’, ‘পোড়া মহেশ্বর’, ‘কুড়ে গরুর ভিন্ন মাঠ’ প্রভৃতি লেখায় তাঁহার গল্পরচনাকৌশলের পরিচয় পাই।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে, চুয়াল্লিশ বৎসর মাত্র বয়সে দীনবন্ধু পরলোক গমন করেন।

এই নির্ভীক, পরদুঃখকাতর, সদালাপী, সহৃদয়, প্রতিভাবান নাট্যকারের মত সুরসিক ব্যক্তি সেদিনের বাংলায় আর কেহ ছিল না।

কেশবচন্দ্র সেন

গতবার ছাপার ভুলে তারিখের আট ও চার উল্টাইয়া গিয়াছিল। কেশবচন্দ্র ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। অনুগ্রহ করিয়া ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

একখানি সাদা কাগজ উড়িয়া আসিল—একেবারে দু'পিঠ সাদা। দেখিতে দেখিতে তাহার মধ্য হইতে সাদা অক্ষরের 'কোরাস' সাদা সুরে সমস্বরে গাহিয়া উঠিল।—

কালি দিয়ে কাটলে আঁচড় কাগজ থাকে সাদা,
কোন্‌খানে তা বলতে পারো, কোন্ দেশে বা দাদা,
—সকল রঙে মিলে গিয়ে রইল শ্বেত-রঙ্গ ?
বলতে যদি পারো তবে যাব তোমার সঙ্গ।

তোমার সঙ্গে যাব দাদা, সাত সাগরের পার,
সাতটি বর্ণ মিলে যেথায় হ'ল একাকার,
রইল সে এক অদ্বিতীয়, জুড়ি যাহার নাই,
সাদা মানুষ, সাদা ফানুস, সাদা কাগজ ভাই।

মুছে ফেলো কালির কালো, কোরো নাকো গোল,
টানে যদি টানুক্ না সে নিজের কোলে ঝোল,
অন্ততঃ ত ঝালের গন্ধ নাকে খানিক যাবে,
না-খাওয়ার আনন্দ বন্ধু, তাতেই তুমি পাবে।

দোয়ার্কিতে পড়েছিল যে-টুকু বে-দাগ,
বে-মালুম তার মিলিয়ে গেল কলঙ্কেরই রাগ,
চমৎকার চুনকামে হল ধবধবে সে সাদা,
সে-বাড়ি সাদার বাড়ি, তোমার ত নয় দাদা।

সাদা বক আর সাদা বকম্, সাদা গরুর দুধ,
নই কি বলদ, নাই কি আছে, বলবে তা বিবুধ।
সাদা তুলো, সাদা মূলো, সাদা 'কাশের ফুল,
সবার সেরা সাদা হাতি, সাদা চোখের ভুল।

মুন-শাইন কি চাঁদের ধাঁধা, সাদা কি তার কর,
হট্টমালার দেশে করে প্রশ্ন পরস্পর,
সে সমস্যা শুনে হাসেন শুভ্র হাসি চন্দ্র,
আকাশে বিরাজেন তিনি, মেটে নাকো দ্বন্দ্ব।

দিন-পঞ্জী

লণ্ডন, ৮ই এপ্রিল—শ্রীযুক্ত বিঠল ভাই প্যাটেল এখানে আসিবার পর হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। একজন বিশেষজ্ঞকে ডাকা হইয়াছিল, তিনি এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, মার্কিণ-ভ্রমণ ও অন্যান্য খাটুনির জন্য তাঁহার স্নায়বিক অবসাদ দেখা দিয়াছে।

গত রবিবার ৯ই এপ্রিল অপরাহ্নে—সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের বার্ষিক স্মৃতিপূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

দিল্লী, ৭ই এপ্রিল—দিল্লীর ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের ১৯৩২ সালের কার্য্য-বিবরণীতে কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি ঘটনা

হইতেছে, সাত বৎসরের এক অবিবাহিতা বালিকার মাতৃত্ব। মিউনিসিপ্যালিটির কাগজপত্র হইতে তাহার বয়স জানা গিয়াছে। অস্ত্রোপচার দ্বারা সন্তান প্রসব করানো হয়। প্রসূতি ও শিশু উভয়েই জীবিত আছে। শিশুটির বয়স এখন ছয় মাস।

নয়া দিল্লী, ১২ই এপ্রিল—অদ্য ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে এন্টি-ডাম্পিং বিল বিনা ডিভিসনে পাশ হইয়া যায়।

শান্তি নিকেতন, ১৩ই এপ্রিল—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বিবৃতিতে জানাইতেছেন,—পাশ্চাত্য দেশে ভারত-বিরোধী প্রচার কার্যের প্রতিকার করিবার জন্য মিঃ ভি-জে-প্যাটেল যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত। মহাত্মা গান্ধীর নাম লইয়া খেলা করা হইতেছে, তাঁহাকে মসীলিপ্ত করা হইতেছে, এবং এরূপ প্রমাণের চেষ্টাও হইতেছে যে আমার সহিত মহাত্মার মতের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আমাদের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে, এরূপ কল্পনা করিয়া ভারতবিরোধীরা উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছে।

আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে
আর ইনজেকসান লইতে হইবে না
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীরই
—রক্ষা করা উচিত—
একমাত্র শ্রেষ্ঠ জর্দ্দা ব্যবসায়ী
ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টোর্স—গোল মার্কেট, নিউ দিল্লী
নমুনা পরীক্ষা করিলেই
বাদসাহী সূর্ত্তি জর্দ্দা বা কিমামের
শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন
আট আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে সকল রকমের নমুনা পাঠানো হয়
প্রতি সের ৫৲ হইতে ৩২৲ পর্য্যন্ত—ভি-পি খরচ স্বতন্ত্র

আধুনিক ফ্যাসানের মিল ও তাঁতের
ধুতি শাড়ী
বিচিত্র ডিজাইনের
ছাপা সিল্ক ও গরদের কাপড়
সুলভে পাইবেন
কোথায় ?
গোষ্ঠবিহারী ভড়
সুবিখ্যাত বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা
৩৫৬ নং চিৎপুর রোড, কলিকাতা

(বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন

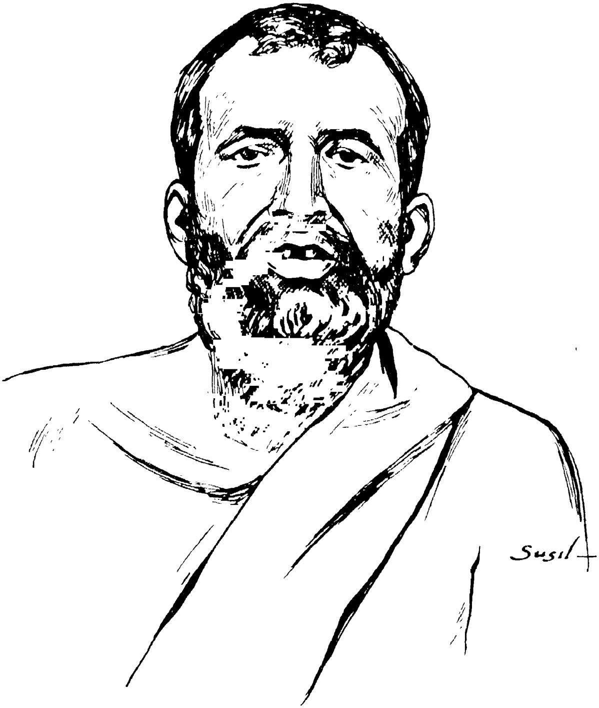

রামকৃষ্ণ পরমহংস

ছোট গল্প

১ম বর্ষ] ৯ই বৈশাখ ১৩৪০ [৪১শ সংখ্যা

'নিশ্চয়' মাত্ বোলো !

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জাপানের রাজধানী তোকিও শহরের কথা।

বসন্ত আসি আসি করিতেছে, চেরির কুঁড়ি দেখা দিয়াছে, এমন সময় একদিন খুব একচোট বরফ পড়িল। বাড়ির ছাত, গাছপালা, পথ ও প্রান্তর বিলকুল শাদা, সব একাকার। 'ইণ্ডিয়া হাউস'এর ছেলেরা দুই বাড়ীর মাঝের ছোট মাঠটিতে নামিয়া পড়িয়া হুটোপাটি দাপাদাপি সুরু করিয়া দিল। বরফের ডেলা পাকাইয়া পরস্পরের গায়ে ছুড়িয়া মারে, রাশিপ্রমাণ বরফ জমা করিয়া কেহ বরফের পাহাড় তৈরি করে, কেহ বা ফুর্ত্তির চোটে বরফের উপর

দৌড়ঝাঁপ করে গড়াগড়ি দেয়। পুরাণো অব্যবহার্য্য কিম্ভূতকিমাকার পোষাকে, গলাবন্ধে, সাত-তালি নোংরা জুতায় আর তোবড়ানো ময়লা টুপিতে সার্কাসের সঙের মত সকলের মূর্ত্তি।

হল্লা যাহারা করিতেছে তাহারা সকলেই যুবক, কেবল একজন ছাড়া। তিনি মৌলবী সাহেব। বয়স পঞ্চাশের ওদিকে, অথচ মনটি বেশ সরস ও কাঁচা। সকলেরই তিনি অন্তরঙ্গ বয়স্তের মত। অল্পবয়সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, দীর্ঘকাল দেশ বিদেশ নানা স্থান ঘুরিয়া সম্প্রতি জাপানে আসিয়াছেন। তিনি অবিবাহিত। বলেন ছুটাছুটি করিয়াই জীবনটা কাটিয়াছে, বিবাহ করিবার সময় বা সুযোগ পান নাই। এই শিক্ষিত সদালাপী সুরসিক মানুষটির দিব্য লম্বা-চওড়া গোলগাল নধর চেহারা। সকলে তাঁহাকে 'ওজিসান্' বা ঠাকুর্দ্দা বলিয়া ডাকে। তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে নামটি বেশ খাপ খাইয়াছে। এ বাড়ীর সকলেই ছাত্র, তিনিই কেবল শিক্ষক। কিন্তু তাঁর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা হইলে বোঝা যায় তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতের লোক, নিতান্তই উদারান্নসংস্থানের জন্য ইস্কুলমাষ্টারি করিয়া থাকেন।

খেলা যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, তখন রমেশ একমুঠা গুঁড়ো বরফ লইয়া চুপি চুপি গজেনের পিছন দিকে গিয়া

ঘাড়ের উপর দিয়া তার পিঠ ও জামার ফাঁকের মধ্যে ঢালিয়া দিল। পিঠে ছ্যাঁক্ করিয়া ঠাণ্ডা লাগিতেই গজেন চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখে রমেশ হাসিতেছে। দেখিয়া তার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। রুখিয়া উঠিয়া বলিল, কি ছোটলোকের মতন ইয়ারকি করেন?

রমেশ বলিল, খবরদার, গাল দেবেন না।

গজেন বলিল, গাল দেবেন না! কেন অমন করলেন? ঠাণ্ডা লেগে যদি মারা পড়ি আপনি দায়ী হবেন?

রমেশ বলিল, ওঃ ননীর পুতুল! একেবারে গলে গেলেন! ঘরে থাকলেই পারতেন। খেলতে আসেন কেন?

গজেন বলিল, আমার খুশী।

রমেশ বলিল, তবে আমারও খুশী।

গজেন বলিল, আপনার যারা ইয়ার-বক্শি তাদের সঙ্গে এ সব চাষাড়ে রসিকতা করবেন! আমি 'হাউস্ অফ্ লর্ড্স্'এর তোয়াক্কা করি না, ধরে চাবকে দেব।

কি!—বলিয়া মুহূর্তে আস্তিন গুটাইয়া রমেশ তার বেঁটে খাটো বলিষ্ঠ বাহু অনাবৃত করিয়া ফেলিল। গজেনও ঘুরিয়া দাঁড়াইল। সংগ্রাম আসন্ন।

এমন সময়ে মৌলভি-সাহেব ছুটিয়া আসিয়া দুজনের মাঝে পড়িলেন। "ছি, ছি, ছেলেমানুষি কোরো না। খেলতে এসে এসব কি? মুখে মুখে তর্ক থেকে একেবারে হাতাহাতি!"

রমেশ ও গজেন উভয়েই লজ্জিত হইয়া উদ্যত ক্রোধ রোধ করিল। এমন-কি, শেষ পর্য্যন্ত মৌলবী-সাহেবের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে দুজনকে হাতে হাত মিলাইতেও হইল।

বলিয়াছি, 'ইণ্ডিয়া হাউস'এর দুই বাড়ি। একখানি ছোট, অপরখানি বড়। ছোট বাড়িতে তিনখানি শয়নকক্ষ ও একটি বৈঠকখানা। রমেশ ও নরেন থাকে এক ঘরে, বিনয় ও মৌলবী-সাহেব থাকেন দুখানি ছোট ঘরে। বড় বাড়িতে দশ বারো জনের বাস, তার মধ্যে অতুল ও গজানন বা গজেনের পরিচয় জানা দরকার, কারণ এ গল্পের তারা অন্যতম পাত্র। ছোট বাড়ির রমেশ নরেন ও বিনয় সৌখীন প্রকৃতির লোক, বাড়িখানি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট রাখে, তাদের পোষাকপরিচ্ছদেও বিশিষ্ট রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ও-বাড়ির গজেন ও তার দলবল তাহা বরদাস্ত করিতে না পারিয়া ছোট বাড়ির নাম দিয়াছে—হাউস অফ্ লর্ডস।

ও-বাড়ির একমাত্র. অতুলের সঙ্গেই রমেশ ইত্যাদি তিনজনের বন্ধুত্ব। অতুল বেচারা নিতান্ত স্থানাভাবেই সেখানে পড়িয়া আছে, যেন fish out of water। নিদ্রার সময় ছাড়া যতক্ষণ বাড়ি থাকে, তার অধিকাংশ সময়ই রমেশদের সঙ্গে কাটায়। রমেশদের তিনজনকে সে Three Musketeers বলিয়া ডাকে, এবং তাহারা অতুলের নাম দিয়াছে Village Blacksmith, কারণ তার চেহারাটা সেই

কামারেরই মত কতকটা—with large and sinewy hands।

বিনয় সুদর্শন যুবক এবং তার গায়ের রংটাও কালো নয়। বাকি সকলের চেহারা যেমনই হোক, রং কালো। 'ইণ্ডিয়া হাউস্'এর কালো বুকে বিনয় যেন আলোর রেখা। সেজন্য সকলেই, প্রকাশ্যে না হোক মনে মনে, বিনয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। একমাত্র সে-ই ভারতবর্ষের প্রেষ্টিজ রাখিয়াছে, ভারতবর্ষে সকলে কৃষ্ণকায় নহে সে-কথা জাপানীদের কাছে প্রমাণ করিরা। বিনয় মৌলবী-সাহেবের বিশেষ স্নেহের পাত্র। বিনয়ের কথাবার্ত্তা ও আচরণের তিনি সর্ব্বদাই তারিফ করেন।

বিনয়দের বাড়ির ছোট উঠানের এক প্রান্তে একটি মানুষ সমান বাঁশের বেড়া। সেই বেড়াটি এ-বাড়ির উঠানের সীমানা। তার ওদিকে আর একখানি বাড়ির উঠান। সে-বাড়িতে এক জাপানী পরিবারের বাস। বিনয়ের ঘরের সুমুখের বারন্দায় দাঁড়াইলে বেড়ার বুনানির ফাঁক দিয়া ওদিককার লোকদের চলাফেরা অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। বেড়ার গায়ে চোখ লাগাইয়া দাঁড়াইলে দুই বাড়ির লোকই পরস্পরের কাছে স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

কয়দিন আকাশ বেশ পরিষ্কার, উজ্জ্বল রোদে পথঘাটের বরফ গলিয়া বেজায় কাদা হইয়াছিল, এখন তা-ও শুকাইয়াছে।

একদিন সকালে বিনয় তার ঘরের সুমুখে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে, হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়িল বেড়ার দিকে। বুঝিতে পারিল বেড়ার ওপারে একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া, তার হাত ধরিয়া আছে এক শিশু। বিনয়ের মনে হইল মেয়েটি এ-বাড়ির দিকেই চাহিয়া আছে। ভাবিল, বিদেশী ভারতীয়দের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করা জাপানী মেয়ের পক্ষে কিছু বিচিত্র নয়—সকল দেশের মেয়েদেরই কৌতূহল অসামান্য।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া মেয়েটি সরিয়া গেল।

পরদিন সকালেও বিনয় লক্ষ্য করিল, মেয়েটি সেই শিশুর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া এ-বাড়ির দিকে চাহিয়া আছে। বিনয় মেয়েটি সম্বন্ধে আর একটু সচেতন হইল, কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। কছুক্ষণ পরে যে যাহার কাজে চলিয়া গেল।

এমনি করিয়া আরও দু'চারদিন যায়। ব্যাপারটা নিয়মিত ঘটিতে লাগিল। একদিন বিনয় বেড়ার পানে চাহিয়া মেয়েটিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইল। ঠাহর করিয়া দেখিল বেড়ার এক জায়গায় একখানি বাঁকারি অপসৃত, সেই ফাঁক দিয়া দুই দিকের মানুষকে স্পষ্ট দেখা যায়। আজও মেয়েটির পাশে সেই শিশু দাঁড়াইয়া। হঠাৎ চোখের মত বিনয়ের কানও সচেতন হইয়া উঠিল। কচি গলার আওয়াজ—ইন্দোচান্ ওহায়ো!—সুপ্রভাত ভারতীয় মহাশয়! বিনয়ও বলিয়া ফেলিল, বোচ্চান ওহায়ো!—সুপ্রভাত খোকাবাবু! তারপর খোকাবাবু বলিল, ইরাশ্শাই—আসুন!

বিনয়ও বলিল, ইরাশ্শাই—এস ! তারপর খোকা বলিল, আরিগাতো—ধন্যবাদ ! বিনয় বলিল, দো ইতাষিমাস্তে।—বিলক্ষণ, ধন্যবাদ দিতে হবে না।

এইরূপে খোকাবাবুর সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত।

একদিন বিকালে কলেজ থেকে ফিরিয়া বিনয় বাড়ির উঠানে পায়চারি করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরেই শুনিতে পাইল খোকা ডাকিতেছে। খোকার ডাক আর উপেক্ষা করা যায় না, বিশেষত তার সঙ্গে যখন আলাপ হইয়াছে ! বিনয় বেড়ার দিকে আগাইয়া গেল। মেয়েটির দিকে চাহিয়া মাথা নোয়াইয়া বলিল, নমস্কার খোকাবাবু ! মেয়েটি সলজ্জ হাসিয়া মাথা নোয়াইয়া 'শুভ সন্ধ্যা' জ্ঞাপন করিয়া বলিল, কোম্বান্ওয়া ! তারপর খোকাকে দেখাইয়া বলিল, আমার ভাইপো। বিনয় বলিল, আর আমার বন্ধু।

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিল তখন দুই বন্ধু পরস্পরে বিদায় লইয়া যে যার ঘরের দিকে চলিল।

বিনয় নিজের ঘরে প্রবেশ করিবে এমন সময় দেখিল দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রমেশ। বলিষ্ঠ বেঁটে হাত দিয়া মুহূর্ত্তে খপ্ করিয়া বিনয়ের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া সে বিষম ঝাঁকানি দিতে দিতে বলিল, Congratulations. You lucky dog! Three cheers for ওজোসান্ !*

---

* জাপানী কুমারী মেয়ে।

বিনয় বলিল, আরে থামো থামো। ব্যাপার কি ?

—এত বড় ব্যাপার, an event! বলে কি না ব্যাপার কি ! বলিয়া রমেশ কোমরে হাত দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে নরেন আসিল, অতুল আসিল। রমেশ দুজনকেই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিল। তখন স্থির হইল ঘটনাটা celebrate করা দরকার। সকলে বৈঠকখানায় গিয়া বসিল। নরেন সুললিত কণ্ঠে গান ধরিল,—মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী, সখি জাগো জাগো! অতুল বেচারার কণ্ঠে সুর না থাকিলেও মনে ফুর্ত্তির অভাব নাই। সে বলিল, একটা মাত্র গান জানি, তাই গাইব। বলিয়া সে গাহিতে লাগিল, ছি ছি এত্তা জঞ্জাল, হরদম লাগাতা ঝাড়ু...। রমেশ টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া উঠিয়া তার নিজস্ব জাপানী ভাষায় বেপরোয়া বক্তৃতা সুরু করিয়াছে, এমন সময় মৌলবী-সাহেব আসিয়া উপস্থিত। সমস্ত শুনিয়া এক গাল হাসিয়া বিনয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আরে ভাই, তুম তো কামাল কিয়া!

ও-বাড়ির গজেন ও তার দলবলের মধ্যে এ-বাড়ি সম্বন্ধে যে-সব আলোচনা হয় তার কিছু কিছু অতুলের মারফৎ তার বন্ধুরা জানিতে পারে। নরেন লাল নেক্‌টাই বাঁধে—সেটা বাবুগিরির লক্ষণ, শিক্ষার্থীর পক্ষে ওরূপ নেক্‌টাই ব্যবহার করা

অনুচিত। নরেন অর্গ্যান বাজাইয়া গান গায়—সেটা অশোভন, গান গাহিতে কি এতদূরে বাপের পয়সা খরচ করিয়া আসিয়াছে? ঘরের সাজসজ্জা আসবাবে এত ঘটা কেন? এত ফুল, এত ছবি—কেনরে বাপু, আমরাও ত বেঁচে আছি, ফুল-কেনা ছবি-কেনার দুর্ব্বুদ্ধি ত আমাদের নেই। ‘হিবাচি’তে * শানায় না, বাবুদের ষ্টোভ চাই, কলের ক্ষুর নইলে কামানো চলে না, লেখার জন্যে চাই ফাউন্‌টেন্ পেন্। এততেও কুলোয় কি? তার ওপর আবার ক্লাবে যাও, টেনিস খেল, ব্রিজ খেল, খানাপিনা করো। কবে দেখব মেমেদের কোমর জড়িয়ে বল্‌নাচ করচে। বলি, দেশের টাকাগুলো কি খোলাম্‌কুচি, এমন করেই ওড়াতে হয়? আর ওই যে রমেশ, একটা বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ছেলে, একটা অকাল-কুষ্মাণ্ড বললেই চলে, তারই বা কী মেজাজ—যেন লাট সায়েব! ঘুষি উঁচিয়েই আছে। কেনরে বাপু, কেউ তোর খায় না পরে? গুণ্ডামি করার আর জায়গা পাস্ না? আর ওই যে বিনয়, রূপের গুমরেই মলেন। বুড়ো মৌলবী ত বিনয় বলতে অজ্ঞান, অমন ছেলে না কি আর হয় না। ও-সব জানতে আর বাকি নেই রে দাদা—সব মিটমিটে সয়তান। হ্যাটকোট ফলালেই যদি মানুষ হ'ত

---

* কাঠের ছোট চতুষ্কোণ আধার। শীতকালে ইহার মধ্যে ছাই ভরিয়া তার উপর কয়লার আগুন রাখা হয় হাত গরম করার জন্য।

তাহলে আর ভাবনা ছিল না। বুড়ো ছিল ভালো, ওই ছোঁড়াগুলোর পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যেতে বসেছে। বুড়ো আছিস, বুড়ো আছিস, তোর শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢোকা কি ভালো দেখায়, না ভালো শোনায়?

বিনয়ের বান্ধবীর নাম ও-কিকু-সান অর্থাৎ কুমারী চন্দ্রমল্লিকা। বিদেশিনী বান্ধবীর সঙ্গে বিনয়ের আলাপ যতই জমিয়া উঠিতে লাগিল বেড়ার ফাঁকটাও তদনুপাতে বাড়িয়া চলিল। ইহাতে বিস্ময়ের হেতু নাই, কারণ শোনা যায় প্রেমের শক্তি দুর্জ্জয়, তুচ্ছ বাঁশের বেড়া ত দূরের কথা, অতি দুস্তর বাধাও উহা লঙ্ঘন করিতে পারে। শেষে একদিন এমন হইল যে বেড়ার মাঝ দিয়া অক্লেশে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাতায়াত করা চলে। তার মাঝ দিয়া তিন বছরের খোকাবাবু 'ইন্দোচান' এর খোঁজে যখন তখন আসিতে লাগিল, অগত্যা খোকাবাবুর খোঁজে তার পিসিকেও ঘন ঘন আসিতে হইল। 'ইন্দোচান'এর চকোলেট লজেঞ্জুস ও বিস্কুটের এমনি আকর্ষণ যে খোকাবাবু এ-বাড়ি ছাড়িতেই নারাজ। দুই বাড়ির মাঝে বেড়াটা থাকার দরুণ ইতিপূর্ব্বে ও-কিকুকে ঘুরপথে ইস্কুলে যাইতে হইত, এখন আর সে কষ্ট নাই, বেড়ার আপদ দূর হইয়াছে। এখন এ-বাড়ির উঠানের উপর দিয়া 'শর্টকাট' করিয়া সে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে। উঠানটাও আগে কেমন যেন মরুভূমির মত ছিল, অধুনা ও-কিকুর নিয়মিত পাদস্পর্শে সরস

ও জীবন্ত হইয়া উঠিল। রং কেবল যে উঠানে লাগিল তা নয়, বাড়ির বাসিন্দাদের মনেও সে রঙের ছোঁয়াচ ধরিল।

একদিন ও-কিকুর বাড়িতে বিনয়ের ডাক পড়িল। খোকাবাবুর কল্যাণে বাড়িসুদ্ধ লোক ইতিপূর্ব্বেই তার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিল, এখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া পরিচয় আরও গভীর হইল। ও-কিকুর মা দাদা বৌদিদি সকলেই বিনয়ের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। শেষ পর্য্যন্ত মৌলবী-সাহেব হইলেন ও-কিকুর 'ওজিসান' এবং রমেশ, নরেন ও অতুলও তার প্রীতিলাভে বঞ্চিত হইল না। ও-কিকু আজ ফুল, কাল পিঠে, পরশু আর কিছু উপহার আনে, তার উপর আনে তার মধুর ব্যবহার ও মধুরতর হাসি। সকলের সঙ্গেই তার সহজ সরল স্নিগ্ধ আত্মীয়তা। রমেশ তার কাছে 'কোক্কে-না-হিতো' বা মজার মানুষ; নরেন 'ওইষা-সান্' বা ডাক্তার-মশাই, কারণ সে মেডিক্যাল কলেজে পড়ে; অতুল 'দাই-কো' বা বুড়োখোকা, আর বিনয় যে কি তা বিনয় হয়ত বলিতে পারে। যে বসন্তের বাতাস কাহাকেও ধরাছোঁয়া না দিয়াও সকলের মনে আনন্দ ও মোহের সঞ্চার করে ও-কিকু ছিল মধুঋতুর সেই বাতাসের মত।

* * *

বিনয়ের কলেজ থেকে ফিরিতে বেলা পড়িয়া আসে। নির্জ্জন প্যারেড-মাঠের গা ঘেঁসিয়া তার ফেরার পথ। ও-কিকু ইস্কুল থেকে ফিরিয়া আজকাল ভাইপোটিকে লইয়া নিয়মিত সেই পথে বেড়াইতে যায়। ঠিক যে সময়টিতে সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তে ডুব দেয়, ঠিক সেই সময়ে পথের দুই দিক থেকে বিনয় ও ও-কিকু পরস্পরকে দেখিতে পায়। দুজনের মুখেই সলজ্জ আনন্দের স্মিত হাসি। মুখোমুখি পৌঁছিয়া ও-কিকু বিনয়ের হাত থেকে রেশমী 'ফুরোশিকি'তে * জড়ানো বইয়ের বাণ্ডিল দুই হাতে টানিয়া লয়, তারপর জনবিরল পথ দিয়া তিনটি প্রাণী ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। ক্রমে সূর্য্য অদৃশ্য হয়, আকাশ-জোড়া সন্ধ্যার ছায়া দ্রুতগতি নামিয়া আসে, কুলায়-প্রত্যাগত পাখীর কলরব শোনা যায়। বিনয়ের হাত ধরিয়া বিনয়ের-দেওয়া বিস্কুট বা চকোলেট পরমানন্দে চিবাইতে চিবাইতে খোকাবাবু চলে, তাহার কথা বলার অবসর নাই। বিনয়ের অন্যপাশে চলে ও-কিকু মরালগমনে দুলিতে দুলিতে, তার মুখে যত কথা চোখে তার চেয়ে ঢের বেশি। চলিতে চলিতে পরস্পরের হাতে হাত ঠেকে, ও-কিকুর 'কিমনো'র † আজানুলম্বিত আস্তিন সন্ধ্যার সুমন্দ পবনে কাঁপিয়া কাঁপিয়া বিনয়ের দেহ যেন আলগোছে ছুঁইয়া ছুঁইয়া যায়। শেষে

---

* এই ঝাড়নে জাপানীরা বই খাতাপত্র বা অন্য ছোটখাট জিনিস বাঁধিয়া লইয়া যায়।

† কতকটা আলখেল্লার মত জাপানী পোষাক।

এক সময় পথ ফুরাইয়া আসে, আবছা অন্ধকারে অদূরে বাড়িখানার অস্পষ্ট মূর্ত্তি চোখে পড়ে, চকিতে দুজনের হাত ব্যাকুল আগ্রহে সংযুক্ত হয়, আর দুই মুখে উচ্চারিত হয় একই কথা—আবার কাল!

এমনি করিয়া বসন্ত শেষ হইয়া গ্রীষ্মঋতু আসিয়া পড়িল। ঝিঁঝিঁর অবিশ্রাম ডাকে বাতাস কম্পমান। একদিন সকালে 'হাউস অফ্ লর্ডস্'-এর ছেলেরা কলেজ কারখানায় বাহির হওয়ার উপক্রম করিতেছে এমন সময় ধুপধুপ করিয়া পা ফেলিয়া কাঠের বাড়ি কাঁপাইয়া শশব্যস্তে অতুল আসিয়া উপস্থিত। ব্যাপার কি! অতুল বিনয়ের ঘরে গিয়া ঢুকিল। কিছুক্ষণ ফুসফাস গুজগাজ, তারপর বিনয় বাহির হইয়া নরেনকে ডাকিল। নরেনের সঙ্গে কি সব কথা হইল, তারপর ডাক পড়িল রমেশের। রমেশ তার মোটা ভুঁড়ির উপর নরেনের বেল্ট চড়াইবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। অতুলকে দেখিয়া বলিল, কি বাবা ব্ল্যাক্স্মিথ, সক্কাল বেলায় ভগ্নদূতের মত দাঁড়িয়ে কেন? সংবাদ কি?

রমেশের ভুঁড়ির উপর চোখ পড়ায় নরেন বলিল, সেদিন একটা বেল্ট ছিঁড়লে, আবার আমার বেল্ট নিয়ে টানাটানি?

রমেশ বলিল, কুছ ডর নেই, ঘাবড়াও মাত্! সেদিন সর্দ্দিকাশি ছিল, হঠাৎ হাঁচির চোটে বেল্ট ছিঁড়েছিল। আজ ত আমি ভালোই আছি।

সকলে চক্রাকারে বসিয়া মন্ত্রণা সুরু করিল। ব্যাপারটি এই—অতুল খবর আনিয়াছে, পূর্ব্বরাত্রে ও-বাড়ির গজেন ও-কিকুকে উদ্দেশ করিয়া অত্যন্ত অকথা কুকথা বলিয়াছে, এমন-কি তার চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছে। সেখানে আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিল। অতুল আপত্তি করায় সে বলিয়াছে, সে কাহাকেও ভয় করে না। সত্য কথা সে সকলের সামনেই ব্যক্ত করিতে পারে!

রমেশ তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বিষম বেগে মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা মাথার উপর ঘুরাইয়া দিল। বলিল, যাব না কি, এক ঘুষিতে বেটার বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।

অতুল বলিল, এই ব্ল্যাক্স্মিথ থাকতে তোমাকে কিছু করতে হবে না ভাই! আমিই শাস্তি দিতে পারব।

বিনয় ধীরভাবে বলিল, থ্যাঙ্ক ইউ। তোমাদের কাউকে কিছু করতে হবে না, শাস্তি দেওয়ার কাজ আমার। এখন কথা হচ্ছে, কখন?

আলোচনার পর স্থির হইল, ইস্কুল থেকে ফিরিয়া বিনয় গিয়া গজেনের সহিত দেখা করিবে। তাহাকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিবে, সে এরূপ কথা বলিয়াছে কি না। যদি স্বীকার করে, তবে তাহাকে সে-কথা সকলের সুমুখে প্রত্যাহার করিয়া ক্ষমা চাহিতে হইবে। তাহাতে যদি অসম্মত হয়, তবে তাহাকে সে স্বহস্তে উচিত শাস্তি দিবে।

* * *

অপরাহ্নে যথাসময়ে সকলে বাড়ি ফিরিল। অতুল কিছুক্ষণ পরে আসিয়া সংবাদ দিল গজেনও ফিরিয়াছে। বিনয় উঠিল। বলিল, তোমরা এখানেই থাক, আমি বোঝাপাড়া করে আসছি। অতুল বিনয়ের সঙ্গে গেল, কারণ সে একজন সাক্ষী, তার কাছাকাছি থাকা দরকার। তা-ছাড়া গজেনের সাহায্যে যদি তার বন্ধুবর্গ অগ্রসর হয়, তবে 'কামার'ও তার এক ঘা লাগাইবে।

তাহারা চলিয়া গেলে রমেশ ও নরেনও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। কিন্তু তাহাদের ডাক আসিল না।

মিনিট দশেক পরে বিনয় ও অতুল ফিরিল। বিনয়ের মুখ গম্ভীর, অতুলের মুখে খুশীর ভাব। বিনয় বলিল, বেশ দিয়ে এসেছি, এখন কিছুদিন মুখ দেখাতে হবে না।

রমেশ বলিল, বলো বলো গজাসুর-বধ-কাহিনী, গোড়া থেকে বলো! আহা শুনেও সুখ!

অতুল বলিতে লাগিল, আমি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম, বিনয় ভিতরে গেল। দোরটা আধখোলা ছিল, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে সব দেখতে শুনতে লাগলুম। বিনয়কে দেখেই গজেন যেন একটু অবাক হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'আসুন, বসুন, খবর কি?' বিনয় বললে, 'না, বসব না। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।' গজেনের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল, বললে, 'বলুন কি কথা?' বিনয় বললে, 'শুনলুম, আপনি কাল আমার বন্ধু ও-কিকু-সান্

সম্বন্ধে অত্যন্ত জঘন্য অপমানকর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এ কথা কি সত্যি ?' গজেন আমতা আমতা করে বললে, 'কে, আমি ত তেমন কিছু বলিনি !' বিনয় বললে, 'সাক্ষী আছে। অতুল শুনেছে। ডাকব ওকে ?' তখন আমি ঘরে ঢুকলুম। আমাকে দেখে গজেন যেন মরিয়া হয়ে বেপরোয়াভাবে বললে, 'মিছে কথা আর কি বলেছি ? আসছিলেন না সেদিন দুজনে হাত ধরাধরি করে ? স্বচক্ষে দেখেচি।' বিনয় তখন চটে গেছে, ধমক দিয়ে বললে, 'সত্যিমিথ্যের বিচার তোমাকে করতে হবে না ! তুমি বলেছ কিনা বলো !' গজেন বললে, 'ইস, চোখ রাঙাতে এসেছেন ! বলেইছি ত, নিশ্চয় বলেছি !' 'নিশ্চয়' বলার সঙ্গে সঙ্গে বিনয় ডান হাত দিয়ে ধাঁ করে তার বাঁ গালে দিলে এক বিরাশি শিক্কার চড়, তারপর হতভম্ব গজেন সামলাবার আগেই বাঁ হাতে তার ডান গালে টেনে আর এক চড়। ব্যাপারটা চোখের নিমেষে ঘটে গেল। এতক্ষণে বাছাধন মুখে জলপট্টি লাগাচ্ছেন।

রাত্রে বাসায় ফিরিয়া বিনয়ের মুখে আগাগোড়া সমস্ত শুনিয়া মৌলবী সাহেব তারিফ করিয়া বলিলেন, আরে ভাই, তুম তো কামাল কিয়া। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নিশ্চয়' কথাটার অর্থ কি, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন ওই কথাটার উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিনয় চড় মারিয়াছিল। কথাটার

অর্থ শুনিয়া তিনি বলিলেন, বিনয় ওই কথাটা শোনা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যথেষ্ট সংযম দেখাইয়াছে। ইহাতে তাহার মামলার জোর হইয়াছে।

যথাসময়ে 'ইণ্ডিয়া হাউস'এর কোর্ট বসিল। সকলেই উপস্থিত। গজেনের মুখ ফুলিয়া হাঁড়ির মত হইয়াছে। মুখে ওষুধের পটি বাঁধা। সর্ব্বসম্মতিক্রমে মৌলবী সাহেব সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। উভয় পক্ষকে প্রশ্ন করিয়া তিনি সব শুনিলেন। তারপর রায় দিলেন—গজেনের অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে! পাশ্চাত্য দেশে এরূপ ব্যাপারের উপসংহার হয় মারাত্মক, সুখের কথা এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটে নাই। কাহারও, বিশেষ করিয়া মহিলার কুৎসা করা ভদ্রতাসঙ্গত নয়, এরূপ আচরণ অসহ্য। দোষ স্বীকার করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেই সব দিক রক্ষা পাইত। গজেন তাহা করে নাই। শুধু তাই নয়, সে 'নিচ্চয়' বলিয়াছে! সে কথা শুনিয়াও বিনয় চুপ করিয়া থাকিলে আমরা সকলে তাহাকে ঘৃণা করিতাম।

কিছুদিন পরে খাওয়ার টেবিলে তুমুল তর্কের ঝড়। কেহ কাহারও কথা শুনিতেছে না, সকলেই নিজ নিজ মত জাহির করার জন্য চীৎকার চেঁচামেচি করিতেছে। ইহা নিত্য-

নৈমিত্তিক ঘটনা। তর্ক হইতেছে বাংলা ভাষায়, সুতরাং মৌলবী সাহেব কিছু বুঝিতেছেন না। হঠাৎ একজনের প্রশ্নের উত্তরে কে বলিয়া উঠিল—'নিশ্চয়!' অমনি মৌলবী সাহেব হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, শশব্যস্তে বলিলেন—আরে আরে, যো বোলো সো বোলো, মগর 'নিচ্ছয়' মাত্ বোলো!

BLUE BLACK
KAJAL-KALI
KAJAL-KALI
CHEMICAL ASSOCIATION CALCUTTA

Chemical Association

55, Canning Street,
Calcutta.

কাজল কালী ব্যবহার করে
সন্তোষ লাভ করেছি।
এই কালিমা বিদেশী কালির
চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।
ইতি ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রসঙ্গ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

যাত্রা

যাত্রার জন্ম কবে হইয়াছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত নিশ্চিত রূপে নির্ণীত হয় নাই। 'যাত্রা' শব্দ অভিনয় অর্থে ব্যবহৃত হইবার কারণ কি, তাহারও সদুত্তর কেহ দিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যাত্রার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে-সব মত প্রচলিত আছে, তাহার আলোচনা আজ করিব না। যাত্রা বলিতে অভিনয় কেন বুঝি, তাহাই বুঝিবার এখানে চেষ্টা করিব।

* * *

অভিধানে যাত্রা শব্দের যে সব অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়, বলা বাহুল্য যে সে-সকল অর্থের সহিত অভিনয়ের কোনই সম্বন্ধ নাই। অনেক দিন হইল, সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছিলেন,—"উত্তর-পশ্চিম ও বেহার প্রদেশ ধরিয়া বলিতে গেলে 'রামযাত্রাই' আদি যাত্রা। রামায়ণ ও রামযাত্রা—একই কথা। অয়ন ও যাত্রা—দুই কথার একই অর্থ। রামযাত্রা নামের অনুকরণে 'কৃষ্ণযাত্রা'র কথার সৃষ্টি

হয়; ক্রমে অভিনয় মাত্রই যাত্রা হইয়াছে।”—কিন্তু সরকার মহাশয়ের এ অনুমান ঠিক বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বেহার ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ‘রাম-যাত্রা’ নামে কোনও ব্যাপার নাই। ঐ দুই স্থানে যাহা হইত এবং এখনও হইয়া থাকে, তাহার নাম—‘রাম-লীলা’। যাঁহারা ‘রাম-লীলা’ দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন যে, নাম বা রূপ কোনও দিক দিয়াই রাম-লীলার সহিত সেকালের বা একালের, আমাদের দেশের কোনও কালের যাত্রারই কোনওরূপ মিল নাই। বাঙ্গালার কীর্ত্তন, পাঁচালী, কবির গান ও কথকতার ন্যায় ইহাও বাঙ্গালীর সৃষ্ট বাঙ্গালীর নিজস্ব সামগ্রী। সাদৃশ্য হিসাবে এক্ষেত্রে বরং ইটালীর অপেরার নাম করিতে পারা যায়। সেকালের কৃষ্ণ-যাত্রা ও ইটালীর অপেরার মধ্যে প্রয়োগ-কলার এক সত্যই সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু রাম-লীলায় যাহারা অভিনয় করে, তাহাদের মুখে কথা বা গান কিছু থাকে না। তাহারা মাঝে মাঝে চলা-ফেরা ও সামান্য আঙ্গিক অভিনয় করে মাত্র। ইহার প্রধান অঙ্গ—রামায়ণ-পাঠ। রামায়ণের যে অংশ যেদিন অভিনীত হইবার কথা থাকে, জনৈক ব্রাহ্মণ রঙ্গভূমিতে বসিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ হইতে সেই অংশ সেদিন পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যাত্রায় গানই প্রধান জিনিষ। সেই জন্য ইহার আর এক নাম—গীতাভিনয়।

* * *

আমাদের মনে হয়, যাত্রার উৎপত্তির ইতিহাসের মধ্যেই ঐ নামের ব্যুৎপত্তি নিহিত আছে। কজলী গান সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে, রাজা দাদুরায়ের কজলী নামে এক বনের ধারে ইহা প্রথম রচিত হইয়া গীত হইত বলিয়া উহার নাম 'কজলী' হইয়াছে। আমাদেরও সেইরূপ মনে হয় যে, এ দেশে ঝুলন, রাস ও দোল প্রভৃতি যে সব যাত্রা-বাচক পার্ব্বণ আছে, তদুপলক্ষেই কৃষ্ণ-লীলার অভিনয় হইতে আরম্ভ হয়। এবং সেই জন্যই লোকে ইহার 'কৃষ্ণযাত্রা' নাম দিয়াছিল। যাত্রা-বাচক পার্ব্বণ উপলক্ষে এ দেশে বহুকাল পূর্ব্বেও যে অভিনয়ের অনুষ্ঠান হইত, তাহার প্রমাণ 'উত্তর-রামচরিত' নাটকের গোড়াতেই পাওয়া যায়। সূত্রধার বলিতেছেন—"অদ্য খলু ভগবতঃ **কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রায়াম্** আর্য্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি, এবমত্রভবন্তো বিদাং কুর্বন্তু।.........

যং ব্রহ্মাণমিয়ং দেবী বাগ্ বশ্যেবানুবর্ত্ততে।
উত্তরং রামচরিতং তৎপ্রণীতং প্রযোজ্যতে॥"

* * *

কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক যে-কোনও অভিনয়কে আগে লোকে যে 'কালীয়দমন' বলিত, তাহারও কারণ ঐরূপ। কথিত আছে, কালীয় দমনের পালা অবলম্বনেই কৃষ্ণযাত্রার সূত্রপাত হয়। ১২৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' 'যাত্রার ইতিবৃত্ত' নামক

প্রবন্ধের এক স্থানে আছে, “কালীয়দমন যাত্রায় সাধারণতঃ লোকের মনোরঞ্জন হইয়াছিল, সে নাম লোকের অভ্যাস পাইয়াছিল, সুতরাং লোকে কৃষ্ণযাত্রাকে সেই নামে অভিহিত করিল। তাহার পর যখন কালীয়দমন ছাড়িয়া কৃষ্ণযাত্রার জন্য পালা আরম্ভ হইল, লোকে তখনও সেই কালীয়দমন নাম ব্যবহার করিতে লাগিল। দান হোক, মান হোক, মাথুর হোক, যে পালাই হউক, লোকে সকল পালাকেই কালীয়দমন বলিতে লাগিল।” এইরূপ দৃষ্টান্ত হিসাবে ‘কুশীলব’ কথাটারও এখানে উল্লেখ করিতে পারি। রামায়ণের আদি গায়ক কুশ ও লবের নামের অনুকরণেই এদেশে অনেকে অভিনেতা মাত্রকেই ‘কুশীলব’ বলিতেন। তাই যাত্রা সম্বন্ধেও আমাদের বিশ্বাস যে, স্নান-যাত্রা, রথ-যাত্রা, পুনর্যাত্রা, ঝুলন-যাত্রা, রাস-যাত্রা ও দোল-যাত্রা প্রভৃতি যাত্রা-বাচক বৈষ্ণব-পার্ব্বণ উপলক্ষেই কৃষ্ণ-লীলার গীতাভিনয় হইত বলিয়া সাধারণে উহার নাম দিয়াছিল—যাত্রা।

চিত্র ও চরিত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

এ-দেশ এবং অন্য দেশের মধ্যে ধর্ম্মের অনুশীলনে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে। প্রতীচ্যে ধর্ম্ম—আচরণ এবং প্রচারের বিষয়। ভারতবর্ষে ধর্ম্ম উপলব্ধির বস্তু। আচার ধর্ম্মের বহিরঙ্গ মাত্র। যিনি আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আচারে প্রয়োজন নাই।

যাহা জীবনের পরম-অভিজ্ঞতালব্ধ ধন, যুগে যুগে তত্ত্বজ্ঞ এবং ভগবদ্ভক্ত-জন তাহাকে নব নব রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে ১৮৩৩ সালে হুগলী জেলার এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে দরিদ্র চট্টোপাধ্যায় পরিবারে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া যৌবনে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দেবীর পূজারী হন, কে ভাবিয়াছিল, সেই শিক্ষাবিহীন ব্রাহ্মণকুমারের ধর্ম্মানুভূতি একদা দেশদেশান্তরের পণ্ডিতগণের আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে, 'গদাধর'—পরমহংস রামকৃষ্ণরূপে বহু প্রতিভাবান অনুসন্ধিৎসুর মনে জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রেরণা জাগাইবে!

প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যেই সত্য আছে, ইহা ভারতবর্ষ অস্বীকার করে না। দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের এই পূজারী

অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া ইহা জীবনে উপলব্ধি করিবার সাধনা করেন। শৈব শাক্ত বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম ত হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত, খ্রীষ্টান বা মুসলমান ধর্ম্মও এই সাধনায় বাদ পড়ে নাই। সন্ন্যাসিনীর নিকট যোগ ও তন্ত্র এবং তোতাপুরীর নিকট বেদান্তের শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণদেব বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সংসারে লিপ্ত হন নাই। তিনি পরমহংস হইয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। কামিনীকাঞ্চনত্যাগী এই মহাপুরুষের নিরাসক্তি ঠিক বৈরাগ্য নহে। মানব ছিল তাঁহার কাছে সত্য। তাঁহার নিকট হইতে বিবেকানন্দ সেবাধর্ম্মের প্রেরণা লাভ করেন।

এই পরম ভগবদ্ভক্ত পুরুষের প্রবল আকর্ষণী-শক্তি ছিল। বিবেকানন্দের ন্যায় বীর এবং গিরিশচন্দ্রের ন্যায় নাট্যকার তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার মিলন হয়। মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি একদা তাঁহার বাড়িতে আসেন। কথিত আছে, বিদ্যাসাগরকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "খাল-বিল পেরিয়ে এতক্ষণে সাগরে এসে পড়লুম।" বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন, "এলেন যদি ত খানিকটা লোনা জল খেয়ে যান।"

রামকৃষ্ণদেব গল্পচ্ছলে অতি অপূর্ব্ব উপদেশ দান করিতেন। সেই দৃশ্যতঃ সহজ সরল উপদেশাবলীতে ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব নিহিত থাকিত।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে, তিপান্ন বৎসর বয়সে তাঁহার তিরোভাব ঘটে।

এই নির্ম্মলচরিত্র, নিরাসক্ত, ভগবদ্ভক্ত, সর্ব্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা-পরায়ণ, সহাস্যবদন, দিব্যজ্ঞানী পুরুষের জীবন অসামান্য।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

বাংলা দেশে ভাবিবার এবং সেই ভাবনাকে ব্যক্তিত্বের বলে প্রতিষ্ঠিত করিবার লোকের প্রয়োজন হইয়াছে। ধীশক্তি এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার উপর ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। এই ব্যক্তিত্বের অভাবে জাতি শিথিলসংকল্প এবং দ্বিধাসঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। দ্বিধা হইতে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। দার্ঢ্যের অভাবে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। চিন্তার ক্ষেত্রে বাঙালী শতাধিক বর্ষ আত্মনির্ভরশীল। বাহিরের বন্ধন গতিকে ব্যাহত করে মাত্র, মনের বন্ধন জীবনকে পঙ্গু করে। চিন্তাজগতে বাংলার স্বাতন্ত্র্য আজিও পরিস্ফুট। স্বাতন্ত্র্য মিলনের পরিপন্থী নহে। বিচিত্রকে এক করাই মিলনের মূলতত্ত্ব !

*　　*　　*

কংগ্রেসের আইডিয়া বাঙালীর নিজস্ব। অথচ এই আইডিয়াকে সে কখনও প্রাদেশিক রূপ দিতে চেষ্টা করে নাই। বাংলার মনে জন্মগ্রহণ করিয়া সে সুদূর দক্ষিণ-পশ্চিমে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। জাতীয় মহাসভার প্রথম সভাপতি বাঙালী, কিন্তু তাহার প্রথম অধিবেশন হয় বোম্বাই প্রদেশে। বিবেকানন্দের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল মাদ্রাজ। সমগ্র ভারতকে জননীরূপে কল্পনা করিতে বাঙালী শিখাইয়াছে। বাঙালী শুধু রাষ্ট্রনৈতিক নয়, বাঙালী কবি। দেশের রূপকে অগ্রাহ্য করিয়া দেশাত্মবোধের আলোচনা অবচ্ছিন্ন চিন্তার প্রকাশ মাত্র।

*　　*　　*

অন্যান্য প্রদেশে জাতীয়তার মৃদুতা ও তীব্রতা ছিল ভাবগত,—অভিজ্ঞতার ব্যাপার নয়। বাংলার আন্দোলন ছিল তাহার তাপমাণ যন্ত্র। অন্য প্রদেশে মডারেট ও ন্যাশান্যালিষ্টের প্রভেদ ছিল মাত্রায়, প্রকারে নহে।

* * * *

সেই প্রাদেশিক বোধই আজ কর্ত্তৃত্ব-লাভ করিয়াছে। ধারণার স্পষ্টতা অবলুপ্ত। তাহাতে কাহার কি আসিয়া যায়? বাংলায় দলের ত অভাব নাই। লক্ষ্য ও মতের পার্থক্য কোথায়—কেহ জানে না, অথচ দলাদলি আছে।

* * *

যাহা নাই, তাহা লইয়া আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা আছে, তাহাই বাস্তব। অবস্থা এই, আজ মধ্যপন্থী ও জাতীয়তাবাদীর প্রভেদ 'কাইণ্ডে' নয়, 'ডিগ্রি'তে। দুঃখ-ভোগের প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি লইয়া কথা নয়, কথা হইতেছে—লক্ষ্য কি?

* * *

বাক্যের পিছনে যদি একাগ্র কায়-মন না থাকে, তাহা হইলে কথা শুধু কথাই থাকিয়া যায়। কথায় যদি কার্য্যোদ্ধার হইত, তাহা হইলে ইতিমধ্যে আমরা শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর বক্তৃতায় 'ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস' পাইতাম। সহযোগী অথবা অসহযোগী কোন বক্তৃতায় তাহা মিলিবার সম্ভাবনা নাই।

* * *

সংসারে থাকিতে গেলে সাময়িক সুবিধা অসুবিধা হয়ত মানিয়া লইতে হয়। পৃথিবীতে সব জিনিষেরই হয়ত সার্থকতা আছে। যুক্ত কর এবং রক্ত চক্ষু, তিক্ত কণ্ঠ এবং মধুর বিনয়, এ সকলই হয়ত কার্য্যসিদ্ধির উপায়। তথাপি মনে হয়, কার্য্য-সিদ্ধি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠাই যদি লক্ষ্যের বিষয় না হইত, কর্পোরেশন নয়, জনসাধারণের সেবা, কৌন্সিল প্রবেশ অথবা বর্জ্জন নয়, দেশের সেবাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হইত, আবেগ মাত্র নয়, আন্তরিকতা যদি কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করিত, খানিকটা কাণ্ডজ্ঞান এবং কতকটা আত্মপ্রত্যয় যদি আমাদের থাকিত, তাহা হইলে আমরা বাঁচিয়া যাইতাম, বাংলার আদর্শ আবার ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করিত।

—আগামী সংখ্যায়—

শ্রীননীমাধব চৌধুরীর

সুমতি

দিন-পঞ্জী

১৬ই এপ্রেল, কলিকাতা—ভারতীয় জাতীয় উদারনৈতিক সঙ্ঘের চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি দেওয়ান বাহাদুর রামচন্দ্র রাও বলেন,—গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অব্যবহিত পরেই তাড়াতাড়ি করিয়া মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভারতের আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসে এরূপ গুরুতর ভ্রম খুব কমই হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নীতির ফলে ভারতে যে বাহ্যিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার কথা মনে করিয়া স্যার সামুয়েল হোর এবং লর্ড উলিংডন আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নীতির ফলে উৎপন্ন বিক্ষোভ এবং বিরক্তির দ্বারা তীব্র অসন্তোষ সাময়িকভাবে চাপা পড়িয়াছে মাত্র। সুতরাং জেলে থাকিয়াও মহাত্মা গান্ধীই এখনও দেশের রাজনৈতিক অবস্থার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। তাঁহার সদিচ্ছা ব্যতীত যে-কোনপ্রকার রাজনৈতিক মীমাংসাই করা হউক না কেন —তাহা কিছুতেই স্থায়ী হইতে পারে না।

নয়া দিল্লী, ১৬ই এপ্রেল—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বৎসরের জন্য ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্সের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

সভ্যগণ—মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ, ঘনশ্যাম দাস বিড়লা, লালা শ্রীরাম, স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, অমৃতলাল ওঝা, বি-দাস, ইব্রাহিমজী করিমজী, জি-এস-সোবনদাস, পদমপাদ সিংহনিয়া ও এস-এস-গাঙ্গুলী।

লণ্ডন, ১৭ই এপ্রিল—অস্ত্রচিকিৎসার জন্য শ্রীযুক্ত ভি-জে প্যাটেল অদ্য সন্ধ্যায় দুইজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সমভিব্যাহারে ভিয়েনা যাত্রা করিয়াছেন।

কলিকাতা, ১৮ই এপ্রিল—উদারনৈতিক সঙ্ঘের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী 'হোয়াইট পেপারে'র আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, যে শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের দিকে ভারতকে অগ্রসর করা হয় নাই, উহা যে-শাসনসংস্কারের লক্ষ্য তেমন কথা পর্য্যন্ত হোয়াইট পেপারের কোথাও উল্লেখ নাই। প্রস্তাবগুলি যে আকারে আছে তাহাতে অতিমাত্রায় যাঁহারা মডারেট তাঁহারাও সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। তিনি আরও বলেন, আমরা ভুলিতে পারি না যে, কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য সমগ্র ভারতের উপকার সাধন। হয়ত উহার ব্যাপক কার্য্যকলাপের ক্ষেত্রে উহা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে, কিন্তু তথাপি যাঁহারা এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদেরই দেশের পুরুষ, তাঁহারা আমাদেরই দেশের নারী। আমরা কি ভুলিতে পারি যে, রাজনৈতিক আন্দোলন যে-শক্তি সংগ্রহ

করিয়াছে সে-শক্তি তাঁহাদেরই সৃষ্টি। এই হোয়াইট পেপারের উপর ভিত্তি করিয়াই যদি শাসনতন্ত্র দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে তাহা থাকিবে না। যদি উহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে কালক্রমে উহা পুনরায় দেখা দিবে, তখন তাহার সম্মুখে সব কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। আমার ইহাই প্রার্থনা।

পাটনা ১৯শে এপ্রিল—অদ্য অতি প্রত্যূষে চারি ঘটিকার সময় কংগ্রেসের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও জাতীয়তাবাদী জননায়ক সৈয়দ হাসান ইমাম পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল।

আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে
আর ইনজেক্‌সান লইতে হইবে না
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীরই
—রক্ষা করা উচিত—
একমাত্র শ্রেষ্ঠ জর্দ্দা ব্যবসায়ী
ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টোর্স
গোল মার্কেট, নিউ দিল্লী
নমুনা পরীক্ষা করিলেই
বাদসাহী সুর্ত্তি জর্দ্দা বা কিমামের
শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন
আট আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে সকল রকমের নমুনা পাঠানো হয়
প্রতি সের ৩৲ হইতে ৩২৲ পর্য্যন্ত—ভি-পি খরচ স্বতন্ত্র

বাঙ্গালীর শিল্পনিদর্শন
ঘোষ ব্রাদার্সের
জুতা
সুলভ ও শ্রেষ্ঠ
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বেঙ্গল জমিদারী এণ্ড ব্যাঙ্কিং কোং লিঃ
জনসন্ রোড, ঢাকা
—আদর্শ জাতীয় ব্যাঙ্ক—
স্থায়ী আমানত, চল্‌তি হিসাব, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, ক্যাশ সার্টিফিকেট
প্রভৃতি নানারকমের টাকা গচ্ছিত রাখিবার বিশেষ সুবিধা।
বিস্তারিত নিয়মাবলী পত্র লিখিলে পাইবেন

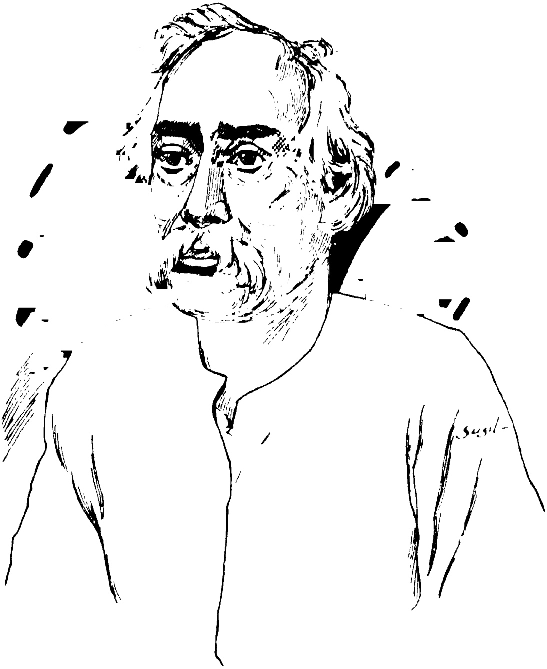

মহেন্দ্রলাল সরকার

ছোট গল্প

১ম বর্ষ] ১৬ই বৈশাখ ১৩৪০ [৪২শ সংখ্যা

সুমতি

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

সহর কলিকাতা, শোভাযাত্রার অভাব নাই। সেদিনও দেখি বেলা প্রায় আড়াইটার সময় গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র মাথায় করিয়া এক প্রসিদ্ধ পল্লীর প্রসিদ্ধ রাস্তা দিয়া একটি ছোট খাট শোভাযাত্রা চলিয়াছে। সাধারণ শোভাযাত্রা যেমন হইয়া থাকে—একজন গলায় হারমোনিয়াম ঝুলাইয়া বাজাইতেছে, আর কয়েকজন উচ্চৈঃস্বরে বেসুরা গান গাহিতেছে, দুই একজন ভাবপ্রবণ করিৎকর্ম্মা লোক উহারই ফাঁকে দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া একটু নাচিবার সুযোগ করিয়া লইয়াছে। হঠাৎ দেখিলে সংকীর্ত্তনের দল বলিয়া মনে হইতে পারে।

কিন্তু পথচারীদের বিস্মিত করিয়া দিয়া হঠাৎ ধ্বনি উঠে—জয় পোল্লাটারিয়ের জয়! বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি শোভাযাত্রাটি বেশীর ভাগ আধা ভদ্রলোকদের লইয়া গঠিত। পোল্লাটারিয়ের জয়ধ্বনি শুনিয়া বাধ্য হইয়াই শোভাযাত্রার দিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হইল। তাইত, এ যে দেখি অভিনব ব্যাপার! শোভাযাত্রার পুরোভাগে দুইজন লোক শালুর এক ঝাণ্ডা বহন করিয়া চলিয়াছে, শালুর গায়ে কাগজ কাটিয়া বড় বড় অক্ষরে লেখা—Proletariat of the World Unite! তারপরেই এক বিচিত্র মূর্ত্তি! উরুর উপরে অনেকখানি পর্য্যন্ত খালি রাখিয়া কাছা-কোঁচা গুঁজিয়া কাপড়-পরা, মাথায় অদ্ভুত ধরণের ধুচনী, এক হাতে ছোট একটি লাল নিশান ও অন্য হাতে বৃহৎ একখানি কাস্তে লইয়া একটি লোক চলিয়াছে। চট করিয়া বুঝিতে পারিলাম না ব্যাপারটা কি। তারপরে ক্রমে ক্রমে আন্দাজ করিলাম ইনিই বোধহয় ‘পোল্লাটারি’র প্রতিনিধি। ইঁহার পশ্চাতে গৌরবর্ণ, পুষ্টদেহ, সুবেশ একটি ভদ্রলোক, বগলে একতাড়া কাগজ, মাঝে মাঝে হাত নাড়িয়া চীৎকার করিতেছেন—‘জয় প্রোলেটারিয়েটের জয়’, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শোভাযাত্রার লোক গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে—জয় পোল্লাটারিয়ের জয়!

চলিতে চলিতে শোভাযাত্রা একটি বৃহদায়তন বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সুবেশ ভদ্রলোকটির ইঙ্গিতে দাঁড়াইল। নূতন উদ্যমে গান, নৃত্য ও জয়ধ্বনি আরম্ভ হইল। গান শুনিয়া

যেমন হইয়া থাকে দুই পাশের বাড়ীগুলির জানালায় কচি, তরুণ, পাকা নানাজাতীয় মুখ সকৌতূহল দৃষ্টি লইয়া দেখা দিল। শোভাযাত্রীদলের কেহ কেহ ও পথচারীদের অনেকেই মাঝে মাঝে আকাশপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ভুলিলেন না। ইতিমধ্যে সেই বৃহদায়তনের বাড়ী হইতে একটি যুবক বাহির হইয়া আসিলেন। তাকে দেখিয়া শোভাযাত্রা-পরিচালক সুবেশ ভদ্রলোকটি আগাইয়া গিয়া বলিলেন,

—কিহে, এখনও তুমি বাড়ীতে? আজ যে মনুমেণ্টের কাছে বিরাট গণসভা।

যুবকটি বলিলেন,

—সে তো জানি। কিন্তু আমার স্ত্রীর শরীরটা বড় খারাপ, আজ আবার বাড়াবাড়ি হয়েছে। তাই আজকের মিটিঙে সভাপতিত্ব করতে পারব না বলে 'হাতুড়ী' আফিসে ফোন করেছি। আমার জায়গায় আপনাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করেছি।

রামেশ্বর বাবু—সুবেশ পুষ্টদেহ ভদ্রলোকটির নাম রামেশ্বর সেন—বলিলেন,

—তোমার স্ত্রীর অসুখটা দেখছি ক্রনিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভাসমিতিতে তোমার বেরুনো একরকম বন্ধ হয়েছে।

—কি আর করছি বলুন? কর্ত্তব্যে অবহেলা হচ্ছে বলে নিজের মনেও যথেষ্ট গ্লানি হয়েছে। সে কথা যাক্।

গণদেবের পূজার জন্য আজ এই কুড়িটি টাকা নিন, কোন ত্রুটি না হয় যেন।

নোট দু'খানি হাতে পাইয়া রামেশ্বর বাবুর চোখ দুইটি একটু চকচকে হইয়া উঠিল। গাঢ় উদ্দীপনাপূর্ণ কণ্ঠে তিনি সতেজে বলিয়া উঠিলেন,—

জয় প্রোলেটারিয়েটের জয়!

নোট দু'খানি শোভাযাত্রীদের কারো কারো চোখে পড়িয়াছিল। রামেশ্বর বাবুর জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে পাড়া চমকাইয়া দিয়া জয়ধ্বনি উঠিল,—

জয় পোল্লাটারিয়ের জয়!

শোভাযাত্রা আবার চলিতে লাগিল। শোভাযাত্রীদল দূরে চলিয়া গেলে যুবকটি আবার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবকটি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দোতলার বারান্দা হইতে একটি তরুণীও ভিতরে চলিয়া গেলেন।

২

আমরা একবার সরোজকান্তির বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিলাম, ঠিক কি উপলক্ষে মনে করিতে পারিতেছি না। বাড়ীখানি বাহির হইতে দেখিলেই শাঁসালো বনেদী পরিবারের গৃহ বলিয়া মনে হয়। আরও মনে হয় সহর কলিকাতার এঁরা সেই শ্রেণীর

বনেদী পরিবার যাঁরা অনেককাল আগে চুঁচড়া, শ্রীরামপুর, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বাস উঠাইয়া এখানে কায়েম মোকাম হইয়াছেন, এবং এমন দৃঢ়ভাবে কায়েম মোকাম হইয়াছেন যে মারাঠাখাত এককালে তাঁদের শারীরিক ও মানসিক গতির যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল আজ অবধি পুরুষানুক্রমে সেই সীমার মধ্যেই তাঁরা পরম সন্তুষ্টচিত্তে বাস করিতেছেন। কিন্তু এ ধারণা যে কতখানি ভুল আমরা সেদিন সরোজকান্তির বাড়ীর মধ্যে গিয়াই সেটা বুঝিতে পারিলাম।

সরোজকান্তি যে ঘরখানিতে আমাদের বসিতে দিলেন সে ঘরে প্রবেশ করিয়াই চমক লাগিল। ভাবিয়াছিলাম দেয়ালে কোথায় দেখিব, রাজা রবিবর্ম্মার শকুন্তলা গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন আর দুর্ব্বাসা, আরে পাপীয়সী!—বলিয়া তর্জ্জনী বাড়াইয়া শাপ দিতেছেন; মোটা ইটালীয়ান ফ্রেমে বাঁধা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বালিকা মূর্ত্তি দেয়ালে ঝুলিতেছে; ব্লুচার ও ওয়েলিংটন ওয়াটার্লু-যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া পরস্পরের করমর্দ্দন করিতেছেন ইত্যাদি; কিন্তু মাথা তুলিয়াই দেখি দেয়ালে মাত্র গুটিকয়েক দাড়িওয়ালা না-হয় টেকো-মাথা লোকের ছবি,—সকলেই রুষিয়ার বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা,—লেনিন আছেন, ষ্ট্যালিন আছেন, আরও অনেকে আছেন। নীচে বড় একখানি কাচের ফ্রেমে বাঁধাই কার্পেটের উপর লাল রেশমী সূতায় লেখা—Proletariat of the World, Unite! এককোণে ছোট একটি 'S'। আরেক দিকের

দেয়ালে রুষিয়ার একখানি বৃহৎ মানচিত্র। মানচিত্রের উপরে ছোট একখানি কাস্তে ও একটি হাতুড়ী আড়াআড়ি-ভাবে দেয়ালে আঁটা। ঘরের একদিকে গুটি দুই মেহাগনি-পালিশ বুক-কেস, তাতে চকচকে-বাঁধাই অনেকগুলি পুস্তক। কাছে গিয়া দেখি সব বইগুলিই রুষিয়া, কম্যুনিজম এবং সোসিয়ালিজম সম্বন্ধে। চারিদিকে চাহিয়া অবাক হইয়া ভাবিতেছি কোথায় আসিয়াছি, সরোজকান্তি বসিতে অনুরোধ করিয়া একটি সুদৃশ্য কৌচ দেখাইয়া দিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, ঘরের বিচিত্র সাজসজ্জা দেখিয়া এতই বিস্মিত হইয়াছিলাম যে মোলায়েম কৌচে সুখাসীন হইয়াও আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটিতেছিল না।

বিস্ময়ের ঘোর কেন কাটিতেছিল না সে কথা বলিতেছি। সরোজকান্তির পিতা ছিলেন প্রসিদ্ধ এটর্নী, পিতামহ মুৎসুদ্দি। আর সরোজকান্তি নিজে এই বয়সেই দালালি করিয়া যথেষ্ট পয়সা রোজগার করিতেন। দশ-বারোটা কোম্পানীর ডিরেক্টরগিরি করিয়াও তাঁর অর্থাগম হইত। এরূপ পরিবারে এমন নৈষ্ঠিক কম্যুনিষ্ট কে জন্মিয়াছে আমরা ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করাটা অভদ্রতা হইবে কিনা চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে সরোজকান্তি বলিলেন,

—দেখুন, কম্যুনিজম সম্বন্ধে আলোচনা এদেশে অনেকদিন সুরু হয়েছে, কিন্তু সত্যিকার কম্যুনিষ্ট এদেশে যাঁরা আছেন আঙ্গুলে ক'রে তাঁদের সংখ্যা গোণা যায়, কিন্তু এঁদের মধ্যেও

out-and-out communist,—সাম্যবাদের গোড়ার কথাটা যাঁরা তলিয়ে বুঝেছেন এবং সমস্ত হৃদয় ও মন দিয়ে কম্যুনিজম ধর্ম্মের চর্চ্চা করেন, এমন লোকের সংখ্যা আরও কম। আমি সামান্য চেষ্টা করছি বটে কিন্তু আমার একার চেষ্টায় আর কতদূর কি হবে, কি-ই বা আমার শক্তি বলুন? সকলের আগে যে-জিনিসটা দরকার—মানে যে-জিনিসটা লোকে দেখলেই আপনাকে কম্যুনিষ্ট বলে চিনবে—এই যেমন ফ্যাসিষ্টদের ব্ল্যাক সার্ট বা ঐরূপ চিহ্নিত পোষাক—সেটারই কোন ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত করে উঠতে পারছি না। দেড় বছর ধরে ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীতে কত বই যে ঘাঁটলেম তার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু এ সম্বন্ধে পরিষ্কার একটা আইডিয়া পাওয়া গেল না। শেষে আর কি করি বলুন, জহরলালকে একখানা চিঠি লিখলেম, তিনি ত দেশটা বেড়িয়ে এয়েছেন, আর এসব বিষয়ে যা-হোক একটু ইণ্টারেষ্ট নিয়ে থাকেন শুনি।

আমরা ত অবাক। সরোজকান্তি বলিতে লাগিলেন,

—মার্কস্ (যুক্ত করে নমস্কার করিলেন) এত খুঁটিনাটি বিষয়ে লিখেছেন কিন্তু এই ইম্পরটাণ্ট জিনিসটার কথা কেন যে ভুলে গেলেন তা বুঝি না। এমন-কি সর্ব্বদর্শী মহামানব লেনিন পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে নীরব। কম্যুনিষ্ট ইণ্টারনেশানাল পর্য্যন্ত সাইলেণ্ট। প্রথমেই এত বড় বাধা পেলে কাজ কি বেশীদূর এগোতে পারে, বলুন? কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না।

বাস্তবিক কি যে করা যায় আমরাও ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। হঠাৎ সরোজকান্তি জিজ্ঞাসা করিলেন,

—আচ্ছা, আপনি ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের কথা শুনেছেন কি? বোধ হয় শুনে থাকবেন। আজকাল দেখছি আমরা,—মানে দু'একজন অর্থোডক্স কম্যুনিষ্ট ছাড়া বাইরের লোকেও এসব বিষয়ে এক আধটুকু বুঝতে চেষ্টা করছে। গ্রাণ্ড আইডিয়া নয় কি? বেরুত ষ্ট্যালিন ছাড়া আর কারো মাথা থেকে? বাকুনিনের মত ভাবুক দেখা যায় না, ক্রোপাটকিনও বড়-দরের লোক, লুনাচারস্কি, চিচেরিন সকলেই আমাদের নমস্য, কিন্তু ঐ ষ্ট্যালিন! হাঁ, একটা মানুষ বটে—১৪ কোটি লোককে কি ভাবে চালাচ্ছেন!

Five Year Plan যে সত্যই বিস্ময়কর ব্যাপার, মাথা নাড়িয়া এই কথাটাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, সরোজকান্তি কেন জানি না হঠাৎ সরোষে বলিয়া উঠিলেন,

—মশাই, সিন্‌সিয়ারিটির অভাবে এই দেশটা উচ্ছন্ন গেল। কেশবলাল ছিল আমার পরম বন্ধু, আদর্শ-চরিত্রের কম্যুনিষ্ট। মার্কস (যুক্ত করে নমস্কার) ও এঞ্জেলস ছিলেন তার ইষ্টদেবতা। 'চাষার ব্যথা' কাগজখানা তার হাতে তুলে দিলেম। সেখানা চালাবার জন্য কত টাকাই যে ঢেলেছি। একদিন সেই কেশবলাল কিনা আমারই টাকায় চালানো কাগজে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখলে—সেণ্টপিটরস্‌বার্গ! কেন লেনিনগ্রাড কথা তার মনে পড়ল না? কম্যুনিষ্ট

ধর্ম্মীদের তীর্থস্থান লেনিনগ্রাড, সেই লেনিনগ্রাডকে প্রাগৈতিহাসিক জারিষ্ট-যুগের সেণ্টপিটরস্‌বার্গ বলা! দিলেম টাকা বন্ধ করে, দিলেম কথা বন্ধ করে। বন্ধুত্বের এত বড় অপমান! সেই কেশবলালটার জুড়িদার ছিল মহীতোষ, টাকা সেও বড় কম খায়নি। একদিন আমার সাথে ট্রট্‌স্কীর পক্ষ নিয়ে তর্ক করে আর কি? সেই ট্রট্‌স্কী যাকে বিশ্বাস ঘাতক বলে ষ্ট্যালিন তাড়িয়েছেন, তার পক্ষ নিয়ে তর্ক! তারপরে যেটাকে রাখলেম কাগজের চার্জে, সেটা আবার বর্ণচোরা গাঁধিভক্ত। যতই তাকে বলি ক্ল্যাস-ওয়ার সম্বন্ধে জোর লেখা ছাড়বে, ততই সে 'পুণ্যভূমি ভারতভূমি' ইত্যাদি ননসেন্স চালাতে চেষ্টা করে। শেষটা দিলেম তাকে তাড়িয়ে। মশাই, এই সব ব্যাপার দেখে শুনেও আমার নেহাৎ কম্যুনিষ্ট প্রাণ বলেই এখনও টিকে আছে, ভেঙ্গে পড়েনি।

একবার সরোজকান্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। ভাঙ্গিয়া পড়িবার কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া ভাবিতেছিলাম মাথা নাড়িয়া কথায় সায় দিই, এমন সময় ফুটফুটে ছোট একটি মেয়ে—লাল মখমলের ফ্রকে ঠিক বিলাতী খুকীর মত দেখাইতেছিল—ছুটিতে ছুটিতে বিনুনী দোলাইয়া ঘরে আসিল। আমাদের দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, একবার চকিতে চাহিয়া সরোজকান্তির কাছে গিয়া তার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। তারপর সরোজকান্তির গলা জড়াইয়া তার কানে ফিসফিস করিয়া কি বলিল।

পর মুহূর্ত্তে সরোজকান্তি দাঁড়াইয়া উঠিল, আমাদের দিকে চাহিয়া বলিল,

—আচ্ছা। আজ মার্কসের (যুক্তকরে নমস্কার, দেখাদেখি ছোট মেয়েটিও যুক্তকরে নমস্কার করিল) জন্মতিথি, আমার স্ত্রী সামান্য কিছু পূজার অনুষ্ঠান করেছেন, তাই উঠতে হল। আপনার মত সিমপ্যাথেটিক লোকের সঙ্গে কথা বলে বড় আনন্দ পেলাম। নমস্কার।

৩

শোভাযাত্রা চলিয়া গেলে সরোজকান্তি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে দোতলার বারান্দা হইতে একটি তরুণীও ভিতরে প্রবেশ করিলেন একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কেমন যেন মনে হইল ইনিই সেই ক্রনিক ব্যারামের রোগী স্ত্রী যাঁর অসুখের বাড়াবাড়ির জন্য সরোজকান্তি আজ সভাপতিত্বের মহান্ কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত পালন করিতে পারিল না।

এই কথা মনে হইবার কাবণ এই যে, বিয়ের পর অনেক দিন না দেখিলেও সরোজকান্তির স্ত্রীকে তাঁর পিত্রালয়ে অনেক বার দেখিয়াছি। সরোজকান্তির স্ত্রী সুমতি বেশ সম্পন্ন ঘরের মেয়ে। পিতামহ বাঁধাই কারবারে যথেষ্ট পয়সা করিয়াছিলেন এবং শেষ জীবনে সঞ্চিত অর্থে জমিদারী খরিদ

করিয়া প্রতিষ্ঠাপন্ন হন। পিতা উত্তরাধিকার-সূত্রে জমিদারী ও বিষয়বুদ্ধি লাভ করেন। এই বিষয়বুদ্ধিবলে মহাজনী কারবারে তাঁর প্রতিপত্তি ও জমিদারী উভয়ই যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সুমতির পিতৃপরিবারের একটি বিশেষত্ব এই যে তাঁরা পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। প্রচুর বিত্তশালী ও জমিদারীর অধিকারী বলিয়া সুমতির পিতার ব্যবহারে বিন্দুমাত্র অহমিকার ভাব ছিল না। সামান্য প্রজা ও অভিজাত বংশীয় খাতকের সঙ্গে তিনি তুল্য বিনয়ের সহিত ব্যবহার করিতেন। গলায় কণ্ঠি, গায়ে হরিনামাঙ্কিত নামাবলী, ললাটে ও নাসিকায় রসকলি, নগ্নপদ জমিদারকে দেখিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে মস্তক নত করিত। তাঁর গৃহে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজির দারুমূর্ত্তির নিয়মিত পূজা ও ভোগ হইত। দোলযাত্রা ও রাসের সময় নবদ্বীপ, গুপ্তিপাড়া ও কাটোয়া হইতে তাঁর গৃহে বহু পরমভক্ত বৈষ্ণবের পদধূলি পড়িত ও রীতিমত সমারোহ হইত। খাতক ও প্রজাবৃন্দের অনেকে এই সকল উৎসবে যোগদান করিয়া কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হইতেন। কারও ভাবাবেশ হইলে জমিদার তাকে কোল দিতেন।

এইরূপ বৈষ্ণবীয় আবহাওয়ায় বড় হইয়া সুমতি স্বভাবতঃই ধর্ম্মপ্রবণ হইয়াছিল। আচারবিচারে ঐকান্তিক নিষ্ঠা বাল্যকাল হইতেই তার ছিল। অবিবাহিত অবস্থায় সে মাছ মাংস খাইত না, কিন্তু বিবাহের পর স্বামীর মঙ্গলার্থে এক আধটুকু মাছ খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু মাংস স্পর্শ

করিত না। শ্বশুরালয়ে আসিবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অর্চ্চনার সঙ্গে সে গান্ধিজীর পূজা করিত। তার পিতার মতে গান্ধিজী আদর্শ বৈষ্ণব, পূজা পাইবার যোগ্য ব্যক্তি বটেন। সুমতিও এই সকল কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস ইত্যাদির ন্যায় মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ জ্ঞানে একান্ত ভক্তির সঙ্গে গান্ধিজীর পূজা করিত।

শ্বশুরালয়ে আসিয়াও সে মহাপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তির সঙ্গে গান্ধিজীর চিত্রের পূজা করিত। শ্বশুরশাশুড়ী এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না, কারণ সুমতির পিতার দুইটি কন্যা ছাড়া আর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, হইবার আশাও বিশেষ ছিল না। কিন্তু হস্তক্ষেপ করিলেন স্বামী। একদিন কম্যুনিজমের নিগূঢ় তত্ত্ব স্ত্রীর নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া সরোজকান্তি বলিলেন যে গান্ধি একজন বুর্জোয়া মাত্র পূজা পাইবার যোগ্য নয়। যদি পূজা করিতে হয় তবে কার্ল মার্কসের পূজা কর। জ্যোতির্মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী কার্ল মার্কসের একখানি চিত্র সে স্ত্রীর হাতে দিল। সুমতি দেখিল যে মহাপ্রভুর মস্তকের চারিদিকে যেমন জ্যোতির শিখা আছে এ চিত্রেরও তাই আছে। সুতরাং ইনিও মহাপ্রভুর একজন পার্ষদ তাতে সন্দেহ নাই।

গান্ধিজীর চিত্র সরাইয়া সে মার্কসের চিত্র মহাপ্রভুর পাশে স্থাপন করিয়া যথারীতি অর্চ্চনা করিতে লাগিল। স্বামীর ধর্ম্মই ত স্ত্রীর ধর্ম্ম, সেহেতু কম্যুনিজম মন্ত্রে দীক্ষা লইতে

সুমতির কোথাও বাধিল না। তাছাড়া তার স্বামী মহাপ্রভুর এই নূতন পার্ষদের ভক্ত হইলেও এবং মাছ মাংস প্রভৃতির অবৈষ্ণবীয় খাদ্যে অনুরক্ত হইলেও মহাপ্রভুর প্রতি তাঁর কতখানি প্রগাঢ় ভক্তি আছে তাহা সুমতি ত নিজেই দেখিয়াছে। তার সঙ্গে তার পিত্রালয়ে যাইবার সময়ে স্বামী গলায় কণ্ঠি ধারণ করেন ও সঙ্গে একখানি চরিতামৃত লয়েন। পিতার সঙ্গে কথোপকথনের সময়ে চরিতামৃত হইতে কত সুন্দর সুন্দর পদ আবৃত্তি করেন। শুনিয়া পিতা কত আনন্দিত হন। তাকে সঙ্গে লইয়া একবার শ্রীধামেও গিয়াছিলেন। সুতরাং সুমতি সর্ব্বদাই স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইত।

কিন্তু কেবল একটি বিষয়ে সে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করিত। কম্যুনিজম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য স্বামী সভাসমিতিতে যাইতে চাহিলেও সেই যেবার কেশবলালের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারে গিয়া তিনি হাত ভাঙ্গিয়া আসিয়াছিলেন তারপর হইতে সে তাকে ধর্ম্মপ্রচারে যাইতে দিত না। অবশ্য এ বিষয়ে সরোজকান্তি নিজেও কোন জিদ করিত না, কিন্তু দলের লোকের কাছে জবাবদিহি করিতে গিয়া সে লজ্জায় পড়িত। আফিসের পোষাক ছাড়া অন্য পোষাকে সরোজকান্তি বাহিরে যাইতে চাহিলেই সুমতি তাঁর সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িত। কাজেই সরোজকান্তির যাওয়া হইত না। স্ত্রীর অসুখ বলিয়া তিনি অনুরোধ এড়াইতেন এবং গণদেবের পূজার জন্য মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিয়া দলপতির পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতেন।

স্বামী আপনভোলা সরল প্রকৃতির লোক, অনুচরদের কথা না ঠেলিতে পারিয়া বাহির হইয়া পড়েন এই ভয়ে শোভাযাত্রা বাড়ীর কাছে আসিলেই স্বামী বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে সুমতিও দোতলার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

৪

স্বামীর অনুচরদের মধ্যে সে বাস্তবিকই দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না ঐ শোভাযাত্রার পরিচালক, সুবেশ পুষ্টদেহ রামেশ্বর সেন নামক লোকটিকে। প্রথম কারণ এই যে, রামেশ্বর সেন কতকটা তার স্বামীর প্রতিদ্বন্দী। রামেশ্বর বাবু পুলিশ কোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল. বিদ্বান ও প্রতিষ্ঠাপন্ন কম্যুনিষ্ট ধর্ম্মী। নামে দলপতি হইলেও কার্য্যতঃ রামেশ্বরই দলপতিত্ব করিতেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, তার স্বামীর সঙ্গে রামেশ্বর বাবুর প্রায়ই ঘোর তর্কযুদ্ধ হইত।

এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, যে-বাহিরের লোক স্বামীর সঙ্গে তর্ক করিয়া কেবলই তাঁকে চটাইয়া দেয় পতিপরায়ণা স্ত্রী তার উপর বিরূপ না হইয়া পারে না।

সে কথা যাক্। রামেশ্বর বাবুর ওকালতিতে খুব পশার। পৈতৃক সামান্য জোত-জমি ছিল, অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া জ্ঞাতিরা তাহা বেদখল করিয়াছিল। রামেশ্বর দেখিলেন, এই একটা সুযোগ। দেশে গিয়া প্রজাদের ডাকাইয়া তিনি বলিয়া

দিলেন যে তাদের আর জমির খাজানা দিতে হইবে না। তারা যখন জমি চাষ করে তারাই ত জমির প্রকৃত মালিক; সুতরাং জমি তাদের ফিরাইয়া দিয়া তিনি তাঁর কর্ত্তব্য করিলেন। ইহার ফলে জ্ঞাতিরা যেমন জব্দ হইল রামেশ্বর বাবুর প্রতিষ্ঠা দেশে তেমনি শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া সরোজকান্তির সঙ্গে প্রায়ই তাঁর খণ্ডযুদ্ধ লাগিয়া যাইত। প্রজারাই জমির মালিক এ কথা শুনিলে সে ক্ষেপিয়া যাইত। তার মত এই যে নেশন জমির মালিক। চাষ করে বলিয়া চাষীকে জমির মালিক বলিলে বাড়ী তৈয়ার করে বলিয়া রাজমিস্ত্রীকে বাড়ীর মালিক বলিব না কেন? গাড়ী চালায় বলিয়া কোচম্যানকে গাড়ীর মালিক বলিব না কেন? ঘোড়াকে দানা খাওয়ায় বলিয়া সইসকে ঘোড়ার মালিক বলিব না কেন? রামেশ্বর কটাক্ষ করিয়া বলিতেন,

—তোমার শ্বশুরের ছেলে নাই, বড় জমিদারী হাতে আসবার আশা আছে, তাই তুমি মনি-লেণ্ডিংকে কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট বলে ব্যখ্যা কর, চাষীকে জমির মালিক স্বীকার কর না।

সরোজকান্তি চটিয়া গিয়া বলিত,

—একশ বার স্বীকার করি না। আমি ত বুর্জোয়া উকিল নই। আমি চাই nationalisation of the means of production, nationalisation of land. জমির উপর

private ownership কেন স্বীকার করব? মহামানব লেনিন কি বলেছেন জানেন?...

তার পরেই তুমুল ব্যাপার লাগিয়া যাইত।

৫

কিন্তু এ সকল তর্ক সত্ত্বেও রামেশ্বর বাবু মনে মনে স্বীকার করিতেন যে সরোজকান্তি প্রকৃতই নিষ্ঠাবান কম্যুনিষ্ট। প্রকৃতই বাংলা দেশে কম্যুনিষ্ট মতবাদ আজ যে লোকের কাছে পরিচিত হইয়াছে তাহা কেবল সরোজকান্তির অর্থব্যয় ও তাঁর নিজের চেষ্টার ফলে। সুতরাং সাক্ষাতে সরোজকান্তিকে মুখে যাহা আসে তাই বলিলেও দলের ও বাহিরের লোকের কাছে তিনি উচ্চকণ্ঠে তার প্রশংসা করিতেন। একবার এক কাগজ বিদ্রূপ করিয়া লিখিল যে, এদেশে যথার্থ কম্যুনিষ্ট মতবাদ যদি শিখিতে চাও তবে দালাল সরোজকান্তি ও পুলিশকোর্টের উকিল রামেশ্বর সেনের কাছে যাও। এই বিদ্রূপে রামেশ্বর চটিয়া লাল-নিশান ও হাতুড়ি হাতে গোলদীঘিতে গমন করিয়া এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,—পেটে যার বোমা মারিলে 'ক' অক্ষর বাহির হয় না সে হইল এদেশের লোকশিক্ষক কাগজের সম্পাদক; এক ফোঁটা দেশ প্রেম না থাকিলেও দেশপ্রেমের

ঢাক বাজাইয়া যে পেট চালায়—সে হইল এদেশের পেট্রিয়ট; ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অপরিমেয় ধনসম্পত্তি ও ক্ষমতা হাতে পাইয়াও কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের সাহায্য ছাড়া যার জমির উপর দখল রাখিবার একতিল ক্ষমতা নাই সে হইল এদেশের জমিদার; ধর্ম্মকে যে দেশ ছাড়া করিয়াছে সে হইল এদেশের ধার্ম্মিক; সুতরাং এ-হেন দেশে যে দালাল ও পুলিশ-কোর্টের উকিল কম্যুনিষ্ট হইবে তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়; বিচিত্র এই যে এরা আবার দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে চেষ্টা করে, দাঁতে দাঁত লাগিয়া ডাক্তার ডাকিতে হয় না ইত্যাদি।

বক্তৃতার মাঝখানে নেড়া-মাথা এক ছোকরা লাফ দিয়া রামেশ্বরের হাত হইতে লাল নিশানখানা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল। তার মাথাটা যে চুলশূন্য এ কথা বোধ হয় তার খেয়াল ছিল না। ফলে রামেশ্বরের ডান হাতের হাতুড়ীর এক ঘায়ে সে বাতোন্মূলিত কদলীবৃক্ষের মত মাটিতে পাতিত হইল। তারপরেই বিষম গোলমাল, মারামারি এবং নিশান ও হাতুড়ী পকেটে গুঁজিয়া রামেশ্বরের নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান।

পরদিন এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে খবরের কাগজে যে রিপোর্ট বাহির হইল তাহা হইতে আমরা জানিতে পারিলাম যে সভাস্থলে বিষম ভিড় ও গুণ্ডার উপদ্রব হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রযত্নে শান্তি স্থাপিত হয় এবং এক মুণ্ডিতমস্তক সনাতনী গুণ্ডা ধৃত হইয়া পুলিশের হাতে সমর্পিত হয়।

রামেশ্বরের বক্তৃতার এই রিপোর্টের এক অপ্রত্যাশিত ফল ফলিল। বক্তৃতা হইবার তিন কি চারদিন পরে রামেশ্বর বাবু সকাল বেলা আফিস-কামরায় 'হাতুড়ী' পত্রিকার (তাঁর দলের কাগজ) সম্পাকীয় স্তম্ভে চোখ বুলাইতেছিলেন এমন সময়ে বেয়ারা একখানি কার্ড আনিল। পড়িয়া দেখিলেন 'চরকডাঙ্গা ফরাস সভা'র সভানেত্রী শ্রীপ্রীতিময়ী বিশ্বাস বি-টি দেখা করিতে আসিয়াছেন।

খদ্দর-পোষাকে দিব্য লম্বা নেতৃ-উপযোগী চেহারার মহিলা। রং সাদা হইলে আমেরিকান বলা যাইত। ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানি খালি চেয়ারে বসিয়া প্রথমে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

—আপনি বাবু রামেশ্বর সেন, ভকিল ?

—আজ্ঞা হ্যাঁ, আপনার প্রয়ো......

—প্রয়োজন আছে বই কি। বিনা প্রয়োজনে নষ্ট করবার মত টাইম আমার নাই। কার্ডে দেখেছেন আমি চরকডাঙ্গা ফরাস সভার সভানেত্রী। তা ছাড়া কাশীপুর ধাঙ্গড়-হিতৈষিনী সভার সভানেতৃত্ব ও গঙ্গোত্রী জুটমিল শ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদিকার কাজও আমাকেই করতে হয়। দেশে এমন একজন রেসপন্‌সিবল লোক নাই যার হাতে এগুলির কোনটার দায়িত্ব ভরসা করে ছেড়ে দিই। এ-সকল ছাড়াও মিডনাপোর-কাম-বাঁকুড়া মেড্‌সার্ভেন্টস্‌ এসোশিয়েশনের অরগানাইজারও আমি। কতদিক সামলাই বলুন ?

রামেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিলেন,

—তা বটে।

রামেশ্বর বাবুর অজ্ঞাতসারেই মাথা-নাড়াটা বোধ হয় একটু প্রয়োজনাতিরিক্ত হইয়াছিল অথবা মাথা-নাড়াটা সভানেত্রী মহাশয়া আদৌ পছন্দ করেন না। স্বর একটু চড়াইয়া তিনি বলিলেন,

—মিঃ সেন, দেশে মাথা নাড়িবার লোক যথেষ্ট আছে। আপনার মত লোকের কাছে চাই গঠনমূলক প্রস্তাব। আমি একটি নারী কম্যুনিষ্ট সঙ্ঘ গড়তে চাই। আপনি এ বিষয়ে সাহায্য করতে বাধ্য এজ্‌ এ কম্যুনিষ্ট লিডার। কি সাহায্য করতে পারেন বলুন?

রামেশ্বর বাবু হাতের কাগজখানা নামাইয়া রাখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু ভাবিলেন। তারপর বলিলেন,

—আপনাকে সাহায্য করতে আমি বাধ্য, একথা যথার্থ বলেছেন। আচ্ছা দেখা যাক্। আপনাকে মিসেস সরোজকান্তি দত্তের সঙ্গে ইণ্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি, তাঁকে দলে পেলে আপনার কাজ যথেষ্ট এগিয়ে যাবে—হার ফাদার ইজ এ মিলিওনেয়ার। মিঃ দত্তও সাহায্য করবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

—বেশ চলুন।

—আগে ফোনে এনগেজমেণ্ট করতে হবে। তিনি ভয়ানক বিজি মহিলা, হাতে বিস্তর কাজ কি না। আপনি বরং ও-বেলা......আচ্ছা, একটু ওয়েট করুন......

ফোনে কিয়ৎকাল আলাপের পরে স্থির হইল আগামী কল্য বিকালে তাঁরা সরোজকান্তির গৃহে যাইবেন।

৬

সরোজকান্তির গৃহে সেদিন পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানের সফলতা কামনায় বিশেষ পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে সুমতি উপবাস করিয়া যথারীতি পূজার্চ্চনা করিয়াছিল, তারপরে প্রসাদবিতরণ হইয়াছিল। সকলকে প্রসাদ বিতরণ শেষ করিয়া বেলা গড়াইয়া সুমতি নিজে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিল। কাছে বসিয়া সরোজকান্তি বলিতেছিলেন, ষ্ট্যালিনের মত ক্ষমতা হাতে পাইলে এদেশে এই ফাইভ ইয়ার প্ল্যান—মানে পঞ্চবার্ষিকী স্কীম প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি কিভাবে দেশের চেহারা ফিরাইয়া দিতেন। এমন সময়ে খবর আসিল একটি মহিলা ও রামেশ্বর বাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন। সরোজকান্তি নীচে নামিয়া গেল।

স্বামীর সঙ্গে রামেশ্বর ও এক মহিলা দেখা করিতে আসিয়াছে। একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ। একা রামেশ্বরকে লইয়াই সুমতি অস্থির, তার উপর আবার কোথাকার এক মহিলা! কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সুমতি উঠিল। আস্তে

আস্তে নীচে নামিয়া সরোজকান্তির বসিবার ঘরের পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া মহিলাটিকে দেখিবার চেষ্টা করিল। কি কাপড় পরিবার ঢং মাগো! মুখে একগাদা স্নো মাখিয়াছে দেখি, বাজারে বুঝি স্নো আর কিনিতে পাওয়া যাইবে না! এমনি পোষাক করিয়া পুরুষদের সঙ্গে যে চলাচলি করে সে নাকি আবার কমিনুষ্ঠ! তা তার স্বামীর কাছে আবার কিসের দরকার? রামেশ্বরটাকে লইয়া বুঝি সুবিধা হইল না? আচ্ছা রোসো।—অত্যন্ত বিরসবদনে সুমতি উপরে উঠিয়া গেল। আসামাত্র ওটাকে ঝ্যাঁটা মারিয়া বিদায় করেন নাই এজন্য স্বামীর উপরেও তার একটু অভিমান হইল। গল্পে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছেন, ভারি আহ্লাদ হইতেছে, না?

বিরসবদনে সুমতি উপরে গিয়া মেজের উপরে শুইয়া পড়িল।

সরোজকান্তি বলিতেছিলেন,—এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে, আপনার সঙ্গে আরও কথবার্ত্তা বলতে চাই। কিন্তু আমার স্ত্রীর ক্রনিক অসুখ, আজ আবার একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছে, কাজেই আজ আর......

চাকর একখানি তার আনিয়া সরোজকান্তির হাতে দিল। সুমতির নামে। ক্ষিপ্রহস্তে লেফাফা ছিঁড়িয়া একবার চোখ বুলাইতে সরোজকান্তির মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—এক্সকিউজ মি। আমার ফাদার-ইন-লা'র সিরিয়াস অসুখ। নমস্কার।

তার হাতে করিয়া সরোজকান্তি দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেলেন। মেজের উপরে যেখানে সুমতি শুইয়াছিল সেখানে উপস্থিত হইয়া তারখানা তার গায়ে ছুঁড়িয়া মারিলেন। চেঁচাইয়া বলিলেন,

—আনন্দ করো, আনন্দ করো,—বড় আনন্দের সংবাদ দিয়েছেন। বুড়ো বয়সে ছেলে হয়েছে। তার ক'রে কন্যাকে জানাচ্ছেন! বোষ্টম,—বোষ্টম না আর কিছু! চশমখোর কি বোষ্টম হয়?

একটু থামিয়া দম লইয়া সুমতির দিকে ক্রূর দৃষ্টি হানিয়া আবার বলিলেন,

—ভাই হয়েছে, একটু কেত্তন করো। এই বয়সে...একটু সংযম নাই। এই জন্যই ত হিন্দুজাতি ধ্বংস হল। হতাম যদি ষ্ট্যালিন সমস্ত জমিদারী এই দণ্ডে নেশনালাইজ করে দিতেম। দাঁড়াও কসে একটা আর্টিকেল ছাড়ছি...।

সুমতির রাগ চড়িয়াইছিল। স্বামীর ইতর কথায় ও ব্যবহারে বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে আজন্ম-বৈষ্ণব, স্বামীর মুখে মুখে জবাব দিবার লোভ দমন করিল। ঘর ছাড়িয়া সে বাহির হইয়া গেল। তারপর কাপড় ছাড়িয়া

পূজার গরদের সাড়ী পরিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। গঙ্গাজলে হাত ধুইয়া মহাপ্রভুর পার্শ্বে রক্ষিত হতভাগ্য কার্ল মার্কসের চিত্রখানি আলগোছে তুলিয়া লইয়া কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

তারপরে গলায় কাপড় জড়াইয়া মহাপ্রভুর সম্মুখে আছাড় খাইয়া বলিতে লাগিল,

—হে প্রভু, আমার স্বামীকে সুমতি দাও !

বাড়ীতে তখন তুমুল ব্যাপার লাগিয়া গিয়াছে, কথাটা প্রচার হইয়া গিয়াছিল কিনা।

BLUE BLACK
KAJAL-KALI
SPECIALLY MADE FOR ALL FOUNTAIN PENS
CHEMICAL ASSOCIATION CALCUTTA

Chemical Association

55, Canning Street,
Calcutta

কাজল কালী ব্যবহার করে
সন্তোষ লাভ করেছি।
এর কালিমা বিদেশী কালীর
চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।
ইতি ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্র ও চরিত্র

মহেন্দ্রলাল সরকার

উনবিংশ শতাব্দী অনুশীলনের যুগ। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা বিশেষভাবে এই যুগধর্ম্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। ইহার ফলে বঙ্গজীবনের বিভিন্ন বিভাগে প্রতিভার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্য, ধর্ম্ম ও দেশাত্মবোধের ক্ষেত্রে নবজাগ্রত বাংলার জীবনে যে সাড়া জাগিয়াছিল, হৃদয় দিয়া আজও তাহার স্পন্দন অনুভব করিতে পারা যায়। সেদিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের আবির্ভাবে বিজ্ঞানের অনুশীলন অপরূপ শ্রদ্ধা ও শক্তির প্রেরণা লাভ করে।

১৮৩৩ সাল রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের বৎসর। ১৮৩৩ সাল রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মাব্দ। এই স্মরণীয় বৎসরেই মহেন্দ্রলাল সরকার জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যে পিতামাতাকে হারাইয়া মহেন্দ্রলাল কলিকাতায় মামার বাড়িতে মানুষ হন। এই দরিদ্র কিন্তু মেধাবী ছাত্র বিদ্যালয়ের অলঙ্কার ছিল। হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় বিজ্ঞানের উপর তাঁহার প্রবল ঝোঁক পড়িল। বিজ্ঞানের আকর্ষণে তিনি মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিলেন। সেদিনের মেডিকেল কলেজে তাঁহার সমতুল্য ছাত্র কেহ ছিল না। এম-ডি ডিগ্রি লাভের পর যখন এই উদীয়মান ডাক্তারের নাম চিকিৎসক-মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ঠিক সেই সময় হঠাৎ মরগ্যানের একখানি বই পড়িয়া হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল জাগ্রত হইয়া উঠিল।

এই খ্যাতনামা ডাক্তার যখন হোমিওপ্যাথিকে বরণ করিয়া লইলেন তখন চিকিৎসা-জগতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সম্পন্ন রোগীরা আর তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে ডাকে না। বন্ধুরা ধিক্কার দেয়। মহেন্দ্রলাল অটল। সহস্র বাধা-বিঘ্নের মধ্যে আত্মবিশ্বাস অনুসারে কাজ করিবার প্রবৃত্তি মহেন্দ্রলালের চরিত্রের এক বিশিষ্ট লক্ষণ। তিনি বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন। এই দিক দিয়া বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার চরিত্রগত মিল ছিল।

চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অতুলনীয় সাফল্য এবং ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জন্যই মহেন্দ্রলাল বড় নহেন। ছাত্রাবস্থা হইতে যাহা তিনি জীবনের ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বিজ্ঞানের শিক্ষাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি তাঁহার সকল শক্তি নিয়োগ করিলেন। তাঁহার জীবনের ব্রত সাফল্য লাভ করিয়াছিল। সায়ান্স-এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা তাঁহার একনিষ্ঠার ফল। এই বিজ্ঞান-মন্দিরে কাজ করিয়া মাদ্রাজী রমন আজ খ্যাতি ও নোবেল প্রাইজ উভয়ই অর্জ্জন করিয়াছেন। এই অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞানব্রতী বাঙালী মহেন্দ্রলালের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া এই একাগ্র সাধক ১৯০৩ সালে, সত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

এই বাহ্যতঃ কর্কশপ্রকৃতি, দৃঢ়চিত্ত, কায়মনোবাক্যে একনিষ্ঠ, সত্য এবং বিজ্ঞানের পূজারী একান্ত উদার এবং অতি স্নেহময় এবং কোমলান্তঃকরণ পুরুষ ছিলেন।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

বুদ্ধি কেবল জীবনের পরিধিটুকুর মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সে জীবনের আলোচনা করে, ভাষ্য করে, কখনও কখনও জীবনকে প্রকাশও করে। গণ্ডীর বাহিরে কিন্তু কখনো সে সীতার মত পা দেয় না—সীতাহরণও হয় না, রামায়ণও রচিত হয় না। কল্পনা কিন্তু বুদ্ধির মত ভীরু নয়। জীবনকে অভিব্যক্ত করিতে করিতে সাহসিকা কল্পনা জীবনকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। জীবনও তাহার কাছে মূল্যবান, জীবনান্তরও তাহার কাছে তুচ্ছ নয়। মরণকে সে মধুর করে এবং মরণাধিক যাহা তাহাকে মধুরতর করিয়া তোলে। সংসার তাহার কাছে অসার নয়, কিন্তু সংসার ছাড়াইয়া যাহা তাহাকেও সে আপনার মধ্যে জড়াইয়া লয়। দেশকে সে আপন ভাবে, কিন্তু বিশ্বকে পর মনে করে না। স্বর্গকে সে ভালবাসে, কিন্তু নরককে সে ভয় করে না। সীমার মধ্যে খেলা করিতে করিতে সে সীমাহীনের রাজ্যে গিয়া পড়ে। নীল আকাশের মধ্যেও সে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, এবং নীল চোখের কাছেও সে আত্মহারা হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানের মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যত তাহার আলিঙ্গনে ধরা পড়িয়া যায়।

* * *

বুদ্ধি মনোজগতের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মানিয়া চলে। লজিককে সে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। ঊর্দ্ধলোকে উঠিতে গেলে যুক্তির নিয়ম পদে পদে তাহাকে ব্যাহত করে। সে বিচার করিয়া মাপিয়া মাপিয়া চলে। ব্যবহার-জগতের বস্তুর মত, দস্তুরমত তাহাকে টানা যায়, ছেঁড়া যায়, মাপা যায়। কল্পনা কিন্তু তড়িতের মত পৃথিবী হইতে আকাশে আনাগোনা করে। এইহেতু কল্পনাকে কোনোরূপেই বস্তুতন্ত্র করা গেল না।

* * *

মর্ত্ত্যের সহিত স্বর্গের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সংসারের মধ্যে থাকিয়াও সংসারকে ছাড়াইয়া যায় বলিয়া স্বর্গকে কখনো কখনো সুদূর বলিয়া মনে হয়। সাধারণ লোক সংসারের লোক। সে কেবল বাহিরের জগতের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়া রাখে। পরিবর্ত্তন হইতে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ক্ষণিকের সহিতই তাহার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিচয় ঘটিতে থাকে। শাশ্বতের সাক্ষাৎ পাইবার অবসর তাহার নাই। এই বহির্জগতের অন্তরে এবং বাহিরে কিন্তু আর এক জগৎ অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছে। তৃতীয় নেত্র যাহার উন্মীলিত হইয়াছে, সেই কেবল এই লোকের সন্ধান পাইয়াছে। দেশ-কালের অতীত বলিয়া এই জগতের জরা

নাই। এই মানসলোকে বিচরণ করেন বলিয়া মর্ত্ত্যের মানুষ হইয়াও কবি অমর। সংসার নশ্বর, স্বর্গ চিরন্তন।

* * *

এই চিরন্তনের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া কবি সংসারীকে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের নিগূঢ় সম্বন্ধটিকে স্মরণ করাইয়া দেন।

—আগামী সংখ্যায়—

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

'অব্যবহিতা'

দিন-পঞ্জী

কলিকাতা, ২২শে এপ্রিল—১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশনের বন্দী শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে জব্বলপুর হইতে কার্সিয়াংয়ে তাঁহার নিজ গৃহে বন্দী থাকিবার আদেশ দিয়াছেন। প্রকাশ তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদিও সঙ্গে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

ওয়াশিংটন, ২২শে এপ্রিল—প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড জগদ্ব্যাপী অন্নসমস্যা সমাধানের পন্থা নির্দ্ধারণের জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্টের সহিত আলোচনা করিতে এখানে আসিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জাহাজ হইতে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে বেতার যোগে তিনি এক বক্তৃতা করেন। তাহাতে বলেন—জগতে সর্ব্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা দেখা দিয়াছে ফলে বেকার ও দারিদ্র্য সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহার প্রতিকার কল্পে তিনি এখানে আসিয়াছেন। মিঃ রুজভেণ্ট, তাঁহার পত্নী ও কন্যা সহ দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। 'হোয়াইট হাউসের' ইতিহাসে ইহা প্রথম।

বার্লিন, ২৪শে এপ্রিল—হার হিটলারকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে জড়িত সন্দেহে রিমষ্টিংয়ের নিকট মিউনিক পুলিশ একজন ভারতীয় কমিউনিষ্ট এবং তাহার একজন সঙ্গীকে

একখানি ইটালীর মোটর গাড়ী থামাইয়া গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিদের একজনের নাম ঠাকুর। পরে প্রকাশ তিনি কবি রবীন্দ্রনাথের পৌত্র, শ্রীযুত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা, ২৪শে এপ্রিল—কলিকাতা করপোরেশনের অল্ডারম্যান নির্ব্বাচনে, ৫ জন নিম্নোক্ত সংখ্যক ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা—৫০ ভোট, মিঃ জে-সি-গুপ্ত—৪৭ ভোট, মিঃ শিউ-কিষণ-ভাট্টা—৪৬ ভোট, মিঃ কে-নুরুদ্দিন—৪২ ভোট, অনারেবল মিঃ কে-বসু—৩৯, একমাত্র কংগ্রেস মনোনীত শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে ৩৪টি ভোট পাইয়া পরাজিত হইয়াছেন।

আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে
আর ইনজেক্‌সান লইতে হইবে না
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

C.R. Das

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

ছোট গল্প

১ম বর্ষ] ২৩শে বৈশাখ ১৩৪০ [৪৩শ সংখ্যা

অব্যবহিতা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১লা আষাঢ় ১৩৩৭

আমার জীবনের আকাশে যে দুর্য্যোগ উঠিয়াছিল তাহা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। শুধু এইটুকুই নহে, খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত মেঘের আড়ালে আজকাল একটা চন্দ্রকলা মাঝে মাঝে দেখা যায়। অপেক্ষায় আছি কবে সেটুকু মেঘও বিলুপ্ত হইবে এবং সমস্ত আকাশটা উহারই জ্যোৎস্নায় আলোকিত হইয়া উঠিবে।

বাস্তবক্ষেত্রে এই চাঁদের কণাটুকু সরু রাস্তাটার ওপারে ঐ পঞ্চম বাড়ীটার জানালার ফাঁকে, কিম্বা ছাদের আলিসার

আড়ালে, কখনও আধখানা, কখনও বা আরও কম, আবার কখনও আলোর আভাসটুকু মাত্রেই দেখা যায়। ঠিক যে তৃপ্তি পাই তাহা বলিতে পারি না, অথচ এই ক্ষণিক দর্শনগুলি যে কেবল অতৃপ্তিরই সৃষ্টি করিয়া আমায় বিভ্রান্ত করিতেছে তাহা বলিলেও মিথ্যাই বলা হইবে। ওই-বাড়ীর ওই-কিশোরী সমস্তদিন নিজের খেয়ালে বা সংসারের প্রয়োজন-মত সমস্ত বাড়ীটাতে নিতান্ত সাধারণভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়, আর, পাঁচটা বাড়ীর ব্যবধানে থাকিয়াও আমায় সেই অনাড়ম্বর গতিবিধির জন্য অমন হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় কেন তাহার তো একটা সমীচীন যুক্তি খুঁজিয়া পাই না। অথচ থাকিতেই হয়। নূতন চাকরি, তবুও এরই জন্য কয়েকদিন দেরী হইয়া গিয়াছে। এত কষ্টের পর পাওয়া চাকরি, সাবধান হইতেই হইবে; কিন্তু আপাতত সবচেয়ে বড় কথা—আমার এই পাঁচ-পাঁচটা বাড়ীর ব্যবধান যে আর সহ্য হয় না।

কখনও, যখন ও থাকে ছাদের এক প্রান্তে, আর নিম্ন হইতে ডাক পড়ে—"সদু!" তখন উত্তরে একটা বাঁশীর মত মিঠে আওয়াজে—"আসি", "যাই", "কেন?" এই রকম স্বল্পাক্ষরা সঙ্গীতে এ-বাড়ীর হাওয়াতেও একটা ঝঙ্কার তোলে বটে, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষার অনুপাতে সে আর কতটুকু?

দুটি অক্ষরের কাব্য; কিন্তু শুনিয়া শুনিয়া তো আর মন ওঠে না।—"সদু! সদু!" নিশ্চয় সৌদামিনী—নিশ্চয়ই।

হায়, তাই বলিয়া কি সৌদামিনীর মতই এত বিরল-বিকাশ হইতে হয় !

সে যাই হোক, কিন্তু এ নিষ্ঠুর ব্যবধান যে আর সয় না......

স্বর্গের দুয়ারে বাসা বাঁধিয়াছি। দেবতার অনুগ্রহে মধ্যেকার চারিটা বাড়ীর চারি যোজনের ব্যবধান এক কথায় মিটিয়া গিয়াছে। এখন আমি সদুদের সামনের বাড়ীটায়, মাঝখানে মাত্র সঙ্কীর্ণ গলিটি।

যে দেবতার এই অযাচিত অসীম অনুগ্রহ তিনি সকালে সামান্য এক মানবের বেশে আসিয়া বলিলেন, "মশায়, বলতে বড় কিন্তু হচ্চি ;—কথা হচ্চে ছোট বাড়ীটাতে অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে আপনার কাছে এসেচি। আপনি দয়া করে যদি অদল-বদল করেন তো ছোট বাড়ী বলে আপনার একলার কোন অসুবিধাই হবে না। দুটোই একই লোকের বাড়ী। বাড়ীওয়ালার সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তিনি বলেন আপনি রাজী হলে তাঁর আপত্তি নেই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত দূরে আপনার বাড়ীটা ? কি জানেন—এ গলি ছেড়ে যাওয়া আমার সুবিধে হবে না।"

ছলনাকারী দেবতা বলিলেন, "দূর কিছুই নয় ; মাঝখানে এই চারটে বাড়ী পেরিয়েই পরের বাড়ীটা। আপনার জিনিষ-

পত্র সমস্তই আমি লোক দিয়ে পৌঁচে দোব। খাসা ছোট্টখাট্ট ফিটফাট বাড়ীটি......

তা দেখিতেছি সত্যই চমৎকার বাড়ীটি। যেন একটি ফোটা ফুলের মত। সে আর হইবে না?—আমার স্বর্গের জ্যোতিষ্কের কল্যাণ-রশ্মি যে সারাক্ষণ এর মুখের ওপর আসিয়া পড়িতেছে!

মেয়েটির রুটিন আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে।—এক নম্বরের কুড়ে—ভয়ানক দেরী করিয়া ওঠে। তাহাতে, আমি প্রতিবেশী মাত্র, আমারই বিরক্তি ধরে, বাড়ীর লোকের তো ধরিবেই। ছোট একটি ভাই আছে, সে তো নামই দিয়াছে 'কুম্ভকর্ণ দিদি'।......সকালে গলির পাশের ঘরটিতেই বসিয়া থাকি, বসিয়া বসিয়া বিভিন্ন কণ্ঠের অনুযোগ শুনি, "না বাপু, এ মেয়েকে পারা গেল না; কি অলুক্ষুণে ঘুম!" "হ্যাঁলা, ওঠ্ না, শ্বশুর বাড়ী গিয়ে তোর কি দুর্গতি হবে?" "ঠাকুরঝি ওঠ, শ্বশুরবাড়ীর জন্যে তোয়ের হওয়া চাই তো?"......যেদিন খুব দেরী হইয়া যায় সেদিন একটি বড় স্নেহসিক্ত স্বরও শুনিতে পাই, "সত্নু, ওঠতো দিদি।...... তোমরা মেয়েটাকে রাতদুপুর পর্য্যন্ত খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেললে, কদিনই বা আর আচে তোমাদের এখানে বাপু?"

এটি ঠাকুরদাদার কণ্ঠস্বর, সর্ব্বদাই পৌত্রীর আসন্ন বিদায়ের বেদনায় গাঢ়। এ রকম নাতনীগত প্রাণ মানুষ দেখা যায় না।

এত কাণ্ডকারখানার পর তো বাবু উঠিলেন। তাহার পর সংসারের কাজকর্ম্মে একটু দেখা যায়। কিন্তু এই সময়ে মিনিটে মিনিটে যেমন "সদু!" "ও সদি!" বলিয়া হাঁকাহাঁকি হইতে থাকে তাহাতে আমার মনে হয় মেয়েটি ফাঁকি দেওয়ার নব নব পন্থা আবিষ্কার করিতেই বেশী মনোযোগী। এক-একদিন আবার ঝাঁঝিয়া উত্তর দিতেও ছাড়ে না, "খালি 'সদি' 'সদি' 'সদি', মলেও 'সদি' নিস্তার পাবে না দেখচি—"

গলাটা খুবই, খু—বই মিষ্টি বলিতে হইবে; কেননা এমন রূঢ় কথাগুলাও এর চমৎকার শোনায়!

ইহার পর কোলের ভাইপোটিকে বাঁকা কাঁকালে লইয়া ছাতের উপর উঠিয়া পাশের বাড়ীতে কে সই আছে, আলিসার আড়াল হইতে তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দেওয়া হয়। এই সময় আমি চেয়ারটা জানালার একেবারে কাছে টানিয়া আনি, কারণ কথাবার্ত্তা যা চলে তাহা একটা শুনিবার জিনিষ—অনভিজ্ঞ লোকের ঠিক এইরকম ধারণা দাঁড়াইয়া যাইতে পারে যে বক্ত্রী একটি সংসারভারনির্জ্জিতা প্রকাণ্ড গিন্নী।—"মার দুদিন থেকে শরীরটা কেমন খারাপ যাচ্ছে... দাদা আর বৌদির নিত্যি ঝগড়ার জ্বালায় আর তো পারা যায় না......ছোট ভাইটি কোন মতেই বাগ মানচে না, সমস্ত দিন তার টিকিই দেখা যায় না...বাবার 'সদু' ভিন্ন একদণ্ড

চলে না...ঠাকুরদা ?—উনি নাতনীর হাতের তামাক যে কী চিনেচেন...আর বোলো না, আমার ভাই যদি একটু মরবার ফুরসৎ আচে...।”

এদিকে ক'দিন থেকে মুস্কিলে পড়িয়াছি। খুব তো সঙ্গোপনে ছিলাম, কিন্তু একটু অসাবধানের জন্য সেদিনে চোখোচোখি হইয়া গেল। আর কিছু দুঃখ নাই—কারণ সে একটি মুহূর্ত্তে যাহা পাইয়াছি তাহা জীবনের অতুল সম্পদ হইয়াই থাকিবে;—তবে দুষ্টু সেই অবধি অত্যন্ত সাবধান হইয়া গিয়াছে। গলার সে বাঁশী থামিয়া গিয়াছে, সখীর সঙ্গে সে বিশ্রম্ভালাপ নাই, আর দেখা ?—কোথায় প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছিলাম তাহার বদলে ত্রস্ত, সন্দিগ্ধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এক আধটা অতি চপল বিক্ষেপ—তাহাতে কি আর আশ মিটে ?

আবার এই নিষ্ঠুর সঙ্কোচ ঘর দুয়ারেও যেন সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে।—স্পর্শ-কাতর লজ্জাবতীর পাতার মত জানালার দুটি সবুজ পাল্লা খড়খড়ি সমেত প্রায় বুজিয়াই থাকে। ঐ এক জনের লজ্জা অমন মুখর বাড়ীটাকে যেন মৌন, নতমুখী করিয়া দিয়াছে। পাশের আমার এ-বাড়ী থেকে সর্ব্বদা যেন একটা তপ্তশ্বাস ওঠে।

একদিন দুপুরবেলা আপিস হইতে পলাইয়া আসিয়া একটু সুফল পাইয়াছিলাম।—বাহিরের ঘরে ঠাকুরদাদার

তামাকের সরঞ্জাম করিতে করিতে মাঝে মাঝে সুমিষ্ট রসালাপ চলিতেছিল; চুরি করিয়া খুব শোনা গেল। এই মেয়ে জাতটা যে কী তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অতটুকু বেলায় আমাদের জিভের আড় ভাঙে না, আর ঐ একফোঁটা মেয়ে, হদ্দ তের থেকে চৌদ্দ বছরের মধ্যে হইবে, সমানে ষাট বছরের বুড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়া গেল। যাহার হাতে পড়িবে তাহাকে নাজেহাল করিয়া ছাড়িবে দেখিতেছি।

সে-কথা যাক্, এরকম ভাবে আপিস-পালানো তো রোজ চলে না। অথচ মন যে-ক্ষেত্রে পলাতক সে-ক্ষেত্রে জড়পিণ্ড শরীরটাকে সুধু সুধু বসাইয়া রাখিয়াই বা ফল কি?...এরকম-ভাবে সমস্ত দিন একটু দেখার তৃষ্ণা, একটু কথার তৃষ্ণা লইয়া কত দিন চলিবে?

হে সুন্দরী, একেই তো এই গলির আর ঐ দেয়ালগুলার নির্ম্মম ব্যবধানের বাহিরে ঝুরিয়া মরিতেছি, তাহার উপর আবার এই কঠোর মৌনতার পাষাণভার কেন?

৩০শে আষাঢ়

দারুণ নিরাশায় অবশেষে সাহস আনিয়া দিল। ওর ঠাকুরদার সহিত আলাপ জমাইয়া লইয়াছি।

গিয়া বলিলাম, "আমার একটি বন্ধু আসবে আজ দুপুর বেলা; সে-সময় আমায় আপিসে থাকতে হবে। দয়া করে

যদি এই চাবিটা তাকে দিয়ে দেন। তাকে বলা আছে, আপনার কাছে আসবে।...মানে হচ্চে—নতুন চাকরি, অসময়ে আপিস ছেড়ে আসাটা...বুঝলেন কিনা...”

কথাটা আগাগোড়া বানানো। তা যে রকম অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অত সত্য মিথ্যা বাছিতে গেলে তো মারা যাইতে হয়।...আমার দৃঢ় বিশ্বাস সত্যপ্রিয় বলিয়া ইহলোকে যাঁহারা নাম কিনিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের কাহাকেও এইরূপ একটি চতুরাকে ভাল বাসিয়া নাকাল হইতে হয় নাই। সুবোধ এবং সত্যবাদী বলিয়া আমারও একসময় যশ ছিল; এখন দেখিতেছি তাহা রাখিতে পারিলে হয়।

ঠাকুরদাদা নাকের ডগায় চশমা দিয়া কি পড়িতেছিলেন। নাকটা আরও নীচু এবং চোখটা উঁচু করিয়া আমায় নিরীক্ষণ করিলেন, তাহারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এই সামনের বাড়ীটাতে থাকো? তা, কৈ দেখি না তো কখনো?”

বলিলাম, “থাকি বড় কম; প্রায় সমস্ত দিনটা আপিসে চাকরি সামলাতেই কেটে যায়...আজকালকার বাজার, জানেনই তো।”

“কি নাম তোমার বাপু? নতুন এসেচ নিশ্চয়; একলা থাক নাকি?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, এই দিন পাঁচ ছয় হোল এসেচি।” নামও বলিলাম।

"বেশ, বেশ; বোস। তাইতো বলি,—আজ সদুকে যখন বললাম, 'ঘোষেরা সামনের বাড়ী থেকে উঠে গেচে, নতুন কারা এল বলতে পারিস?' সে বললে, "কই, কাউকেও তো দেখতে পাই না'।"

মনে মনে হাসিলাম, ভাবিলাম একটা শুভ লক্ষণ বটে,—মিথ্যা বলাটা তাহা হইলে ও তরফেও দরকার হইয়া পড়িয়াছে! জিজ্ঞাসা করিলাম, "সদু কে?—সেই যে ফর্শাপানা ছোট ছেলেটি স্কুলে যায় দেখি?"—মুখে একটুও বাধিল না; সদুর প্রসঙ্গটা উঠিয়াছে, একটু চালাইতেই হইবে।

ঠাকুরদাদা হাসিয়া উঠিলেন। এত হাসিলেন যে আমার ভয় হইল—বুঝি চতুরালি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বলিলেন, "না, সে সদু হতে যাবে কেন? সে আমদের ঝড়ু; সদু হচ্চে ওর বোন। অমন মেয়ে দেখেচ কিনা বলতে পারি না; আর কিছু নয়তো গড়ন ওরকম...ওরই বের জন্যে দিন দেখতে তো এই পাঁজি নিয়ে বসেচি। এই দেখনা. শ্রাবণ মাসে দুটো দিন আচে (পাঁজিটা আমার দিকে ঠেলিয়া দিলেন)...না, তোমার বুঝি আবার আপিসের তাড়া..."

নিজের বাঞ্ছিতার জন্য পাঁজি দেখা ইহার পূর্ব্বে কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কিনা জানি না। লজ্জাকে এতদূর পর্য্যন্ত পরাভব করা অসম্ভব হইয়া পড়িল, বলিলাম, "হ্যাঁ, এখন তাহলে আসি; দয়া করে চাবিটা..."

"সে তুমি নিশ্চিন্দি থেকো।"—বলিয়া বৃদ্ধ আমায় কবাট পর্য্যন্ত আগাইয়া দিলেন, আবার বলিলেন, "মাঝে মাঝে এসো ; এইতো একই বাড়ী।"

বলিলাম, "নিশ্চয় আসব ; আমার তো সঙ্গীর বড়ই অভাব।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তা যদি বললে, সঙ্গীর অভাব আবার সব অভাবের ওপরে। জানি কি না। আমার বুড়ো বয়সের সঙ্গী হয়েচে নাতনীটি। তা বলতে কি, একদণ্ড যদি তাকে না দেখেচি, কি তার কথা না শুনেচি তো...সে আর কি বলব। তোমারও তো ঠিক সেই রকমই হয় ?"

বলিলাম, "হ্যাঁ, হয় বই কি।" উত্তর দিয়া কিন্তু বুঝিতে পারিলাম বৃদ্ধের প্রশ্নটাও বেখাপ্পা হইয়াছে, আমার উত্তরটাও।

—কথাটা কিন্তু সত্য, যেন প্রাণের কথা অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। কয়টা দিন যে কী গিয়াছে তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নাই, আপিস যাইতে পা ওঠে না, জানালাটির পাশে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছি—কখন ছাতে ভিজা নীলাম্বরী শাড়ীটি মেলিয়া দিতে আসিবে, ঐ কৃপণ, বদ্ধ জানালার সঙ্কীর্ণ ফাঁক দিয়া কখন একটু তরল আওয়াজ ভাসিয়া আসিবে, ঠাকুরদাদার ঘরে কখন কলহাস্যের ঢেউ উঠিবে—সেই আশায়। বৈষ্ণব ভিখারী নিত্যই আসে, তবে আপিসের সময় উৎরাইয়া গেলে। তবুও

কখন কখন বসিয়া থাকিতাম। দ্রুততালে মন্দিরা বাজাইয়া গান গাহিবে—

(প্যারীর) দরদ ভেল জীবন-নিধি
সঙ্গোপনে মরমে ধরে
সখিরেও নাহি কহয়ে কিছু বাণী
(প্রেমের কথা প্রকাশ করে না, বুকের ব্যথা বুকে পুষে রাখে,
প্রকাশ করে না)

……………………………

প্রথমে দরজার কাছে আসিয়াই শুনিত, কিন্তু সেই চোখাচোখি হওয়া অবধি জানালাটি ঠেলিয়া দিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিত। আমি দেখিতে পাইতাম না বটে, তবু অন্ধের মত প্রাণ দিয়া অনুভব করিতাম। গান শেষ হইয়া গেলে ভিখারী বাদ্যযন্ত্রে দুটা বড় ঘা দিয়া বলিত, "কৈ গো দিদিমণি, একমুঠো দিয়ে দাও লক্ষ্মীমণি, আবার অন্য বাড়ী আচে।"

লক্ষ্মীমণি ক্ষণিকের জন্য বাহির হইত, দুইটি ভিখারীকে একসঙ্গে তৃপ্ত করিয়া আবার ত্বরিতে চলিয়া যাইত।

ওর ঠাকুরদাদা ঘরে থাকিলে বৈষ্ণব বাবাজীর জ্যোতিষ-জ্ঞানভাণ্ডের মুখটা খুলিয়া কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাইতে হইত। সে সব প্রশ্নও বাঁধা, তাহাদের উত্তরও প্রায় একই। ঠাকুরদাদা জিজ্ঞাসা করিতেন, "গোঁসাইজি, তারপর, মেয়েটার বরের ভাগ্যি কেমন দেখচেন?"

গোঁসাইজি বলিত, "ঐ যে বললাম দা'ঠাকুর, মা আমা শাপভ্রষ্ট দেবকন্যে ; ও আর দেখতে আচে ?"

ঠাকুরদাদার মুখটা আনন্দের হাসিতে ভরিয়া উঠিত। বলিতেন, "না, না, সে ভাগ্যি কি আমরা করেচি ?" তারপর আবার গম্ভীর হইয়া পড়িতেন ; প্রশ্ন হইত, "আচ্ছা, বর জুটতে এত দেরী হচ্চে কেন বলতে পারেন ? আমি ঐখানটা বুঝতে পারি না।"

বাবাজি বলিত, "ঠিক ঐ জন্যেই ; এক যে-সে এসে বিয়ে করে নিয়ে গেলেই তো হোল না, দাদাঠাকুর। তবে আমি দেখলাম খড়ি কেটে—বর রথে চড়েচে, আর দেরী নেই।"

ঠাকুরদাদার তখনকার মত সন্দেহটা মিটিয়া যাইত। বৈষ্ণব খানিকটা ফৌজদারী বালাখানার তামাক কিম্বা দুটো পয়সা লইয়া 'জয় রাধে শ্যাম' বলিয়া বিদায় হইত।

এইরকম ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপারগুলি সমস্তই আমার অন্তরের বিরহব্যথায় করুণ হইয়া উঠিত। এক একদিন ভিখারী চলিয়া গেলেও চেয়ারের হাতলে মাথা রাখিয়া বসিয়া থাকিতাম। সকালে নাওয়াখাওয়া যেমন নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইত, এ-সময় আপিস যাওয়াটাও ঠিক তেমনি একটা বাজে কাজ বলিয়া মনে হইয়া মনটাকে সারা জীবনটা সম্বন্ধেই নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল করিয়া দিত।...ঝকঝকে, তকতকে, মনোরম ঘরে বসিয়া থাকিতাম, সামনে কোমল শয্যা, আলনায় ভদ্রোচিত কাপড়চোপড়, প্রয়োজনাতিরিক্ত দু'একটা সৌখিন

দ্রব্যও সাজানো থাকিত, আপিসে সাহেবের অপরিমিত প্রীতি-দৃষ্টিও ছিল; কিন্তু কিছুতেই স্বাদ ছিল না, এবং এসবের তুলনায় দুদিন আগে যে রাস্তায় রাস্তায় সেই নিরুদ্দেশভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো—সেটাকে তেমন বিশেষ দুঃখকর বলিয়া বোধ হইত না। মনে হইত, আর যাহাই হোক, তাহার মধ্যে একটা বিশাল স্বাধীনতা ছিল। তখন অমৃতের সন্ধানও পাই নাই, আর সে-কারণ এই দারুণ অভাবের কঠোর যন্ত্রণাও ছিল না। এক কথায়—আমার কাছে দুঃখের স্মৃতিতে আর দুঃখ ছিল না এবং প্রত্যক্ষ সুখের মধ্যেও সুখ ছিল না; সদ্বর বিরহ-ব্যথা আমার অতীত কালের যন্ত্রণা, বর্ত্তমানের সুখ সাচ্ছন্দ্য এবং ভবিষ্যতের আশা নিরাশা—সমস্তইকেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।...যেন বন্যার জলে সব একাকার করিয়া দিয়াছে, ফুলের বাগানও ডুবিয়াছে, কাঁটার বনও ডুবিয়াছে, আছে খালি দিগন্তপ্রসারিত গাঢ় জলরাশি।

তাই বলিতেছি সে যে কী যন্ত্রণায় কটা দিন গিয়াছে তা অন্তর্য্যামীই জানেন।

৭ই শ্রাবণ

ঠাকুরদাদাকে সেই তো ভাব করিয়া চাবি দিয়া আসিলাম; বিকালবেলা দেখা করিতেই বলিলেন, "কই ভায়া, তোমার বন্ধু তো এলেন না। আমি সমস্তদিন এইখানে ঠায় ব'সে, জলখাবারটাবারও আনিয়ে রাখলাম, কিন্তু কই— ?"

অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলাম; একটা মিথ্যা কথা বলিয়া সমস্তদিন বৃদ্ধকে এতটা কষ্ট দিলাম! আসল কথা, এত অন্যমনস্ক ছিলাম যে এ-সম্ভাবনাটাই মনে উদয় হয় নাই। ইহার উপর উনি যে আবার আতিথ্যের আয়োজন করিয়া বসিবেন তাহা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারি নাই; তা হইলে না হয় মিথ্যা কথাটার উপর আর একটু জুড়িয়া দেওয়া যাইত যে আগন্তুক বন্ধুর জন্য ঘরে সমস্ত আয়োজন সারিয়া রাখিয়াছি।

সমস্ত দোষ সদুর, ও আমার মন লইয়া যে কী যাদু করিয়াছে ওই জানে।

ঠাকুরদাদা বলিলেন, "তা-হলে তোমায়ই এনে দিক, একটু জল খেয়ে নাও।...না, সে হয় না; তবুও তোমার বন্ধু না খেয়ে তুমি খেলেও আমাদের একটা সান্ত্বনা থাকবে।...সদু, ও সদু!—বলি, ও বড় গিন্নি!...এটি আমার পাতানো সম্বন্ধ।"—শেষের কথাগুলি বৃদ্ধ বড় গিন্নির টীকাস্বরূপ আমায় বলিয়া স্মিত করিলেন।

ঝড়ু দুয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "কি?"

"বলি, সে কোথায়?"

ঝড়ু দুয়ারের পিছনে তাকাইল।

ঠাকুরদাদা বলিলেন, "হয়েচে; নিজে আড়ালে থেকে বুঝি তোমায় চর পাঠিয়েচেন। বল সেই খাবার, জল, পান সব নিয়ে আসতে।"

ঝড়ু আর একবার অন্তরালে তাকাইয়া বলিল, "বলচে 'তুই আনগে'।"

"কেন ?...ও, হয়েচে !"—বলিয়া ঠাকুরদাদা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তোমায় লজ্জা, বুঝেচ ভায়া ? আমার এতক্ষণ ঠাওরই হয় নি।"

বৃদ্ধ উঠিয়া গিয়া, সঙ্কোচে জড়সড়, লজ্জায় রাঙা-মুখ নাতনীকে ধরিয়া আনিয়া আমার হাততিনেক দূরে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "পাশের বাড়ীর লোক, ছেলে মানুষ ; ওকে আবার এত লজ্জা ?...এইবার লজ্জা ভাঙলো তো ? যাও, খাবার নিয়ে এস।...কই হে ভায়া, তুমিও যে দেখচি আবার মুখ নীচু ক'রে রইলে ;—সব সমান !"

এটা গেল প্রথম পরিচয়ের কাহিনী। এখন আর সদু আমার সামনে আসিতে জড়সড় হয় না, আমিও উহাকে কাছে পাইলে নিজের হাতের আঙুল লইয়া গবেষণায় ব্যস্ত থাকি না। ছাতে নীলাম্বরীটার খাতির বাড়িয়া গিয়াছে। সদু একবার তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিংড়াইয়া খুব পরিপাটি করিয়া ভাঁজ খুলিয়া শুখাইতে দেয় ; তাহারপর শুখাইল কি না সে তদারকও মাঝে মাঝে করিয়া যায়। আমার সহিত এ-সময় প্রায়ই দেখা হয় ; কখনও হাসিয়া চলিয়া যায়, কখনও ছোট ভাইয়ের কথা পাড়ে, "আজ ঝড়ু ঠিক সময় পড়তে গিয়েছিল অজিতদা ?" কিম্বা "ওকে খুব শাসনে রাখবেন"—অথবা ঐ রকম গোছের একটা কিছু।

এদিকে সেই অকরুণ জানালা দুটিও দরদী হইয়া উঠিয়াছে, দুহাত ভরিয়া আমায় শব্দ আর রূপের সম্ভার বিলায়। সকালে ঝড়ু যখন আমার কাছে পড়ে, সদু আসিয়া মাঝে মাঝে জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়ায়। কয়েকটি নিয়মিত প্রয়োজন থাকে;—প্রথমত ঝড়ুকে খাবার খাইবার জন্য ডাকা; তাহার কিছু পরে আমার চা লইয়া আসিবার জন্য ফরমাইস করা, এবং সবশেষে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, স্নানের সময় হইয়াছে—এই সব খবর দেওয়া; যদিও তাহার বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকে না, কারণ আমার কাছেও ঘড়ি থাকে, এবং ওবাড়ীর ঘড়িটা ঢং ঢং করিয়া যখন বাজে তখন ঝড়ুর সতর্ক কর্ণে সবচেয়ে আগে তাহার খবর পহুঁছায়।

মাঝে মাঝে গিয়া ঠাকুরদাদার কাছে বসি। প্রায় দেখি হুঁকা হাতে করিয়া, নয় পাঁজিটা খুলিয়া, না হয় সদুর ঠিকুজিটা মেলিয়া গভীর মনোনিবেশের সহিত ঝুঁকিয়া চাহিয়া আছেন। বলেন, “ভাবনার কথা নয়, অজিত ভায়া?—ঠিকুজিতে লিখচে ‘ত্রয়োদশবর্ষপ্রাপ্তৌ’ বিয়ে হয়ে যাবে; তা কোন লক্ষণ কি দেখতে পাচ্চ? তুমিই বলনা? বাপকে বললে বলে, “সময় হলেই হবে’—দিব্যি নিশ্চিন্দি আছে।”

আমি বিজ্ঞের মত বলি, “না, নিশ্চিন্দি থাকাটা আর তো কোনমতেই উচিত হয় না।”

এ-সমর্থনটুকু পাইয়া ঠাকুরদাদার উৎসাহ ও আমার প্রতি শ্রদ্ধা অত্যন্ত বাড়িয়া ওঠে। বলেন, “এই তো সমঝদারের

মতন কথা। ওরা সব বলবে—‘ছেলে-মানুষ’। হ্যাঁহে অজিত, তের বছরের মেয়ে ছেলে-মানুষ হল? তুমিই বল না। তের পেরিয়ে গেছে, কোন্ দিন এবার চোদ্দয় পড়বে।... ব্রহ্মজ্ঞানী নয়, খ্রীশ্চান নয়......

বলিতে গিয়া কথাটা একটু জড়াইয়া গেল্লেও আমি বলি, “না, ছেলে-মানুষ তো আর মোটেই বলা চলে না......”

ঠাকুরদাদা মাথা কাৎ করিয়া, চোখ দুটো বড় করিয়া বলেন, “মো—টেই আ—র বলা চলে না; ঠিক, আমারও এই কথা। না ভায়া, ঐ যে বললাম—তুমি ভেতরে ভেতরে চেষ্টা কর। আমায় তো দেখচই, বাতে পঙ্গু, জ্যান্তে ম’রে আচি।...বেশ ভাল ক’রে দেখেচ তো মেয়েটাকে? একেবারে নিখুঁৎ ক’রে বর্ণনা করবে। না হয়, নিজেই এসে দেখে যাক্, কাজ কি? দেখি, একবার চোখে দেখলে কোন্ শালা না-বিয়ে ক’রে থাকতে পারে...”

বৃদ্ধের মুখটা বিজয়ের গৌরবে দীপ্ত হইয়া ওঠে এবং এইরূপ সময় সদুর ডাক পড়ে তামাক দিয়া যাইবার জন্য। আমায় বলেন, “খুব লক্ষ্য ক’রে দেখোতো ভায়া, গড়ন থেকে নিয়ে ইস্তক চলনটি পর্য্যন্ত কোন জায়গায় কোন দোষ চোখে পড়ে কিনা।”

সদু আসিয়া কলিকা তামাক টিকা লইয়া যায়। একটু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে এবং জলন্ত টিকায় মাঝে মাঝে টোকা মারিতে মারিতে ফিরিয়া আসে। কোন দিন নিঃসংসয়

চিত্তে এ-কথা সে-কথা তুলিয়া একটু দেরী করে; কোন দিন বা অহেতুক ভাবেই লজ্জিত হইয়া পড়ে, তাড়াতাড়ি হুঁকাটা ঠাকুরদাদার হাতে দিয়া, কোনদিকে না চাহিয়া, কাহারও সহিত একটাও কথা না কহিয়া বাহির হইয়া যায়।

আমি কিছু দেখি, বাকীটুকু জীবন্ত কল্পনার সাহায্যে পূরণ করিয়া লই। সেইটুকু সময়ের মধ্যে ঘরের হাওয়ায় যে কী একটা মধুর বিপর্য্যয় হইয়া যায় তাহা বলিতে পারি না। চলিয়া গেলে ঠাকুরদাদা হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতে দিতে আমার পানে আড়চোখে চাহেন। বলেন, "কিরকম দেখলে বল দিকিন?"

প্রথম প্রথম বেজায় লজ্জা করিত, হয়ত বলিতাম, "মন্দ কি।" কিম্বা, খুব জোর—"ভালই"। আজকাল কখনও কখনও একটা বিশিষ্ট অভিমতও দিই, বলি, "রংটা এদানি যেন একটু আরও মাজামাজা বোধ হচ্চে না?" অথবা "চলনটা যেন একটু ভারিক্কে হ'য়ে এসেচে না? আপনি কি বলেন?"—ওর ঠাকুরদাদার সামনে কখন-কখন একটু লুকোচুরি, বেহায়াপনা আজকাল বড় মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

ঠাকুরদাদা উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া ওঠেন, "তোমার চোখ আছে; অমিত ঠিক ওই কথাটিই বলতে যাচ্ছিলাম...।"

এক এক দিন ঘরে ঢুকিতেই ঠাকুরদাদা প্রশ্ন করেন, "কি ভায়া? কাজ কিছু এগুল? তোমার গিয়ে—সেই ছেলেটির কি হল?"

ঠাকুরদার তাগিদের ঝোঁক সামলাইবার জন্য একটি কাল্পনিক পাত্রকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। এক হিসাবে নেহাৎ কাল্পনিকও নহে। এক বছর এম-এ পড়িয়া কলেজ ছাড়িয়া এখন চাকুরিতে ঢুকিয়াছে। বাড়ীর অবস্থা এখন নিতান্ত খারাপ নয়—মোটা ভাত মোটা কাপড়টা চলিয়া যায়। ছেলে দেখিতে শুনিতে চলনসই, যেমন গৃহস্থ ঘরের ছেলে হইয়া থাকে...

ঠাকুরদাদার প্রশ্নের উত্তরে বলি, "সে পাত্র তো প্রায় হাতের পাঁচ ঠাকুরদা; আমার ছেলেবেলার বন্ধু, ধরে পড়লেই হবে। ওর চেয়ে ভাল যদি পাওয়া যায় তো দেখতে দোষ কি?"

ঠাকুরদাদা বলেন, "সে কথা হাজারবার বলতে পার; নাতনী আমার রাজ-রাজড়ার ঘরেও বেমানান হবে না। তবে, এ পাত্রও বা মন্দ কি অজিত? বলচ তিন-তিনটে পাশ, দেখতে শুনতেও মন্দ নয়।...আচ্ছা, গায়ের রংটা কেমন হবে বল দিকিন,—ওর সঙ্গে মানাবে তো?...দাঁড়াও, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার;—সামনেই এনে দিচ্চি, আর এবার ভাল করে দেখেই বলনা।...সদু, অ দিদিমণি!..."

সদু আসে, ঠাকুরদাদার মিথ্যা অছিলা শুনিয়া চলিয়া যায়। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পাত্রের রংটা মনে করিবার চেষ্টা করি। ঠাকুরদাদা অসহিষ্ণুভাবে নানানরকম আভাস দিতে থাকেন, "আচ্ছা, সদুর চেয়ে কত ময়লা? যদি পাশে দাঁড়

করানো যায় তো উনিশ-বিশ,—আঠার-বিশ ?...ধর তোমার গায়ের রং হবে ?...”

আমি পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি নিজের হাতের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলি, “হ্যাঁ, তা হলেও হতে পারে।”

“তা হলে তুমি ঠিক করে ফেল। সত্যি বলতে কি অজিত ভায়া, আমার কেমন যেন ছেলেটিকে মনে লেগেচে। থাকতে পারে ওর চেয়ে ঢের ভাল পাত্র ; কিন্তু আমার মনে যেন বলচে—ওই আমার সত্নর বর...”

আমি আজকাল খুবই বেহায়া হইয়া পড়িয়াছি ; কিন্তু ইহার পর আর লজ্জা দমন করিয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমি উঠিয়া পড়ি, বলি, “তাহলে তাই দেখব ; এখন তবে আসি।”

বৃদ্ধ এক একদিন আমার বুকে চাপিয়া ধরেন। শিশুর মত সারল্যে-ভরা চক্ষুদুটি কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ছল্‌ছল্‌ করিয়া ওঠে। বলেন, “ভাই, আর জন্মে তুমি কে ছিলে আমাদের যে এজন্মে এই দুদিনেই এত আপনার হয়ে পড়েচ ? পরের মেয়ের জন্যে কে এত দেক্‌দারি ঘাড়ে করে বল দিকিন ?”

২রা ভাদ্র

আর গলির ব্যবধানটিও নাই। আমি গলি পারাইয়া আজকাল সত্নদের পাশের বাড়ীটিতেই আছি।

এটুকু ঠাকুরদাদার স্নেহের প্রসাদ। একটা বিপদ আসিয়া পড়িয়াছিল যা বোধ হয় আমায় আমার এই স্বর্গ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিত। ঠাকুরদাদার স্নেহে সেটা একটা সম্পদে পরিণত হইয়া আমায় একেবারে সেই স্বর্গের সীমানার মধ্যেই তুলিয়া লইয়াছে।

আমার বাড়ীওয়ালা ওপরে একটা ঘর তুলিয়া দ্বিগুণ ভাড়ার নোটিশ দিয়া গেল। সেদিন ঠাকুরদাদার কাছে যখন গেলাম, মুখটা বোধ হয় বিমর্ষ ছিল। তিনি সমস্ত কথা না শুনিয়া ছাড়িলেন না। শুনিয়া, সদুকে ডাকিয়া তামাক সাজিতে বলিয়া আমায় কহিলেন, "রোস, বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিই।"

বুদ্ধির গোড়ায় ভাল করিয়া ধোঁয়া পড়িলে বলিলেন, "হয়েচে, এ আর শক্ত কথা কি?"

সদু দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, ঠাকুরদাদা একটা ঠাট্টা করিতে সে-বেচারা দুড়্‌দুড়্‌ করিয়া পলাইয়া গেল। ঠাকুরদাদা একটু হাসিয়া চুপি চুপি আমায় বলিলেন, "কথাটা একটু গোপনীয়। বলি কি,—তুমি আমাদের এই পাশের বাড়ীটাতে চলে এস; দুমাস থেকে মিছিমিছি ভাড়া গুণচি।"

আমি কথাটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ঠাকুরদাদা বলিলেন, "দেখ ভায়া, মেয়েটার বিয়ে যে খুবই আছে, একথায় তুমি আর সন্দেহ কোরো না।

তা যদি হোল,—আমাদের এই একটি বাড়ীতে কি কুলুবে সে-সময়? কুলুবে না। আচ্ছা, তাহলে আমি তখন বাড়ী পাচ্ছি কোথায়?...এই সব ভেবেটেবে, মিত্তিররা ছাড়বার পর থেকে পাশের বাড়ীটা ধরে রেখেচি। মন্দ কাজ করেচি? —তুমিই বলনা।...ছেলেকে বলিনি। বললেই, "বাজে খরচ, বাজে খরচ" করে রদ করে দেবে। ভূ-ভারতের মধ্যে আর কেউ জানে না। জানে এক বাড়ীওয়ালা আর আমি, আর এই তুমি জানলে।"

আমি তো স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কোথায় কি তাহার ঠিক নাই, অথচ এই বৃদ্ধ এ কী কাণ্ডকারখানা করিয়া বসিয়াছে! মনে হইল বলি, "ঠাকুরদা, যখন এতই নিশ্চয় তুমি, তাহলে বোধ হয় নিজেই বিয়ে করবে ঠিক করেচ" —বলিয়া লঘু বিদ্রূপের ঘায়ে সাংঘাতিক ভুলটা ভাঙ্গিয়া দিই। কথাট ঠোঁটেও আসিয়াছিল, এবং কর্ত্তব্য হিসাবে বলিয়া ফেলাও উচিত ছিল; কিন্তু পারিলাম না। দেখিলাম অপরিসীম বিশ্বাসভরে এই শিশু-বৃদ্ধ নিজের সত্যমিথ্যা ধারণাগুলি লইয়া জীবনের অবসান-দিনে একবার পুতুল খেলা করিতে বসিয়াছে; যুক্তির রসায়ন সে অন্ধ-বিশ্বাসের ওপর ঢালিয়া তাহাকে গলাইয়া দেওয়া নিতান্ত হৃদয়হীনের কাজ বলিয়া বোধ হইল।

তাহা ভিন্ন অন্তরের মধ্যে প্রিয়সান্নিধ্যের যে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা এখানে আর অস্বীকার করি কেন?

একথাও ভাবিয়াছিলাম যে আমি ভাড়াটি দিয়া দিলে এই পরিবারটির এই নিরর্থক খরচাটাও বাঁচিয়া যাইবে; কিন্তু ঠাকুরদাদাকে এড়াইয়া তাহা যে পারিব সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আলাদা আছি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই স্নিগ্ধ পরিবারটির সহিত এক হইয়া গিয়াছি বলিলেও চলে। সবাই এই নিঃসঙ্গ প্রবাসীকে অন্তরের প্রীতি ও স্নেহ দিয়া আমন্ত্রণ করিয়া লইয়াছে। এই গ্রহণের মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কেহ একবার একটু থমকিয়া ভাবিয়া দেখিল না; সবাই-যেন সব সময়ের জন্য হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া রাখিয়াছে। আমিও দ্বিধাহীন পদে সেই দুয়ার পথে এমন সহজে প্রবেশ করিয়া এমনই সহজে মিলিয়া গেলাম যে অপরিচয়ের রেখাটা যে কখন অতিক্রম করিয়া আসিলাম তাহার জ্ঞানই নাই।

চরম সৌভাগ্যের কথা এই যে সদু আমার এই অকিঞ্চন গৃহখানিতে পা দিয়াছে।

আরশির গায়ে যে ঐ ফুলকাটা পরদা সেটা সদুরই হাতের নিদর্শন, বাক্সগুলার উপর যে রঙিন কাপড়ের ঢাকনা সেগুলিও সেই পদ্মহস্তখানির কমসৃষ্টি। আমার ব্যবহারের জিনিষগুলোর মধ্যে যে এমন শ্রী লুকানো ছিল তাহা সদু স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। দুপুর বেলা আমি যখন আপিসে যাই, চাবিটা সদুর জন্য

ঠাকুরদাদার কাছে দিয়া যাইতে হয়। ফিরিয়া আসিয়া দেখি ঘরটিতে যেন সৌন্দর্য্যের এক একটি পাপড়ি খুলিয়াছে।

সকালবেলা ঝড়ু যখন পড়ে এবং আমি হেলান-চেয়ারে বসিয়া নানান কথা ভাবিতে থাকি, সে-সময় সত্নু প্রায়ই আসে,—কখন হাতে একটা ঘর-সাজানোর জিনিষ লইয়া, আবার কখন মুখে মিষ্টি অনুযোগ লইয়া,—কোন্ জিনিষটা একটু অগোছ করিয়া ফেলিয়াছিলাম, কোন্ জিনিষটা কিনিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কোন্ জিনিষটা ব্যবহার করিবার প্রণালী ঠিক বুঝি নাই—এই সব।

আমি কখন কখন বলি, "ব্যাটাছেলে চিরকাল লক্ষ্মীছাড়া, অগোছালো..."

মেয়েদের এই পরোক্ষ প্রশংসাটিতে সুন্দর মুখখানি লজ্জায় একটু রাঙা হয় এবং একটু নুইয়া পড়ে। সত্নু বলে, "অমন কথা বলবেন না অজিত দা, তাহলে এই যে ছেলেটি দেখচেন, ও বাড়িতে একটি জিনিষও গোছানো থাকতে দেবে না; একেই তো গোছাতে গোছাতে আমার প্রাণান্ত..."

এই রকমের কথাবার্ত্তায় ভাইবোনে কখন কখন একটু কলহ হইয়া পড়ে। দুজনেই যখন আমায় মধ্যস্থ মানিয়া বসে, আমি পড়িয়া যাই সে এক মহা সমস্যায়; দুজনেরই পিঠ ঠুকিয়া আর কবে সুবিচার হইয়াছে?...সত্নুর সপক্ষে রায় দিলে ঝড়ু গর্ গর্ করিতে থাকে। কেন কে জানে, তাহাতে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িতে হয়। ঝড়ুর সপক্ষে

বলিলে সত্ব একেবারেই খানিকক্ষণ কিছু বলে না—তখন মনে হয় এর চেয়ে একটু লজ্জা পাওয়া বরং ছিল ভাল...

কাল আপিস হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম—শরীরটা তেমন ভাল ছিল না। সত্ব ওপরের ছাদে কি করিতেছিল, এমন সময় পাশের ছাদে সেই সখীটি আসিয়া দাঁড়াইল। একটু অভিমান এবং বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "আর যে বড় দেখিনে ভাই, আমাদের ভুলে গেলে নাকি ?"

সত্ব হাসিয়া বলিল, "তোমার ঐ এক কথা ভাই, যদি জানতে কি খাটুনিটে..." বলিয়া সেই পুরাণ ফর্দ্দ আওড়াইতে যাইতেছিল, সখীটি বাধা দিয়া বলিল, "তার ওপয় আবার একটি নতুন লোকের ঘরকন্নার ঝক্কি নিয়েচ"—বলিয়া মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "না ভাই, রাগ কোরো না, তোমার বৌদি বলছিলেন তাই জানলাম।"

আলসের উপর একটি বুনোফুলের লতা ছিল; একটা ফুল তুলিয়া সত্ব সঙ্গীর গায়ে ছুঁড়িয়া মরিল, লজ্জিতভাবে একটু হাসিয়া বলিল, "তোমরা সব সমান, কেউ কম যাওনা..."

সখীটি ইহার পর আরও সরিয়া আসিল এবং তাহার পর যে কথাবার্ত্তা হইল সে আর শোনা গেল না।

বোধ হয় এই জন্য আজ সকালে আসে নাই; অনেকক্ষণ পথ চাহিয়া চাহিয়া ঠাকুরদাদার ঘরে গিয়া আড্ডা জমাইতে হইয়াছিল। তাও কি সেখানেও একটু দেখা দিল ? লজ্জা রোগটা চাগাইলে আর নিস্তার নাই!

বিকালে আসিয়াছিল; একটু লজ্জিত লজ্জিত ভাবটা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আজ সকালে একবারটিও আস নি কেন সদু?" 'একবারটি' কথাটার ওপর একটা বেয়াড়া রকম ঝোঁক পড়িয়া গেল।

সদু কি একটা বলিতে যাইতেছিল, একটা ঢোঁক গিলিয়া মাথাটা নত করিয়া ফেলিল; কাণের সোণা দুটি গালের উপর পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল।

একটু দেখিলাম, তাহারপর বলিলাম—কি করিয়া যে বলিলাম তাই ভাবি—বলিলাম "তুমি একটু না আসাতে সদু, আমার সমস্ত ওলট-পালট হয়ে গেচে।"

মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল। একবার ঘাড়টা উঁচু করিয়া চোখদুটি তুলিয়া তখনি আবার নত করিয়া লইল। আর একটি এ চকিত দৃষ্টির আশায় অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম; পুরস্কৃত হইতাম কিনা কে জানে, তবে ঝড়ুটা বাদ সাধিল। ঘরের ভিতর যান্মাসিক পরীক্ষার পড়া করিতেছিল, মহম্মদ তোগলকের পাগলামি সম্বন্ধে একটা ছাইপাঁশ প্রশ্ন করিয়া সব মাটি করিয়া দিল।

২২শে অগ্রহায়ণ

অনেক দিন কিছু লিখি নাই। একেবারে সদুময় হইয়া আছি; একটুও কি ফুরসৎ আছে আর? মাঝে মাঝে বন্ধু-

বান্ধবরাও গঞ্জনা দেয়। যাহাদের বিবাহ হয় নাই তাহারা বলে, "হ্যাঁরে, তুই হেন যে আড্ডাবাজ তাকেও পর্দ্দানশীন করে ফেলেচে একেবারে! কেউ যেন সাত পুরুষে আর বিয়ে না করে..."

সতুকে এই সব অভিমতের কথা যখন শুনাই সে কৃত্রিম অভিমানে বলে, "থাক না তুমি বন্ধুদের নিয়ে। পায়ে কি শেকল আঁটা আচে?"

বলি, "আচে যেন একটা।"

হাসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলে, " 'আচে যেন একটা',...তা, সেকি আমি পরাতে গিয়েছিলাম?"

না, শিকলটা আমি নিজেই পরিয়াছি। সে খুব সংক্ষিপ্ত কথা। শিকলটা গড়িতেই যা দেরী হইয়াছিল; পরিবার সময় এক কথাতেই পরা হইয়া গেল।

ইদানীং সব ছাড়িয়া ঠাকুরদাদা সেই 'হাতের পাঁচ' ছেলেটির জন্য বড় তাগাদা লাগাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার রাশি, গণ, মেল ইত্যাদি যোগাড় করিতে করিতে কয়েক দিন কাটাইয়া দিলাম; কিন্তু শেষে আর কোন মতেই রুকিয়া রাখা গেল না। বাড়ী গিয়াছে—কাজের ভীড়—প্রভৃতি কয়েকটা অছিলা পর্য্যন্ত যখন নিঃশেষ হইয়া গেল তখন একদিন নিরুপায় হইয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতেই হইল।

সেদিন যে কী মুস্কিলেই পড়িয়াছিলাম বিধাতাই জানেন। দশটা, এগারটা, বারটা বাজিয়া গেল, কাহারও দেখা নাই; কেই বা দেখা দিবে? ঠাকুরদাদা এক-একবার গলিতে উঁকি মারিয়া আসিয়া উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিতেছেন, আমি ক্রমেই মূঢ়ের মত নির্ব্বাক হইয়া আসিতেছি, কি করিয়া সামলাইব?...শেষকালে বৃদ্ধ আর থাকিতে পারিলেন না; আমার হাত দুইটা ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ অজিত, তুমি কি বুড়ো ঠাকুরদাকে মিছে আশা দিয়ে পরিহাস করচ ভাই? অনেকে এমনও করে..." অশ্রুতে দুটি শীর্ণ গাল প্লাবিত হইয়া গেল।

এর পরেও সঙ্কোচ করিয়া থাকা মহাপাতক। আমি মাটির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, "ঠাকুরদা, আমিই মস্ত বড় একটা মিছে আশা করে বসে আচি; আমায় মাফ করুন। আমি নিজের সম্বন্ধেই এতদিন বলে এসেচি...।"

সব লিখিয়া রাখা অসম্ভব এবং বিশেষ প্রয়োজনও নাই; মোটকথা ঠাকুরদাদা একটা তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিলেন। তিনি যে আমার কথা এতদিন ভাবেন নাই এইটিই তাঁহার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইল। এবং এই সমস্যা পূরণের ভার উল্টাইয়া আমারই উপর পড়িল।—"হ্যাঁ হে অজিত, এমনটা কেন হোল বল দিকিন?"

আমি বলিলাম, "কিজানেন ঠাকুরদা, আলোর নীচেই অন্ধকার; বড় কাছে থাকায় আমি সেই অন্ধকারে পড়েছিলাম বোধহয়।"

"সম্ভব। তা, আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে লব্, প্রেম, কত কি হচ্চে, কৈ ঘুনাক্ষরেও তো জানতে পারিনি।"

"সে সব আমরা কেউ অত বুঝি-টুঝি না ঠাকুরদা; সেকেলে চাল ধরেই বসে আছি।"

"সম্ভব। না হলে এত সেকেলে মানুষ-ঘেঁষা হতে না,—দুজনেই।...কিম্বা এও তো হতে পারে যে, ঐ যে বললে আলোর নীচেই অন্ধকার, সেই জন্যেই কি হচ্চে না হচ্চে কিছু দেখতে শুনতে পাই নি..." বলিয়া চসমার উপর দিয়া আমার দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

ঠাকুরদাদার অত্যাচারে তাড়াতাড়ি মাসখানেকের ছুটি লইতে হইল, এবং ইহারই একটি সার্থক দিনে সদু আর আমার মধ্যেকার ক্রমসঙ্কীর্ণায়মান ব্যবধান একেবারেই বিলীন হইয়া গিয়াছে।

BLUE BLACK
KAJAL-KALI
SWADESHI MADE
FOR ALL FOUNTAIN PENS
CHEMICAL ASSOCIATION CALCUTTA

কাজল কালী ব্যবহার করে সন্তোষ লাভ করেছি। এই কালিমা বিদেশী কালির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। ইতি ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Chemical Association

55, Canning Street,
Calcutta

প্রসঙ্গ

শ্রীমনোমোহন সিংহ রায়

গম

কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে গমকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারা যায়। যেমন, কতকগুলির বর্ণ লালচে, আর কতকগুলি সাদা; কতকগুলির দানা নরম, আর কতকগুলির দানা কঠিন; আবার কতকগুলি শুঁয়াযুক্ত (awned or bearded) আর কতকগুলি শুঁয়াবিহীন (awnless, bald or beardless variety)। এইরূপ বিভাগ করিলে বিশেষজ্ঞদিগের মতে কোন ভুল হয় কি না জানি না। বিভিন্ন প্রদেশের স্থানবিশেষের নামানুসারে যে নানাপ্রকার গম দেখা যায় তাহাদিগকে উপরোক্ত কয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কঠিন দানার গম সুজির পক্ষে বেশী উপযোগী, সুতরাং উহাতে gluten বেশী থাকে, আর নরম দানার গম ময়দার পক্ষে বেশী উপযোগী।

* * *

আমি কেবল গঙ্গাজলি, ডুধিয়া, ১২ নং পুষা ও ৪ নং পুষা এই চারি প্রকার গমের চাষ করিতে দেখিয়াছি। প্রথমোক্ত তিন প্রকারের গম বিঘা প্রতি চারি মণ হিসাবে উৎপন্ন হইয়াছিল। হুগলীর তৎকালিক Dist. Agri. Officer

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন যে নিম্ন বঙ্গে গমের ফলনের উহাই সাধারণতঃ উচ্চ হার। গঙ্গাজলি ও দুধিয়া বীজ আমি কলিকাতায় ক্রয় করিয়াছিলাম, আর নলিনাক্ষ বাবু আমাকে ১১ নং পুষা গমের বীজ দিয়াছিলেন।

* * *

ক্রমশঃ উৎপাদন কমিতে থাকায় আমি ৪ নং পুষা বীজ আনাইয়া বপন করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি; বিঘা প্রতি ছয় মণ হিসাবে ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই অবধি আমি ৪ নং পুষার চাষ করিয়া থাকি। প্রতি বৎসরই যে ছয় মণ হারে উৎপন্ন হয় তাহা নহে। তবে কখনও ছয় মণের বেশী উৎপন্ন হয় নাই। যখন কম হয় তখন বিঘা প্রতি মাত্র আধ মণ হইতে দশ পনের সের কম পর্য্যন্ত ফসল ফলিয়াছে।

* * *

কোন ফসলই প্রতি বৎসর সমান হারে ফলে না। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। বীজের অপকর্ষ ইহার একটা বিশেষ কারণ। একই বীজ হইতে উপর্য্যুপরি উৎপন্ন ফসলের সংগৃহীত বীজের নানা কারণে অপকর্ষ (degeneration) ঘটে। অপকর্ষের লক্ষণ বুঝিতে পারিলে তৎপ্রতিকারার্থে উপযুক্ত স্থান হইতে উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করা উচিত। সেই জন্য আমি মধ্যে মধ্যে পুষা হইতে নূতন বীজ আনাইয়া থাকি। সকল বৎসরের আবহাওয়ার অবস্থা সমান হয় না। ঝড়, বৃষ্টি,

উত্তাপ ও শৈত্যাদির ন্যূনাধিক্য প্রভৃতি প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা (unfavourable climatic condition) একটি প্রধান অন্তরায়। প্রাকৃতিক প্রভাব প্রবল, অথচ লৌকিক চেষ্টা দ্বারা ইহার প্রতিকারের উপায় নাই। সারের পরিমাণের ও গুণের ইতর-বিশেষে যে ফসলের তারতম্য হয়, অবশ্য সহজেই তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যায়। মাটির ঠিক 'জো' না বুঝিয়া ভূমি কর্ষণ করিলে ক্ষেত্রের প্রকৃতির এমন একটা ব্যতিক্রম ঘটিয়া যায় যে তাহার সংশোধন না করিলে সহস্র চাষেও মাটি ফসলের ঠিক উপযোগী হয় না। চাষীরা বলে, "যে 'জো' হারায়, সে সারা বৎসরটা হারায়।" 'জো' অর্থে কি বুঝায়, 'জো' না বুঝিয়া চাষ দিলে মাটির কি দোষ জন্মায় এবং তাহার সংশোধনের উপায় কি প্রভৃতি বিষয় ক্রমে আলোচনা করিব।

—আগামী সংখ্যায়—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের

'গল্প'

চিত্র ও চরিত্র

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দেশমাতার চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দেশের নিকট যিনি দেশবন্ধু হইয়াছিলেন, রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁহার নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি নব নব রূপে প্রকাশ পাইয়া মিত্রকে বিস্মিত এবং অমিত্রকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, অপরিমেয় ভোগ হইতে অপূর্ব্ব ত্যাগের ভিতর দিয়া জীবনকে পরিচালিত করিয়া যিনি আত্মচরিতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন, সেই চিত্তরঞ্জন যেদিন অসমাপ্ত কাজের মাঝখানে অকস্মাৎ বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন ভারতবর্ষের আকাশ এক আকুল আর্ত্তনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দেশবন্ধুর চিতার সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক গৌরব নির্ব্বাপিত হইল।

১৮৭০ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ জন্মগ্রহণ করেন। চিত্তরঞ্জন বিলাত গিয়াছিলেন, ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন, প্রথমে না হইলেও পরে এই ব্যবসায় বিপুল অর্থ, উপার্জ্জন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন; আইনের কূট তর্কে, তথ্য-উপস্থাপনে, বাগ্মিতায় তাঁহার সমান কেহ ছিল না; অর্থে প্রতিপত্তিতে, সম্মানে তিনি সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে যখন তিনি যোগদান করিলেন, তখন তাঁহার আসন বহু উর্দ্ধে নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই সকল কারণে নহে।

ভারতের জাতীয় মহাসভা একদা তাঁহার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে চলিত, সকল প্রদেশের নেতারা তাঁহার পরামর্শ

লইতেন, তিনি অতি সুকৌশলে রাজনীতির রথ চালনা করিতেন। নেতারূপে তিনি সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার জন্যও তিনি বড় নহেন।

তিনি দানে অকৃপণ, কার্য্যে কুণ্ঠাহীন এবং বাক্যে মাধুর্য্যময় ছিলেন। এই সহৃদয়তা এবং বৈষ্ণবপ্রকৃতির সঙ্গে তাহার আত্মপ্রত্যয় ছিল অগাধ এবং সাহস ছিল অসীম। ইহাও সব নহে।

তাঁহার দান, তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার দেশভক্তি—তাঁহার প্রাণেরই পরিচয়। চিত্তরঞ্জনের চিত্ত ছিল উদার, হৃদয় ছিল বৃহৎ। তাঁহার বিপুল ধীশক্তি এই মহৎ হৃদয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিত।

প্রকৃতপক্ষে চিত্তরঞ্জন ছিলেন কবি। একদা সাহিত্যকে তিনি ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের দুঃখ তাঁহাকে ভিন্ন পথে টানিয়া লইয়া গেল। তাঁহার হৃদয়ের অনুভূতি বাক্যে নয়, কার্য্যে প্রকাশিত হইল।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্চান্ন বৎসর মাত্র বয়সে দেশবন্ধু স্বর্গারোহণ করেন।

এই মধুরভাষী, হৃদয়বান, দেশপ্রাণ, সৌম্যমূর্ত্তি, মহানুভব পুরুষের প্রতিভাদীপ্ত চক্ষুর দৃষ্টি প্রীতিতে কোমল এবং সাহস সমুজ্জ্বল ছিল।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

সকলের সঙ্গে এবং সমস্ত কিছুর সঙ্গেই কবির একটি সহধর্ম্মিতা, সহমর্ম্মিতা আছে। যাহাকে কবি বলিয়া ডাকি, সেই সামাজিক মানুষটি কবি নহেন। সংসারের সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টি সীমায় আবদ্ধ, সংস্কারে ক্লিষ্ট, বিরাগ-বিদ্বেষে ক্লিন্ন। কবি সেই প্রেমিক—সেই ভাবুক পুরুষ, অনন্যসাধারণ আত্মীয়তার প্রভাবে যাঁহার উন্মীলিত মানসনেত্র অব্যর্থ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছে, অনুরাগ এবং সমবেদনায় পূর্ণ তাঁহার হৃদয়, বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতির দুঃখ-সুখ এবং ছায়া-আলোকের সহিত সমান স্পন্দনে স্পন্দিত হইতেছে। এই অন্তর্দৃষ্টি কল্পনার ধর্ম্ম। বুদ্ধির সহিত চর্ম্মচক্ষুর একটা ঘনিষ্ঠতা আছে, মর্ম্মচক্ষুর সহিত কিন্তু হৃদয়েরই সম্পর্ক নিবিড়।

* * *

কাব্যের দিক দিয়া থাক্, সমাজের দিক দিয়াই না হয় একবার কল্পনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্। চারিদিকে দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব অত্যাচারের ত সীমা-পরিসীমা নাই। শ্রমীর মুখের গ্রাস ধনী অনায়াসে কাড়িয়া লইতেছে; অম্লান বদনে বলী দুর্ব্বলের প্রাণটুকু বৈতরিণীর পরপারে পৌঁছাইয়া দিতেছে; অজগর যেমন করিয়া ছোট ছোট সাপগুলিকে গিলিয়া ফেলে, বড় বড় রাষ্ট্রগুলি তেমনি করিয়া ক্ষুদ্র রাজ্য

সমূহকে আত্মসাৎ করিতেছে—আমরা কয়জনেই বা সেই উত্যক্ত পীড়িত আর্ত্তদের অন্তর্বেদনা অনুভব করিতে পারি? আমরা যে লোক মন্দ বলিয়া অনুভব করি না, তাহা নহে। মানুষ সাধারণতঃ হৃদয়হীন নয়। পরিবার পরিজনের দুঃখ বিয়োগ সে মনে-প্রাণে অনুভব করে। চোখের সুমুখে যে মৃত্যু ঘটে তাহাতে সে আকুল হইয়া উঠে। সম্মুখে যে অত্যাচার সে ঘটিতে দেখিয়াছে, তাহা তাহাকে অধীর করিয়া ফেলে। অথচ এই সব অবিচার, অনাচার, মৃত্যু, নিষ্ঠুরতা একটু দূরে গণ্ডীর বাহিরে ঘটিলেই আর তাহার চক্ষে জল আসে না, দুঃখেও নয়, ক্রোধেও নয়।

* * *

সে হৃদয়হীন স্বার্থপর বলিয়াই যে এমন হয়, তা নয়। যে বৃত্তির প্রভাবে তাহার অন্তরে এই সব ব্যাপারের চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠে তাহার সেই মানসবৃত্তি দুর্ব্বল বলিয়া এমন হয়। কল্পনাশক্তি তাহার যথেষ্ট নাই বলিয়াই, ঘটনাগুলিকে সে ভাল করিয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়াই, তাহার অনুভূতির তন্ত্রী সাড়া দিয়া বাজিয়া ওঠে না। অন্য লোক যে চোখ দিয়া দেখিতেছে, সে-চোখ দিয়া সে-ই দেখিতে পারে যার আছে কল্পনাশক্তি। তেমনি করিয়া দেখে বলিয়া সে অপরের আনন্দ ও ব্যথা বোধ করিতে, ধারণা করিতে পারে। যে অন্ধ, সৌন্দর্য্যের

দর্শনে যে আনন্দ তা সে উপভোগ করিতে পারে না, কুৎসিতের দর্শনে যে ক্লেশ তাও তাকে অনুভব করিতে হয় না। চোখ নাই বলিয়া এই হর্ষ-বেদনা সম্পর্কে অন্যের সহিত তাহার সহানুভূতি নাই। কল্পনাবৃত্তিতে বঞ্চিত হইয়া সংসারের সাধারণ লোক এমনিই অপরের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন, কেন-না মনের দিক দিয়া সে অন্ধ। অতএব দেখা গেল যে, কল্পনা মানুষের মনকে সহানুভূতি প্রবণ করিয়া তোলে এবং সহানুভূতি অন্তরকে নূতন দৃষ্টি দান করে।

BEST
VIRGINIA
Bombay Special

BEST
VIRGINIA
Bombay Special

বোম্বে স্পেসালেরই
আজকাল চলন
ভারতীয় ভার্জ্জিনিয়া
সিগারেট
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়
স্বদেশী এবং সুলভ
সোল এজেণ্ট
দাস এণ্ড কোং
২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট

দিন-পঞ্জী

বারাণসী, ২৯শে এপ্রিল—ইংলণ্ডের মহাবোধি সোসাইটি ও বৌদ্ধ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং ডিরেক্টর-জেনারেল পূজ্যপাদ শ্রীদেবমিত্ত ধর্ম্মপাল অদ্য বেলা তিন ঘটিকার সময় সারনাথে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি এই কথাকয়টি মাত্র বলিতে পারিয়াছিলেন,—শীঘ্রই যেন আমার মৃত্যু হয় আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে চাই। ভগবান বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আরও পঁচিবার জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।

কলিকাতা, ৩০শে এপ্রিল—গতকল্য সন্ধ্যায় কলিকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু ও হাজি আবদুর রেজাক যথাক্রমে মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মিউনিক, ২৮শে এপ্রিল—হার হিটলারের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া ধৃত শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে জার্ম্মাণী ছাড়িয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

পুণা, ৩০শে এপ্রিল—মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করিয়াছেন যে, হরিজনসেবা সম্পর্কে তিনি একুশ দিন অনশন করিবেন। এই অনশনের কোন সর্ত্ত নাই এবং একুশ দিন উত্তীর্ণ না হইলে তিনি কিছুতেই অনশন ভঙ্গ করিবেন না। এই সম্পর্কে তিনি একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, 'কয়েক দিন যাবৎ আমার হৃদয়ে এক ঝটিকা বহিতেছে। আমি ইহার বিরুদ্ধে যথাসাধ্য সংগ্রাম করিয়াছি। হরিজন-দিবসের প্রাক্কালে বারংবার এই বাণী শুনিতে পাইলাম,—এইরূপ

কর না কেন? আমি ইহা প্রতিরোধের চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়াছে। এইজন্য ৮ই মে হইতে অনশনের সঙ্কল্প করিয়াছি, ২৯শে মে মধ্যাহ্নে ইহা ভঙ্গ করিব।’

কলিকাতা, ২রা মে—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাত্মার অনশন সম্পর্কে এক বাণী প্রদান করিয়াছেন,—মহাত্মাজী পুনরায় উপবাস করিবেন অবগত হইয়া, আমি গভীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছি। তাঁহার ন্যায় এমন একটা মহাপ্রাণ, এরূপ সর্ত্তবিহীন আত্মবিলোপের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিবে, একথা আমি ভাবিতে পারি না। মহাত্মাজী যদি এই নিদারুণ সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে আমার দেশ এবং সমগ্র মানব জাতির পক্ষে একটা বিষম বিপদ ঘটিবে। মৃত্যুর দ্বারা তিনি তাহাদিগকেই অনাথ করিবেন, যাহাদের কল্যাণের জন্য তিনি এই অনশনব্রতের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে
আর ইনজেক্সান লইতে হইবে না
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীরই

—রক্ষা করা উচিত—

একমাত্র শ্রেষ্ঠ জর্দ্দা ব্যবসায়ী

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টোর্স

গোল মার্কেট, নিউ দিল্লী

নমুনা পরীক্ষা করিলেই

বাদ্সাহী সুর্ত্তি জর্দ্দা বা কিমামের

শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন

আট আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে সকল রকমের নমুনা পাঠানো হয়

প্রতি সের ৩৲ হইতে ৩২৲ পর্য্যন্ত—ভি-পি খরচ স্বতন্ত্র

শুভ বিবাহের এবং প্রিয়জনকে উপহার দিবার উপযোগী

বেনারসী, শাড়ী, জোড়, খদ্দর এবং মিলের ধুতি,

শাড়ী ও আধুনিকতম রুচির পোষাকের

বিচিত্র ও বিপুল আয়োজন

চন্দ্রকুমার বৈকুণ্ঠনাথ গুঁই

(১৮৭১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত)

—কলিকাতা—

৩৬ নং খোঙ্গরা পটি, (ফোন, বড়বাজার ৩৪৭)

—শাখা—

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, (ফোন, বড়বাজার ১৯৭৫)

পি ২৩৩, লেক রোড, কালিঘাট (ফোন, সাউথ ১০৫৪)

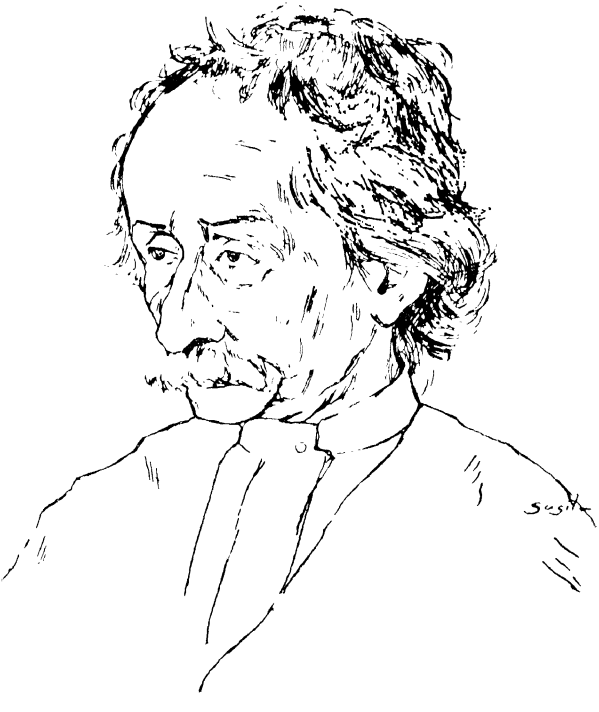

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট গল্প

১ম বর্ষ] ৩০শে বৈশাখ ১৩৪০ [৪৪শ সংখ্যা

গল্প

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ফাল্গুন তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমারই নিকটতম বন্ধুর বিবাহ। হইতেছিল এক দুর্গমতম গ্রামে—আমাদের গ্রাম হইতে সাড়ে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে। কেননা, কেবল গো-যান ছাড়া এই দুরত্বটা অতিক্রম করা চলে এমন কোন হীন বা উচ্চ যান এ অঞ্চলের কোথাও নাই। তথাপি বর-যাত্রী সাজিয়া ইহাতে চাপিয়া বরানুগমন করিতেই হইল।

সকলেই জানেন, বিশেষ করিয়া পল্লীগ্রামে, বরের বাপ অপেক্ষা বর-যাত্রীর দাপট অধিক। তাহাদের কীর্ত্তি-কথা বিবাহের বহুকাল পরেও কন্যাপক্ষের মনে জাগ্রত থাকে।

কিন্তু আমরা সকলে ছিলাম নিতান্ত নিরীহ। পৌঁছিয়া কন্যাপক্ষের নির্দ্দেশমত স্থানীয় স্কুলঘরখানির ঢালা ফরাসে বসিলাম এবং বরকে কেন্দ্র করিয়া গল্প-গুজবে, তাসে ও তাম্রকুট সেবনে কালক্ষেপ করিতে লাগিলাম।

এইভাবে সন্ধ্যা পার হইয়া গেল। বরের গাঢ় লাল মখমলের শয্যার দুই পাশে ও ঘরের চার কোণে ছয়টি বড় বড় সেজ জ্বলিয়া উঠিল। আতর, গোলাপজল ও বাহির হইতে অজস্র আম্র মুকুলের সুগন্ধে ঘরের বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছে। কনের বাড়ীর আঙ্গিনার একধার হইতে সানাইয়ের সকরুণ সুর ভাসিয়া আসিয়া অন্তরকে স্পর্শ করিতেছিল। বাহিরে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি—পল্লবে, তৃণে, অনতিদূরের দীঘির জলে তাহার রূপালী আঁচলখানি লুটাইতেছিল। বিবাহের তখনও দেরি। আমরা কয়জনে মিলিয়া স্থির করিলাম, গ্রামের পথ ধরিয়া কিছুদূর বেড়াইয়া আসিব। এমন সময় একটি ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিলেন, আর, অমনি যেন ঘরের সেজগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বাতাস মাতালের মত ঘরময় টলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাঁহার চোখে-মুখে হাসি, সারা দেহে চঞ্চলতা। তিনি ঘরে ঢুকিয়াই সস্মিতকণ্ঠে বলিলেন, "নমস্কার মশায়রা। আপনাদের কোন কষ্ট হচ্ছে না? হুকুম করুন, কি চাই—পান, তামাক, সরবৎ, গোলাপজল?" এবং বলিতে বলিতে বসিয়া পড়িলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সেকি! আপনারা উঠছেন যে? কষ্ট হচ্ছে?"

"না, না।"

"দুবার 'না' বললেন। নিশ্চয়ই হচ্ছে। হবারই কথা। একটু গান-বাজনা নেই, আমোদের কোন ব্যবস্থা আমরা করতে পারি নি, পথেও এমন কিছু ঘটছে না যা মনকে আকৃষ্ট পারে। এক জায়গায় কতক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকা যায়, বলুন? তার ওপর এঁরা সকলেই বন্ধু-বান্ধব। মানুষের কথার থলি ত অফুরন্ত নয় যে একই লোকের সঙ্গে রোজ নতুন নতুন কথা বলা চলবে। বুঝি, মশায়, আমিও বুঝি। নূতনত্ব চাই—সব কিছুতেই—তা সে গল্পেই হোক, আর আহারেই হোক। না-হলে বাঁচা কঠিন। কেমন কি না?" বলিয়াই তিনি হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

ঘরের সকলেরই চোখ তাঁহার উপর পতিত হইয়াছে। বৃদ্ধেরাও গল্প ভুলিয়া, তামাক ছাড়িয়া হাঁ করিয়া তাঁহার কথাগুলি গিলিতে লাগিলেন।

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "এই বিয়েরই একটা গল্প বলি শুনুন। একেবারে চোখে দেখা ঘটনা। তখন আমার বয়স একুশ বছর। তারপর এই পনেরো বছরেও তা ভুলতে পারি নি। চোখের সামনে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে।" বলিয়াই তিনি হাতের সিগারেটে একটি টান দিলেন।

ভারি মজার লোক ত। সকলে উৎকর্ণ হইয়া বসিলাম।

সজোরে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে তিনি বলিলেন।—

* * *

গড়ুই নদীর নাম শুনেছেন? শোনেন নি? মস্ত নদী। বর্ষাকালে তার দিকে তাকালে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যেমনি বিশাল, তেমনি প্রচণ্ড তার হাঁক-ডাক। রাক্ষসী পদ্মার মেয়ে কি-না। সে সময় ফেনায়িত, তরঙ্গসঙ্কুল, ধূসর হয়ে ওঠে তার জল। দিন-রাত পাড়-ভাঙার শব্দ। নদীটা আমাদের বাড়ীর নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে। কোথায় জানেন? একেবারে সেই সমুদ্রে। কিন্তু আমি যখনকার কথা বলছি তখন বৈশাখ মাস। শীর্ণা নাগিনীর মত তার গতি মন্থর হয়ে এসেছে। কূলে কূলে শুষ্ক চর। তার ওধারে শস্যশূন্য বিশাল প্রান্তর, ছায়াঘন ছোট ছোট গ্রাম। জলের রঙ নীল। তখন তাকে দেখলে মনে হয়, আরবের টাইগ্রিস নদী। আপনারা কেউ টাইগ্রিসকে দেখেছেন, মরুভূমির বুক চিরে ছায়ানিবিড় খর্জ্জূরকুঞ্জের পাশ দিয়ে, তুঁতগাছের কোলে কোলে এঁকে-বেঁকে চলেছে যেন বেদুইন নর্ত্তকী। না? যাই হোক, ঐ বৈশাখ মাসে আমার এক বন্ধুর বিয়ে হচ্ছিল আমাদের গ্রাম থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরে রূপোডাঙায়। রেলপথ হলে গ্রামখানা বড় জোর চল্লিশ মাইল দূরে হত। কিন্তু তার ত্রিসীমানায় রেল দূরের কথা গরুর গাড়ী চলবারও ভাল রাস্তা নেই। তবে গড়ুই নদীর তীরেই রূপোডাঙা। তাই স্থির হল, বর যাবে নৌকোয়, আসবেও নদী-পথে। বুঝতেই পাচ্ছেন গ্রীষ্মের সময় জলে বাস, বিশেষ ক'রে নদীতে কতখানি লোভনীয়। একারণ, বরযাত্রীও জুটে গেল দশটি

নয়, পনেরোটি নয়, পনেরো দুগুণে তিরিশটি। যাতায়াতে অন্তুতপক্ষে নটা দিন লাগবার কথা। এতে আরও একটা লাভ—চেঞ্জ। গ্রামে বাস করেও ম্যালেরিয়ায় ভোগে না এমন ভাগ্যবান কজন পাওয়া যায়? এই সব হিসেব ক'রে নির্দিষ্ট-দিন দুপুরে তিনখানি বড় বড় পানসীতে সকলে যাত্রা করা গেল।

আমি ছিলুম বরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমরা একসঙ্গে ইস্কুল-কলেজে পড়েছি। কাজেই কারো মনের কথা কারো কাছে গোপন ছিল না। বরং সেটা প্রকাশ ক'রে আনন্দ লাভ করতুম প্রচুর। ঐ যে-মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছিল, তার মামার বাড়ী ছিল কৃষ্ণনগরে। আমরা দুজনে ওখানকার কলেজে তখন পড়ছি। বকে যাব এই আশঙ্কায় আমাদের অভিভাবকেরা কাউকে কলিকাতায় যেতে দেন নি। কিন্তু পরের মনের ওপর খবরদারি করার মত অসম্ভব কাজ আর নেই। কৃষ্ণনগরে যে বাড়ীতে আমরা থাকতুম, তার পাশের বাড়ীটি ছিল আমাদের পেস্কার বিশ্বম্ভর বাবুর। লোকটি ছিলেন নামের চেয়েও রাশভারি। হাসতে তাকে আমরা কখনও দেখিনি। গানকে তিনি ঘৃণা করতেন, ছেলে-ছোকরা দেখ্‌লে তাঁর দাড়ীশুদ্ধ মুখখানা হয়ে উঠত যেন সজারুর পিঠ। আর নারীকে তিনি দেবী বা দানবী কি ভাবে দেখতেন, প্রথমে তা জানতে পারি নি। কেননা, তাঁর অন্তঃপুরে কোন নারী যে বাস করে এ ধারণা

আমাদের ছিল না। দরজা, জানলা, ঘুলঘুলি পর্য্যন্ত সব সময়ই বন্ধ থাকত।

কিছুদিন যায়। আমরা ফোর্থ ইয়ারে উঠেছি। গরমের ছুটির পর বর্ষা নেমেছে। পেস্কার বাবুর বাড়ীর পূবদিকে কদম্ব গাছটি ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। সেদিন আবার মেঘ করেছিল,—আষাঢ়ের মেঘ, নিবিড় কালো—ঠিক পেস্কার বাবুর দোতলা বাড়ীটার মাথার ওপর। বৃষ্টি আসে আসে। তার গন্ধটা বাতাসে ভেসে আসছে। আমার বন্ধুটি বললে, "ওরে দেখ্ দেখ্। ওই যে—"

তাকিয়ে দেখি, পেস্কারবাবুর বাড়ীর জানালায় একখানি মুখ। বড় মিষ্টি। ফুট্‌ফুটে রঙ। মনে হল কালো মেঘের পর্দ্দা এক হাতে সরিয়ে যেন কোন্...কিন্তু উপমা নাই বা দিলুম। নারীর সৌন্দর্য্য পরের চোখ দিয়ে দেখার চেয়ে হীনতা আর কিছু নেই। আমরা দু'জনে তাকে যে একমনে দেখছিলুল, তা সে প্রথমে জানতে পারেনি। কিন্তু একটা ফেরিওয়ালার হাঁকে সে চোখ দুটো ফেরাতেই দৃষ্টি পড়ল আমাদের ওপর। কি কালো আর গাঢ় সে দৃষ্টি! এবং তা নিবদ্ধ হল আমার বন্ধুটির মুখে। অবশ্য ক্ষণিকের তরে। তারপরই জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল। সেদিন আর তার দেখা পেলুম না।

পরদিন আমাদের পাঁচটা অবধি ক্লাস। কিন্তু বন্ধু তার অনেক আগেই শরীর অসুস্থ বলে চলে এল। আমি ফিরে

এসে দেখলুম, সে ম্লান মুখে শুয়ে আছে। হয়ত এতক্ষণ শুয়েই ছিল। উদ্বেগের সঙ্গে তার কপালে হাত দিয়ে দেখি, আমার শরীরের উত্তাপের চেয়ে তার গা এক ডিগ্রি কম ঠাণ্ডা হবে। ব্যাপারটা কতক অনুমান কোরে নিলেও সে জানালে মেয়েটিকে সে ভালবেসে ফেলেছে। ফেলবারই কথা। অমন চেহারায় মুগ্ধ না হয় কে? বোধ হয় খোলসা ক'রে না বললেও আপনারা বুঝতে পারছেন, এরপর থেকে তার অসুখটা উত্তরোত্তর বেড়ে উঠতে লাগল। যায় ফলে কলেজের প্রতি তার টান এত কমে গেল যে দিন কয়েক সে কলেজে গেল না। আর, এটাও জানতে পারলুম, রোগটা অপর পক্ষেও সংক্রামিত হয়ে উঠেছে। অমন একটি প্রিয়দর্শী যুবককে মেয়েটি যে ভালবেসে ফেলবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? অবশ্য আমি এ কথা বলতে চাই না যে নারী কেবল সুন্দর পুরুষকেই ভালবেসে থাকে।

খোঁজ নিয়ে জানলুম, মেয়েটি পেস্কার বাবুরই ভাগ্নী। ওর মা নেই। বাপ কি এক কর্ম্মোপলক্ষে বৎসরখানেক হল রেঙ্গুনে গেছেন। শীগ্‌গিরিই ফিরবেন। লোকটির পয়সা কড়ি কিছু আছে। বছর খানেক থেকে মেয়েটি তাই মামার খবরদারিতে বাস করছে। আমার বন্ধুটির সঙ্গে তার বিয়ের বিশেষ কোন বাধা দেখা গেল না। কিন্তু পেস্কারবাবু হয়ে উঠলেন চীনের প্রাচীরের চেয়েও দুর্লঙ্ঘ্য। দূর থেকেই তাকে দেখা চলে, কাছে গেলে তার গাম্ভীর্য্য ও বিরাটত্বে

সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে হয়। এতে আমরা দুজনে বড় চিন্তিত হয়ে পড়লুম। যাকে আয়ত্ত করা অল্প চেষ্টা সাপেক্ষ, সেই চেষ্টার পক্ষেই যদি ঐরকম একটি বাধা থাকে, তা-হলে প্রেমটা প্রবলতর হয়ে উঠলেও দুঃখ যে কতখানি তা আপনাদের সকলের না হলেও কেউ কেউ বুঝতে পারবেন। আবার ওপক্ষে যদি ভালবাসার প্রমাণ না পাওয়া যেত তা হলে একতরফা দুঃখ ক'রে, দীর্ঘতম নিঃশ্বাস ফেলে, কয়েকটা কবিতা লিখে, গান গেয়ে, আহারে নিস্পৃহ হয়ে দিনগুলো কাটিয়ে চলা সম্ভব হত। কিন্তু ব্যাপারটা ত তা নয়। সেই জন্য সব জটিল হতে জটিলতর হয়ে পড়তে লাগল। এ বিষয়ে পাকা এমন কোন লোকেরও নাম তখন মনে পড়ল না যে তার সাহায্য নিতে পারি।

এমন সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা শোনা গেল, পেস্কারবাবু হুঙ্কার দিচ্ছেন। দু'বন্ধুতে তৎক্ষণাৎ ঘরের আলোটা নিবিয়ে জানলার ধারে গিয়ে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ালুম। স্পষ্ট শোনা গেল তিনি বলছেন, "এমন কলঙ্ক! এমন জঘন্য কথা তোর নামে শুনতে হল? দুটো বিশ্ববকাটে ছোঁড়ার সঙ্গে—"

আপনাদের আগেই বলেছি, আমরা আর যাই হই, বিশ্ববকাটে ছিলুম না। এটা আমাদের গুরুজনরাও জানতেন। আর, জানতেন বলেই আমাদের ভালত্ব বজায় রাখতে পাঠিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে। কাজেই বিশ্বম্ভর বাবুর কথায় রাগ হল যেমনি, দুঃখ হল তার চেয়ে কম নয়। বন্ধুকে আধ্যাত্মিক

উপদেশ দিলুম—ত্যাগেই ভোগ। অন্ততঃ এই প্রবাসে ঐ পথটাই নিরাপদ মনে হচ্ছে।

আপনারা এখানে সকলেই গুণী। এটা নিশ্চয়ই জানেন যে আধ্যাত্মিক মার্গের অনেক স্তর আছে। প্রথম স্তরটি সংসারের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে—ওখান থেকেই শতকরা নিরানব্বই জন সাধক স্খলিতচরণ হয়ে সংসারকূপে নিপতিত হয়ে থাকেন। প্রেমে পড়লে লোকে ঠিক ঐ স্তরটিতে উঠে পড়ে। সেই জন্যেই প্রেমিকের কথা এত আধ্যাত্মিক ও আধিদৈহিক ভাবময়। আমার উপদেশের উত্তরে বন্ধু বললে, "ত্যাগ কথাটা দুর্ব্বলের জন্য সৃষ্টি হয়েছে।" এবং তারপর থেকে সে সবলের মত সতেজ প্রেমচর্চ্চায় ব্যাপৃত হল। আমি গত্যন্তর না দেখে কিঞ্চিৎ সরে দাঁড়ালুম।

ইতিমধ্যে পূজোর ছুটি এসে পড়ল। আমরা সব ছাত্রই বাড়ী যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। বন্ধুটি কিন্তু এ বিষয়ে একেবারে অটল। রকম দেখে মনে হল, গৃহ-সংসারের প্রতি সে বীতরাগ হয়ে পড়েছে। এমন কি আমার সঙ্গও সে এড়াতে চায়। এ অবস্থায় আমার একা বাড়ী ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কি থাকতে পারে, বলুন? তবুও তাকে বন্ধুর মত কয়েকটি সৎপরামর্শ দিলুম। কিন্তু তার একটিও কার্য্যকরী হল না। অগত্যা একাই বাড়ী ফিরে গেলুম। ওরা আমাদেরই প্রতিবেশী। তাকে না দেখে তার বাপ-মা ভাই-বোন সকলে এমন কি দুচার জন পল্লীবৃদ্ধ পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন।

তখন আর ব্যাপারটা ঢেকে রাখা সম্ভব হল না, যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে ও সাবধানে ব্যক্ত করে দিলুম। তার পিতৃদেব সেইদিনই স্বয়ং ছুটলেন কৃষ্ণনগরে এবং ফিরলেন পূজো কাটিয়ে। সঙ্গে তাঁর পুত্রটি। এ কয়দিনে তার মুখ-চোখের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটেছে। মনে হল যেন আধ্যাত্মিক জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। নেপথ্যে কারণটা জিজ্ঞাসা করে জানলুম—Successful. মেয়েটির বাপও ফিরেছেন। তাঁর সঙ্গে বন্ধুর পিতার পূর্ব্বপরিচয় ছিল। তিনিই কথায় কথায় মেয়েটিকে পাত্রস্থা করবার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহ্য হয়। কিন্তু বিয়ে সেই বোশেখ মাসে; আর কৃষ্ণনগরেও নয়, সেই রূপোডাঙা মেয়ের বাড়ীতে। কেননা, পেস্কারবাবু এমন কলঙ্কাঙ্কিত বিয়ের প্রশ্রয় দিতে মোটেই রাজী নয়। লোকের কাছে তাঁর মান আছে, সম্ভ্রম আছে, ধর্ম্ম আছে, সমাজ আছে, আর সকলের চেয়ে বড় আছে তাঁর দশ বছরের অনূঢ়া মেয়ে রক্ষেকালী। একটা bad example set তিনি করতে চান না।

কাজেই বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছিল পুরোদস্তুর একটা 'লভ-ম্যারেজ'। তবে তফাতের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, ছেলেটি মেয়ে বা মেয়ের বাপের কাছে কুন্ঠিতকণ্ঠে propose না করে propose করলেন মেয়ের বাপ ছেলের বাপের কাছে। তাঁদেরও পরস্পরকে খুব পছন্দ হয়েছিল। কেননা, মেয়ের

বাপের ঐ একমাত্র সন্তান, আর ছেলের বাপের পয়সা অনেক।—

বলিয়াই ভদ্রলোকটি সিগারেটে একটি টান দিলেন। কিন্তু তাহা কখন নিভিয়া গেছে এ খেয়াল আমাদেরও ছিল না। পুনরায় তাহা ধরাইয়া কয়েকটা টান দিয়া বলিলেন।—

তারপর, আমরা ত চলেছি। বোশেখ মাস হলেও কাল-বোশেখীর ভয় আমাদের ছিল না। এতবড় নৌকোকে সমাধিস্থ করে, এমন গভীর স্থান তখন পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে নদীর কোথাও নেই। চরের পাশ দিয়ে গ্রামের কোল দিয়ে ঘাট ছাড়িয়ে ক্ষেত-প্রান্তর পেরিয়ে আমাদের পানসী তিনখানি চলেছে। গান-বাজনা উল্লাসরোলে স্নানার্থিনী পল্লীবধূকে সচকিত করে তুলি, হাটের লোক, মাঠের চাষী কৌতূহলী হয়ে দাঁড়ায়, রাখাল-ছেলেরা জলের ধারে ছুটে আসে, বিপরীতগামী নৌকারোহীরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। রাত্রে আমাদের কারো চোখে ভাল করে ঘুম নেই। ব্যাপার দেখে মনে হতে লাগল, পৃথিবীতে এর পূর্ব্বে বিয়েটা আর কেউ করে নি, বরযাত্রীও কেউ যায় না। অথবা, চিরশৃঙ্খলিত একদল মানুষ সহসা মুক্ত উন্মত্ত হয়ে দক্ষিণ হাওয়ায় পাল তুলে যে কোন একটা দিক লক্ষ্য করে দিনরাত আনন্দস্রোতে ভেসে চলেছে।

তা ব্যাপার যাই হোক, যাত্রার পর তৃতীয় দিন গভীর রাত্রে আমরা রূপোডাঙার ভাঙা ঘাটখানিতে এসে পৌঁছলুম। বাঁশবনের মাথায় শুক্লপক্ষের চাঁদখানি তখন অস্ত গেছে। সারা গ্রামখানি সুপ্ত। সেখান থেকে অন্ততঃ তাই মনে হতে লাগল। হয়ত কোন বিরহিনী তখনও একাকিনী শয্যাতলে প্রতীক্ষাকম্পিত বক্ষে জেগে থাকবে। সে রাত্রে আমাদেরও কারো চোখে ভাল করে ঘুম এল না। সেই অন্ধকার ঘাটের কোলে আমরাও বাকী রাতটুকু প্রায় জেগেই কাটিয়ে দিলুম।

ও অঞ্চলে যদি কেউ গিয়ে থাকেন, দেখেছেন বোধ হয়, দেশটার চারিদিকেই নারিকেল সুপারি ও খেজুর গাছের সারি। হাওয়ায় সেগুলো সবুজ কেতন উড়িয়ে দিয়ে এক অবিরাম শব্দতরঙ্গে সারা দেশটাকে ছেয়ে রেখেছে। আপনাদের এই ঘরখানার চারধারে যেমন আম-কাঁঠালের ঘন বন, আমাদের যেখানে থাকবার জায়গা হয়েছিল তার চারধারে ছিল আম, নারিকেল, সুপারি ও কয়েকটি দীর্ঘ খেজুর গাছ। সেখানাও গ্রামের মাইনর স্কুল। কিন্তু ঘরখানা ছিল এর চেয়ে ছোট, আর ভগ্ন-জীর্ণ। ঐ ঘর ছাড়া অতগুলো লোক হাত পা ছড়িয়ে একটু আরামে বসে এমন জায়গা রূপোডাঙার কোথাও ছিল না। যা ছিল, তা জমিদার-বাড়ী। কথা ছিল, তাঁরই বৈঠকখানায় আমাদের থাকবার জায়গা হবে। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল প্রবাস-বাসের পর আগের দিন হঠাৎ এসে পড়ায় তা হয়ে ওঠে নি। তাঁরও সাঙ্গোপাঙ্গ বিস্তর; এয়ার-বন্ধু,

দ্বারোয়ান-চাকর, গাইয়ে-বাজিয়ে, কুকুর-মোটরে ছোট গ্রামখানা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। চারিদিকে কেমন একটা চাপা আতঙ্ক। শুনলুম জমীদারবাবু লোকটি বিপত্নীক, নিঃসন্তান ও মাতাল। গত পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি একটিবারের জন্যও বর্ণহীন জলপান করেন নি। এ প্রকার একনিষ্ঠ আরাধনার জন্যে তাঁর প্রতি আমাদের সকলেরই মনে অল্প-বিস্তর সম্ভ্রম জেগে উঠল। স্থির হল যাবার আগে সাধকটিকে একবার দেখে যেতে হবে। কিন্তু তিনি সে আশা আমাদের পূর্ণ হতে দেন নি ; কি করে তা ক্রমে বলছি।

মনে করেছিলাম, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে আমাদের আনন্দ স্রোত সিন্ধুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। কিন্তু ডাঙার পা দিতেই তা শুকিয়ে সকলে কেমন ঝিমিয়ে পড়লুম। বেলা যত বাড়তে লাগল চোখ দুটো ততই ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগল এবং দ্বিপ্রহরে আহারাদি শেষ ক'রে গাছের ছায়া, বারান্দা বা ঘরের ফরাস প্রত্যেকের পছন্দমত এক একটা জায়গা বেছে নিয়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়লুম। কিন্তু আমার বন্ধুটির চোখে ঘুম এল না, সে সেই নিদ্রিতের মাঝখানে নিজেরই হৃদয়ের প্রহরী স্বরূপ হয়ে একা জেগে বসে রইল।

সেদিন লগ্ন ছিল রাত আটটায়। হাঁ—ঠিক আটটায়। কিন্তু সন্ধ্যা উৎরে সময়টা এগিয়ে এলেও কন্যাপক্ষ থেকে কোন

তাগিদ দেখা গেল না। বরং যে লোকটি এতক্ষণ আমাদের কাছে বসেছিল সেও সন্ধ্যার পর সেই যে উঠে গেল আর ফিরল না। আবার কনের বাড়ী থেকে যে সানাইয়ের সুর এতক্ষণ শোনা যাচ্ছিল, মনে হল কি একটা দুর্ঘটনা সহসা যেন তায় কণ্ঠরোধ করে দিলে। অবশ্য এ সব আমাদের কল্পনা হতে পারে। কিন্তু মানুষের একটা সহজ সংস্কারও আছে। বাস্তবিক পক্ষে, এ বিয়ে না হলে এক বরের বাপ ছাড়া আর কারোর কোন ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না, কেননা, বিয়ে হলে তাঁরই কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হত। কি বলছেন? বর? 'লভে' বিশ্বাস করেন?—বলিয়াই ভদ্রলোকটি হাসিয়া উঠিলেন।

সেই বিদ্রূপের হাসিমাখা কণ্ঠে বলিলেন,—অবস্থা যখন এরূপ, রাত যখন ঠিক আটটা, তখন মেয়ের বাড়ী থেকে তার এক নিকট-আত্মীয় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললেন, "মশায়, সর্ব্বনাশ!"

ঠিক এই আশঙ্কাই আমরা করছিলুম। উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম, "সর্ব্বনাশ কি মশাই? কেউ মারা গেছেন নাকি?"

"আজ্ঞে না, সকলেই জীবিত আছেন। বরবেশে স্বয়ং জমীদারবাবু বাড়ীতে হাজির—"।

"কি বলছেন মশায়? একি মগের মুল্লুক? মেয়ে বাগ্‌দত্তা—"

"আজ্ঞে বাক্যের জোর আর খাটবে না। আমরা বহু অনুনয় বিনয় করেছি। এখন আপনারা যথাকর্ত্তব্য বিবেচনা করুন। সমস্ত বাড়ীখানা তাঁর লাঠিয়ালে ভরে গেছে। বিয়েও আরম্ভ হয়েছে—"

এই মুহূর্ত্তে যদি এখানেও ঐ রকম একটা ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহলে আপনারা আমাদের তখনকার মানসিক অবস্থাটা কিছু অনুমান করতে পারবেন। রাগ ও অপমানটাকে নীরবে সহ্য করে শান্ত-শিষ্টের মত অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করা ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় যেমন আপনাদের নেই, আমাদেরও তেমনি স্থির হল, তৎক্ষণাৎ গৃহাভিমুখে রওনা হওয়া ও নিরাপদে গৃহে পৌঁছে ঐ সয়তান, লম্পট, পরস্বাপহারী, অত্যাচারী জমীদারটার নামে আদালতে মামলা রুজ্জু করা। কন্যার আত্মীয়টি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের সঙ্কল্প তাঁকে জানাতে তিনি আর দাঁড়ালেন না। আমরাও আর বিলম্ব করলুম না, রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলুম। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলুম, এ বিয়ে দেবার ও করবার লোকের অভাব না হতে পারে কিন্তু অত বড় মেয়ে কি করে সম্মত হল? এখনও মূর্চ্ছা গেল না, কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করলে না, খিড়কী-দরজা দিয়ে বেরিয়ে মাঠ ভেঙে যে কোন একদিকে ছুটে পালালো না? বিয়ের পূর্ব্বকথা সকলেরই জানা ছিল; তাই সকলে বলতে লাগল,—"অসতী।

ও মেয়েকে বিয়ে না করাই উচিত। ভগবান যা করেন ভালর জন্যেই—”

কথাটা বলে ফেলেই বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি লাল হয়ে উঠেছে।

এদিকে ততক্ষণে সব গুছিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বরের বাপ তাকে বললেন, “ওঠ্।”

অমনি একটী ভদ্রলোক বাগানের অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে হাতযোড় কোরে দাঁড়ালেন, যেন বিনয়ের অবতার। তাঁর পিছনে দশ বারোটি লাঠিয়াল। যেমনি লম্বা, তেমনি চওড়া, গায়ের রং আব্লুশ কাঠের মত কালো, পরণে লাল কাপড়, মাথায় বাবরী, হাতে বাঁশের পাকা লাঠি—মাথার চেয়েও আধ হাত বড়। ভদ্রলোকটি বললেন, “অপরাধ নেবেন না। বসুন-বসুন। আপনারাই এ বিয়ের বরযাত্রী। বিয়েটা প্রায় শেষ হয়ে এল। খাবারও এল বলে। না খেয়ে গেলে আমাদের বাবু মশায়ের বড় অপমান হবে। ওরে সম্রা, তোরা বাবুদের পাহারা দে। খবরদার যেন একজনও না খসে। রূপোডাঙার বাবুর মান রাখিস্।”—বলতে বলতে তিনি বাগানের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

আমরা সকলে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলুম। তা ছাড়া আর কি করব? কোনটা আগে, মশায়, প্রাণ না মান? মরে গেলে মান নিয়ে আমার কি হবে? মানী বাঙালীকে কেউ জানে না, প্রাণী বাঙালীরই চিরদিন খ্যাতি আছে।

তার কিছুক্ষণ পরেই ভারে ভারে খবর আসতে লাগল। তার ফর্দ্দটা দিয়ে আপশোষ বাড়াতে চাই না। আর, সমরার খবরদারিতে আমাদের সকলকেই কিছু কিছু স্পর্শ করতে হল। খেলে না কেবল আমার বন্ধু। এবং খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে না হতেই সেই ভদ্র লোকটি আবার এলেন, হাতে এক থালা পান। সকলের হাতে এক একটি পান তুলে দিতে দিতে বললেন, "বড় কষ্ট দিলুম। বিদেশ-বিভূঁই একটুও আরাম পেলেন না কেউ। তবুও মনে রাখবেন। আজকের রাতটা থেকে কাল ভাল ক'রে খেয়ে-দেয়ে গেলেই হত। থাকবেন না? কপাল আমাদের। কি আর করতে পারি বলুন?"

তাঁর কথাটি শেষ হয়েছে আর আপনি কনের বাড়ীতে ভয়ঙ্কর গোলমাল উঠল।—আগুন? আত্মহত্যা? খুন? কিসের গোলমাল? সেই ভদ্রলোকটি লাঠিয়ালের দল নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেদিকে ছুটলেন।—আমাদেরও মনে সাহস এল। আমরাও জনকয়েক তাঁদের অনুসরণ করলুম। গিয়ে শুনলুম, বাসরঘরের দরজায় জমিদারবাবুর মৃত্যু হয়েছে। চৌকাঠে ধাক্কা লেগে প্রকাণ্ড সেজটার ওপর তিনি পড়ে যান।

সেটা ভেঙে গিয়ে তার খানকয়েক বড় বড় কাঁচ তাঁর শরীরে বিঁধে গেছে। তাঁর ও কনের পোষাকে, ঘরের মেঝে কাঁচা তপ্ত রক্ত। অত্যধিক সুরাপানের ফলেই এই বিভ্রাট। অত্যাচারের ফল যে এমন হাতে হাতে ফলবে এ আশা করিনি। সোৎসাহে ফিরে এসে আনন্দে জয়ধ্বনি ক'রে উঠলুম। বন্ধু তাতেও যোগ দিলে না। সে যেন কলের মানুষ; চেতনা নেই, একটা গতি আছে মাত্র।

তারপর সকলে গিয়ে নৌকোয় উঠলুম। সেদিনও ছিল এমনি জ্যোৎস্নারাত্রি। কিছুদূর চলবার পর পূর্ব্বের একটি বছরের পাঠ্যজীবনের নানা স্মৃতি মনের মধ্যে মাথা তুলতে লাগল। বিশেষ ক'রে মনে পড়ল সেই গাঢ় কালো মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে একটি ক্ষুদ্র জানালপথে একখানি অতি রমণীয় মুখ।...

বলিয়াই ভদ্রলোকটি স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার নিষ্প্রভ সঙ্কুচিত চোখ দুটি লইয়া বুঝিতে পারিলাম সত্যই তিনি অতীতের কতকগুলি দিন ও রাত্রিকে মনের মধ্যে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু খানিক পরেই তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন,—কেবল ঐটুকুই যদি হত তাহলে আমরা সান্ত্বনার যাহোক একটি কোন বিষয় খুঁজে নিতে পারতুম। কিন্তু এর পর যা ঘটল, তার তুলনার অভাব এদেশে না থাকলেও তা সাংঘাতিক।

* * *

ঐ অদ্ভুত ঘটনার পর তিনটি মাস চলে গেল। ব্যাপারটা সকলের মনে একটা দুঃস্বপ্নের মত একটি কোণ দখল করে পড়ে থাকলেও তা নিয়ে আর কেউ আলোচনা করে না। আমার বন্ধুটিও সুযোগ ও সুবিধা সত্ত্বেও আর কাউকে বিয়ে করে নি। একাকী দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছে। দৃশ্য-বৈচিত্র্যের মত সুচিকিৎসক আর নেই। সেগুলো মনকে যেমনি ভোলায়, তার তুলনায় মাতায় কম নয়। বন্ধুটি আমার নানাদেশ ঘুরে অনেকদিন কাটিয়ে সহসা আবার একদিন গ্রামে ফিরিলেন। সঙ্গে সেই মেয়েটি। সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেল, বিশেষ ক'রে তার বাপ মা। সে তাঁদের কাছে কৈফিয়ৎ দিলে, মেয়েটি বিধবা হবার পরেই বাপের সঙ্গে কাশী চলে যায়। সেখানে কিছুদিন হল তার পিতৃ-বিয়োগ হয়েছে। সে মেয়েটিকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। মেয়েরও মত আছে।

বুঝতেই পারছেন এতে তার বাপ-মায়ের মত হতে পারে কি না। মা বললেন, "ঐ অলক্ষুণে মেয়ে হবে আমার সোণার সংসারের বউ ?—"

বাপ বললেন, "তোকে ত্যাজ্যপুত্র করব—"

ছেলে জানালে, সে পৃথক গৃহে ত্যক্তের মতই বাস করবে। হয়ত করতও তাই। কিন্তু সেদিন রাত্রেই মেয়েটি আত্মহত্যা করে। কি ক'রে জানেন ? ঐ গড়ই নদীতে

ডুবে। পরদিন জেলেরা মাছ ধরতে ধরতে একখানা নিমজ্জিতপ্রায় চরের ধারে তার দেহটাকে টেনে তোলে। সে দৃশ্য বড় ভীষণ ও করুণ।...

তা, আপনাদের এই কনেটিও বড় সুন্দরী, এ গ্রামে জমিদারও একজন আছেন। কিন্তু তাঁর বয়স এখন মাত্র সাড়ে সাত বছর। ও বয়সে প্রেমে পড়লেও বিয়ের ইচ্ছেটা এমন উৎকৃষ্ট ভাবে প্রকাশ পাবে না। অতএব আপনারা নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হতে পারেন। এ বিয়ে হবেই। সময়ও হয়ে এল। ঐ যে কনের বাড়ী থেকে লোক আসছে। আচ্ছা, মশায়রা, নমস্কার।—বলিয়াই তিনি ত্রস্তে উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন। কোথায় গেলেন এবং এমন সচকিত হইয়াই বা উঠিলেন কেন বুঝিতে পারিলাম না। ইহার পর তাঁহাকে আর দেখিতে পাই নাই।

গল্পটা লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে বিয়ের পর কন্যাপক্ষের সেই ভদ্রলোকটিকে কথকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রশ্ন শুনিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "একটা পাগল। এখানে বর-যাত্রী এলেই তাদের কাছে ঐ গল্পটা বলে থাকে। কি ক'রে যেন ওর ধারণা হয়েছে, ঘটনাটা ওরই জীবনের। কিন্তু আসলে ওটা গল্প—" বলিয়াই তিনি হাসিতে হাসিতে পানের থালাখানি আমার দিকে আগাইয়া দিলেন।

ভাবিতে লাগিলাম—গল্প? হইবেও বা। কিন্তু তিনি যখন বলিতেছিলেন, তখন মনে হইতেছিল সত্য। এখনও পাগলামি বলিয়া মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছি না। এই মুহূর্তে এমনতর ঘটনা কোথাও যে ঘটিতেছে না, তাই বা কি করিয়া বলি?

BLUE BLACK
KAJAL-KALI
CHEMICAL ASSOCIATION CALCUTTA

Chemical Association

55, Canning Street,
Calcutta

কাজল কালী ব্যবহার করে সন্তোষ লাভ করেছি। এই কালিকে বিদেশী কালির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। ইতি ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রসঙ্গ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

বাবু নাটকের কথা

বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া এত রকম মজার সংবাদ পাইয়াছি ও এত রকম অদ্ভুত নামের নাটক দেখিয়াছি, যাহা বাস্তবিকই কৌতূহলপ্রদ। অনেকে মনে করেন, নাটক লেখা রোগটা আজকালই এদেশে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু এ অনুমান ঠিক নহে। বঙ্কিমের আমলে উহা আরও প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ৩৯৮ খানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হয়; তাহার মধ্যে নাটক নামাঙ্কিত পুস্তকের সংখ্যা ছিল—৯৪ খানি। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রকাশিত যে সব বাঙ্গালা নাট্যগ্রন্থের নাম পাওয়া যায়, তাহার হিসাব করিলে সংখ্যায় সে দুই শতের প্রায় পাশে গিয়া দাঁড়াইবে। অদ্যকার আলোচ্য 'বাবু নাটক'ও এই শেষোক্ত সংখ্যার শ্রেণীভুক্ত।

* * *

অনেক দিন হইতে অনেক লেখকই বাঙ্গালী বাবুর উপর চাবুক চালাইয়া আসিতেছেন। বঙ্কিমবাবু যখনই যেখানে সুবিধা পাইয়াছেন, তখনই সেখানে 'বাবু-চাঁদের' পিঠে দুই ঘা কসাইয়া দিয়াছেন। অমৃতলালও তাহাই করিয়াছেন।

বিশেষতঃ তাঁহার 'বাবু' প্রহসনে বাবু-বুদ্ধির বিকটতা যে-ভাবে আঁকা হইয়াছে, বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবিকই তাহার তুলনা নাই। মনীষী হরিনাথ দে উহার ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, আমরা জানি। কিন্তু কেন যে সে অনুবাদ এ পর্য্যন্ত ছাপার অক্ষরে বাহির হইল না, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, এই প্রহসন-প্রকাশের প্রায় ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালা ভাষায় 'নাটক'-রূপে 'বাবু' বাহির হইবার যে বার্ত্তা আমরা শুনিয়াছি, এইবার তাহাই বলিব।

* * *

তবে এখানে প্রথমেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, বঙ্গ-নাট্য-সাহিত্যের এ 'বাবু'ও আদি বাবু নহে। ইহারও প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটক' প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সংবাদ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদ প্রভাকরে'র বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ধার করিয়া ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ-সংখ্যার 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এই 'বাবু-নাটকের'ও খবর আমরা 'বিজ্ঞাপন' মারফতে পাইয়াছি। তবে এ 'বিজ্ঞাপন' ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' নয়,—তাঁহার 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' মুদ্রিত হইয়াছিল। সে কাগজের তারিখ—১৩ই জুলাই, ১৮৫৭ (৩০শে আষাঢ়, ১২৬৪ সাল)। সাধুরঞ্জনের 'বিজ্ঞাপন'টুকু এখানে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"বিদ্যাভূনীকৃত বাবু নাটক"

"কলিকাতা মহানগর নিবাসী বাবুগণের বাবুয়ানা ও তাঁহারদিগের ব্যবহার ও তাঁহারদিগের কথোপকথন অবগতিকরণ বহুকাল হইল বাবু বিলাস নামক গ্রন্থ প্রকাশ হয়, কিন্তু অতি পূর্ব্বকালের পুস্তক অজ্ঞ ভট্টাচার্য্য দ্বারা বিরচিত হইবায় এইক্ষণে তাহা পাঠযোগ্য নহে, এবং কথোপকথনও বর্ত্তমান প্রচলিত নিয়মমত নহে, এ নিমিত্ত নূতন মতে পদ্যে ও গদ্যে নাটকাকারে সুন্দররূপে লিখিত হইয়া মুদ্রিত আরম্ভ হইয়াছে, মূল্য ।০ আনা, বিনা স্বাক্ষরকারিগণের ।৵০ আনা। গ্রাহক গণনায় গণ্য হইতে ইচ্ছা করিলে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে, তত্ত্ববোধিনী সভায় ও কবরডাঙ্গায় আর, এম, বসু কোম্পানীর পুস্তকালয়ে নাম ধাম প্রেরণ করিবেন, সাবকাশ সময়ে পাঠ করিলে আনন্দদায়ক ও মনোরঞ্জন হইবেক।"

* * *

উপরি-উক্ত 'বিজ্ঞাপন' ধরিয়া দুই-একটা কথা এখানে বলিতে চাই। আমাদের ধারণা ছিল, গদ্যগ্রন্থের মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলাল'ই সর্ব্বপ্রথম নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু এখন দেখিতেছি, হীরালাল মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল নাটক" প্রকাশেরও ১২ বৎসর পূর্ব্বে প্রমথ শর্ম্মার 'নববাবু বিলাস' নামক গ্রন্থ নাটকে রূপান্তরিত হইয়াছিল। বোধ করি, সকলেই জানেন যে, বাবু-বিষয়ক গ্রন্থ-মধ্যে এই 'নববাবু বিলাস'ই সব চেয়ে পুরাতন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহার

দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। প্রথম সংস্করণ দেখি নাই; তবে শুনিয়াছি, ১৮২৩ অব্দে তাহা মুদ্রিত হইয়াছিল। এখন কথা হইতেছে, ইহাকে যিনি নাটকে পরিণত করেন, তিনি কে? বিজ্ঞাপনের 'বিদ্যাভুনী' নামটা যে বাজে, তাহা না বলিলেও বোধ করি চলে। তবে মনে রাখিতে হইবে, ঐ 'বিজ্ঞাপনে' গ্রন্থ-প্রাপ্তির স্থান-হিসাবে 'তত্ত্ব-বোধিনী সভা'র উল্লেখ আছে। এদিকে ১৩৩১ সালের ১৬ই শ্রাবণের 'নাচঘরে' দেখিতে পাই, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছিলেন, "আমাদের জোড়া-সাঁকোর হল ঘরটা ঐতিহাসিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ ঘরে আমাদের তিন পুরুষ অভিনয় করে আসছে। প্রথমে আমাদের কাকাদের আমল। তখন মেজ-কাকা মশায়ের (৺ গিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর) রচিত 'বাবু বিলাসে'র যাত্রা ঐ ঘরে হয়। আমার বয়স তখন ৪।৫ বৎসর হবে।"—এই সব পড়িয়া-শুনিয়া স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে যে, 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' বিজ্ঞাপিত 'বাবু নাটক'ই কি গিরীন্দ্রনাথের 'বাবু বিলাস' নয়? 'সাধুরঞ্জনে' যখন ঐ বিজ্ঞাপন বাহির হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন ৮।৯ বৎসর হইবে। সুতরাং সেই শিশুকালের স্মৃতির সাহায্যে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সবটুকুর সহিত 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে'র বিজ্ঞাপনের মিল না থাকিবারই কথা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে যে মিলের আভাসটুকু পাওয়া যায়, তাহা আমাদের অনুমানের অনুকূল বলিয়া মনে করি। মনে পড়ে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যখন একবার লিখিয়াছিলেন,

“প্রথম নাটক ‘নব বাবু বিলাস’ ও নব বিবি বিলাস।” তখন সে কথার আমি প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। এখন মনে হয়, শাস্ত্রী মহাশয়ও বাল্যকালের স্মৃতির উপর নির্ভর করিতে গিয়া ভুল বলিয়া ফেলিয়াছেন। বাল্যকালে ক্লাসিক থিয়েটারে ‘ভ্রমরে’র অভিনয় দেখিয়া বা সে অভিনয়ের কথা শুনিয়া এখন যদি কেহ ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’কে নাটক বলেন, তাহা হইলে তাহা যেরূপ ভুল হয়, ইহাও সেইরূপ ভুল। নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত ‘নববাবু বিলাসে’র স্মৃতিই বোধ হয় তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে।

BEST
VIRGINIA
Bombay Special

বোম্বে স্পেসালেরই
আজকাল চলন
ভারতীয় ভার্জ্জিনিয়া
সিগারেট
স্বদেশী এবং সুলভ
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়
সোল এজেন্ট
দাস এণ্ড কোং
২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট

চিত্র ও চরিত্র

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

যে শক্তি নিজের মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে দেয় না, বাস্তব অথবা মানস জগতে কোন না কোনরূপ বিপ্লব বাধাইয়া তোলে, যাহা সহজে পরিতুষ্ট নয়, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেই চঞ্চল ও আবেগবান শক্তির অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার শক্তির মধ্যে প্রশান্তি ছিল। ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, স্নিগ্ধতা ও সামঞ্জস্য লইয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব গঠিত।

১৮৪৪ সালে গুরুদাস জন্মগ্রহণ করেন।

গুরুদাস ছিলেন আদর্শ গৃহী পুরুষ।

প্রতিভা নূতন সৃষ্টি করে, গৃহী নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সংসারকে বরণীয় করিয়া তোলে।

পরতন্ত্র দেশে সংসারীর যাহা কাম্য, গুরুদাস আত্মশক্তিতে তাহা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দরিদ্র, পিতৃহীন, মাতৃভক্ত বালকের পক্ষে ছাত্রজীবনে পূর্ণ কৃতিত্ব লাভ করা, আইন-ব্যবসায়ে প্রভূত খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করা, প্রধান বিচারালয়ে বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করা, কর্ণধার-রূপে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা, সর্ব্বজনবরেণ্য হইয়া সংসারধর্ম্ম পালন করা, সুগঠিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবারের নিয়ামক-রূপে

সংসারসুখ ভোগ করিয়া বৃদ্ধবয়সে গঙ্গালাভ করা—বাঙ্গালী-জীবনের সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার জীবনে পরিপূর্ণ হইয়াছে, দেখিতে পাই।

সুচিন্তিত উপদেশ দানে তিনি অকৃপণ ছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। সদাচার পালনে তিনি সর্ব্বদা রত ছিলেন। সত্যনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যবোধ তাঁহার সকল কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করিত। তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ছিল, কিন্তু কাঠিন্য ছিল না।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে চুয়াত্তর বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

এই সদাপ্রফুল্ল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুপণ্ডিত, শান্ত ও কমনীয়-স্বভাব, নিষ্ঠাবান, মিতাচারী, গৃহধর্ম্ম-পরায়ণ ধার্ম্মিকের প্রকৃতি অতি মধুর ছিল।

বাঙ্গালীর জুতার দোকান!
পছন্দসই জুতা এখানে সস্তা
ইউনাইটেড ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং —
১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মেছুয়াবাজারের মোড়, কলিকাতা

সাময়িকী ও অসাময়িকী

মহাত্মা গান্ধীর অনশনব্রতগ্রহণে শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারতের বাহিরের অনেক লোকও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মার বিবৃতি হইতে এইটুকু বোঝা যায়, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি, এবং ইহার অন্যতম কারণ হরিজন-সম্পর্কে বন্ধুজনের কর্ত্তব্যে অবহেলা।

* * *

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, এই আত্মবিলোপে তিনি তাহাদিগকেই অনাথ করিবেন, যাহাদের কল্যাণের জন্য তিনি এই অনশনব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

* * *

মহাত্মা ২৫শে বৈশাখ হইতে উপবাস আরম্ভ করিয়াছেন। সরকার সেই দিনই তাঁহাকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিয়াছেন।

* * *

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে, মহাত্মা সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।

* * *

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশে এবং বর্ত্তমান কংগ্রেস-সভাপতি আণের আদেশে আইন-অমান্য-আন্দোলন সম্প্রতি ছয় সপ্তাহ স্থগিত রহিল। আপোষ হইলে বা না হইলে কি হইবে, তাহা এখনও পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ক্রমে বিবৃত হইবে।

* * *

সকলে আশা করেন, মহাত্মা আত্মিক বলে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন।

দিন-পঞ্জী

ডাবলিন, ৩রা মে—সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শপথ পরিত্যাগের জন্য প্রেসিডেন্ট ডি-ভ্যালেরা যে বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা চূড়ান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই বিলের উপর বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ডি-ভ্যালেরা বলেন, আমি সাধারণতন্ত্রকে রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করিয়া সমস্ত ব্যাপারের যবনিকা পাত করিব।

মাদ্রাজ, ৭ই মে—ডাঃ স্পিজেল। মহাত্মার জার্ম্মান তরুণী শিষ্যা। তিনি মহাত্মার অনশনের সহিত পাল্টা অনশন চালাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য মহাত্মা নিশ্চয়ই অনশন ত্যাগ করিবেন।

পুণা, ৮ই মে—মধ্যাহ্ন ঠিক ১২টার সময় প্রার্থনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রস্তাবমত অনশনব্রত আরম্ভ করিয়াছেন।

পুণা, ৮ই মে—রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় মহাত্মা গান্ধীকে ভারত সরকার বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিয়াছেন। তিনি এক্ষণে পুণায় (পর্ণ কুটীরে) লেডী বিঠলদাস খ্যাকার্সের ডাক-বাংলায় অবস্থান করিতেছেন।

পুণা, ৮ই মে—মহাত্মাজী মুক্তির পর, তাঁহার ইচ্ছানুসারে কংগ্রেসের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত আণে ছয় সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিবেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। সেই সঙ্গে গবর্ণমেণ্টকে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার, ও অর্ডিনান্স সমূহ প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

সিমলা, ৯ই মে—গবর্ণমেণ্ট একটি ইস্তাহারে প্রচার করিয়াছেন যে, আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা সন্তোষজনক নহে। অবৈধ আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃবর্গের সহিত কোন আপোষ-নিষ্পত্তি করিবার বা

কারারুদ্ধদিগকে মুক্তিদান করিবার কোন অভিপ্রায়ই গবর্ণমেণ্টের নাই।

বোম্বাই, ১০ই মে—মিস্ মার্গারেট স্পিজেল শ্রীযুক্তা নাইডুর অনুরোধে অনশন ত্যাগ করিয়াছেন শ্রীযুক্তা নাইডু তাঁহাকে বোঝান যে, গান্ধীজীকে আপনি ভালবাসেন বলিয়া জানাইতেছি, যে এই কার্য্যের দ্বারা সেই গান্ধীজীরই ঘোরতর অনিষ্ট করা হইবে।

ভিয়েনা, ৯ই মে—শ্রীযুক্ত প্যাটেল ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু একযোগে একটি বিবৃতিতে জানাইয়াছেন, 'আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা কার্য্যটির দ্বারা মিঃ গান্ধীর বিফলতার স্বীকারোক্তি সূচিত হইতেছে।' রাষ্ট্রনেতা হিসাবে মিঃ গান্ধী বিফল হইয়াছেন, অতএব নূতন নীতি ও পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া কংগ্রেসের পুনর্গঠনের সময় আসিয়াছে এবং যেহেতু গান্ধীর আজীবন অনুসৃত নীতির বিরোধী কোনও কার্য্যে তাঁহাকে পাইবার আশা করা অসঙ্গত, সেই জন্য এই কার্য্যে একজন নূতন নেতার আবশ্যক। যদি কংগ্রেস এইরূপ পরিবর্ত্তন মানিয়া লইতে না পারে, তাহা হইলে চরমপন্থীদের কংগ্রেসের মধ্যে আর একটি দল গঠন করা উচিত।

আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে
আর ইনজেক্সান লইতে হইবে না
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

শুভ বিবাহের এবং প্রিয়জনকে উপহার দিবার উপযোগী
বেনারসী, শাড়ী, জোড়, খদ্দর এবং মিলের ধুতি,
শাড়ী ও আধুনিকতম রুচির পোষাকের
বিচিত্র ও বিপুল আয়োজন

চন্দ্রকুমার বৈকুণ্ঠনাথ গুঁই

(১৮৭১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত)

—কলিকাতা—

৩৬ নং খোঙ্গরা পটি, (ফোন, বড়বাজার ৩৪৭)

—শাখা—

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, (ফোন, বড়বাজার ১৯৭৫)
পি ২৩৩, লেক রোড, কালিঘাট (ফোন, সাউথ ১০৫৪)

বাঙ্গালীর শিল্পনিদর্শন

ঘোষ ব্রাদার্সের

জুতা

সুলভ ও শ্রেষ্ঠ

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

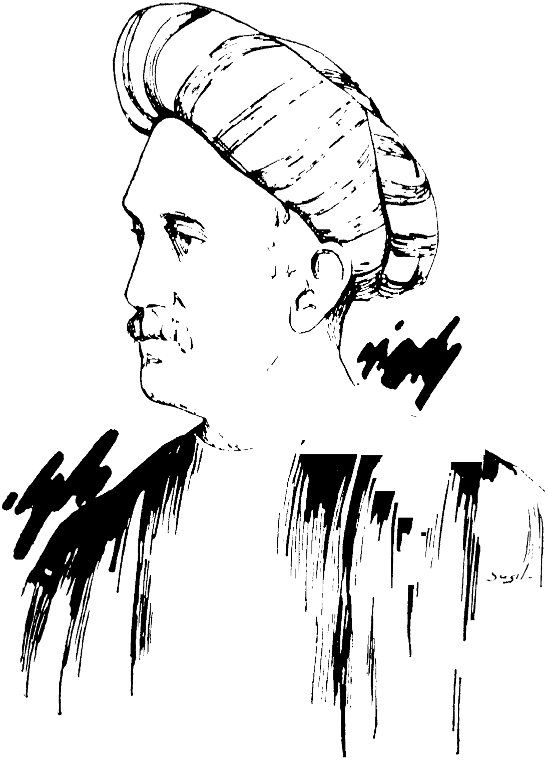

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

ছোট গল্প

১ম বর্ষ] ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ [৪৮শ সংখ্যা

পাগল

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

গুড্‌ ফ্রাইডের ছুটিটা কোথায় কাটানো যাবে ভাবছিলাম। কয়েকজন বন্ধু মিলে স্থির করা গেল রাঁচি বেড়িয়ে আসা যাক। রাঁচি তার পাগলা গারদের জন্য বিখ্যাত,—যাদের মাথা খারাপ হয়েছে এবং যাদের এখনো তা হয়নি উভয়ের পক্ষেই ওটা একটা আকর্ষণ।

সমস্ত দুপুরটা মেণ্টাল হস্‌পিটালে কাটিয়ে অবসন্ন মন নিয়ে আমরা কাঁকের এক নির্জ্জন প্রান্তরে এসে বসলাম। এতগুলি জীবনের এই বিকৃত পরিণাম, এই জীবন্ত সমাধির প্রত্যক্ষ দৃশ্য আমাদের যেন অনন্ত রহস্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। সত্যই, মানুষ তার সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত

শক্তি, সমস্ত গৌরব নিয়ে কতখানি অসহায়! ভাগ্যের দুয়ারে তার কোনো স্পর্দ্ধাই টেকে না। যে মানুষ অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত জীবনের গর্ব্ব করে, তারই মস্তিষ্কের কোনো এক সূক্ষ্মতম যন্ত্রে সামান্য একটু বিকৃতি ঘটলে কোন্ বিপুল ব্যর্থতা ও কারুণ্যের মধ্যে তার পরিসমাপ্তি ঘটে, তা ভাবলে বিংশ শতাব্দীর দর্শন বিজ্ঞান শক্তি ও সভ্যতার অভ্রভেদী চূড়ার দিকে তাকিয়েও কোনই সান্ত্বনা পাওয়া যায় না।

আমাদের মধ্যে প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে পূর্ণেন্দু।

—পাগল হওয়া তো একটা ফ্যাশান নয়, সখের খাতিরে মানুষ পাগল হয় না। একদিনে মানুষ পাগল হয়ে যায় বটে, কিন্তু তার পেছনে থাকে এক যুগের ইতিহাস। সে ইতিহাস যে কী তা তোমরা ভাবতেও পারো না।

আমরা কেউ পূর্ণেন্দুর কথার কোনো উত্তর দিলাম না। উত্তর দেবার কিছু ছিলও না।

পূর্ণেন্দু বলসে—সত্যি, যে-কারণের ফলে মানুষ তার সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে বসে, তার বিচার বুদ্ধি, তার সঙ্গতি ও সঙ্কোচের জ্ঞান ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, সেই কারণের মত মর্ম্মন্তুদ কিছু কল্পনা করা যায় না। এই যে এতগুলি বিচিত্র রকমের পাগল দেখা গেল, এদের জীবনের নেপথ্যে কি করুণ ট্র্যাজেডি ঘটেছে যার ফলে তারা আজ এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তা কি ভাবতে পারো? একটি পাগলের জীবনের ইতিহাস জানার সুযোগ আমার হয়েছিল, তাই

থেকেই আমি জানি কত বড় বেদনায় মানুষ পাগল হয় এবং পাগল হওয়ার মানে কত বড় ব্যর্থতা।

আমরা কিছু বললুম না, কেবল সাগ্রহে পূর্ণেন্দুকে ঘিরে বসলুম। তার ইঙ্গিত বুঝতে পূর্ণেন্দুর দেরি হোলো না, সে তার গল্প সুরু করল।—

বোধ হয় তোমরাও তাকে দেখেছ।

কলকাতার কোথায় না তাকে দেখতে পাওয়া যায়? ময়লা কাপড়, অপরিচ্ছন্ন চেহারা—পায়ের প্রত্যেক আঙুলে ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ানো, বোধ হয় তাই তার জুতো। তাকে দেখা মাত্র লোকে বোঝে যে, এ পাগল।

কলকাতার কত জায়গাতেই না তাকে দেখেছি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোই তার কাজ। তবে যেখানেই ঘুরুক, আস্তানা হচ্ছে তার আমাদের পাড়ায়। আমাদের রাস্তাটা যেখানে ট্রাম রাস্তায় মিশেছে তারই মোড়ে তাকে বেশির ভাগ সময় দেখতে পাওয়া যায়।

দেখা হোলো কি আর এড়ান্ নেই। একটি পয়সা তাকে দিতে হবে, কেননা সে চা খাবে।

একটি পয়সাই ত। বেশির ভাগ সময়ই দিতাম।

একদিন সে আমাদের বাসাতেই এসে হাজির। এসে বললে—আমাকে আজ খেতে দিতে হবে।

আমি বললাম—তা বেশ। খেয়ো।

বাসার ঠাকুরকে ডেকে খাবার কথা বলে দিলাম।

আমার হাতের কাগজখানা লক্ষ্য করে বললে—ওটা কি কাগজ, ফরওয়ার্ড ?

না।

তবে কি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান ?

উঁহু। লিবার্টি।

লিবার্টি ? কই দিন ত দেখি। লিবার্টি আবার কি কাগজ ?

কাগজখানা হাতে নিয়ে গড়্ গড়্ করে পড়ে যেতে লাগল। তার ইংরেজি উচ্চারণ শুনে তার প্রতি শ্রদ্ধা হোলো. বুঝলাম, সাধারণ পাগল এ নয়। ভাবলাম এমনো তো হতে পারে যে বেশি পড়াশোনার চাপে এর মাথা বিগড়ে গেছে। ভেবে শ্রদ্ধা আরো বাড়ল।

খানিকক্ষণ পরে এপাতা ওপাতা উলটে, চারিধার তন্ন তন্ন করে দেখে কাগজখানা ফিরিয়ে দিলে। হতাশার সুরে বললে—নাঃ, এতে লী কমিশনের রিপোর্ট নেই।

অবাক হলাম—লী কমিশনের রিপোর্ট! জিজ্ঞাসা করলাম—সে আবার কি ?

সেই যে—সেই যে। বালী ব্রিজ তৈরি হবার সময়ে। আপনি জানেন না যে দাশ-মশাই বিলেত যেতে চেয়েছিলেন ?

আমি মাথা নেড়ে বললাম—না।

দাশ-মশাই আবার কে? সি-আর-দাশ—আমাদের মেদিনীপুরে গেছলেন, তখন আমি কলেজে পড়ি।

তোমার বুঝি মেদিনীপুরে বাড়ি? কোথায়?

কোথায়, কোথায়?—কপাল কুঁচকে ভয়ানক চেষ্টা করে সে ভাবতে লাগল। অবশেষে বললে, বাড়ী আমাদের হারিয়ে গেছে।

তোমার নাম কি?

আমার নাম জগদীশ। কিন্তু একটা চাকরি যোগাড় না করলে আর চলছে না। মাধবীকে বিয়ে করতে হলে—

এইমাত্র বলে সে গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগল। তার আচ্ছন্ন মুখভাব দেখে আমার মনে হোলো, হয়ত বিদ্যার চাপই এর পাগলামির যথেষ্ট কারণ নয়, এর পেছনে কোনো প্রেমের ইতিহাস থাকতেও পারে। ভালোবেসেও তো অনেকে পাগল হয় শোনা গেছে।

আপনি জানেন না বুঝি? আমার কাকা আমাদের সব বিষয় সম্পত্তি ফাঁকি দিয়েছেন। সেই মামলা এখন হাইকোর্টে। সেইটা জিততে পারলেই হয়। আজ একবার হাইকোর্টে যাব। হ্যাঁ, হাইকোর্টে। কেন হাইকোর্টে কি আমি যেতে পারি না?

খুব খুব। কেন পারবে না?

আমার কথা শুনে সে আশ্বস্ত হোলো। বললে—কিন্তু একটা চাকরি না করলে আর চলে না। আমাকে একটা চাকরি দেবেন ?

কোথায় পাব চাকরি ? আমি তো নিজেই চাকরি করি।

চাকরির জন্যে কি শেষে মামাকে লিখব ? আমার মামারা খুব বড় লোক ? ঘাটালের মহাজন।

আমার কৌতূহল হল, জিজ্ঞাসা করলাম—নাম কি তোমার মামার ?

অত্যন্ত সহজ সুরে সে উত্তর দিলে—প্রিন্স অব ওয়েল্‌স। একটু কাগজ আর কলম দিনত আমাকে।

কাগজ কলম দিতে যাব, এমন সময়ে বাসার ঠাকুর এসে জানালে যে ওর ভাত বেড়ে দেওয়া হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্র তার মর্ম্ম সে বুঝতে পারলে, মামাকে চিঠি লেখার আর কোনো উৎসাহ দেখালে না।

নীচে নেমে গিয়ে দেখলাম, রান্নাঘরে যেখানে সকলে খায় সেখানে তার ভাত দেওয়া হয়নি। সেজন্য মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও অভিযোগের কোনো কারণ পেলুম না। হোক না লেখাপড়া জানা, হোক না ভদ্রলোকের ছেলে, কিন্তু আজ সে তার সমস্ত অতীতের সঙ্গে সম্পর্কহীন। কেবলমাত্র স্মৃতিলোক থেকে ভ্রষ্ট হয়ে, যুক্তির যোগ ছিন্ন করে, আজ এত মানুষের মধ্যে থেকেও সে তাদের থেকে কত দূরে !

রান্নাঘরের উঠানেই পাতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেখানে খেতে জগদীশ নারাজ। ভাবলাম এবার বুঝি মুস্কিল বাধালো। পাগল মানুষের তো কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। কিন্তু সে আবদার ধরলেই, বাসার আর সবাই তার মত অপরিচ্ছন্নের সঙ্গে একঘরে একসঙ্গে বসে খাবে কেন—বদ্ধ পাগল সে নাই বা হোলো।

সে বললে—ঘরে আমি খাব না। ঘরে খেলে আমার জাত যায়। আমার ভাত রাস্তায় দিতে বলুন।

রাস্তায়? আশ্চর্য্য করলে। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা—অবশেষে চাকর গিয়ে রাস্তায় পাতাটা ধরে দিয়ে এল।

সে খেতে বসতে যাবে, এমন সময়ে তারও কতকগুলো অতিথি জুটে গেল। রাস্তার কয়েকটা কুকুর। তাদের দেখে সে দাঁড়িয়ে উঠল, তাদের উদ্দেশে বললে—খাবি যদি পাতা নিয়ে আয়।

কিন্তু কুকুরেরা সেখান থেকে নড়ে না। লুব্ধ প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকে—তাদের লোলুপ জিভের জল মাটিতে পড়ে।

জগদীশ বলে—ভয় নেই, আমি যাচ্ছি না। যা পাতা নিয়ে আয় গে। পাতা না হলে খাবি কিসে?

জগদীশও দাঁড়িয়ে থাকে, কুকুরগুলোও। কারুই খাওয়া হয় না। বাসার লোকেরা দাঁড়িয়ে মজা দেখে, রাস্তার

লোকও। কিন্তু মজা দেখবার সময় কোথায়? অফিসের টাইম যায়—বেরিয়ে পড়তে হয়।

অদ্ভুত ধরণের পাগল এই জগদীশ। বদ্ধ পাগল নয়, মানুষ-খুন-করা পাগল নয়, একেবারে সমস্ত বিচারবুদ্ধি হারিয়ে বসেছে এমন পাগলও নয়। কথাবার্ত্তা গোলমেলে বটে, কিন্তু অনেক সময়ে এমন বুদ্ধিসহ কথা বলে যে অবাক হতে হয়। বোধ হয় কখনো কখনো ওর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে—কিছুক্ষণের জন্য।

ও যে সাধারণের চেয়ে পৃথক, এ-জ্ঞান মাঝে মাঝে যেন ওর হয়। একদিন ও রাস্তায় আমাকে ধরে বসল। বললে—আমার এই রোগটা কি করে সারে বলতে পারেন?

কি রোগ

এই—এই। এই আমার অসুখ।

তোমার পাগলামি?

হ্যাঁ হ্যাঁ। ওটা না সারলে ত আমি চাকরিও পাব না, মাধবীকেও পাব না।

জিজ্ঞাসা করলাম—মাধবী তোমার কে?

ও আছে। এখন বলুন দেখি কি করলে সারে?

যে-উত্তরটা মুখে এল সেটা বললে হয়ত ও অসন্তুষ্ট হবে—যদি এখন ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। একটু ইতস্ততঃ ক’রে

অবশেষে বলেই ফেললাম—রাঁচিতে গভর্ণমেণ্টের একটা হাসপাতাল আছে, মেণ্টাল হসপিটাল, সেখানে গেলে সারে শুনেছি।

সে একটুক্ষণ ভাবলে—তারপর বললে—আমি জানি। কিন্তু আমাকে যেতে দেয় না।

যেতে দেয় না কি রকম ?

আমি একবার রাঁচির গাড়িতে উঠে বসেছিলাম কিন্তু আমাকে নাবিয়ে দিলে। আমার কাছে টিকিট চাইলে। আমি বললাম, আমার দাদামশায়ের নিজের এ-সমস্ত রেলগাড়ি। তা কিছুতেই শুনলে না।

আচ্ছা আমি দেখব এখন চেষ্টা করে।

চেষ্টা আমি করেছিলাম অবশ্য, কিন্তু তার কোনো ফল হয়নি। খবর নিয়ে জানলাম বদ্ধ পাগল কিম্বা মারাত্মক রকমের পাগল না হলে সেখানে নেয় না। যে পাগল কারু অনিষ্ট করে না, কেবল একটু মাত্র মাথার ছিট আছে, বিশেষতঃ ক্রিমিনাল কোনো অপরাধ করেনি—সে পাগলকে নিয়ে সকলেরই মাথাব্যথা কম। ভেবে দেখলাম, ও যদি একটু বিপদজনক পাগল না হয় তাহলে ওর রাঁচি যাবার এবং সারবার আশা নেই।

অবশেষে একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়ে একদিন ওকে ডেকে বললাম—তুমি কি সত্যিই রাঁচি যেতে চাও ?

অনেকক্ষণ সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, যেন আমার প্রশ্নটা বুঝতেই পারলে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কি সারতে চাও সত্যিই, না চাও না?

সে বললে—হ্যাঁ।

কিন্তু আমার প্রশ্নের মর্ম্মবোধ তার হয়েছে কি না বুঝতে পারলাম না।

তাহলে এক কাজ কর। বড় বড় ইট-পাটকেল নয়, ছোট ছোট কুঁচি ঢিল জোগাড় কর, তাই দিয়ে বড় রাস্তায় মানুষ দেখ আর ছুঁড়ে মারো।

সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—মারব কেন?

আমার আইডিয়া ছিল এই যে ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়ে মারলে মানুষ কিছু মরবে না। অধিকাংশই কারুর গায়ে লাগবে না আর লাগলেও একটু আদটু কেটে ছড়ে যাবে মাত্র। কিন্তু তার ফলে ও-বেচারার যথার্থ উপকার হবে। বিপদজনক পাগল বলে পুলিস তখন ওর চার্জ্জ নেবে এবং ওকে রাঁচি পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।

সমস্ত ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে বললাম এবং এটাও ভালো করে বলে দিলাম যে আর যাকেই সে তার ইটপাটকেলের লক্ষ্য করুক না কেন, ভুলক্রমে যেন আমাকে না করে বসে। আমার সমস্ত কথা সে মন দিয়ে শুনলে।

মনে হল আমার কথাটা সে বুঝতে পেরেছে এবং রাজিও হয়েছে। রাস্তার ধারে কর্পোরেশনের পুঞ্জীভূত খোয়ার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পালাব মনে করছি, সে তাড়াতাড়ি আমার কাছে এগিয়ে এসে পথরোধ করে প্রশ্ন করলে—কিন্তু মারব কেন?

আমি তখন তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারেই হতাশ হলাম। আমার অনেক চিন্তার ফলে এই রাঁচি যাবার শর্ট্‌কাট্‌ যে একেবারেই কোনো কাজে লাগল না সে বিষয়েও নিঃসংশয় হলাম। অত্যন্ত গবেষণার ফল একেবারে ব্যর্থ হলে যে বিরক্তি ও বৈরাগ্য মানুষের হওয়া স্বাভাবিক—আমার তখন সেই অবস্থা। আমি তার পুনঃপুনঃ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে আমার গতিকে ক্ষিপ্রতর করলুম। সেই মুহূর্ত্তে জগদীশের প্রতি আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি ছিল না।

কে একজন আমাকে বলেছিল যে ছোটখাট পাগলামি সাইকো-য়্যানালিসিস্‌ করলে সেরে যায়। কিন্তু মানসিক চিকিৎসার উপকার পেতে হলে রোগীর পূর্ব্বতন ইতিহাস জানার দরকার।

জগদীশের ইতিহাস যোগাড় করা তখন আমার চেষ্টা হল। আমার কেমন একটা খেয়াল হলো যে ওকে সারানো যায় এবং ওকে সারাতে হবেই। আমার উৎসাহের আতিশয্য

দেখে বাসার কোন কোন ব্যক্তি টিপ্পনি কাটলেন—পাগল না ছাই! পেটের দায়ে পাগল সেজে থাকে। তবে ভালো মানুষকে পাগল করার মন্ত্র জানে দেখছি!

যাক, বলুক গে! এ সব কথার কি জবাব দেব? ওকে যদি ভালো করতে পারি সেই হবে আমার জবাব।

অত্যন্ত দৈবক্রমেই একদিন জগদীশের এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আলাপ হলও এক অদ্ভুত ঘটনাচক্রে।

বায়স্কোপ দেখতে গেছি, তখন ইণ্টারভ্যালের সময়। সামনের সীটের একজন যুবক তার পার্শ্ববর্ত্তীকে বললে—বক্সের ওই মেয়েটাকে দেখছিস?

কথাটা কাণে গেল: তার নির্দ্দেশ অনুসরণ করে দোতালার ডানদিকের বক্সে যে যুবতীটিকে দেখতে পেলাম তিনি অসামান্যা সুন্দরী না হোন, তাঁর মুখে এমন একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট যা সচরাচর বড় চোখে পড়ে না।

বেশ দেখতে, কি বলিস?

পাশ্ববর্ত্তীটি সায় দিয়ে বললে—দেখে মনে হয় খুব আপ-টু-ডেট।

তা মনে হয়, কিন্তু ও ভদ্রঘরের মেয়ে নয়।

বলিস কি? বাজারের?

একেবারে বাজারেরও না। ওর মা কোন এক জমিদারের রক্ষিতা ছিল। ও-ও এখন তাই। ওর ষ্টাইল

দেখে আর কথাবার্ত্তায় কে ধরবে, ও কোনো ব্যারিষ্টার কি বড়লোকের মেয়ে নয়? পাশ করেছে পর্য্যন্ত।

তুই ত ওর হাঁড়ির খবর রাখিস দেখচি। তোর সঙ্গে আলাপ আছে নাকি? আমার মনে পড়ছে, বায়স্কোপ সুরু হবার আগে ও যেন তোকে লক্ষ্য করছিল।

করছিল? তাহলে চিনতে পেরেছে। অনেক দিন পরে এই দেখা হোলো।

বল্‌না ভাই, কি করে তোদের আলাপ হোলো। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

সে আমার এক বন্ধুর 'থ্রু' দিয়ে। ওরা তখন প্রেমে পড়েছিল। প্রায়ই এই বায়স্কোপে এসে দেখা করত। খুব বেশি দিনের কথা নয় বটে, তা হলেও সে-বেশ কিছুদিন। সেই সময়েই আমার সঙ্গে আলাপ হয়।

তা তোর সে বন্ধু আজও এসেছে নাকি? কোথায় বসেছে সে? কোথায় সে?

সে এখানে কোথায়? সে মেয়েটিকে ভালোবেসে পাগল হয়ে গেছে। সত্যিকারের পাগল—একেবারে বদ্ধ পাগল। কিছুদিন আগে রাস্তায় রাস্তায় তাকে ঘুরতে দেখতাম, এখন আর দেখতে পাই না।

কানে আসছিল বলে কথাগুলো আমি শুনছিলাম। মেয়েটির মুখের ছাপে আমার যে উচ্চ ধারণা ও উৎসাহ হয়েছিল, ভদ্রঘরের নয় জেনে তার খুব সামান্যই তখন

অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু এই মেয়েটিকেই ভালোবেসে কোন এক হতভাগ্য যুবক পাগল হয়ে গেছে শুনে আমার কৌতূহল কিঞ্চিৎ বাড়ল।

পার্শ্ববর্ত্তীটি তার বন্ধুকে এবার প্রশ্ন করলে—ছেলেটা যে পাগল হয়ে গেছে তা মেয়েটা জানে?

কি করে জানব? বোধ হয় না। পাগল হয়ে যাবার পর সেত আর ছবি দেখতে আসে না। যদি সুযোগ পাই মেয়েটাকে খবরটা দেব।

না না, ছিঃ।

কেন?

কে জানে মেয়েটি হয়ত এখনো তারই সঙ্গে দেখা হবার আশায় বায়স্কোপে আসে। হয়ত কেন, ঠিক তাই। কি রকম চারিধারে তাকাচ্ছে, সবাইকে দেখছে তা লক্ষ্য করেছিস। ওই খবর দিলে ওর প্রত্যাশা ভেঙে যাবে, ভারি আঘাত পাবে মনে। ছিঃ, কাজ নেই।

আচ্ছা, তুই যখন বলছিস। বায়স্কোপ ভাঙলে ওকে নমস্কার করব তখন। তা হলেই ও নীচে নামলে কথাবার্ত্তার সুযোগ হবে, ঠিক দেখিস। যদি বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করে বলব, চাকরি নিয়ে বোম্বাই চলে গেছে, চিঠিও দেয় না, ঠিকানাও জানি না।

সেই ভালো। তাই বলিস।

কিম্বা বলব স্কলারশিপ পেয়ে বিলেতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেছে। খুব ভালো ছেলে ছিল কিনা, ইউনিভারসিটিতে ফি বার ফার্ষ্ট হোতো। ও সে কথা জানে, বিশ্বাসও করবে।

মেয়েটার নাম কি ভাই ?

ওর নাম মাধবী।

নামটা শুনে আমার চমক লাগল। একি সেই জগদীশের মাধবী নাকি ? মেয়েটিকে আরেকবার ভালো করে দেখে নিলাম, হতেও পারে। জগদীশ হয়ত খুব ভালো স্কলার ছিল সেটা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু একটি ভালো ছেলেকে পাগল করে দেবার মত এমন কি আছে ওই মেয়েটির ? এই কথাই আমি ভাবতে লাগলাম।

যাই হোক, মাধবীর প্রণয়াস্পদের বন্ধুটির প্রতি আমি লক্ষ্য রাখলুম। মতলব, বায়স্কোপ ভেঙে যাবার পর ওর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে আরো বিস্তারিত করে ব্যাপারটা জানব। আর এর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি আমাদের সেই জগদীশ হয় তাহলে এর কাছ থেকে তার পূর্ব্ব ইতিহাসটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা যাবে। সুতরাং বায়স্কোপ ভাঙার প্রতীক্ষায় রইলাম।

বায়স্কোপ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিন জনে সেই বক্সের দিকে তাকালাম। কিন্তু মেয়েটি ত বক্সে নেই। যুবকটির নমস্কারোদ্যত যুক্ত কর আপনা থেকেই নেমে এল। এর

মধ্যে মেয়েটি গেল কোথায় ? এইমাত্র ত আলো জ্বলল। খুব সম্ভব ইণ্টারভ্যালের পরই সে উঠে গেছে।

আমি যুবকটির কাঁধে হাত রাখলাম। বললাম, কিছু মনে করবেন না, মেয়েটিকে নিয়ে আপনাদের সমস্ত আলোচনা আমি শুনেছি। সেই ছেলেটির নাম কি জগদীশ ?

অত্যন্ত বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে যুবকটি উত্তর দিলে—আপনি কি করে জানলেন ?

যুবকটির কাছে জগদীশের যে-কাহিনী শুনলাম তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি রোমাণ্টিক। তার কাকারা ঘাটালের ব্যবসাদার, ধান চালের কারবার তাঁদের, তা ছাড়া মহাজনীও কিছু আছে। জগদীশের বাবা মারা গেলে তাঁর ব্যবসায়িক অংশটা ওর কাকারা আত্মসাৎ করে নেন, ফলে জগদীশ ফাঁকিতে পড়ে। এ অবস্থায় অর্থহীন সহায়হীন জগদীশ যে কি করবে কিছুই স্থির করতে না পেরে কয়েকটা প্রাইভেট টিউশানীমাত্র অবলম্বন ক'রে কলকাতার এক মেসে আশ্রয় নেয়। সেই সময়ে অকস্মাৎ মাধবীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ।

জগদীশ ছিল তার কলেজের বন্ধু। কলেজের অনেকের সঙ্গেই জগদীশের বন্ধুত্ব ছিল, কেননা সকলেই সৌম্যদর্শন মিষ্টস্বভাব যুবকটিকে পছন্দ করত, কিন্তু তার সঙ্গেই

জগদীশের সৌহার্দ্দ্য ছিল সব চেয়ে বেশি। কেবলমাত্র ঘনিষ্ঠতা নয়, কি মৌখিক বন্ধুতা নয়, তাদের ছিল প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতা। দুজনে ছিল যেন একমন একপ্রাণ—কারুকে না হলে কারুর চলত না।

মাধবীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিন থেকে সমস্ত ঘটনা জগদীশ ওকে বলত—এতবার করে বলত যে প্রত্যেক দিনের ঘটনা যেন এখনো ওর মুখস্থ হয়ে রয়েছে। যুবকটির কাছে জানা সেই কাহিনী সুরু করা যাক।—

সেদিন ছিল শুক্রবার, ছবির শেষ দিন। কাজেই সেদিন বায়স্কোপে খুব বেশি দর্শক ছিল না। জগদীশ যে 'রো'তে বসেছিল সে রো-তে সেই ছিল একা। সাধারণতঃ জগদীশ তেমন আসনই বেছে নিয়ে বসে যেখানে তার আশে পাশে কেউ নেই অথবা অকস্মাৎ কারু এসে বসার সম্ভাবনা কম। কেননা ছবি দেখবার সময় কানের পাশে কারু আলাপ-আলোচনা বা গল্পগুজব সে একেবারেই পছন্দ করে না। এইজন্য প্রথম দিকের ভিড়ের দিনগুলো এড়িয়ে মাঝামাঝি কিম্বা একেবারে শেষের দিনটাই বায়স্কোপ দেখার সব চেয়ে উপযোগী তার কাছে।

জগদীশ আজ কিন্তু গোড়া থেকেই লক্ষ্য করছিল তার সামনের রো-এর কোণের দিকে একটি মেয়ে বসে। সে

মেয়েটিও একা। সাধারণতঃ জগদীশ, কোনো মেয়ের দিকে তাকায় না, সেটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু আজ যেন সেই স্বভাবের কেমন অন্যথা হচ্ছিল, ইচ্ছা করেও সে মেয়েটির দিকে না তাকিয়ে পারছিল না।

ছবি সুরু হবার পরই এক ব্যক্তি তার পাশের শূন্য আসনটি অধিকার করলেন। এত খালি জায়গা থাকতে তারি পাশে এসে বসল, তার এই পক্ষপাতিতায় জগদীশ মনে মনে বিরক্ত হোলো। কিন্তু খানিক পরে মনের বিরক্তি ও চোখের অন্ধকার লাগাটা কেটে গেলে যখন পাশের সীটের দিকে তাকালো তখন স্ক্রীনের প্রতিফলিত অস্পষ্ট আলোকের আভাসে জগদীশের মনে হোলো, সেই সামনের মেয়েটিই যেন তার পাশে এসে বসেছে। তার সংশয় আরো দৃঢ় হোল যখন সে লক্ষ্য করলে যে আসনটিতে মেয়েটি বসেছিল সে জায়গাটা ফাঁকা। এইভাবে নিঃসন্দেহ হবার পর জগদীশের বুকের ভিতরটায় কি রকম যেন কাঁপুনি ধরল।

ইণ্টারভ্যালের সময় মেয়েটি তাকে জিজ্ঞাসা করলে—নায়িকার চরিত্রটা আপনার একটু অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না?

ইণ্টারভ্যালের আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জগদীশের চোখ ছিল স্ক্রীনের দিকেই বটে, কিন্তু তার মন পড়েছিল খুব কাছেই—তার পাশের সীটে। সে কেবল ভাবছিল, যে মেয়েটি এতদূর এগিয়েছে তার সঙ্গে কি করে আলাপ সুরু

করা যায়। কিন্তু কোনো কথাই সে ভেবে পাচ্ছিল না। এখন মেয়েটির প্রশ্নে আলাপের উপক্রমণিকাটা এইভাবে সহজ হয়ে যাওয়ায় সে মনে মনে আরাম পেলে।

ছবির চরিত্রদের নিয়ে আলোচনায় তাদের আলাপ অল্প সময়েই জমে উঠল। এমন কি মেয়েটি শেষে এরূপ প্রশ্ন করে বসল—ছবিটার নাম কি রকম অদ্ভুত দেখছেন? Strangers may kiss. বেশ কিন্তু।

এই কথার জবাব জগদীশের মুখে যোগাল না, এর উত্তর যোগাল তার কান—মৌন আরক্ত ভাষায়। মেয়েটি তা লক্ষ্য করে একটু হেসে কথাটা পালটে নিয়ে বললে—আপনি কি এখানে প্রায়ই ছবি দেখতে আসেন?

প্রায়ই।

আমিও ত প্রায় আসি, কিন্তু আপনাকে দেখি না ত।

আমি আসি যেদিন একটু ভিড় কম থাকে। এই শুক্রবারের দিকটায়।

বেশ এবার থেকে আমিও শুক্রবারে শুক্রবারে আসব।

জগদীশের প্রেমকাহিনীর প্রথম পৃষ্ঠা এই রকম। এর পরের অনেকগুলি পৃষ্ঠার খুঁটিনাটি বিবরণ না দিয়ে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে আজকাল ওরা কেবল শুক্রবারের অপেক্ষায় থাকে না। শনি রবিবারের মিড্-ডে শো-এও

ওদের দেখা পাওয়া যায়। পাঁচটার সময় বায়স্কোপ শেষ হলেই ওরা বাড়ি ফেরে না, বরং দুজনে এক আধটু ময়দানে কিম্বা গার্ডেনে বেড়ায়। কোনো কোনো দিন চীনে হোটেলেও যায়—সে সবদিন মেয়েটিই জগদীশকে নিমন্ত্রণ করে।

কিন্তু এতদিনের ঘনিষ্ঠতার পরেও মেয়েটি জগদীশের কাছে প্রথম দিনের মতই রহস্যময়ী। সে যে কে, কোথায় তার ঠিকানা—তার একটি খবরও ঘুণাক্ষরে সে জানায় নি। জগদীশ জানবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কথা উঠতেই মেয়েটি তা চাপা দিয়েছে। কেবল নিজের নামটি সে বলেছে, এবং সে রকম মিষ্টি নাম যে বাংলা ভাষায় ছিল, সেই নামটি শোনার আগে কোনোদিন জগদীশ তা সন্দেহ করেনি।

অবশেষে অনেক পীড়াপীড়িতে একদিন মেয়েটি তাকে জানালে যে সে এক ব্যারিষ্টারের মেয়ে। জগদীশ অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে থেকে তারপরে বলল—তাহলে তো আমাদের কোনোই আশা নেই মাধবী! তবে এই ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে লাভ কি? তুমি আর আমার দেখা পাবে না।

কেন, আশা নেই কেন?

তুমি ব্যারিষ্টারের মেয়ে আর আমি সামান্য—

থাম, থাম। বাবার অবশ্য মত হবে না জানি কিন্তু আমরা ইলোপ করব। ইণ্টারমিডিয়েট্‌টা দিয়ে দি আগে। ভালো করে পাশ করতে পারলে বাবা আর রাগবেন না।

সেদিন থেকে জগদীশ যেন হাওয়ায় উড়তে লাগল। এতদিন যে ছাত্রদের সে অবহেলাভরে পড়াত, এখন থেকে তার পড়ানোর যত্ন ও মনোযোগ দেখে তারাও অবাক হয়ে গেল।

এইবার জগদীশের প্রেমকাহিনীর শেষ পৃষ্ঠায় আসা যাক। একটি বাক্য সম্পূর্ণ হবার মাঝপথে অনুচ্ছেদের মতই তা একান্ত আকস্মিক। বায়স্কোপে পৌঁছুতে সেদিন জগদীশের একটু বিলম্বই হয়েছিল। অত্যন্ত মনোযোগে মাধবী কি একখানা চিঠি পড়ছিল, জগদীশকে দেখে চিঠিখানা সে চেপে বসল। চিঠিখানা লুকোতে দেখে জগদীশ সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করলে না বটে, কিন্তু সেই অপঠিত পৃষ্ঠার অজ্ঞাত রহস্য সমস্তক্ষণ তার মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করতে লাগল। বায়স্কোপ যখন ভাঙল মাধবী চিঠির কথা তখন একেবারেই ভুলে গেছে। জগদীশ সেই অবসরে অত্যন্ত সন্তর্পণে চিঠিখানি আত্মসাৎ করলে। যদিও সন্ধ্যার তখনো দেরি, তবু সেদিন তার বেড়াতে কিম্বা ইম্পীরীয়ালে যেতে কিছুমাত্র উৎসাহ দেখা গেল না, সে তাড়াতাড়ি মাধবীর কাছে বিদায় নিয়ে চাঁদপাল ঘাটে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসল।

চিঠির লেখকের নাম ছিল না, কিন্তু না থাকুক, সে যে মাধবীর অন্তরঙ্গ বন্ধু চিঠির ভাব ও ভাষা থেকে সে কথা না

বোঝা অত্যন্ত কঠিন। জগদীশ বারবার চিঠিখানা পড়লে, অনেকক্ষণ ভাবলে, তারপরে মনে মনে কি একটা সঙ্কল্প স্থির করে উঠল।

খামের ওপর মাধবীর ঠিকানা ছিল, কিন্তু সেই ঠিকানার কাছাকাছি পৌঁছতেই জগদীশের মনে প্রশ্ন হোলো এ পাড়ায় কি কোনো ব্যারিষ্টারের বাড়ী থাকা সম্ভব? কিন্তু ঠিকানাতে যে স্পষ্ট এই রাস্তারই নাম লেখা।

তখন সে পাড়ায় প্রথম রাতের চাঞ্চল্য। বাড়ীর নম্বর খুঁজে পাওয়া এক হাঙ্গাম। জগদীশ অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়ল, একমাত্র যাদের কাছ থেকে ঠিকানা সম্বন্ধে সাহায্য পাওয়ায় সম্ভাবনা ছিল তাদের দিকে চাইতেই জগদীশের দেহ-মন সঙ্কুচিত হয়ে উঠছিল। তবু তার দৃঢ় সঙ্কল্প, মাধবীর রহস্যের কিনারা আজ সে করবেই। অবশেষে অনেক কষ্টে নম্বর খুঁজে পাওয়া গেল, সেই বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াতেই একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কাকে খুঁজছেন আপনি?

ইচ্ছা হল প্রশ্ন করে, এটা কি কোনো ব্যারিষ্টারের বাড়ী? কিন্তু সে প্রশ্ন তার গলায় বেধে গেল, তখন তার পায়ের তলায় সমস্ত জগত ঘুরছে। সে শুধু জিজ্ঞাসা করলে —মাধবী এখানে থাকে?

তার জবাবে মেয়েটি বললে—হ্যাঁ, তেতলায়। কিন্তু আপনি ত যেতে পারবেন না। সে যে-জমিদারের বাঁধা, তিনি

একটু আগে এসেচেন, ঐ তাঁর মোটোর দাঁড়িয়ে। আপনি অন্য সময়ে আসবেন।

এইভাবে জগদীশের প্রেম-কাহিনীর মধ্যখানে অকস্মাৎ যবনিকা পড়ে গেল।

তারপর জগদীশ দিনকতক কি-রকম যেন হয়ে গেল। দিনরাত বাসাতেই পড়ে থাকত, বাড়ীর বা'র হত না আদপেই। কামাই করার ফলে টিউশানীগুলো একে একে গেল। এক আধদিন ছাত্রদের পড়াতে যেত, কিন্তু যা পড়াত তার এক বর্ণও ছাত্ররা বুঝতে পারত না। অবশেষে একদিন দেখা গেল তার মাথা খারাপ।

জগদীশের পূর্ব্বঘটনা জানবার পর থেকে তাকে খুঁজছিলাম, কিন্তু আর তার দেখা পাই না। তার ওপর আমার যে মনোভাব, তার মধ্যে দয়ার চেয়ে শ্রদ্ধার অংশটাই তখন বেশি—ভালোবেসে ক-জন পাগল হতে পারে? আমার ইচ্ছা ছিল মানসিক চিকিৎসায় তাকে সারাই, সেই জন্যই তার ইতিহাস জানার আমার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সেই ইতিহাস জানার পর আমার মনে হোলো তাকে না সারানোই ভালো। যে মর্ম্মদাহী বেদনার ফলে জ্ঞান হারিয়ে সে পাগল হয়েছে, আবার তাকে জ্ঞানের সঙ্গে সেই মর্ম্মদাহ ফিরিয়ে দিতে আমার মায়া করে।

একদিন পরিচিত রাস্তার মোড়ে আবার তার সঙ্গে দেখা হল। জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় ছিলে এতদিন?

এইখানেই। একটা পয়সা দিন না, চা খাব।

দেখা হলে এখনও সে একটা পয়সা চায়, আমি তাকে চারটে পয়সা দিই।

সে হয়ত একটু অবাক হয়, কিন্তু সে-এক মুহূর্তের জন্য। কিম্বা মোটেই অবাক হয় না।

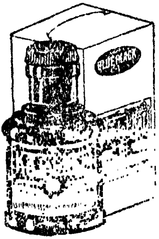

Chemical Association

55, Canning Street,
Calcutta

কাজল কালী ব্যবহার করে
সন্তোষ লাভ করেছি।
এই কালিমা বিদেশী কালীর
চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।
ইতি ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রসঙ্গ

শ্রীমনোমোহন সিংহ রায়

গম—দ্বিতীয়াংশ

নদীর নূতন চরে গমের আবাদ করিলে সার বা সেচনের আবশ্যক হয় না। ভাল দোঁয়াশ মাটিই গমের উপযোগী। ভাদ্র মাসের শেষে বা আশ্বিনের প্রথমে পাট, শন বা আউষ ধান্যাদি কাটিয়া বিঘা প্রতি দুইশত ঝুড়ি গোবর সার দিয়া 'জো' বুঝিয়া জমিতে চাষ দেওয়া উচিত। মাটিতে যেরূপ 'বাত' (moisture) থাকা অবস্থায় চাষ দিলে পরবর্ত্তী চাষ ও মইয়ের ঘর্ষণে মাটি বেশ চূর্ণ হইয়া ধূলার মত হয়, ঠিক সেইরূপ 'বাত' থাকা অবস্থাকে 'জো' কহে। অতিরিক্ত 'বাতে' কর্ষণ করিলে কর্ষিত মাটি ডেলা বাঁধিয়া যায় আর ঐ ডেলা ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে হইতে পরবর্ত্তী চাষে ও মইয়ের কর্ষণে চূর্ণ না হইয়া বরং কঠিনতর হয় তাহাতে মাটির প্রকৃতির একটা ব্যতিক্রম ঘটে। এইরূপ শুষ্ক মাটি ও বিকৃত জমি কর্ষণের অনুপযোগী হয়। পরবর্ত্তী চাষ সমূহে মাটির নাড়াচাড়ায় জমি আরও শুষ্ক হইলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। এই সকল কারণে 'জো' বুঝিয়া কর্ষণ সুরু করা উচিত। অভিজ্ঞ চাষী ভূমির উপরিভাগের বর্ণ দেখিয়া, অথবা ভূমির উপরে এদিক ওদিক বেড়াইয়া কতকটা স্পর্শানুভূতি এবং কতকটা পদচিহ্নের গভীরতার দ্বারা ঠিক 'জো' বুঝিয়া লয়। সামান্য কর্ষণ

করিয়া কর্ষিত মাটির 'বাত' (moisture) দেখিলে 'জো' বুঝা যায়। ভিজে মাটির উপরিভাগ শুষ্ক হইয়া কিছু সাদা হইলে 'জো' কতকটা ঠিক হইয়াছে, বুঝা যায়।

* * *

যদি অতিরিক্ত বাতে কর্ষণ হেতু মাটি ডেলা বাঁধিয়া যায় তাহা হইলে 'বাত' খুলিয়া দিতে হয় অর্থাৎ কর্ষিত ভূমিতে আদৌ মই না দিয়া দুই তিনটি চাষ দিয়া জমি উত্তমরূপ শুষ্ক হইবার জন্য ফেলিয়া রাখিতে হয়। জমি শুষ্ক হইলে ডেলা বা চাঙ্গড়ের আকার অনুসারে হয় 'শোয়াতি' করিতে নচেৎ 'ঝটকাইতে' হয়। জমির উপর জল চালাইয়া প্লাবিত করাকে 'শোয়াতি' কহা যায় এবং জমির মধ্যে মধ্যে পয়ঃপ্রণালী কাটিয়া তাহার মধ্য দিয়া জল চালাইয়া ঐ জল ছিটাইয়া দিয়া উত্তমরূপে মাটি ভিজাইয়া দেওয়াকে 'ঝটকান' কহে। তারপর জমি যখন ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকিবে তখন আবার সেই 'জো' দেখিয়া চাষ আরম্ভ করিতে হইবে।

* * *

এক্ষণে 'জো' বুঝিয়া প্রথমতঃ অগভীর ভাবে 'শিরেল' (Shallow Furrow) কাটিয়া চাষ আরম্ভ করিতে হইবে নচেৎ বড় বড় চাঙ্গড় উঠিবে। এজন্য লাঙ্গলের 'জুৎ' মারিয়া চাষ দিতে হয়। অর্থাৎ লাঙ্গলকে জোয়ালের সহিত বাঁধিবার সময় উহাকে এরূপভাবে রাখিতে হইবে যেন লাঙ্গলের

ফালখানা হালের বলদ দুটির নাভিদ্বয়ের সহিত সমসূত্রে থাকে। ইহাতে অগভীর কর্ষণ হয়। প্রতি চাষের পরেই মই দিতে হইবে নচেৎ মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ হইবে না। পরবর্ত্তী চাষে ক্রমশঃ লাঙ্গলের ‘জুৎ’ একটু একটু করিয়া ছাড়িয়া বা বাড়াইয়া চাষ দিতে হয়। অর্থাৎ লাঙ্গলের ফলাকে পূর্ব্বোক্ত অবস্থান হইতে ক্রমশঃ একটু একটু পশ্চাৎদিকে সরাইয়া রাখিয়া চাষ দিতে হয়। ইহাতে ক্রমশঃ গভীরতর কর্ষণ হইতে থাকিবে। এইরূপে চাষ ও মই দিতে থাকিলে খনন গভীর হইবে অথচ চাঙ্গড় উঠিবে না, এবং কর্ষিত মাটি চূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রত্যহ মই দিয়া জমির বাত ঢাকিয়া দিয়া আসিতে হইবে নচেৎ বাত উড়িয়া (Evaporation) জমি শুষ্ক হইয়া যাইবে। মাটি উত্তমরূপে কর্ষিত ও চূর্ণীকৃত হইলে, কিছুদিন বৈকালে যখন রৌদ্রের উত্তাপ কমিয়া যায় সেই সময় একটা চাষ দিয়া জমি খুলিয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতে আর একটি চাষ দিয়া মই দিয়া ‘বাত’ ঢাকিয়া দিতে হয়। এইরূপে রৌদ্র বায়ু ও শিশির খাওয়াইয়া মাটিকে ‘তোয়াজ’ (Sweeten) করিলে মাটির শক্তি বৃদ্ধি হয়।

* * *

বিঘা প্রতি দশ সের বীজ আবশ্যক হয়। অক্টোবরের শেষ হইতে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত গম রোপণের সময়। যেদিন বপন করা হইবে সেই দিন প্রাতে বিঘা প্রতি এক

মণ রেড়ির খইল চূর্ণ জমির উপর ছড়াইয়া দিয়া দুই একটি চাষ দিয়া, উহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া দিয়া তিনবার মই দিয়া জমি সমতল করিতে হইবে। চাষে মাটি সরিয়া গিয়া প্রায়ই জমির আইলের নিকটের ভূমি উচ্চ হইয়া যায়। ইহা মই দ্বারা প্রায় সমতল হয় না, এজন্য কোদালি দ্বারা ঐ মাটি টানিয়া দিয়া শেষে মই দিলে ভাল হয়। ঐ দিনই বিকালে বপন শেষ করিতে হয়।

* * *

কেহ কেহ বীজ ছড়াইয়া বপন (Broad Casting) করেন, কেহ বা লাঙ্গল দ্বারা এক হাত অন্তর শিরেল (Furrow) কাটিয়া শিরেলে বপন (Line Sowing) করেন। আমি Line Sowing করি। বপনের পূর্ব্বে বীজ দুই এক ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া জল শুষ্ক করিয়া লইলে বপনের উপযুক্ত হয়। ইহাতে শীঘ্রই বীজ অঙ্কুরিত হয়। দক্ষ 'লাঙ্গ্‌লা' কৃষাণ আন্দাজে এক হাত অন্তর ঠিক সোজা 'শিরেল' কাটিয়া দিতে পারে। অভাবে জমির এক প্রান্ত পর্য্যন্ত একগাছি দড়ি লাগাইয়া উহার গায়ে গায়ে লাঙ্গল চালাইলে সোজা শিরেল হয় এবং এইরূপে একহাত অন্তর শিরেল কাটিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ঐ শিরেল কাটার সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন কৃষাণ ঐ শিরেল মধ্যে যথাসম্ভব সমভাবে বীজ বপন করিয়া দিলেই ঐ দিনের কাজ শেষ হইল। পরদিন সকালে লাইনের লম্বালম্বি এক পাল্লা ভাল করিয়া মই দিয়া,

বীজগুলিকে শিরেল মধ্যে মাটি দিয়া, এড়োএড়ি (crosswise) আর এক পাল্লা মই টানিয়া জমিকে সমতল করিয়া দিলেই বপনকার্য্য শেষ হয়।

* * *

যখন চারাগুলি তিন চারি ইঞ্চি বড় হইবে সেই সময় জমিকে 'শোয়াতি' করিয়া দিতে হইবে আর ঐ সঙ্গে ঘন চারা বা লাইনের বাহিরের চারাগুলি তুলিয়া লইয়া যেখানে চারা বাহির হয় নাই বা পাতলা বাহির হইয়াছে সেই লাইনে রোপণ করিয়া দিলে ভাল হয়। তারপর যখন জমি ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকিবে তখন ঠিক 'জো' বুঝিয়া কোদাল দিয়া খুড়িয়া (Spading) মাটি আলগা করিয়া দিতে হয়। এই কাজের জন্য লাইন মধ্যে Hands-hoe চালাইলে অতি অল্প খরচে কাজ হয়। খুড়িবার পূর্ব্বে বিঘাপ্রতি পনের সের সোডিয়াম নাইট্রেট্ চূর্ণ দোঁয়াশ মাটির সহিত ছড়াইয়া দিলে উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে। ডিসেম্বরে 'থোড়মুখী' অবস্থায় (শীষ উদ্গত হইবার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থায়) আর একবার এবং পরে যখন শীষে 'দুধ' হইতে শস্য জমিতে থাকে তখন আবার একবার 'শোয়াতি' করিয়া দিলেই শেষ হইল। দ্বিতীয় 'শোয়াতি' ফলে শীষ বড় হয় এবং ঝাড়িয়া বাহির হয় এবং শেষ শোয়াতির ফলে শস্য পরিপুষ্ট হয়, আগড়া হয় না।

* * *

গমের গাছ যখন এরূপ শুষ্ক হইবে যে দু'একটি শীষ আপন হইতেই ভাঙ্গিয়া ঝরিয়া যাইতেছে দেখা যাইবে তখন গম কাটা উচিত, নচেৎ মাড়াই করিবার সময় শীষ হইতে দানা ঝরিবে না।

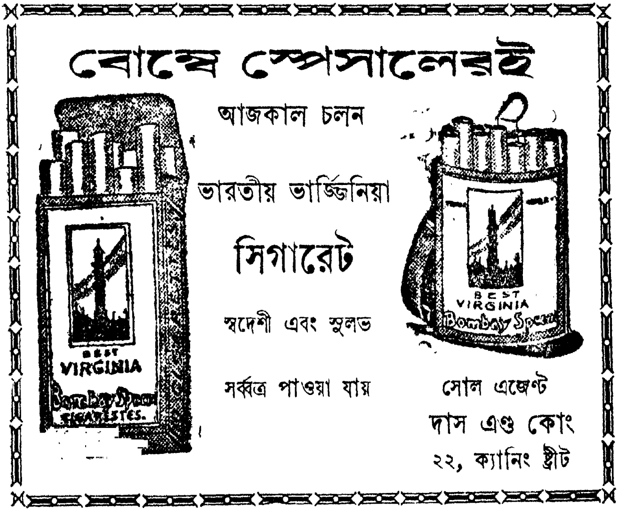
BEST
VIRGINIA
Bombay Special
CIGARETTES.
BEST
VIRGINIA
Bombay Special

বোম্বে স্পেসালেরই
আজকাল চলন
ভারতীয় ভার্জ্জিনিয়া
সিগারেট
স্বদেশী এবং সুলভ
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়
সোল এজেন্ট
দাস এণ্ড কোং
২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট

বাবু নাটক সম্বন্ধে আলোচনা

মাননীয় 'ছোট গল্প' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন

গত ৩০এ বৈশাখ তারিখের 'ছোট গল্পে' শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বাংলা নাটক সম্বন্ধে যে উপাদেয় প্রসঙ্গটি লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। এই সম্পর্কে অমরেন্দ্রবাবু আমার নাম করিয়াছেন, সেজন্য ভরসা পাইয়া একটি সংবাদ জানাইতেছি। অমরেন্দ্রবাবুর নিকট উহা তুচ্ছ না ঠেকিতে পারে। বিদ্যাভূনীকৃত বাবু নাটক প্রসঙ্গে অমরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, উহার বিজ্ঞাপনটি ১৮৫৭ সনের ১৩ই জুলাই তারিখের 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' প্রকাশিত হয়,—'সংবাদ প্রভাকরে' নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে অবিকল এই বিজ্ঞাপনটি ১৮৫৭ সনের ১১ই জুলাই তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে'ও প্রকাশিত হয়,—'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' প্রকাশিত হইবার দিন-দুই পূর্ব্বে। বিজ্ঞাপনটি আমি ১৩৩৮ সালের চৈত্র সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'র ৭৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আমার 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ' শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্ধৃত করি।

নিবেদক

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র ও চরিত্র

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

রাজেন্দ্রলালের বহুমুখী প্রতিভা কত দিক দিয়া যে বাঙালীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে, কালের ব্যবধানে আজ সে হিসাব সহজেই দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক বলিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি। বাংলার সাহিত্যসৃষ্টিতে তাঁহার প্রভাব অল্প নয়।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক। তিনি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যে কালে নূতন বাংলা গড়িয়া উঠিতেছিল এবং নূতন বাংলা গড়িয়া তুলিবার জন্য বাঙালীর প্রাণে এক অপরূপ প্রেরণা জাগিয়াছিল, তিনি সেই কালের লোক।

বাল্যে তীক্ষ্ণধী রাজেন্দ্রলাল গৃহে এবং বিদ্যালয়ে যত্নসহকৃত শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। বাড়ীতে ইংরেজীর জন্য সাহেব অধ্যাপক নিযুক্ত ছিল, সংস্কৃত শিক্ষাতেও অবহেলা ছিল না। রাজেন্দ্রলাল পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি পাইয়াছিলেন। সে ডিগ্রী ডক্টর-অব-ল। গোড়ায় কিন্তু তিনি মেডিকেল কলেজেরই কৃতী ছাত্র ছিলেন। বিলাত যাত্রাকালে দ্বারিকানাথ ঠাকুর যে পাঁচ জন মেধাবী ছাত্রকে

সেথায় ডাক্তারি প'ড়বার জন্য সঙ্গে লইয়া যাইতে চান, রাজেন্দ্রলাল তাঁহাদেরই অন্যতম। পিতার অসম্মতি-হেতু বিলাত যাওয়া হইল না। এদিকে অধ্যাপকদের সহিত বিবাদ করিয়া মেডিকেল কলেজ ছাড়িয়া তিনি আইন পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইল।

এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষের পদলাভে তাঁহার প্রতিভার সম্যক স্ফূর্ত্তি হইল। সেই সময় হইতেই সোসাইটির জর্ণালে তাঁহার মৌলিকগবেষণামূলক প্রবন্ধাবলীপ্রকাশে দেশবিদেশে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল।

এই বিবিধবিষয়জ্ঞ বহুভাষাবিৎ জ্ঞানীপুরুষ শুধু পণ্ডিত ছিলেন না, রসজ্ঞও ছিলেন। তৎসম্পাদিত তথ্য এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে অপূর্ব্ব বঙ্গদর্শনের পূর্ব্বে প্রকাশিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' বাঙালী পাঠককে প্রথম কৌতূহলী হইতে শিখাইল। এই মাসিকপত্রখানি সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার বিপুল প্রতিষ্ঠা। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহারই শিষ্য। উড়িষ্যা এবং বুদ্ধগয়া সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য মনীষীরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ কুশল তর্ক ফার্গুসনকেও সন্ত্রস্ত করিয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটির তিনি প্রথম

বাঙালী সভাপতি। রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বহুবিধ উপাধি ও সম্মান অর্জ্জন করিয়া রাজেন্দ্রলাল ১৮৯১ সালে পরলোক গমন করেন।

এই স্বাধীনচেতা, নির্ভীক, রসজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট বাংলা সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্ব সমভাবে ঋণী।

বাঙ্গালীর জুতার দোকান!
পছন্দসই জুতা এখানে সস্তা
ইউনাইটেড ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং ——
১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মেছুয়াবাজারের মোড়, কলিকাতা।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

কল্পনা কথাটির সহিত অলীকতার ছায়া বড় ঘনিষ্ঠরূপে জড়াইয়া পড়িয়াছে। তথ্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে গিয়া কল্পনাকে তত্ত্বের বিরুদ্ধবাদিনী করিয়া তোলা হইয়াছে। 'কথাটা প্রকৃত নহে—কল্পিত' বলিয়া কল্পনার যাথার্থ্যে অযথা সন্দিহান হইয়া অনেকে মনোবেদনা পাইয়াছেন। তথ্য সকল সময়ে সত্য নহে জানিয়াও আমরা ইহার কোন সুব্যবস্থা করি না। ইথার-তত্ত্ব অথবা পৃথিবীর সূর্য্য-প্রদক্ষিণ ব্যাপারটি বিশেষজ্ঞের গোচরীভূত হইয়াও অশিক্ষিত সাধারণের কাছে তথ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, প্রত্যক্ষ, বাস্তব—তাহাই তাহাদের কাছে সত্য। আবার বৈজ্ঞানিক সত্য ইহার অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর সত্য। পরীক্ষা, বিচার এবং বিশ্লেষণের দ্বারা প্রাকৃতিক পদার্থ এবং লীলা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করি তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য। কবির যে শক্তি তাহা সৃজনী শক্তি, বৈজ্ঞানিকী যে প্রতিভা তাহা বিশ্লেষণী প্রতিভা। তবুও বৈজ্ঞানিকের কাছে কল্পনার প্রয়োজন অল্প নহে। কারণ কল্পনা সত্য-দর্শনে আমাদের সাহায্য করে। কল্পনা অনেক সময় অলৌকিক হইতে পারে, কিন্তু তাহা অলীক নহে। যে কল্পনার সহিত মিথ্যা মিশিয়া থাকে তাহা লৌকিক কল্পনা। অলীক অথবা লৌকিক কল্পনার নাম কাল্পনিকতা দেওয়া যাইতে পারে। ভাবুকতা ও ভাবপ্রবণতার মত কল্পনা ও কাল্পনিকতার মধ্যে প্রভেদ মৌলিক।

* * *

একই কবির বর্ণনা হইতে দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক। রাধার রূপে কৃষ্ণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন—

"কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে
মুখভয়ে চাঁদ আকাশে,
হরিণী নয়ন ভয়ে স্বর ভয়ে কোকিল,
গতিভয়ে গজ বনবাসে।
সুন্দরি, কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল
তুঁহু পুন কাহে ডরাসি।"

ইহার সহিত তুলনা করা যাক—

"সজনি, ভাল করি পেখন না ভেল,
মেঘমালা সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল।"

দ্বিতীয়টি কল্পনার সৃষ্টি—রাধার অঙ্গ-সৌষ্ঠব আর খুঁটিয়া খুঁটিয়া বর্ণনা করিতে হইল না—শুধু রূপের বিদ্যুৎস্পর্শে প্রেমিকের হৃদয়ে যে উন্মাদ সাড়া পড়িয়া গেল, একটি উপমার মধ্যে তাহাই ধরিয়া ফেলিয়া কবি যে সৌন্দর্য্যের আভাস দুটি কথায় ব্যক্ত করিয়া গেলেন, তাহা মানবের সৌন্দর্য্যপ্রিয় অন্তরে অমর হইয়া রহিল। প্রথমটি কাল্পনিকতার ফল। বর্ণনার সূচনা হইতেই আমরা বুঝি যে উপমা সত্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে—রাধার মুখের কাছে হারিয়া যাইবার ভয়ে চাঁদও আকাশে পলায় না, আর চোখের কাছে হারিয়া যাইবার ভয়ে হরিণও বনে পলায় না। এ শুধু অত্যুক্তি এবং এই অত্যুক্তি স্থায়ী ভাবে আমাদের মনের উপরে বিশেষ কোনো রূপের ছায়া ফেলিয়া যায় না। অত্যুক্তি বলিয়া ইহা অগ্রাহ্য নহে—যাহার জন্য এই বর্ণনার আড়ম্বর তাহাই প্রকাশ করিতে পারিতেছে না বলিয়া কল্পনার দিক দিয়া ইহার কোনই মূল্য নাই।

দিন-পঞ্জী

পুনা, ১১ই মে—ডাঃ আনসারী আসিতেছেন এই সংবাদে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া মহাত্মাজী আনন্দভরে বলেন,—ডাঃ আনসারীর ক্রোড়ে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে আমি সুখী হইব। মহাত্মাজীর এ কথা টেলিফোন যোগে ডাঃ আনসারীকে জানানো হইলে তিনি আবেগভরে উত্তর দেন,—আমি আমার ক্রোড়ে মহাত্মাকে প্রাণত্যাগ করিতে দিব না। আমি তাঁহাকে মরিতেই দিব না।

নানকিং, ১১ই মে—টান-উই-সান নামক একজন চৈনিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভারতবর্ষে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

আমেদাবাদ, ১০ই মে—অদ্য প্রাতে ঠিক ১০টার সময় শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈকে সবরমতী জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি অদ্য রাত্রিতেই গুজরাট মেলে পুনা যাত্রা করিবেন।

লণ্ডন, ১৩ই মে—জার্ম্মানীর অর্থ সচিব আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ককে জানাইয়াছে, ইয়ং প্ল্যান অনুসারে স্বর্ণমুদ্রার দ্বারা যে ঋণ পরিশোধের কথা আছে, তাহা জার্ম্মানী অগ্রাহ্য করিতেছে। সুতরাং সে ১৫ই মে কিস্তির টাকা কাগজের গাঁইট দিয়া পরিশোধ করিবে। ব্যাঙ্ক জার্ম্মানীর এই সিদ্ধান্তে অসম্মত হইয়াছে এবং বলিয়াছে, ইহার দ্বারা ঋণ-চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ করা হইতেছে।

১৬ই মে—মহাত্মাজী অনশন-আরম্ভের প্রাক্কালে ফরাসী মনীষী মসিয়ে রোঁম্যা রোলা ও তাঁহার ভগ্নীর নিকট হইতে ক্ষুদ্র অথচ গভীর প্রীতিপূর্ণ একটি তার পান—আমরা সর্ব্বদাই আপনার সঙ্গে আছি।

পুনা, ১৬ই মে—গান্ধীজি বেশ ভালই আছেন। এখানে তিনি গভীর নিদ্রামগ্ন, উদ্বেগের কোনই কারণ নাই।

লণ্ডন, ১৫ই মে—বিলাতী সংবাদপত্র সমূহ বলিতেছে, ইউরোপ অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে, এবং তথায় ১৯১৪ সালের অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। জার্ম্মানী কর্ত্তৃক ভার্সাই সন্ধি ভঙ্গের আশঙ্কায় ফরাসী শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছে এবং ফরাসী-জার্ম্মান সীমান্তে দুর্ভেদ্য দুর্গাদি নির্ম্মিত ও কারখানা সমূহে গোলা বারুদ ও অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে।

আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে
আর ইনজেক্‌সান লইতে হইবে না
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

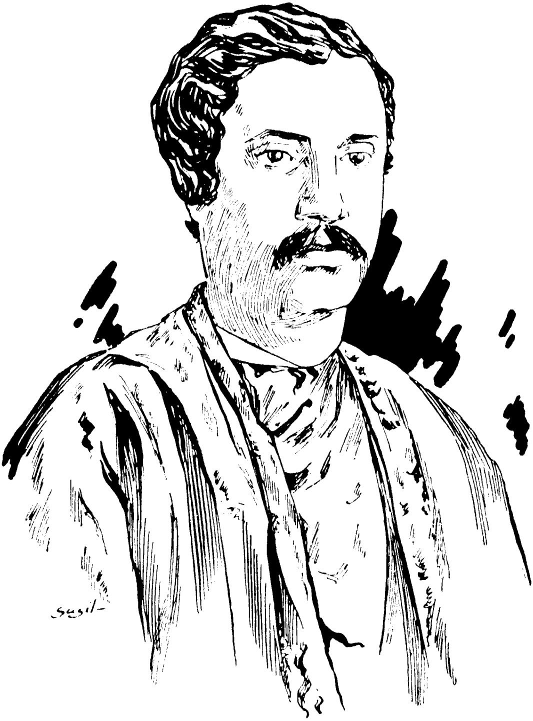

রামগোপাল ঘোষ

ছোট গল্প

১ম বর্ষ] ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ [৪৬শ সংখ্যা

শঠে শাঠ্যং

শ্রীসুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত

সলিসিটরের চিঠি পেয়ে যতটা বিস্মিত হওয়া উচিত ছিল নীলাচল চেষ্টা করেও ততটা হতে পারল না। সলিসিটর লিখেছে, চায়ের সেয়ারের দাম গত কয়েক বছর থেকেই নাবছে ; দু'বছর তবু নামমাত্র ডিভিডেণ্ড পাওয়া গেছে, এবারে তাও বন্ধ হয়েছে। ব্যাঙ্কে নীলাচলের যে টাকা আছে তাতে ব্যয়সঙ্কোচ করে তার একবছর হয়ত চলতে পারে। সুতরাং এখন থেকে একটা চাকরির চেষ্টা করলে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন কষ্টে নাও পড়তে পারে, ইত্যাদি।

এতদিন নিয়মিতভাবে নীলাচল তার সলিসিটরের কাছ থেকে বছরে দু'বার একটা মোটা অঙ্কের চেক পেয়ে এসেছে। বহুদিন যাবৎ এই ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়ের বস্তু ছিল। আশ্চর্য্য হয়ে সে ভেবেছে, এই টাকাটা কোত্থেকে আসে এবং যদি কোনদিন এই পরম শুভাগমন বন্ধ হয়ে যায় তাহলেই বা তার কি উপায় হবে? অর্থশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব নিয়ে সে কোনদিন মাথা ঘামায় নি। সুতরাং অর্থশাস্ত্রের পরিভাষায় সেও যে একজন ক্যাপিটালিষ্ট ও প্রফিটিয়ার একথা জানবারও অবকাশ পায়নি। বছরে দু'বার সলিসিটরের কাছ থেকে চেক পায় এবং এই পাওয়াকেই সে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিল। এর অন্যথা হলে তার কি অবস্থা হবে একথা ভেবে তার সহজ ও অনায়াস জীবনযাত্রার গতি পরিবর্ত্তন করবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা সে কোনদিন অনুভব করেনি। তার কপালে বিশেষ কোন দুর্ঘটনা যে কখনও ঘটতে পারে না, এই ছাব্বিশ বছরে এটা সে প্রায় স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় মেনে নিয়েছিল।

সুতরাং সলিসিটরের চিঠি পেয়েও বিপদটাকে সে সহজে মনের ভেতরে গ্রহণ করতে পারছিল না। এখনও এক বছরের সংস্থান তার আছে এবং এক বছরের মধ্যে যে অনেক-কিছু হতে পারে একথা ভেবে নীলাচল উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এক বছরের মধ্যে ভূমিকম্পে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, একটা নতুন গ্রহ কি জগৎ আবিষ্কৃত হতে পারে, বিজ্ঞানের উন্নতির

ফলে মানুষের জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হতে পারে; কিন্তু তার ভাগ্য যে কিছুমাত্র সুপ্রসন্ন নাও হতে পারে, এ চিন্তা নীলাচলের মনের কোণেও ঠাঁই পেলে না—এমনিই ছিল তার স্বভাব, তার লঘুচিত্ততা।

নীলাচল ভাবতে বসল, কোন্ চাকরির সে উপযুক্ত। সরকারী কোন চাকরি পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব, যেহেতু তার বয়স ছাব্বিশ বছর। আই-সি-এস কি বি-সি-এস পরীক্ষা দেবার কথা পূর্ব্বে কোনদিন তার মনেও হয়নি এবং এখন তা ভাবা নিরর্থক। তবে ইনসিওরেন্সের ব্যবসাতে তার একটা হিল্লে হতে পারে মনে করে কোন-এক ইনসিওরেন্স অফিসের বড়কর্ত্তা—তার পিতৃবন্ধুর সঙ্গে দেখা করলে। ভদ্রলোক যথেষ্ট সহৃদয়তার সঙ্গে তার কথা শুনে মন্তব্য প্রকাশ করলেন, "তাইতো, একটা চাকরি না হলে তো তোমার কিছুতেই চলবে না। তবু ভাগ্যিস বে-থা করোনি এখনো। ছেলেরা অল্প বয়সে বে করেই তো দেশটাকে উচ্ছন্নে দিচ্ছে। যেমনি মাসিক আয় হ'ল তিরিশ টাকা, তেমনি মাসিক খরচার বন্দোবস্ত করা হল ষাট টাকা। কেনরে বাপু, নিজেরাই ভাল করে দু'বেলা খেতে পাস না, তার ওপরে কতগুলো ছেলেপিলের সৃষ্টি করে তাদের শুকিয়ে মারবার তোদের কি অধিকার আছে? কি বল?"

"সে তো ঠিক কথা, কিন্তু একটা চাকরি—"

"চাকরি? হ্যাঁ, সে হবে'খন। আমি বলি কি, তোদের চারদিকে যে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার দৃষ্টান্ত ছাড়িয়ে রয়েছে একবার ভাল করে চোখ খুলে সেদিকে তাকা, তাহলেই বুঝতে পারবি যে যেটাকে আপাতসুখ বলে মনে করছিস সেটা সত্যিকারের সুখ নয়, চরম দুঃখ। তা তো শুনবে না, বাছাধনেরা মায়ের জন্যে একটি দাসী আনতে পারলে আর কিছুই চায় না। হাঃ হাঃ—মায়ের জন্যে একটি দাসী, যেন নিজেদের তাতে কোনই স্বার্থ নেই—কথাটা মনে হলেও হাসি পায়। আমাদের দেশে এখনও এই ব্যবস্থা, না?

নীলাচলের ধারণা ছিল, এ ব্যবস্থা দেশে কোনকালেই ছিল না, এখনও নেই। তবু বিবাহ সম্বন্ধে বৃদ্ধের এই তীব্র অনুভূতির সামনে তার মুখ থেকে সত্যি কথাটা বেরুলো না। বললে, "ঠিক জানি না—"

এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। বৃদ্ধ রিসিভারটা কাণে তুলে এক মুহূর্ত্ত চুপ করে শুনলেন, তারপরে যে ব্যক্তি রিং করেছিল প্রাণপণে তাকে ধমকাতে আরম্ভ করলেন। এ ধরণের ব্যাপার পূর্ব্বেও নীলাচল লক্ষ্য করেছিল, সুতরাং তার ধারণা হ'ল ইনসিওরেন্সের অফিসে কেউ কারুকে না ধমকে কথা বলে না। খানিকক্ষণ পরে বৃদ্ধ রিসিভারটা তুলে রেখে আবার নীলাচলে প্রতি মনোযোগ দিলেন। বললেন, "হ্যাঁ, কি বলছিলুম। তোমার একটা চাকরি চাই? দেখ, ইনসিওরেন্সের দালালি করা আমি

মোটেই যুক্তিসঙ্গত মনে করিনে। কারণ every man in the street is an insurance agent until the cortrary is proved. যত সব অকর্ম্মা ভবঘুরে এসে জোটে এই ব্যবসাতে। সেই জন্যেই তো ইনসিওরেন্সের দালাল বলে কেউ পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ করে। তা চাকরিও একটা আমাদের অফিসেই খালি আছে। কিন্তু তার জন্যে যে পাঁচ হাজার টাকা সিকিউরিটি চাই—তুমি কি দিতে পারবে অত টাকা ?”

নীলাচল নিশ্চিন্ত হয়ে সহজ ভাবে উত্তর দিলে, “অসম্ভব।” “অনেক চেষ্টা করে তোমার জন্যে পাঁচ হাজারকে কমিয়ে হয়ত তিন হাজার করা যেতে পারে কিন্তু that's the irreducible minimum. তুমি চেষ্টা করে দেখ টাকাটা যোগাড় করতে পারো কিনা। আমাদেরও কোন তাড়া নেই ; দিন পনের পরে আমার সঙ্গে আবার দেখা কোরো।”

চাকরি না পাওয়া সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হয়েই নীলাচল ফিরলেন। এখন তার প্রধান ভাবনার বিষয় হ'ল কি করে ব্যয়সঙ্কোচ করা যায়। অবশ্য বাড়ীটা তাকে ছাড়তেই হবে ? এত বেশি ভাড়ার বাড়ী, তার উপরে চাকর ও রাঁধুনে বামুন তার আর রাখা চলবে না। বাড়ীটা ছাড়বে ভেবে নীলাচল মনে মনে যে একেবারে খুসি হয়নি তা বলা যায় না। কিছুদিন হল পাশের ছোট বাড়ীটা একটা ফ্যামিলি

ভাড়া নিয়েছে। স্বামী, স্ত্রী ও একটি কন্যা এই নিয়ে তাদের পরিবার। স্বামীটি নীলাচলের চোখে পড়েনি, কারণ সে বেশির ভাগ সময়ই বাইরে কাটায়। স্ত্রী ও কন্যা নিয়মিতভাবে দুবেলা বেড়াতে বেরোয়, সুতরাং তাদের সে খুব ভাল করেই দেখেছিল। ভদ্রমহিলার রূপ বর্ণনা করলে বোধ করি অসঙ্গত হবে, অন্ততঃ শোভন হবে না একথা ঠিক। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে হাতের হীরার আংটি থেকে গলার হার পর্য্যন্ত যত অলঙ্কার পরে তিনি বেরোন তার দাম সবশুদ্ধ হাজার দশেক টাকার কম হবে কিনা সন্দেহ। তাঁকে দেখে নীলাচল একএকদিন স্তব্ধ হয়ে ভাবত, স্ত্রীজাতির ভ্যানিটির চাপে সৌন্দর্য্যজ্ঞান কি সহজে মৃত্যুলাভ করে। কন্যাটি দেখতে একটি অতিকায় জন্তু বিশেষ—যেমনি মোটা, তেমনি কালো। মাথায় নিগ্রোদের মত কোঁকড়ানো কালো চুল ; মুখের স্তূপীকৃত মাংসপেশীর চাপে নাসিকা অদৃশ্যপ্রায় এবং খুব ভাল করে লক্ষ্য করলে কপালের নীচে ক্ষুদ্র দুটি চোখের অস্তিত্বেরও আভাস পাওয়া যায়। রূপে কন্যাটি যে তার মা'রই উপযুক্ত তা অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। সবার ভাগ্যেই সমান প্রতিবেশী জোটে না ভেবে নীলাচল নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যখন সে টের পেলে যে মেয়েটি এরই মধ্যে তারই সঙ্গে ভয়ানক ফ্লার্ট করতে আরম্ভ করেছে তখন তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। সুতরাং বাড়ী ছেড়ে দেবার সম্ভাবনায় তার মন খুসিতে ভরে গেল।

ছাব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত মোটামুটি স্বচ্ছলতার ভেতরে জীবন কাটানোর ফলে নীলাচল একটা মহামূল্য শিক্ষালাভ করেছিল। তার জীবনযাত্রা একটা ধরাবাঁধা আরাম ও স্বাচ্ছ্যন্দের নিয়মাধীন হয়ে পড়েছিল এবং বর্ত্তমানে তার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স যতই ক্ষীণ হোক অভ্যস্ত জীবন বর্জ্জন করে দারিদ্র্য বরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। দারিদ্র্য ঘোষণা করে সে নানাজায়গায় সাহায্য প্রার্থনা করতেও পারত কিন্তু তাতে তার আত্মসম্মানে বাধত। নিজের ভাগ্য ও ক্ষমতার উপরে তার ছিল অসাধারণ বিশ্বাস, সেইজন্যে কিছু-একটা ইতিমধ্যে হবেই ভেবে এই অর্থসঙ্কটের দিনেও পূর্ব্বের চাল-চলন বজায় রাখতে দ্বিধাবোধ করলে না। বাড়ী সে ছেড়ে দিলে বটে কিন্তু উঠল গিয়ে এমন একটা হোটেলে যেখানে পূর্ব্বের তুলনায় খরচা তার কিছুমাত্র কম হবার কথা নয়।

হোটেলবাস নীলাচলের কাছে মোটামুটি ভালই লাগছিল। আলস্যময় দিনযাপনের পক্ষে হোটেলের মত নির্ঝঞ্ঝাট আবাসস্থান বোধ করি পৃথিবীতে আর নাই। কোন ব্যাপারেই মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই—ভগবানের মত হোটেলের ম্যানেজার অদৃশ্যে থেকে তার বোর্ডারদের মঙ্গল কামনা করছে। যেন আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের যাদুবলে যখন যা আবশ্যক হাতের কাছে এসে উপস্থিত হচ্ছে। জীবনটাও এখানে একেবারে রসহীন হয়ে উঠে না। হোটেলটাকে একটা প্রকাণ্ড রেলওয়ে ষ্টেশনের সঙ্গে তুলনা

করলে হয়ত ভুল হবে না। রোজই এখানে যাত্রী আসছে, গাড়ী বোঝাই হয়ে মাল আসছে; আবার রোজই কিছু কিছু চলে যাচ্ছে। সময় কাটাবার জন্যে তাদের চেহারা দেখে চরিত্র ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা খুবই উপভোগ্য সন্দেহ নেই। নীলাচলও হোটেলের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে যে নতুন রস খুঁজে পেয়েছিল তার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে সময় কাটাতে লাগল। হঠাৎ একদিন একখানা সন্দেহজনক চিঠি পেয়ে সে নতুন অ্যাডভেঞ্চারের জন্য প্রস্তুত হল। চিঠির কাগজের ওপরে লেখা 'Confidential Agency' এবং সই করেছে জয়ন্তবিলাস সিকদার নামে একটি লোক। ভদ্রলোক লিখেছেন যে নীলাচল একদিন তার সঙ্গে তার অফিসে এসে দেখা করলে খুব ভাল হয়, কারণ তাতে তারই (নীলাচলের) উপকৃত হবার সম্ভাবনা বেশি। ঠিকানাও অবশ্য একটা দেওয়া ছিল।

পরদিন যথাসময়ে নীলাচল চিঠি লেখকের সঙ্গে দেখা করতে চলল। সহরের উত্তর দিকে এক এঁদো গলিতে অতিশয় জীর্ণ এক বাড়ীর দোতলার একটা ঘরে সে তাকে আবিষ্কার করলে। নীলাচল ভেবে পেলে না এ ব্যক্তি তার কি উপকার করবে। কিন্তু গলি যত সরু হচ্ছিল ও অন্ধকার বাড়ছিল, নীলাচলও রহস্যের আশায় তত বেশি পুলকিত হয়ে উঠছিল।

পুরোণো একটা রাইটিং টেবিলের একদিকে বসে একটি শীর্ণ লোক উদাসভাবে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়েছিল।

তার চেহারাতে একটা দারুণ বিষাদের ভাব, যেন বেঁচে থাকবার জন্য কোন আকর্ষণ সে জীবনে অনুভব করেনি। চেহারা দেখে তার বয়স অনুমান করবার জো ছিল না—পঁয়তাল্লিশও হতে পারে, পঁয়ষট্টিও হতে পারে।

জয়ন্তবিলাস আগন্তুককে অভ্যর্থনা করে বললে, "আসুন, আসুন। চমৎকার দিন, চমৎকার দিন।"

নীলাচল বললে, "ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন।"

জয়ন্তবিলাসের একটা মুদ্রাদোষ ছিল, প্রত্যেক সাধারণ কথাই সে দু'বার করে বলত।

"বসুন, বসুন। আপনাকে কেন এখানে আসতে লিখেছি তা আমি দু'কথাতেই বলতে পারি। বলব, বলব?"

"বলুন, বলুন।"

জয়ন্তবিলাস বললে, "আপনার বয়স অল্প। রোমান্টিক নেচার? বেশ। টাকা পয়সা কিছু আছে?"

"সামান্য কিছু আছে।"

"বেশ, বেশ। আমি পূর্ব্বেই তা শুনেছি। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই: আমি এখন আর আইনজীবী নই; পূর্ব্বে ছিলুম, কিন্তু এখন আর নয়। অনেক বছর আগে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে। তাতে যদিও আমার কোনই দোষ ছিল না, তবু সম্পূর্ণ দোষটা আমার ঘাড়েই চাপানো হয়। অন্যের অপরাধের ফলে আমি এখন প্র্যাকটিস্ করতে পারি না। যাকগে, তাতে কিছু আসে-যায় না। আমার হাতে

এখনও অনেক সম্ভ্রান্ত মক্কেল আছে এবং তাদেরই একজনের কাজ উপলক্ষ্যে আপনাকে ডেকেছি। কিন্তু ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, মনে রাখবেন; কারণ এর সঙ্গে এক ভদ্র মহিলা জড়িত।"

রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। নীলাচল যথাসম্ভব রোমাঞ্চিত হয়ে বললে, "আমার কাছ থেকে কোন কথাই বাইরের লোক জানতে পারবে না।"

"আচ্ছা, আপনি কখন প্রেম-পত্র লিখেছেন?" লোকটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে।

নীলাচল চট্ করে একটা মিথ্যা কথা বানিয়ে বললে, "হাজার, হাজার।"

জয়ন্তবিলাস বলতে লাগল, "একএকখানা চিঠির জন্যে দশ টাকা হিসাবে দিলে একটি মেয়ের কাছে আপনি কয়েকখানা চিঠি লিখতে পারেন? শুনুন, আপনাকে সব বুঝিয়ে বলছি," নীলাচলের মুখে বিস্ময়ের ভাব দেখে বললে, "আমার মক্কেল হচ্ছে খুব বড়লোক এক ভদ্রমহিলা। তাঁর এক মেয়ে সম্প্রতি যৌবনে পা দিয়েছে এবং এ-বয়সে সবাই যা হয় সেও তাই। মেয়েটি পরমাসুন্দরী এবং অত্যন্ত রোমান্টিক প্রকৃতির। খুব সম্ভব তার মাথায় একটু গোলমাল আছে, তা না হলে এরকম অদ্ভুত কাজের ভার আমার ওপরে পড়ত না। মেয়েটি সম্প্রতি—এই—আপনারা যাকে বলেন প্রেম—একটি ছেলের সঙ্গে তাতে পড়েছে। ঐ ব্যাপারে

তার মা ভয়ানক আপত্তি করেন এবং ছেলেটিকে তাঁর বাড়ীতে আসতে নিষেধ করে দেন। মেয়েটিরও তখন থেকে, বলতে গেলে, আহার নিদ্রা বন্ধ, একটু একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা রূপকথার মত শোনাচ্ছে, না? কিন্তু সত্যিকারের জীবনেও রূপকথার চেয়ে অনেক আশ্চর্য্যতর ঘটনা ঘটে। মা'র ধারণা তাঁর মেয়ে ছেলেটার প্রেমে পড়েনি—আজকালকার মেয়েদের যা হয়ে থাকে তাই হয়েছে। She is in love with love, if you see what I mean."

নীলাচল intrigued হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "বুঝেছি। এখন আমাকে কি করতে হবে বলুন।"

"বিশেষ কিছু নয়। আপনি তার কাছে প্রায় রোজ একখানা করে চিঠি লিখবেন। তাতে লিখবেন যে আপনি তাকে দেখেই আত্মহারা হয়েছেন। সূর্য্যের কথা, চাঁদের কথা লিখবেন। Dear me, you know what to write. এখন কথা হচ্ছে, আপনার বাংলা ষ্টাইল কি রকম?"

"সে জন্যে ভাববেন না। ছোটবেলা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে আমি বাংলাটা ঠিক করে নিয়েছি। চিঠিগুলোতে আমার স্বাক্ষর থাকবে কি?"

"আপনার নামের প্রথম অক্ষর—যেমন শুধু 'ন'—লিখতে পারেন। পুরো নাম লেখবার দরকার নেই। মেয়েটি শেষটাতে আবার আপনার প্রেমে পড়ে তা আমি চাইনে। শুধু এই সর্ত্তে আপনাকে রাজি হতে হবে যে, আপনি তার

সঙ্গে কোনদিন দেখা করতে চেষ্টা করবেন না এবং সমস্ত চিঠি-পত্র আমার হাতে দিয়ে যাবে।”

নীলাচল বললে, “আচ্ছা। আমি ভেবে দেখে কাল আপনাকে খবর দেব।”

ভাববার বিশেষ কিছু ছিল না। অজানা সুন্দরীর সঙ্গে প্রেম করতে নীলাচলের কোন আপত্তি ছিল না, বিশেষতঃ যখন তাতে কোন হাঙ্গামা নেই। পরদিন তার সম্মতি জ্ঞাপন করে তার সঙ্গে নমুনা স্বরূপ একখানা প্রেম-পত্র লিখে সে জয়ন্তবিলাসের কাছে পাঠিয়ে দিলে। মেয়েটির অপূর্ব্ব মুখশ্রী দর্শনে তার কি প্রকার শরীরঘটিত পরিবর্ত্তন হয়েছিল, তার হৃৎপিণ্ড ও ধমনীতে কি অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য ও অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা সে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই চিঠিতে বর্ণনা করলে। খানিকক্ষণ বাদে লোক-মারফৎ উত্তর এল। জয়ন্তবিলাস চিঠিখানার খুব প্রশংসা করেছে এবং সেই সঙ্গে দশটাকার একখানা নোট পাঠিয়েছে। আরও লিখেছে যে চিঠির কোন উত্তর এলে পাঠিয়ে দেবে। দু'দিন পরে উত্তর এল। সে চিঠি এক বালিকা-হৃদয়ের উচ্ছসিত ভালবাসার অভিব্যক্তি। নীলাচল আবার ছ'পাতা লম্বা এক চিঠি লিখিলে এবং তার জন্যে জয়ন্তবিলাসের কাছ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ

করতে লজ্জা বোধ করলে। তিনদিন পরে সে আরও একখানা চিঠি লিখলে। এ চিঠিতে ছিল প্রাকৃতিক বর্ণনা। তাতে চন্দ্র, তারা, আকাশ, বাতাস (মৃদু), ফুল, স্বপ্ন ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞের ন্যায় মতামত ছিল। একদিন পরে এ চিঠিরও সে উত্তর পেলে। চিঠিতে মেয়েটি ভালবাসা, কুকুর, পোষাক, মোটার সাইকেল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছে। চিঠি পড়ে নীলাচল অভিভূত হল এবং তক্ষুণি উত্তর লিখতে বসল। উত্তর লিখতে লিখতে প্রায় সন্ধ্যা হল এবং যখন তার চিঠির কাগজ ফুরিয়ে গেল তখন থামল। এ চিঠিখানাতে একাধারে উদ্ভিদ—যেমন গাছ, লতা, পাতা, ফুল যার সঙ্গে সে মেয়েটির একাধিক তুলনা করেও উপমা খুঁজে পায়নি—ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা ছিল। তিনদিন পরে এ চিঠির যে উত্তর পেলে তাতে সে ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। মেয়েটি লিখেছে যে নীলাচলের একখানা চিঠি তার মা'র হাতে পড়েছে এবং চিঠি পড়ে তিনি এত রেগেছেন যে এখন আর নীলাচলের কাছে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। এ অবস্থাতে তাদের গোপনে বিয়ে করাই যুক্তিসঙ্গত এবং সেই অভিপ্রায় নিয়ে সে শীগগিরই তার কাছে আসবে।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে নীলাচল তৎক্ষণাৎ একটা ট্যাক্সি ডেকে জয়ন্তবিলাসের অফিসে উপস্থিত হল। জয়ন্তবিলাস তার বিষাদময় মুখে আরও একটু দুঃখের হাসি টেনে জিজ্ঞেস

করলে, "টাকা নিতে এসেছেন? আমি তো এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছিলুম। বসুন, বসুন।"

নীলাচল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "আমি টাকা চাই না। মেয়েটা আমাকে বিয়ে করতে চায় কেন?"

"যে মেয়েটির কাছে চিঠি লিখছিলেন? তা তো চাইবেই, তা তো চাইবেই।"

"কি?"

"কেন, কেন, তাতে দোষ কি?"

"দেখুন, আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। কি কারণে আমি মেয়েটার কাছে চিঠি লিখেছিলুম, আপনি তাকে শীগ্‌গির জানিয়ে দিন।"

জয়ন্তবিলাস ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, আপনার অনুরোধ রাখতে পারলে আমি খুবই সুখী হতুম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা অসম্ভব—অসম্ভব। মক্কেল আমাকে বিশ্বাস করে একটা কাজের ভার দিয়েছে। তার কাজ সুসম্পন্ন করাই আমার কর্ত্তব্য, বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারিনে। এখন থেকে এ ব্যাপার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনে। আপনাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে; সুতরাং যদি কোন বিপদে পড়েই থাকেন, সেটা আপনারই দোষ। আচ্ছা আসুন তবে, নমস্কার—নমস্কার।"

নীলাচল ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে বললে, "আপনারই চক্রান্তে আমি এই বিপদে পড়েছি। আপনাকে জেল খাটিয়ে তবে ছাড়ব, একথা মনে রাখবেন।"

"কেমন করে? Breach of promise case ছাড়া এ ব্যাপারে আপনি আমাকে জড়াতেই পারবেন না এবং," একটু মৃদু হেসে বললে, "আশাকরি সেটা আমাদের দিক থেকে হবে না। যদি হয়তো আপনিই করবেন।"

"মেয়েটা কে?" নীলাচল জিজ্ঞেস করলে।

"মেয়েটির বংশ-গৌরব যথেষ্ট আছে। বিয়ে করলে আপনি ঠকবেন না। তার নাম শতদল—"

"শতদল? শতদল ভৌমিক নয়তো?"

"আপনি তাকে চেনেন দেখছি। শতদল ভৌমিকই বটে।"

"সর্ব্বনাশ!" নীলাচল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

তার মনে পড়ল পাশের বাড়ীর সেই সালঙ্কারা স্ত্রীলোককে ও তার মোটা, কালো ও কুৎসিত কন্যাকে। তারই নাম শতদল ভৌমিক। আরও বুঝতে পারলে যে সমস্ত ব্যাপারটা ষড়যন্ত্রের ফল।

কিছুক্ষণ নীলাচলের মুখ থেকে কথা বেরুলো না; স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তার মনে পড়ল এক উকীল বন্ধুকে।

তার ধারণা ছিল সংসারে এমন কোন বিপদ নেই যা থেকে কোন উকীল তাকে উদ্ধার করতে না পারে। সুতরাং জয়ন্তবিলাসের সঙ্গে বৃথা তর্কে সময় নষ্ট না করে সে তক্ষুণি গেল বন্ধুবর রাসবিহারী গোস্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করতে।

রাসবিহারী সম্বন্ধে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে আইন তার কাছে অত্যন্ত নীরস মনে হত এবং আইনব্যবসায়ীরা যে কেমন করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে এটা তার কাছে পরম বিস্ময়ের বস্তু ছিল। তার বন্ধুরা পূর্ব্বেই তার মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভা লক্ষ্য করেছিল—সত্যি কথা বলতে কি এদিকে তার একটু নাম ও যশও ছিল; সুতরাং একদিন সে আইন ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি সাহিত্যিক হয়ে উঠল। ওকালতি থেকে যে আয় হত তাতে তার সিগারেট খরচা ও বাসভাড়া প্রায় উঠে যেত। অবশ্য নিতান্ত দরকার না হলে সে বাসে কখনই উঠত না এবং সিগারেটও সে খুবই কম খেত।

অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়বার পরে সে দরজা খুলে দিলে। প্রথমটা সে নীলাচলকে মক্কেল ভেবেছিল এবং মক্কেলরা ঠিক যতক্ষণ কড়া নেড়ে চলে যায়, তার পরেও লোকটার নড়বার কোন লক্ষণ নেই দেখে রাসবিহারী নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা খুললে। কোন মক্কেল আসছে জানতে পারলে পেছনের দরজা দিয়ে সে পালিয়ে যেত।

সন্দিগ্ধভাবে নীলাচলকে জিজ্ঞেস করল, "খবর কি? এ সময়ে যে?"

"রাসবিহারী, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে ভাই।"

রাসবিহারী আরও ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি আমার কাছে আইনের পরামর্শ করতে আসনি তো? প্র্যাকটিস্ আমি প্রায় ছেড়ে দিয়েছি।"

নীলাচল সে কথায় কাণ না দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "জয়ন্তবিলাস সিকদারকে চেন?"

রাসবিহারী হাঁপ ছেড়ে বললে, "ওঃ, এই কথা। জয়ন্তবিলাসের সম্বন্ধে অনেক-কিছু শুনেছি। গোড়াতে সেও learned professionএর মেম্বার ছিল। কিন্তু, বোধ করি আমি জন্মাবারও আগে, unprofessional conductএর জন্যে তার সনদ কেড়ে নেওয়া হয়। এখন সে একটা 'প্রজাপতি অফিস' না কি খুলেছে। মনে কর তোমার একটি ভয়ানক কুৎসিত কি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে আছে যার বিয়ে দেওয়া দরকার। তুমি বুড়ো জয়ন্তবিলাসকে খবর পাঠালে—চমৎকার একটা গল্পের প্লট, কি বল? শীগ্‌গিরই আমি এই প্লট নিয়ে একটা গল্প লিখব।"

"চুলোয় যাক তোমার প্লট। মেয়ের বিয়ের জন্যে জয়ন্তবিলাসকে খবর পাঠালুম। তার পর?"

"তারপর আর কি? সে একটি বর যোগাড় করে। একবার আমার এক বন্ধু—দীনবন্ধু সান্যাল তার নাম—তার ফাঁদে পড়েছিল।"

"কেমন করে?"

"ব্যাপারটা এত সহজ যে দীনবন্ধু তার ফাঁদে কেন পড়তে গেল তা আমি আজ পর্য্যন্ত ভাল করে বুঝতে পারিনি। বুড়ো জয়ন্তবিলাস তাকে দিয়ে একটি অপরিচিতা মেয়ের কাছে কতগুলি চিঠি লিখিয়ে নেয়। ওকি—তোমার কি হল ?"

"কিছু না," নীলাচল নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, "তারপর ?"

"বললে মেয়েটি কোন এক ছোকরার প্রেমে পড়ে পাগল হবার জোগাড় হয়েছে এবং চিঠি লেখবার জন্যে তার বাপ উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবে। দীনবন্ধু ভাবলে, মন্দ কি, এতদিনে একটা রহস্যের সন্ধান বুঝি পাওয়া গেল। চিঠি লিখতে লিখতে বেচারা মেয়েটার সঙ্গে সত্যিকারের প্রেমেই পড়েছিল—যতক্ষণ না সে তাকে নিজের চোখে দেখলে। তারপরে পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক দিয়ে সে বুড়োর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। আমার ধারণা ছিল দীনবন্ধুর বুদ্ধি সুদ্ধি আছে ; সে যে এতদূর বোকার মত কাজ করবে—"

"থাক্, থাক্, সে সব জানি। তাইতো ভাবিয়ে তুললে।"

"কি সর্ব্বনাশ! তোমারও দীনবন্ধুর অবস্থা হয়েছে নাকি ?"

"পাগল ! আমাকে কেউ ধরতে পারবে না। আমি ভাবছি কি করে বুড়োকে ফাঁদে ফেলব।"

চট করে তার একটা ব্যাপার মনে পড়ল। তার স্মরণশক্তি ছিল তার প্রধান সহায়।

হোটেলে পৌঁছেই ম্যানেজারের কাছ থেকে খবর পেলে এক ভদ্রমহিলা ও তাঁর মেয়ে অনেকক্ষণ থেকে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। নীলাচল গম্ভীর ভাবে আদেশ দিলে, তাদের আমার ঘরে পাঠিয়ে দিন। মিসেস্ ও মিস্ ভৌমিক মন্থর গতিতে তার ঘরে প্রবেশ করল। নীলাচল দু'খানা চেয়ার দেখিয়ে বললে, "বসুন।"

মিসেস্ ভৌমিক ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "বসুন বলতে আপনার লজ্জা করে না? এসবের মানে কি আমি জানতে চাই। আপনি আমার মেয়ের কাছে চিঠি লিখেছেন কেন? জানেন আপনাকে আমি প্রসিকিউট করতে পারি।"

মাংসপিণ্ডের অন্তরালে মিস ভৌমিকের চোখখানা খোলা না বোঝা ঠিক বোঝা গেল না।

নীলাচল শান্তভাবে উত্তর দিলে, "আপনি আমাকে প্রসিকিউট করতে পারেন না, কারণ শুধু চিঠি লেখা কোন অপরাধ নয়। তাছাড়া আপনার মেয়েকে আমি প্রথম যেদিন দেখি, সেইদিন থেকেই তাকে ভালবাসি। মিস ভৌমিককে দেখা মানেই ভালবাসা।"

এক মুহূর্ত্তের জন্য মিসেস্ ভৌমিক নিস্তব্ধ হয়ে রইল। বললে, "আপনি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে প্রস্তুত ?"

"নিশ্চয়। এতদিনে বুঝি আমার স্বপ্ন সফল হল।"

মিসেস্ ভৌমিক দেখলেন এদিক দিয়ে সুবিধা হবে না। তখন নরম সুরে বললেন, "দেখুন, সত্যি-সত্যিই আপনার বিয়ে করবার প্রয়োজন নেই। আমাকে তিন হাজার টাকা দিলেই সমস্ত ব্যাপারটা ভুলে যেতে রাজি আছি।"

"কিন্তু আমি রাজি নই। আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করবই।"

মিসেস্ ভৌমিক একবার মিষ্টি হেসে শেষ চেষ্টা করলেন, "আমার মেয়েকে বিয়ে করাতে আপনার কোন লাভ নেই। চট্ করে উত্তর দেবার প্রয়োজন নাই—ভেবে চিন্তে কাল সকালে আমাকে জানাবেন, তাহলেই হবে। মনে রাখবেন, তিন হাজার টাকা।"

মিসেস্ ভৌমিক কন্যাসহ প্রস্থান করলেন।

নীলাচলও তখন এক সত্যিকারের উকীলের পরামর্শ গ্রহণ করতে গেল। বিনয় দত্ত জুনিয়ার উকীল হলেও এরই মধ্যে বেশ নাম করেছে। তার সঙ্গে আধঘণ্টা পরামর্শ করবার পরে নীলাচল প্রফুল্লচিত্তে চেম্বার পরিত্যাগ করলে।

পরদিন দশটার সময় জয়ন্তবিলাস হাঁপাতে হাঁপাতে তার হোটেলে উপস্থিত। তার হাতে একখানা টাইপ করা

চিঠি। মুখের ঘাম মুছে জিজ্ঞেস করলে, "এ চিঠির মানে কি?"

নীলাচল বিদ্রূপের স্বরে বললে, "এ চিঠির মানে বোঝা কি এতই শক্ত? আপনিও তো এক সময় উকীল ছিলেন। মনে আছে, একদিন বলেছিলেন যে Breach of promise case ছাড়া এ ব্যাপারে আপনাকে জড়াতে পারব না। সেইজন্যে Breach of promise caseই আপনাদের নামে করব।"

"আপনি কি পাগল হয়েছেন? একটি মেয়ের নামে case করবেন! কোন ভদ্রলোক তা কখন করে?"

নীলাচল অবিচলিতকণ্ঠে জবাব দিলে, "মেয়েটি সাবালিকা এবং আপনারা ভদ্রলোক নন। সুতরাং case করতে কোন বাধা নেই। তিন হাজার টাকা compensation পেলে চুপ করতে পারি।"

জয়ন্তবিলাস কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললে, "অত টাকা আমরা কোথায় পাব? আমরা ভয়ানক গরীব।"

"তাতে আমার কিছু আসে যায় না। দীনবন্ধুর কাছ থেকে যে পাঁচ হাজার নিয়েছেন, তা থেকে তিন হাজার দিন। আর তা না-হলে মিস্ ভৌমিকের সঙ্গে আমার বিয়ের বন্দোবস্ত করুন যদি case করাতে আপনাদের এতই আপত্তি থাকে।"

জয়ন্তবিলাস একটু ভেবে বললে, "দেখুন, আপোষে একটা মিটমাট করে ফেলুন। আমরা এক হাজার দিতে রাজি আছি।"

"অসম্ভব।"

"আচ্ছা, আপনার কথাও থাক, আমার কথাও থাক। দেড় হাজার নিন। হ'ল তো?"

উত্তরে নীলাচল শুধু ঘাড় নাড়লে।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় নীলাচল বন্ধুবর রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। রাসবিহারী তাকে কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করে বললে, "আরে এস, এস। তোমার খবর কি? চল একটা হোটেল টোটেলে যাওয়া যাক। এইমাত্র দশ ফর্ম্মার একখানা উপন্যাস সাড়ে তিনশ টাকায় বিক্রী করেছি। গ্রেট, কি বল?"

নীলাচল বললে, "আমিও একটা বিক্রী করেছি তিন হাজার টাকায়। গল্পটার নাম "বিয়ের আংটি হাতে পরা নিরাপদ নয়।' প্লটটা হচ্ছে, একটি বিবাহিতা মেয়ে blackmail করে টাকা আদায় করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার আঙুলে বিয়ের আংটি থাকাতে সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যায়।"

রাসবিহারী অন্যমনস্কভাবে বললে, কারণ সে ভাবছিল এই চমৎকার প্লটটা তার মাথায় কেন আগে ঢোকেনি, "বটে, বটে। তা টাকাটা সাবধানে একটা ব্যাঙ্কে রেখে দিও। বেশি বাজে খরচ কোরো না।"

নীলাচল বললে, "টাকাটা একটা ইনসিওরেন্স অফিসে জমা আছে। তারা ছ'পারসেন্ট দেবে ও রোজ দুপুরবেলা তাদের অফিসে গিয়ে ঘুমোবার জন্যে প্রতি মাসে একটা মোটা মাইনে দেবে।"

BLUE BLACK
KAJAL-KALI
CHEMICAL ASSOCIATION CALCUTTA

Chemical Association

55, Canning Street,
Calcutta

কাজল কালী ব্যবহার করে
সন্তোষ লাভ করেছি।
এর কালিমা বিদেশী কালীর
চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।
ইতি ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রসঙ্গ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

বাঙ্গলা নাটকের কথা

দুই তিনখানি বাঙ্গলা নাটক সম্বন্ধে এবার কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

কিছুদিন হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গ রঙ্গালয়ের ইতিহাস প্রণয়ন উদ্দেশ্যে যে সব প্রবন্ধ লিখিয়া বিবিধ পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছেন, সে প্রবন্ধগুলি যথার্থই অনেক অনুসন্ধানের ফল। কাজেই ব্রজেন্দ্রবাবুর দ্বারা অনেক লেখকের অনেক ভ্রম সংশোধিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি তিনি 'অনেকের ভ্রম' দূর করিতে গিয়া নিজেই ভ্রমের ফাঁদে পা দিয়া ফেলিয়াছেন!

* * *

এই জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বঙ্গশ্রী' নামে নূতন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রবাবুর "বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়" ইতিশীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে, "অনেকে ভ্রমক্রমে উপেন্দ্রনাথ দাসকে 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের গ্রন্থকার বলিয়াছেন। উপেন্দ্র বাবু নাটকখানির প্রকাশক বটেন।" কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। উপেন্দ্রনাথ 'শরৎ-সরোজিনী'র প্রকাশকও বটে এবং রচয়িতাও বটে। এই গ্রন্থের গোড়ায় গ্রন্থকার হিসাবে যদিও '৺দুর্গাদাস দাসে'র নাম মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু সেটা ছদ্ম-নাম মাত্র। প্যারীচাঁদ মিত্র যেমন

নিজের নাম গোপন রাখিয়া তাঁহার গ্রন্থগুলিতে 'টেকচাঁদ ঠাকুরে'র নাম ব্যবহার করিতেন, রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁহার রচিত 'পদাবলী' ভানুসিংহের নাম দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, উপেন্দ্রনাথও তেমনি শুধু তাঁহার 'শরৎ-সরোজিনী' নহে, তাঁহার 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকও '৺দুর্গাদাস প্রণীত' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'দাদা ও আমি' নামক প্রহসনেও মনে হয়, গ্রন্থকার হিসাবে তাঁহার নাম প্রকাশিত হয় নাই। এই জন্য এ ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্র বাবুর যেরূপ ভুল হইয়াছে, সেরূপ ভুল ইতঃপূর্ব্বে আরও কেহ কেহ করিয়াছিলেন।

* * *

'শরৎ-সরোজিনী'র সন্দর্শন-লাভ করিয়া তখনকার বিখ্যাত 'সাধারণী পত্রিকা' লিখিয়াছেন, "শরৎ-সরোজিনী গ্রন্থে আমরা অনেক স্থানে অশ্রুপাত করিয়াছি ও তজ্জন্য আমরা দুর্গাদাস বাবুর প্রেতাত্মাকে শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।" তখনকার 'সাপ্তাহিক সমাচার' নামে আর একখানি কাগজ বলিয়াছিলেন, "নাটককার পরলোকগত হইয়াছেন, বাঁচিয়া থাকিলে তিনি একজন নিপুণ লেখক হইতে পারিতেন।" —এইরূপ মন্তব্য তখন আরও দুই চারিখানি কাগজে বাহির হইয়াছিল। তারপর যখন 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' প্রকাশিত হইল, তখন তাহার 'উৎসর্গ' ও 'বিজ্ঞাপন' পত্র পড়িয়া অনেকে বুঝিলেন যে, উপেন্দ্রনাথই ঐ দুই গ্রন্থের রচয়িতা। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের 'The Bengal Magazine'

ঐ দুই নাট্য-গ্রন্থের সমালোচনা-উপলক্ষে বলেন, "We notice these two plays together, because they are from internal evidence the productions of one and the same author. The first of them professes to have been written by one Durga Das Das who is said to be dead, and who before his exit from the great stage of the world entrusted the play for publication to his friend Baboo Upendra Nath Das. It is superfluous to remark that the writer who is said to be dead never existed, and that the real author of the drama is Baboo Upendra Nath Das." উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার কোনও বন্ধু কর্ত্তৃক লিখিত "বন্ধুকৃত্য" নামে যে প্রবন্ধটি ১৩০৭ সালের শ্রাবণ-সংখ্যার 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও জানিবার যোগ্য অনেক কথা আছে। মুদ্রিত নজির নহিলে ব্রজেন্দ্র বাবু কোনও কথা বড় বিশ্বাস করিতে চাহেন না; তাই সেই ছাপানো প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি ছত্র এখানে পুনরায় ছাপাইয়া বাহির করিতেছি। 'পূর্ণিমা'র লেখক বলিয়াছিলেন, "যে বয়সে উপেন্দ্রনাথ 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' বা 'শরৎ'-সরোজিনী লিখিয়াছিলেন, সে বয়সে সাধারণত সকলের মনেই একটা দর্প থাকে, উপেন্দ্রনাথেরও তাহা ছিল; সমাজের কাছে তিনি যে পূজা, যে সম্মান প্রত্যাশা করিয়াছিলেন,

সমাজ তাহা দিতে চাহিল না বা পারিল না, তাই উপেন্দ্রনাথ সমাজ ছাড়িলেন, বলিতে হইলে বলা উচিত, বুঝি জাতিও ছাড়িলেন।”

* * *

এই প্রসঙ্গে আর একখানি বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে কিছু বলিব। কাহারও কাহারও মুখে মুখে শুনিতে পাই, Gerasim Lebedeff নামক জনৈক রুষ জাতীয় লেখক যে এদেশে প্রথম বাঙ্গালা নাটক লিখিয়াছিলেন ও তাহার অভিনয় করাইয়া বাঙ্গালা নাটকাভিনয়ের প্রথম পথ দেখাইয়াছিলেন, একথা ‘বিশ্বকোষে’ই প্রথম লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা ‘বিশ্বকোষে’র পাতা উল্টাইয়া কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ‘বিশ্বকোষ’ যাহা লিখিয়াছেন, সাধারণের অবগতির জন্য এখানে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

“কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে এই সময়ে ডোমটুলীতে ইংরাজদিগের যে নূতন নাট্যশালা স্থাপিত হয়, তাহাতে এই বিদ্যাসুন্দর ইংরাজীতে গীত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় ;—‘By permission the Honorable the Governor General, Mr. Lebedeff’s New Theatre in the Doomtulla (ডোমটুলী চিনাবাজার), decorated in the Bengali style, will be opened very shortly with a play called “The

Disguise"....The words of the much admired poet Shree Bharat Chandra Ray are set to music.'—অর্থাৎ গবর্ণর জেনারেলের আদেশ অনুসারে মিষ্টার লেবেডেফ্‌সের ডোমটুলীস্থ নূতন নাট্যশালায় "ছদ্মবেশী" নামক নূতন ইংরাজী নাটক শীঘ্রই খোলা হইবে।... বহুআদৃত কবি ভারতচন্দ্রের কবিতা সুরে বাঁধা হইয়াছে। ইহা যে বিদ্যাসুন্দর—অন্নদামঙ্গল নহে, তাহা প্রমাণ ভিন্নও বুঝা যায়। তাহা সম্ভবতঃ Ballad হিসাবে গীত হইয়াছিল। ইহা ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের কথা।"—বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বিশ্বকোষের এই লেখাটুকুর মধ্যে যাহা আছে, তাহার পনেরো আনাই ভুল।

বোম্বে স্পেসালেরই

আজকাল চলন

ভারতীয় ভার্জ্জিনিয়া

সিগারেট

স্বদেশী এবং সুলভ

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

BEST VIRGINIA Bombay Special

সোল এজেণ্ট
দাস এণ্ড কোং
২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট

চিত্র ও চরিত্র

রামগোপাল ঘোষ

রামগোপাল ঘোষ ছিলেন নব্য বাংলার প্রথম যুগের প্রধান পুরুষ। সেদিন পর্য্যন্ত বাংলার বাক্‌পটুতার যে প্রখ্যাতি ছিল, রামগোপালের রাজনৈতিক বাগ্মিতায় তাহার স্থচনা। ডিরোজিওর যে কয়জন শিষ্য জীবনের বিভিন্ন বিভাগে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, রামগোপাল তাঁহাদের অন্যতম। বিদ্যাসাগরের মত স্ব-প্রতিভায় আপনাকে উন্নীত করিয়া সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিয়া তিনি দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

বয়সে তিনি বিদ্যাসাগরের পাঁচ বৎসরের বড়। ১৮১৫ সালে তাঁহার জন্ম।

মাহিনা দিয়া হিন্দুকলেজে পড়িবার সামর্থ্য ছিল না বলিয়া ডেভিড হেয়ার এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালককে অবৈতনিক ছাত্ররূপে গ্রহণ করেন। গুরু ডিরোজিওর শিক্ষায় এবং সংসর্গে রামগোপালের প্রতিভা প্রথম বিকাশ লাভ করে। রসিককৃষ্ণ মল্লিক একই গুরুর শিষ্য ছিলেন। মল্লিকের বাগানে যে সাহিত্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সভায় লোকে রামগোপালের অদ্ভুত বক্তৃতাশক্তি এবং ইংরেজীভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হয়।

এক ইহুদীবণিক-অফিসের সামান্য কর্ম্মচারী হইতে রামগোপাল সেখানকার মুৎসুদ্দি ও অংশীদার হন। তাহার

পর নিজের কুঠী স্থাপন করিয়া তিনি বাংলার এক প্রধান বণিক রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাঁহার সুনাম লক্ষমুদ্রার সমান ছিল। যে সাহেবের তিনি অংশীদার ছিলেন, তাহারই ঋণের দায়ে একদা রামগোপালের সর্ব্বস্বান্তি ঘটিবার উপক্রম হয়। সে ঋণ কড়ায় কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করিতে তিনি প্রস্তুত হন। সে দিনের বহু উচ্চশিক্ষিত ইংরেজীনবীশের মত তিনি একাদকে বিলাতী খাদ্য ও পানীয় প্রিয় সামাজিক আচারহীন, অন্যদিকে একান্ত সত্যনিষ্ঠ দৃঢ়ব্রত ছিলেন।

নিমতলা শ্মশানঘাট স্থানান্তরীকরণের সম্পর্কে তাঁহার বক্তৃতা শুধু প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই, তাহাতে কার্য্যসিদ্ধিও হইয়াছিল। তিনি নানাবিধ শুভদ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন।

১৮৬৮ সালে তিপান্ন বৎসর মাত্র বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

এই আত্মশক্তিতে শক্তিমান, শিক্ষায় সুন্দর, যুগপ্রভাবে কিছু উচ্ছৃঙ্খল, তেজস্বী, বাক্‌পটু, স্বাধীনচিত্ত, সত্যনিষ্ঠ পুরুষ বর্ত্তমান যুগের একজন অগ্রদূত ছিলেন।

বাঙ্গালীর জুতার দোকান!
পছন্দসই জুতা এখানে সস্তা
ইউনাইটেড ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং —
১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মেছুয়াবাজারের মোড়, কলিকাতা

সাময়িকী ও অসাময়িকী

কল্পনা কবির একটি মানসিক বৃত্তি, তাহার আত্মার একটি স্বাভাবিক শক্তি। এই শক্তি যে শুধু কবির তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেয়, তাহা নহে। যেটি যাহা তাহাই দেখাইয়া দিয়া, অথবা কেবল বস্তু, বিষয় ও অবস্থার নিহিত সত্য ও সৌন্দর্য্যের সন্ধান বলিয়া দিয়া, ইহা ক্ষান্ত হয়, তাহাও নহে।

* * *

সকলেরই হয় ত কল্পনা-শক্তি কিছু আছে, কিন্তু তা এমনি আর্দ্র ও শীতল যে, কবির কাব্য-প্রদীপ-শিখা ভিন্ন তা ক্ষণিকের জন্যও জ্বালাইবার কোন উপায় নাই। বাহিরের শিখায় কিন্তু কবির কোন প্রয়োজন নাই। বিশ্বের সহিত সংস্পর্শে কবির অনুরাগপূর্ণ অন্তরে আবেগের যে স্পন্দন পড়িয়া যায়, তাহারই উত্তাপে এবং উত্তেজনায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া কল্পনার যে দীপ্তি চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া তোলে, জলে স্থলে সে আলোর সাক্ষাৎ কোথাও মিলিবে না, কোথাও মিলিবে না।

* * *

অতএব যে শক্তি হৃদয়ে থাকিয়া কবিকে দিব্যদৃষ্টি দান করে, সেই শক্তিই কাব্যের উপাদান সমূহের সংস্রবে আসিয়া তাহাদিগকে নূতন আলোকে আলোকিত করিয়া তোলে। অর্থাৎ—কল্পনা সেই শক্তি, যাহার বলে কাব্যান্তর্গত বস্তু ও বিষয়, রূপ ও বর্ণে মণ্ডিত হইয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে। নানা বৈচিত্র্য ঐক্যে বাঁধিয়া সুষমা দিবার যে শক্তি, সেও

কল্পনার। মূর্ত্তি ও আকার দিয়া সূক্ষ্ম ভাবগুলির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাও কল্পনার কাজ। আবার স্থূল বাস্তবকে ভাবময় করিয়া তোলা—সেও কল্পনার লীলা। এমনি করিয়া কল্পনার মায়াদণ্ডের স্পর্শে, অনঙ্গ ভাব মূর্ত্ত রূপে এবং স্থূল বাস্তব সুকুমার ভাবে পরিণত হইয়া যায়। সুতরাং অজানা এবং অরূপকে রূপ দিয়া অপরূপ করিয়া তোলে যে—সে ঐ কল্পনা।

* * *

বিজ্ঞান-সম্পর্কে মানুষ বলবান, সাহিত্য-সম্পর্কে মানুষ দেবতা। বিজ্ঞানে সে আবিষ্কার করে, সাহিত্যে সে সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানে তাহার সুখ, সাহিত্যে তাহার আনন্দ।

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ কাব্যে।

* * *

অন্য সকল শক্তি দিয়া মানুষ জীবনকে সেবা করিয়াছে, সুস্থ করিয়াছে, সুখকর করিয়াছে। সাহিত্যে সে জীবন সৃষ্টি করিয়াছে। কোটাল-পুত্র জানিত অস্থিসংস্থান করিতে, মন্ত্রী-পুত্র জানিত রক্তে মাংসে সম্পূর্ণ করিয়া আকারটি দিতে, শুধু প্রাণ সঞ্চার করিবার বিদ্যা কারো আয়ত্ত ছিলনা—সে বিদ্যা জানিত শুধু রাজার ছেলে। ঐতিহাসিক নয়, বৈজ্ঞানিক নয়—জীবন যে দেয় সে ঐ কবি। মানুষ সকল অবস্থায় মানুষ—শুধু কাব্যে সে ঈশ্বর।

কবির জীবন্ত সৃষ্টি—কাব্য।

দিন-পঞ্জী

বার্লিন ১৭ই মে—অদ্য হার হিটলার নিরস্ত্রীকরণ ও ভার্সাই সন্ধির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রাইখ্‌ষ্ট্যাগে জার্ম্মান-নীতি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, সীমানা-নির্দ্দেশ যথোচিত হয় নাই। যদিও যুদ্ধের জন্য একমাত্র জার্ম্মানীই অপরাধী ইহা প্রমাণ করিতে যখন শক্তিবর্গ ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে এই সন্ধি রচিত, তথাপি সন্ধির বাধ্য-বাধকতা জার্ম্মানী পালন করিয়াছে। জার্ম্মানীর তরুণ বংশধরগণ দুঃখকষ্ট যথেষ্ট ভোগ করিয়াছে, তাহারা অন্যকে দুঃখকষ্ট দিতে চাহে না। কারণ ইউরোপীয় সমর বাধিলে তাহাতে অশান্তি-আপদ ও কমিউনিষ্ট বিশৃঙ্খলতা আরও বাড়িবে।

পুনা, ২০শে মে—অদ্য সন্ধ্যা হইতে মহাত্মাজী ইতিহাস প্রসিদ্ধ সিংহগড় প্রস্রবণের জল পান করিতেছেন। তিনি ডাঃ বিধান রায়কে বলেন, ভি-সি ওয়াটার অপেক্ষা এই জল অধিকতর মিষ্ট এবং সুন্দর; সিংহগড় আমার মনে শিবাজী ও লোকমান্যের স্মৃতি জাগরূক করে।

লণ্ডন, ১৮ই মে—ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান এসোসিয়েসনের এক সভায় স্থির হইয়াছে, আগামী ১০ই জুন লণ্ডনে সর্ব্বদলসম্মিলনের ব্যবস্থা করা হইবে। এই সম্মিলনের সভাপতি হইবার জন্য শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসুকে আহ্বান করা হইয়াছে।

দানাপুর, ২০শে মে—এখানকার এক স্কুলের শিক্ষক আত্মশুদ্ধির জন্য মহাত্মার সহিত অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহার বয়স ৮২ বৎসর।

ভিয়েনা, ২২শে মে—শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসুকে জার্ম্মানীতে যাইবার ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছে। আগামী তিন সপ্তাহ মধ্যে তিনি ব্ল্যাক ফরেষ্টে অবস্থিত ওয়ার্ডবার্ড স্বাস্থ্যনিবাসে যাইবেন।

দার্জ্জিলিং, ২২শে মে—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধীজীর নিকট তার প্রেরণ করিয়াছেন, “আপনার এই তপশ্চর্য্যা আপনাকে জীবনের অমঙ্গলময় বাস্তবের দুর্ব্বহ ভার হইতে শাশ্বত সত্যের বুকে লইয়া যাক এবং কঠোর বৈরাগ্যের সহিত অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য আপনার মধ্যে নবীন শক্তি সঞ্চার করুক।” তদুত্তরে মহাত্মাজী বলেন, “গুরুদেবকে বলিবেন, তাঁহার এই দান আমি সঞ্চিত রাখিয়া তাঁহার বাণীতে আমি তাঁহার সাহচর্য্য অনুভব করিতেছি। আমার তপশ্চর্য্যার সম্পর্কে তাঁহার এই প্রার্থনা আমার অনেক সাহায্য করিবে। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।”

আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে
আর ইনজেক্সান লইতে হইবে না
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

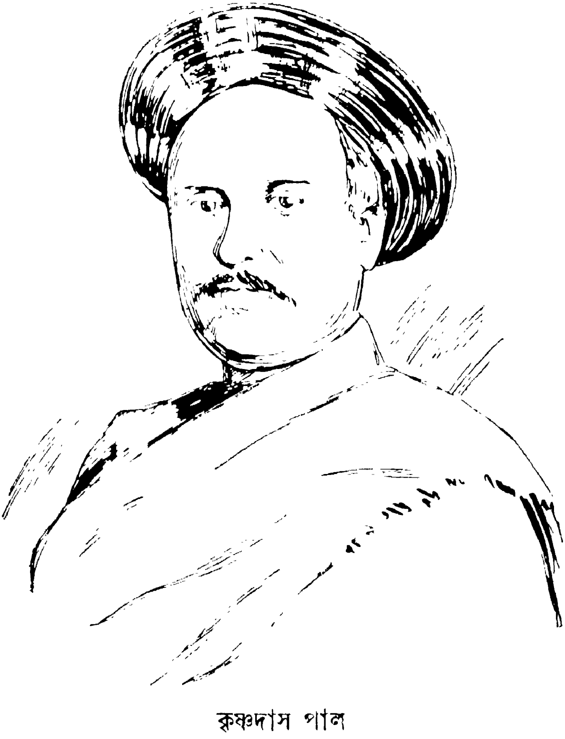

কৃষ্ণদাস পাল

ছোট গল্প

১ম বর্ষ] ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ [৪৭শ সংখ্যা

ভৈরবী নদী

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ডবল বখশিস্ কবুল করিয়া মাঝিকে ত কোনোরকমে রাজি করিয়াছিলাম। তখন একবার কল্পনা করিয়াও দেখি নাই, নদী ছাড়া যাহাদের জীবনের কোনো অস্তিত্বই নাই,—দূরপ্রসারী, তরঙ্গায়িত জলস্রোতের সঙ্গে যাহাদের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, যাহাদের একবার নদী পাড়ি দেওয়া, অফিস হইতে দোতালা বাসে আমাদের বাড়িফেরার চেয়েও সহজ, তাহাদেরও একজন যে আমাকে আজ বারবার নিষেধ করিতেছে, তাহার কারণ কি? মনে করিয়াছিলাম, বোধ করি বা ঘুম তাহার এখনো চোখে লাগিয়া আছে, অথবা শরীরের সামান্য একটু

আলস্যের আয়েজের বশেই রাজি হইতেছে না। কিন্তু পরশু সকালে ঠিক দশটা-দশে আমাকে আমার নির্দ্দিষ্ট চেয়ারটিতে গিয়া বসিতে হইবে—বড়বাবু বারবার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। একদিন দেরি হইলেই মুস্কিল। চাকরি নূতন, তাহাতে এই প্রথম ছুটি। মামাতো-ভাইয়ের বিবাহটা মাত্র দেখিতে পারিয়াছি, আনুষঙ্গিক অনেক উৎসবই পিছনে পড়িয়া রহিল। একমাত্র নাতি আমি,—দিদিমা কাঁদিলেন, বড়-বৌদি ত কথাই কহিলেন না। স্নিগ্ধহাস্যোজ্জ্বল, রমণীয় প্রহরগুলির মধ্যে অকস্মাৎ একটি রূঢ় যতিভঙ্গ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি—মনের আরশিতে অনেকগুলি অভিমান-ক্ষুব্ধ, বেদনাহত প্রিয়জনের মুখ ভিড় করিয়া আসিতেছিল।

হঠাৎ বঙ্কু-মাঝির ডাকে চকিত হইয়া কহিলাম, 'কি রে?'

মাঝিটি বড় ভালো। মুখে নিরীহ কিন্তু শরীরে বেশ জোয়ান। ধীরে ধীরে জবাব দিল, 'কিছু না কত্তা, বলছিলাম কি থেকে যান আজ আমাবস্যেটা। আঁদারে-আঁদারে ঠিক না পেয়ে যদিই সেই দেরি হয়ে যায়?'

উত্তরের প্রত্যাশায় বঙ্কু উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া রহিল।

অত্যন্ত উদাসীনভাবে বলিলাম, 'ও! তা কি করব আর—তোমাকে ত বললাম আমার কাজ বড় জরুরি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। বৈঠার শব্দ ক্রমশঃ দ্রুত এবং তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কাজ কতদিন করছ তুমি?'

বন্ধু অশিক্ষিত হইলেও বেশ বুঝিতে পারিলাম, তাহার অভিমানে আঘাত লাগিয়াছে। কথাটা হঠাৎ বলিয়া ফেলার জন্য লজ্জিত হইলাম।

বন্ধু সংক্ষেপেই জবাব দিল, 'সবই পারি কত্তা, শুধু দেবতা কি দানোর ওপর দিয়েই যেতে পারি না।'

বিংশ শতাব্দীর কলিকাতাবাসী আমি, সহসা এ সব কথা বিশ্বাস করিতে একটু বাধে। তবু, বন্ধুর কথাবার্ত্তার মধ্যে সংযম এবং দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়াছি,—তাহার দীর্ঘদিনের নদীবাসের বিচিত্র, প্রচ্ছন্ন অভিজ্ঞতা আমাকে কেমন যেন আবিষ্ট করিতে লাগিল। যেন অতীত-কাহিনীর রহস্যময় বিস্তীর্ণ পরিধি আমার চোখের সামনে অস্পষ্ট মূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে,—উন্মাদিনী কীর্ত্তিনাশার উচ্চকিত হাস্যধ্বনির অন্তরালে বিগতদিনের হেমাভরণভূষিতা, ঐশ্বর্য্যময়ী রাজলক্ষ্মীর অতি ক্ষীণ করুণ ক্রন্দনধ্বনিও যেন দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে।

সুবর্ণরেখার গাঙ পাড়ি দিয়াই আমাদের নৌকা একবার স্থির হইয়া টাল খাইল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। তারপরই তর্‌তর্ করিয়া শাদা পালে ভর দিয়া তীরবেগে সেই উদ্দাম, তরঙ্গ-চঞ্চল জলস্রোতের উপরে কিশোরী বালিকার মতো নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলিল। দূর তীরের বিস্তীর্ণ বালুচরটি

ঈষৎশুভ্র, ধূসর আবছায়ায় ক্রমশ দূরে দূরে মিলাইয়া গেল,—শুধু দিগ্বলয়ের কোলে তাহার সেই পাণ্ডুর আভা একটি বিশীর্ণ নীলাঞ্জনবর্ণ রেখার মতো জাগিয়া রহিল। সম্মুখে রহিল শুধু অপার বিশাল নীলাভ ফেনসঙ্কুল জলস্রোতের উপরে নক্ষত্রখচিত নীলাকাশের বিস্ময়ময়, উদার বিস্মৃতি।

বাংলাদেশের নদী-সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল, কিন্তু এই ভয়ঙ্করী নদীটির আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চোখে আর পলক পড়িল না। মনে হইল যেন এর অতলস্পর্শী দূর-বিসর্পী ফেনিল জলরাশির উন্মত্ত গর্জ্জনধ্বনি প্রকাশের ভাষাকে অতিক্রম করিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া আছে। শস্যশ্যাম, ছায়া-নিবিড় বাংলাদেশের সীমান্তে কীর্ত্তিনাশার সহচরী এই পার্ব্বত্য গৈরিকনদীর সর্পিল তরঙ্গলীলা,—চকিত বিদ্যুতের মত ক্ষণদীপ্ত, ফেনোচ্ছল এর ভয়াবহ রণমূর্ত্তি দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

অস্ফুটকণ্ঠে কহিলাম, ‘এর নাম কি বন্ধু ?’

বন্ধু বুঝিতে পারে নাই, কহিল, ‘কিসের কত্তা ?’

ধীরে-ধীরে আবার বলিলাম, ‘এই নদীর।’

বন্ধু কহিল, ‘ভৈরবী।’

ভৈরবী !

ভৈরবীই বটে। তবু মনে হইল এই নামেও এর ঠিক পরিচয় দেওয়া যায় না—মানুষের ভীষণা কল্পনাকেও এ যেন পরাস্ত করিয়াছে।

রাত্রি বোধকরি তৃতীয় প্রহর হইবে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ষ্টীমার-ঘাটে কতক্ষণে পৌঁছুবে ?'

নির্ব্বিকারকণ্ঠে বন্ধু বলিল, 'ঠিক-মত গেলে বেলা দশটা-এগারোটা।'

এবার কেন জানি না এক অস্ফুট আতঙ্কে মনে-মনে শিহরিয়া উঠিলাম।—'ঠিক মতো গেলে ? সে কি ?'

এবারে একটু রাগ দেখাইয়া বলিলাম, 'দেখছি, ষ্টীমারে এলেই হ'ত—নিশ্বেস নেবার ফুরসুৎ পেতাম না, এই যা।'

বন্ধু উত্তেজিত হইল না। মুখে সামান্য একটু হাসি টানিয়া বলিল, 'আপনি কোনদিন ত ইদিকে আসেন নি, তাই বলচেন। নইলে ষ্টীমারকেও মরজিতে ধরে।'

একদিকে সুটকেশ, ট্রাঙ্ক এবং বিছানা দিয়া নৌকার সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু এই ভৈরবী নদীর এই প্রশান্ত প্রকৃতির মধ্যেও তাহা অসম্ভব হইয়া উঠিল। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারই খেয়ালের উপর আত্ম-সমর্পণ করিয়া বেলা দশটা এগারোটার প্রতীক্ষায় যেন নিশ্বাস রোধ করিয়া বসিয়া আছি।

তবু খানিকক্ষণ গল্প করিয়া এই অস্বস্তিকর ভাবটা কাটাইবার জন্য কহিলাম, 'ষ্টীমারও কি বন্ধ হয় নাকি মাঝে মাঝে ?'

বন্ধু কহিল, 'হ্যাঁ কত্তা, এই সেবার একটা ইষ্টিমার বাঁচাতে আমরা পাঁচজন গেলাম—ইষ্টিমারের লোক বাঁচল চারজন, কিন্তু আমাদের দু'জন আর ফিরল না।'

ঝিরঝির করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। গায়ের চাদর ভালো করিয়া জড়াইয়া একটা চুরুট ধরাইলাম। তারপর একটা সামান্য আগ্রহের মত ভাব দেখাইয়া বলিলাম, 'কেন ইদিকটায় এমন কি ব্যাপার ঘটে, যার জন্যে এত কাণ্ড? মানুষ ত সমুদ্রেও যাতায়াত করে, আর হাজার-হোক এ ত নদী!'

বন্ধু কথা কহিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া অন্যমনস্কের মত কি যেন ভাবিতে-ভাবিতে দাঁড় টানিয়া চলিয়াছে!

কেন জানি না, এক আগন্তুক রহস্যের কালো আবছায়া ধীরে ধীরে আমার চেতনাকে আশ্রয় করিতেছে।

বন্ধু যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল,—'আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা কালীগড়ের চর পাব। সেইটে ভালোয় ভালোয় পেরুতে না পারলে আমায় কিছু জিজ্ঞেসা করবেন না কত্তা,—পরে বলব। মাইল-পাঁচেক দক্ষিণে কালীগড় ছিল এক ডাকসাইটে জমিদারের মহল। জমিদার ঠিক নয়, চাষীদের সর্দ্দার-মহাজন আর কি! আসলে ছিল তারা ডাকাত। সেই গড় যখন নদীতে ভাঙে তখন আমরা খুব ছোট।'......

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড দম্‌কা বাতাসে নৌকাটি একবার দুলিয়া উঠিল। আগে লক্ষ্য করি নাই, এখন বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখি, কৃষ্ণপক্ষের ঘন অন্ধকার আকাশের অগণিত নক্ষত্রমালার উপর কালি-ঢাকা মেঘের আস্তরণ নামিয়া আসিয়াছে। মেঘাবৃত নীরন্ধ্র সেই আকাশে জমাট-বাঁধা অন্ধকার ছাড়া কোথাও কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় শুধু প্রখর তরঙ্গের কুলুকুলু শব্দ।

বঙ্কু একেবারে চুপ হইয়া গেছে। তাহার দাঁড়ের ঝুপঝুপ শব্দ সেই দিক্‌চিহ্নহীন অপার তমিস্রার বুক চিরিয়া যেন একটি করুণ আর্ত্তনাদের মত দিগদিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কালীগড় আর কতদূর বঙ্কু?'

বঙ্কু কহিল, 'কালীগড়কে দূরে রাখবার জন্যেই ত অনেক ঘুরে যেতে হচ্চে কর্ত্তা, নইলে ইষ্টিশানে পৌঁছুতে ত ঘণ্টা দুই-ও লাগে না। অন্ততঃ পাঁচ মাইল পাশ কাটিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু এই নদীটার আবার এমনিই মজা যে, টানটা থাকবে ঠিক বরাবর ওই গড়েরই দিকে। তার ওপর আবার ঝড়টা বেশ জেঁকেই আসবে মনে হচ্চে, তাড়াতাড়ি আন্দাজি একটা পারে নিয়ে ডিঙিটাকে বাঁধবার চেষ্টা করি।'

অনেকদূরে একটা ষ্টীমারের সার্চ-লাইট জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দিগন্তলীন বিস্তীর্ণ অন্ধকারের মধ্যে অপ্রত্যাশিত সেই চকিত আলোয় দেখা গেল, উন্মাদিনী ভৈরবীর উদ্ধত ফণা ফুঁসিয়া

উঠিতেছে। বন্ধুর সঘন দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে মিলাইয়া যাইতেছে—গর্জ্জমান বাতাসের প্রচণ্ড তাণ্ডব-লীলা।

আমার চেতনা যেন ধীরে-ধীরে প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে—চোখের উপরে একটা কালো, অন্ধকার পর্দ্দা বুঝি এখনই নামিয়া আসিবে। হয়ত দুর্য্যোগময়ী রাত্রির আকাশের নীচে এই দুঃসাহসিক অভিযান জলবুদ্বুদের মতই কোথায় মিলাইয়া যাইবে।

মগ্নচৈতন্যের অস্পষ্ট আলোয় ছায়ামূর্ত্তির মত কাহারা যেন ভিড় করিয়া আসে। যেন কোন্ বিস্মৃতির পরপার হইতে বন্ধু ধীরে-ধীরে বলিতে সুরু করে।—

পঞ্চাশ বছর আগের কথা। আমার ঠাকুর্দ্দার মুখেই আমরা এ-গল্প শুনেছি, ছেলেবেলায়। তাঁর বয়স তখন তেইশ-চব্বিশ হবে—তেজস্বী জোয়ান—হাতের কব্জি দুটোয় অসুরের মত শক্তি। তাঁরই বন্ধু ছিল বিপিন সর্দ্দার। ভৈরবী নদীর জল ছিল তাদের খেলার সঙ্গী। যতকিছু অসাধ্য-সাধন করবার একটা দুর্জ্জয় সাহস তাদের শিরায় শিরায় নেচে উঠত। নেশার মত তাদের দিনরাত আকর্ষণ করত এর উজ্জ্বল জলস্রোত। কত দূর দূর দেশের অজানা রহস্য তাদের হাতছানি দিত। কত অনাবিষ্কৃত নির্জ্জন দ্বীপ,—বিচিত্র ফুলের গন্ধে-ভরা উদাস দুপুর,—লতায়-

পাতায় ঢাকা স্নিগ্ধ-সবুজ গাছগুলির দূরাগত মর্ম্মরধ্বনি,—জলের ঢেউয়ের উপর মাছরাঙা, গাঙচিলের ডানার শব্দ।—নীল আকাশে উড়ে-যাওয়া শঙ্খচিলের সার দেখতে দেখতে তারা ভাটিয়াল স্বরে কোন্ নিরুদ্দেশে পাড়ি দিয়ে চলত! সেখানে হয়ত কোনো শাদা বালির চড়ায় কুমীর, শুশুক রোদ পোহায়। হয়ত-বা জ্যোৎস্না রাতে দূর থেকে চরগুলো নির্জ্জন মায়াপুরীর মত দেখায়—অস্পষ্ট পাহাড়ের চূড়ায় সোনালি মেঘের লুকোচুরি! তাদের রক্তের মধ্যে বেজে উঠত, একটা সতেজ প্রকৃতির নগ্নসুন্দর বন্য বর্ব্বরতা।

কালীগড়ের জমিদার শঙ্করদাস,—কয়েকঘর জেলে আর চাষা ছিলে তার প্রজা; আর আমার ঠাকুর্দ্দা, বিপিন এরা ছিল তাঁর ডাকাতির সহায়। কত শিশু, নারী আর যুবককে নির্ম্মমভাবে হত্যা ক'রে, তাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে যে তার ধনভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তার লেখাজোখা নেই। শঙ্করদাসের অবলম্বনের মধ্যে ছিল, তার একমাত্র মেয়ে শ্যামা। নারী-হৃদয়ের কোমলতা তার ছিল কি না জানি না, তবে ভৈরবী নদীর এই ভীষণ প্রকৃতি তার মনে যেন মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। বাপের এই নিষ্ঠুর নরহত্যা, লুণ্ঠন,—এসব কথা সে জানে, কিন্তু কোনোদিন সে তাই নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেনি।

সমস্ত সকালবেলাটা ভৈরবীতে সাঁতার কাটবার পর —রোদ যখন প্রখর হয়ে উঠত, পিঠে একপিঠ কালো

চুল এলিয়ে দিয়ে একখানি লাল গরদের শাড়ি প'রে সে বাড়ীর দিকে ফিরত, মনে হত যেন প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নি থেকে এইমাত্র কৃষ্ণা উঠে এল। টানা-টানা হরিণের মত চঞ্চল গভীর-কালো দুটি চোখ—সে চোখে মেদুর মমতার ছায়া, না দৃপ্ত কঠোরতা কিছুরি আভাস নেই। প্রতিমার মত সুন্দর মুখে নিটোল প্রশস্ত কপালই আগে চোখে পড়ে। ভোরবেলাকার শিশির-শিক্ত শ্যামল প্রান্তরের মত গায়ের রঙ—পরিপূর্ণ সুগোল দুটি বাহু, ছোট দুটি কোমল পা।

শঙ্করদাস সেদিন বিপিনকে ডেকে পাঠালে। মনিব হলেও সে বিপিনকে বন্ধুর মতো মনে করত; পরামর্শ যা-কিছু সব তার সঙ্গেই। শঙ্কর নাকি খবর পেয়েছে এক সদাগরি নৌকোর আজ যাবার কথা আছে। কাজেই তাড়াতাড়ি সব প্রস্তুত হতে হবে।

মাস তিনেকের মধ্যে একটা ভালো শিকার জোটে নি। বিপিন অতিরিক্ত আনন্দে যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। সঙ্গীদের আড্ডায় খবর দেবার জন্যে সে একরকম ছুটেই উঠোনের বেড়া টপ্‌কে বাড়ির বাইরে লাফিয়ে পড়ল। হঠাৎ তার পিঠে টুক্ করে একটি নুড়ি পড়তেই সে চম্‌কে ফিরে তাকালে। দেখে, শ্যামা পেছনে দাঁড়িয়ে খিল্‌খিল্ করে হাসছে।

বিপিন এক মুহূর্ত্ত এই অপরূপ ছবির দিকে চেয়ে রইল। তারপর হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'পাগলীর খবর কি?'

শ্যামা এবার ক্রুদ্ধভঙ্গিতে বলে উঠল, 'ছাখো বিপিন-দা, যখন-তখন পাগলী-পাগলী কোরো না বলছি, ভালো হবে না। কেন পাগলী কি আমার নাম নাকি?'

বিপিন ব্যস্ত হয়ে উঠল,—'না না না না, ঠাট্টা করবারও জো নেই দেখছি। ভালো! কি? ঝপ্ করে বলে ফেলো।'

সজোরে মাথা নেড়ে শ্যামা বললে, 'না বলব না।'

'বেশ বোলো না, চললুম,' বলে বিপিন পা বাড়ালো।

শ্যামা বললো, 'বেশ ত যাও না, তোমার সব কটা দাঁড় আমি পুড়িয়ে না ফেলি ত কী!'

ভৈরবী নদীর তীরে তখন পূবালি হাওয়ার মাতামাতি সুরু হয়েছে।

বিকেলবেলা শিকারের সন্ধানে অভিযান সুরু হল। পশ্চিমদিকে একটা পাহাড়ি ঝরণার ঢল নেমেছে। নদীর আবার সেই স্ফীত-মুখর গতিবেগ—কূলপ্লাবিনী বন্যার গেরুয়া জলে আকাশের রঙ হয়ে উঠেছে পাণ্ডুর। পূবে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের সঙ্গে ঢেউগুলো উঠছে আকাশের দিকে। পনেরোখানা ডিঙি-নৌকো তখন বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অবলীলাক্রমে ছুটে চলল।

বিপিন চোখে দূরবীণ লাগিয়ে চারদিকে তার অব্যর্থ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে, এমন সময় শঙ্করদাসের বিস্মিত কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকালে।

—'ভ্যাখো, ভ্যাখো মানুষের মতন কি যেন একটা ঠেকল বলে মনে হচ্ছে।'

আসন্ন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোয় বিপিন চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। হঠাৎ লক্ষ্য স্থির করে কাউকে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই খরস্রোতা নদীর অতল জলে।

চারিদিকে একটা হৈ-হৈ উঠল। রুদ্ধনিশ্বাসে শঙ্করদাস যেন কিসের প্রতীক্ষা করতে লাগল। পনেরো মিনিট প্রতীক্ষার পর বিপিনের একখানি শিথিল হাত দেখা গেল। চারদিক দিয়ে সব কটা ডিঙিই গিয়ে তাকে ঘিরে ফেললে এবং দারুণ পরিশ্রমের পর তারা দুটি মানুষের দেহ ডিঙিতে টেনে তুললে। বিপিন তখন জোরে জোরে শ্বাস টানছে, সম্পূর্ণ জ্ঞান তখনও তার বিলুপ্ত হয় নি, সে ধীরে-ধীরে অন্য দেহটির দিকে ইসারা করলে।

দেখা গেল, মৃত্যু তখনো পর্য্যন্ত তাকে গ্রাস করতে পারে নি বটে কিন্তু যত্নের ত্রুটি হলে বাঁচানো অসম্ভব। ঘণ্টাখানেক ধরে মরণের সঙ্গে সংগ্রাম করে ধীরে ধীরে সে যখন চোখ মেললে, শঙ্করদাস মুগ্ধ-বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার তারে চেয়ে দেখলে। গৌরকান্তি অপূর্ব্ব-সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক, বিরাগী রাজপুত্রের মতই সুদূরের পিপাসায় চোখ দুটি তার আমীলিত। নৃশংস নরঘাতী শঙ্করদাসের নিদ্রিত হৃদয়াবেগ যেন কোন্ মোহময় সোনার কাঠির স্পর্শে অকস্মাৎ উজ্জীবিত হয়ে

উঠল। মুখে কোনো কথা না বলে সে রুদ্ধ আবেগে বিপিনের হাত হুটি চেপে ধরল। শঙ্করদাসের মনে হল শিকার খুঁজতে আসা এতদিনে তার সার্থক হয়েছে।

বছর ঘুরে এসেছে।

শ্যামার সঙ্গে রতনের বিয়ে হয়েছে বটে, কিন্তু রতনের ওপরই যেন আক্রোশ শ্যামার বেশি। রতন তার এই অসম্ভব খেয়ালের জন্যে কোনোদিন শাসন করেনি বলেই তার যেন রাগ।

সেদিন সে শান্তভাবে এসে রতনকে বললে, 'শুনছ ?'

রতন অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললে, 'শুনছি।'

শ্যামা বললে, 'কি শুনছ ?'

রতন হাসতে হাসতে বললে, 'যা বলছ।'

—'না ঠাট্টা নয়, শোনো। এই যে আমি এত দস্যিপনা, এত অত্যাচার করি, কই তুমি ত কিছু বারণ কর না !'

রতন যেন এ-পৃথিবীর ছেলে নয়। যেন অন্যমানুষ—মনের এই আশ্চর্য্য সরলতা সে যেন নবজন্মের মধ্য দিয়ে লাভ করেছে। বিশাল প্রশান্ত চোখ হুটি তুলে সে বললে, 'এবার থেকে করব।'

তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'হ্যাঁ আমি যা বলব, তাই করবে ত ?'

অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো শ্যামা ঘাড় নেড়ে বললে, 'হুঁ।'

—'দ্যাখো আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, কোথায় কোন্ দেশে যেন আমার আপনার লোক আছে। আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে হয়—এক একদিন রাত্তিরে আমি স্বপ্ন দেখি। তুমি যাবে ত আমার সঙ্গে?'

শ্যামা চম্‌কে উঠে রতনের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে উঠল, 'না না আমি যেতে পারব না, পারব না; তুমি অন্য কথা বল। এই বাড়ি, এই নদী, এ ছেড়ে কোথাও আমি যাব না।'

রতন ব্যথিতদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললে, 'বেশ!'

পরদিন থেকেই রতন আরো অন্যমনস্ক। শ্যামা কোনো কথা কয় না, রাগে-অভিমানে গুম হয়ে বসে থাকে। কিসের একটা বাধা তাদের আড়াল করে রাখে।

বিপিন কিন্তু রতনকে চোখে চোখে রাখে।

সেদিন চুপি-চুপি সকলের অলক্ষ্যে রতন একলা বেরিয়ে পড়ল। কিসের একটা দুরূহ ভাবনা তাকে কাঁটার মতন বিঁধতে থাকে। তাড়াতাড়ি ঘাটে এসেই সে একটি ডিঙি খুলে দিলে। বহুদূর যখন চলে এসেছে তখন একটি ব্যগ্র ব্যাকুল চীৎকার শুনে ফিরে দেখলে, বিপিন তাকে ফেরবার

জন্যে দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। হাত নেড়ে রতন বোধ করি তাকে বিদায়-অভিবাদন জানালো।

রতনের অনভ্যস্ত হাতে ডিঙি আর ঠিক থাকছে না। বিপিন বিদ্যুদ্বেগে তার অনুসরণ করলে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! এবার দৈব তার বলি গ্রহণ করবার জন্য শতহস্ত প্রসারিত করে দিয়েছে। হঠাৎ একটা ঘূর্ণীঝড়ে কোথায় যে ডিঙিটা তলিয়ে গেল, বিপিন তা বুঝতেই পারলে না। তবু সে আবার ঝাঁপ দিলে। কিন্তু বহুচেষ্টার পর যখন সে রতনের দেহকে আবিষ্কার করলে, তখন সেখানে প্রাণের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নেই। দ্বিতীয়বার আর সেই নিরুদ্দেশের যাত্রী পথিককে সে ঘরে নিয়ে যেতে পারলে না। বালির চড়ায় সেই বিবাগী রাজপুত্রকে সমাহিত করে শূন্যহাতে ফিরে এল।

শ্যামার মনের সেই চঞ্চল খেয়ালী বালিকাটি স্তব্ধ হয়ে গেছে। একটি করুণ গম্ভীর ছায়া—তার সজলপক্ষ্ম দুটি কালো চোখে, অপরিসীম বেদনায় পরিম্লান তার মুখে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। শ্যামার মুখের দিকে বিপিন তাকাতে পারে না, কি করে সে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ তাকে শোনাবে! শ্যামার বিধবা বেশ সে কল্পনা করে শিউরে ওঠে।

সেদিন শ্যামা ধীরে ধীরে বিপিনের কাছে এসে দাঁড়ালো। আয়ত গভীর দুটি চোখ তুলে বিপিনকে বললে, 'তুমি কেন আর ঢাকছ বিপিন-দা, আমাকে বলে নিস্কৃতি দাও।'

বিপিন রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'চেষ্টার ত ত্রুটি করছিনে শ্যামা, হঠাৎ একটা খবর দিই-বা কি করে?'

এই মিথ্যাকথা বলতে গিয়ে বিপিনের গলার আওয়াজ কেঁপে উঠল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে উদ্গত অশ্রু গোপন করবার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'দেখি, আজ একবার প্রাণপণ চেষ্টা করব।'

একমাত্র মেয়ের এই দারুণ দুর্ভাগ্যে শঙ্করদাসের দেহ যত ভেঙ্গে পড়ছিল তার মনের নিদ্রিত দানবও ঠিক ততখানিই মরিয়া হয়ে উঠছিল। সে ভাবে, বিধাতার দরবারে যত পাপ সে সঞ্চয় করেছে, তার দেনা-পাওনা মিটিয়ে দেবার সময় এল বুঝি। তাই সে আবার সেই নরহত্যার প্রবল বন্যার স্রোতে নিজেকে একেবারে ভাসিয়ে দিতে চায়। এর মধ্যে আগেকার সেই দুর্দ্দান্ত উল্লাস, অসহনীয় উত্তেজনা নেই, আছে শুধু নিরানন্দ বিক্ষত জীবনের করুণ বিদ্রোহ।

আমার ঠাকুর্দ্দাই এসে খবর দিলে, একটা মহাজনী বোট রহিমগঞ্জের চড়ায় নোঙর করেছে।

শঙ্করদাসের নিষ্প্রভ মুখে একটি ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। অর্থহীন, অস্বাভাবিক ভাবে হেসে উঠে সে বললে, 'ব্যস, আর কোনো কথা নয়। খতম করে দাও।'

* * *

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশান কোণে ভ্রূকুটি-ভঙ্গি দেখা দিলে। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার যেন সমস্ত প্রকৃতিকে গ্রাস করে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল প্রচুর বৃষ্টি,—তীক্ষ্ণ তীরের মতো শাণিত সেই করকার আঘাতে ভৈরবীর সর্ব্বাঙ্গ যেন ফুলে ফুলে উঠছে। চোখের দৃষ্টি আর চলে না, কাছের মানুষকেও আর ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না। একসঙ্গে হাজার হাজার বজ্রগর্জ্জন যেন ধ্বংসের উদ্দাম অট্টহাসির মতো ভৈরবীর তরঙ্গের বুকে ছড়িয়ে পড়ছে।

শ্যামা কিন্তু তখনো স্থানুর মতো ভৈরবীর দিকে তার দৃষ্টি প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে। চকিত বিদ্যুতের আলোয় সে একবার দেখলে, ছোট ছোট পাখীর মত ডিঙিগুলো হঠাৎ কোথায় যে ছিটুকে পড়ল, তার আর কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই!

মনে হয় যেন সৃষ্টির আগে কোন্ অজানা অচেনা প্রেতপুরীর রহস্যময় ঘনানিবিড় অন্ধকারে, নবসৃষ্টির প্রত্যূষ-কালের জন্য তপস্যার কঠোর সংগ্রাম সুরু হয়েছে!

শ্যামা দু'হাতে মুখ ঢেকে, আর্ত্তকণ্ঠে প্রাণের সমস্ত শক্তিকে আশ্রয় ক'রে একটা সচেতন ধ্বংসের প্রবল তাণ্ডবের মধ্যে বিলীন হবার জন্য প্রবল প্রার্থনা জানাতে লাগল। অবিরল অশ্রুধারে তার প্রাণের একান্ত কামনা যেন মূর্ত্তি

পরিগ্রহ ক'রে এসে দাঁড়ালো। স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে মৃত্যুপিপাসা—ভৈরবী নদীর নিত্যসঙ্গিনী শ্যামার সর্ব্বাঙ্গ তখন বাতাসে আহত বেতসলতার মতো কাঁপছে।

এই একাগ্র প্রবল প্লাবনের দুর্দ্ধর্ষ বাসনা কি ভৈরবী শুনতে পেলে?

তীব্র তীক্ষ্ণ একটি আর্ত্তনাদ করে শ্যামার পায়ের নীচের মাটি কেঁপে উঠল, তারপরই ধীরে-ধীরে ভৈরবীর অতল উন্মত্ত জলরাশি কালীগড় গ্রাস করলে!

বছরখানেকের মধ্যেই কালীগড়ের মাইল-পাঁচেক দক্ষিণে আবার সবুজ শরবনে ঢাকা একটি চর জেগে উঠল!

প্রচ্ছন্ন একটি ক্ষীণ প্রত্যাশা শ্যামার মনে বোধ করি বাসা বেঁধেছিল, তার মনে হত রতন যদি এসে ফিরে যায়! রতন চলে যাবার পর এই ভাবনাই যে তাকে পেয়ে বসেছিল।

তারপর সেই চরে আবার অজানা ফুলের হাল্‌কা গন্ধে ঝির্‌ঝির্‌ ক'রে পূবে বাতাস বইতে থাকে, সবুজ মাঠের ওপর থেকে দেখা যায়, অনেক দূরে—ভৈরবীর ঠিক ওপরেই সোনালি মেঘে সূর্য্য অস্ত যায়, কখনো-কখনো মাঝরাতে ভৈরবীর ভাঙনের শব্দ ভেসে আসে।

লোকে ঐ চরের নাম দিয়েছে—কালীগড়ের চর। অনেক মাঝিই দেখেছে, অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাতে ওখানে লাল-কাপড়-পরা, সিঁথিতে-সিঁদুর, একটি সধবা মেয়ে একপিঠ রুখু এলোচুলে পাগলের মত ছুটোছুটি করে। কখনো-বা চোখের ওপর দুটি হাত তুলে একদৃষ্টে ভৈরবীর দিকে তাকিয়ে থাকে। আবার কখনো উন্মাদিনীর মত দুহাতে চড়ার বালি সরায়। আশ্চর্য্য, নৌকাগুলো যেন কিসের টানে ওইদিকেই এগিয়ে যায়।

লোকে বলে, ঐ শ্যামা। মৃত্যুর পরপারে গিয়েও সে রতনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে!

হঠাৎ বন্ধুর ডাকে ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। —'বেশ ঘুম ত কত্তা আপনার! যাক্, চরটাকে খুব বাঁচিয়ে গেছি। কিন্তু ভাগ্যিস্ ঝড়টা থেমে গেল! আর সেই থাম্‌তে না থামতেই আপনার ঘুম এল আর ভাঙল এই এতক্ষণে! নিন্—উঠুন। ইষ্টিশান এসে গেছে। গল্পটা আর আপনার শোনা হ'ল না।'

ভালো করিয়া চোখে-মুখে জল দিয়া বন্ধুর দিকে স্পষ্ট দৃষ্টিতে চাহিলাম। দূরপ্রসারী ভৈরবীর তরঙ্গায়িত গৈরিক

স্থলধারার উপরে সদ্যোজাত সূর্য্যের কনকরশ্মি তখন চঞ্চল হরিণশিশুর মত নাচিতেছে।

অস্ফুটকণ্ঠে বলিলাম, ‘থাক্, আর তার দরকার নেই।’

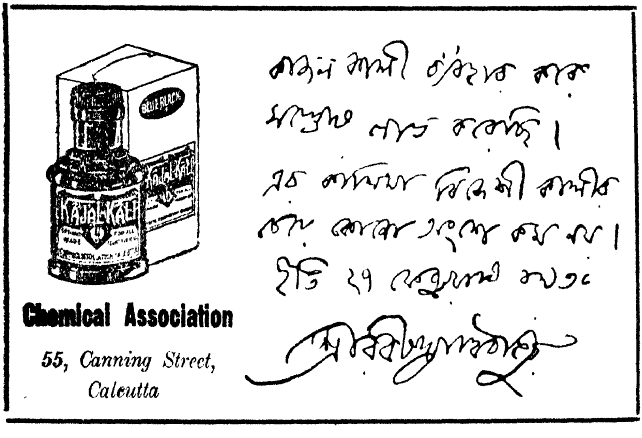

কাজল কালী ব্যবহার করে সন্তোষ লাভ করেছি। এই কালিমা বিদেশী কালির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। ইতি ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Chemical Association

55, Canning Street,
Calcutta

মহাত্মার অনশন সম্পর্কে

রবীন্দ্রনাথের দুইখানি পত্র

প্রিয় মহাত্মাজী,

কয়েকদিন পূর্ব্বে আপনার নিকট যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম, কোনও কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলেও তাহা আপনার হস্তগত হয় নাই বলিয়া বোঝা যাইতেছে।

আপনি যে কঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বিষয়ে আমি যদি আপনার অনুরূপ মত অবলম্বন করিতে না পারি, তাহা হইলে আশা করি আমাকে দোষী করিবেন না। যে সকল কারণ বশতঃ আপনি আপনার কঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন তাহা না জানিলে আপনার সিদ্ধান্তের মর্ম্ম উপলব্ধি করা অসম্ভব এবং আমি সেই কারণ অবগত নহি। সৃষ্টির আদিকাল হইতেই জগতে কুৎসিত পাপাচার রহিয়াছে ;—উহা সমাজ-সংস্থিতির বিরোধী। শাশ্বত ও সনাতন আদর্শ সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণই উদ্ঘাটিত করেন ; তাঁহাদের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অপবিত্রতা ও চিত্তদৌর্ব্বল্য দেখিয়া বিরক্তি ও নিরাশায় কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। জগতের সীমাহীন দুঃখদুর্গতিতে যখন ভগবান বুদ্ধ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি জগতে মুক্তির বার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্ত আপনাকে দেখাইতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র।

মরণশীল জীবের পক্ষে মৃত্যুই যখন ধ্রুব, তখন মৃত্যুর আগমনে বীরত্বের সহিত তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে মানবজীবনের উদ্দেশ্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত মৃত্যুবরণ ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না, একমাত্র সেই ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র মৃত্যুবরণ করিবার অধিকার আমাদের নাই। অনশন-ব্রতের সঙ্কল্প যে অপরিহার্য্য বলিয়া আপনার বিশ্বাস তাহা আপনার একটি ভ্রমও হইতে পারে। আপনার ভীষণ প্রতিজ্ঞার পরিণাম যদি সাংঘাতিক ভাবে সঙ্কট-সঙ্কুল হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে আপনার গুরুতর ভ্রম সংশোধনের কোনই উপায় থাকিবে না ভাবিয়া আমরা মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিবার সুপ্রচুর সুযোগ সত্ত্বেও ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান জীবন বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য, এবং ভগবানকে এইরূপ পরম শোকাবহ চরমপত্র না দিবার জন্য, আমি আপনাকে অনুরোধ না করিয়া পারি না।

যাহা হোক, আপনি যে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন আমি তাহা লাভ করি নাই এবং যে প্রত্যাদেশ কেবল আপনার নিকট আসিয়াছে, আমার নিকট তাহা আসে নাই; সুতরাং আপনার সিদ্ধান্তের পরিণাম যাহাই হোক না কেন, আমি নিশ্চিত বুঝিব আপনার সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত এবং ভয় ও অজ্ঞতা প্রযুক্তই আমার এই দ্বিধা।

আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানিবেন।

২

জগদ্বাসীকে আজ আপনি যে বাণী দান করিয়াছেন, আমি তাহার মর্ম্ম সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছি। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য দ্বারা জগদ্বাসীকে সর্ব্ব ভূতে অগাধ করুণা-বিতরণের শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। যীশু খৃষ্ট বলিতেন, 'শত্রুকেও ভালবাসিও।' তাঁহার এই শিক্ষা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাঁহার হত্যাকারীদিগকে তৎকর্তৃক ক্ষমায়। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, স্বদেশবাসীদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কল্পেই আপনি অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। আমি যদি বলি, যে হতভাগ্যেরা কৃতকর্ম্মের গুরুত্ব বুঝিতে পারে না, তাহাদের শুভবুদ্ধি উদ্বোধনের নিমিত্ত প্রাত্যহিক প্রচেষ্টা করিলেই যথার্থভাবে ও বীরত্বের সহিত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। দুষ্কৃতকারীদের প্রতি আপনার অনশন কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না—অথচ এই অনশনের ফলে তাহারা আপনার নির্দ্দেশ লাভে বঞ্চিত হইতে পারে; সুতরাং এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত সর্ব্বজন-গ্রাহ্য হইতে পারে না, বিশেষতঃ যাঁহারা লোক-শিক্ষক তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ প্রাণঘাতী প্রায়শ্চিত্ত কিছুতেই সমীচীন নহে।

আপনার দৃষ্টান্তের পরিণতি এই দাঁড়াইবে যে, ধরাবক্ষ হইতে সমস্ত মহাপুরুষ বিলুপ্ত হইবেন, এবং নৈতিক হিসাবে

দুর্ব্বল ব্যক্তিরা অজ্ঞতা ও অন্যায়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইবার জন্য বাঁচিয়া থাকিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত কেবল আপনার পক্ষেই সমীচীন এবং অন্যান্য সকলের পক্ষে ইহা নিরর্থক,—এই কথা বলিবার অধিকার আপনার নাই। যদি তাহাই আপনার বক্তব্য হয়, তবে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিগূঢ়পন্থী যোগীর ন্যায় আপনার এই প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য ছিল; তাহা হইলে আপনি ব্যতীত আর কেহ এইরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞার সংবাদ জানিতে পারিত না। যে পাপে আমাদের জাতীয় জীবনের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, সর্ব্বসাধারণকেই আপনি সক্রিয়ভাবে তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু আপনি যে ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা নিষ্ক্রিয়। যাহারা আপনার ন্যায় জ্ঞান-বৈভবের অধিকারী নহে, তাহারা নিস্ফল আত্মনির্য্যাতনের অন্ধকারময় গহ্বরেই নির্ব্বিচারে লম্ফ প্রদান করিতে চাহিবে। তাহারা যদি দেশের পাপমোচনে আপনার পন্থা অবলম্বন করে, তবে আপনি তাহাদিগকে দোষ দিতে পারেন না; কারণ সমস্ত বাণীই সর্ব্বসাধারণের প্রতি অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে প্রযোজ্য হওয়া কর্ত্তব্য; নতুবা ঐ বাণী প্রচার করাই উচিত ছিল না।

আপনার সঙ্কল্পে আমি যে মানসিক ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, তাহার ফলেই আমি আপনাকে এইরূপ ভাষায় পত্র লিখিতেছি। কারণ, আমি যাহার কোনই সার্থক যৌক্তিকতা দেখিতেছি না, একটা মহনীয় জীবন সেই পরিসমাপ্তির দিকে

অগ্রসর হইতেছে, এই দৃশ্য আমার পক্ষে অসহ্য। আপনার জীবনে আমাদের জাতির যে গৌরব প্রতিফলিত সেই গৌরবের খাতিরে, যে কোটী কোটী লোক আপনার মুখ চাহিয়া আছে তাহাদের নামে, আপনার সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্তি হইবার জন্য আমি পুনরায় আপনাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

ইহা গভীর বেদনা এবং আন্তরিক ভালবাসার নিবেদন।

(আনন্দবাজার)—এ-পি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

BEST
VIRGINIA
Bombay Special
CIGARETTES

BEST
VIRGINIA
Bombay Special

বোম্বে স্পেসালেরই
আজকাল চলন
ভারতীয় ভার্জ্জিনিয়া
সিগারেট
স্বদেশী এবং সুলভ
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়
সোল এজেণ্ট
দাস এণ্ড কোং
২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট

চিত্র ও চরিত্র

কৃষ্ণদাস পাল

বাংলায় রাজনৈতিক খ্যাতি লাভ করিয়া যে কয়জন শক্তিমান পুরুষ স্মরণীয় হইয়াছেন, কৃষ্ণদাস পাল তাঁহাদের অন্যতম। রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পূর্ব্বগামীগণের প্রস্তুত ক্ষেত্রে তিনি যে বীজ বপন করেন তাহা ফলশস্যপ্রসূ হইয়াছিল। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে হরিশ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অগ্রজ এবং শম্ভু মুখোপাধ্যায় তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। ধীর বুদ্ধি, শান্ত মনোভাব এবং কার্য্যসিদ্ধিতৎপর চেষ্টা কৃষ্ণদাসকে বিজ্ঞ রাজনীতিক এবং বিচক্ষণ সাংবাদিক করিয়া তুলিয়াছিল।

যে পুণ্য বৎসরে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, সেই ১৮৩৮ সালে কৃষ্ণদাসের জন্ম।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহিত সংস্রব তাঁহার প্রথম প্রতিষ্ঠার মূল। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই তিনি এই জমিদার-সভার সহকারী সম্পাদক হন। শেষ জীবনে তিনি ইহার সম্পাদক হইয়াছিলেন।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তৎপ্রতিষ্ঠিত ‘হিন্দু পেট্রিয়টে’র স্বত্ব কালীপ্রসন্ন সিংহ ক্রয় করিলে বিদ্যাসাগরের উপর এই সুবিখ্যাত পত্রের পরিচালন-ভার অর্পিত হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের তীক্ষ্ণবুদ্ধি তরুণ সহ-সম্পাদকের উপর বিদ্যাসাগরের নজর পড়ে। তিনি কৃষ্ণদাস পালকেই ‘পেট্রিয়টে’র সম্পাদক রূপে মনোনীত করেন।

তারপর, কৃষ্ণদাসের আমলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মুখপত্ররূপে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' একদিকে সরকার, অন্যদিকে জনসাধারণের শ্রদ্ধার সামগ্রী হইয়াছিল।

কৃষ্ণদাস স্পষ্ট কথা মিষ্ট করিয়া বলিতে জানিতেন বলিয়া, একদিকে তাঁহার মৌখিক বক্তৃতা, অন্যদিকে তাঁহার লেখা কার্য্যকারিতার দিক দিয়া এত সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার নাগরিক সভা হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট-লাট এবং বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভা পর্য্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠানেই তাঁহার সুবেবেচিত বাক্য এবং সুপ্রযুক্ত যুক্তি সকলের নিকট সমাদর লাভ করিত। বড়লাটের সভায় ইলবার্ট বিলের সমর্থনে তাঁহার বক্তৃতা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ধনী-নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলেই কৃষ্ণদাস পালের পরামর্শ-লাভে উপকৃত হইত।

১৮৮৪ সালে ছেচল্লিশ বৎসর মাত্র বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন

এই ধীরপ্রকৃতি, তীক্ষ্ণ-ধী, সৌম্যমূর্ত্তি, সুচতুর, মধুরভাষী, ইংরেজিতে সুলেখক, রাজনৈতিক পুরুষ নিজের ভাগ্য নিজে গড়িয়াছিলেন।

বাঙ্গালীর জুতার দোকান!
পছন্দসই জুতো এখানে সস্তা
ইউনাইটেড ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং ——
১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মেছুয়াবাজারের মোড়, কলিকাতা

সাময়িকী ও অসাময়িকী

দীর্ঘ একুশ দিনের পর গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করিলেন। মহাত্মা এই অগ্নিপরীক্ষায় নিরাপদে উত্তীর্ণ হইলেন দেখিয়া দেবকৃপাভিক্ষু আশঙ্কাকাতর দেশের লোক একটি পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। যে জীবনের প্রয়োজন দেশের পক্ষে একান্ত, তাহা ফিরিয়া পাইয়া আমরা গভীর আনন্দে আনন্দিত।

* * *

এই অনশন সম্পর্কে পুনার প্রচারণাপ্রিয় কৌতূহলী সাংবাদিকের দল এবং আড়ম্বরপ্রিয় ধনী বণিকবৃন্দ যে রাজসিক কাণ্ডের অভিনয় করিলেন তাহার তুলনা বোম্বাই প্রদেশেই মেলে। এই ব্রতের বহিরঙ্গের সৌকুমার্য্যটুকু নষ্ট করিতে ইঁহারা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। মহাত্মার আদর্শ হইতে ইহা কত বিভিন্ন, তাহা দরিদ্র বাংলাদেশে বুঝিয়াছে, অবশিষ্ট ভারত বুঝিবে কি-না জানিনা।

* * *

এই নিদারুণ ব্রত সম্বন্ধে মহাত্মা পরে বিবৃত প্রদান করিতেও পারেন। এখনও সাধারণের নিকট ইহার কারণ একরূপ অজ্ঞাত। যাঁহারা অসাধারণ তাঁহাদের কার্য্য ও চিন্তা সাধারণ মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু মনের ‘কেন’ বাধা মানে না।

* * *

রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের চিন্তাধারার অন্যতম নিয়ন্তা। গান্ধী কর্ম্মবীর। জগতের দুই প্রধান পুরুষ ভারতের সন্তান। এই অনশন সম্পর্কে সাধারণের ধারণার কোন মূল্য দিতে না পারি, তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথের মত সম্বন্ধে আমরা যেন নির্ব্বিকার না থাকি। স্থানান্তরে মুদ্রিত তাঁহার পত্র দুইখানি আমাদের বোধ এবং বিচার-শক্তিকে যেন উদ্রিক্ত করিতে পারে।

* * *

সকলেরই একটি স্বধর্ম্ম, আর একটি সামাজিক ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্মপ্রকৃতি নিগূঢ় বলিয়া জগতের পনের আনা লোক স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমাজের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলে। অসাধারণ ব্যক্তি সময়ে সময়ে সমাজধর্ম্ম তুচ্ছ করিয়া স্বধর্ম্মকে অনুসরণ করে। ঋষি, সন্ন্যাসী অথবা বনবাসীর পক্ষে সমাজধর্ম্ম অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু দেশজীবনের সহিত আত্ম-জীবনের সম্পর্ক যেখানে ঘনিষ্ঠ,, সেখানে সমাজের দাবি অগ্রাহ্য করিবার অধিকার অসাধারণ জনেরও আছে কি না, কে বলিবে?

দিন-পঞ্জী

লণ্ডন, ২৪শে মে—'বৃটিশ সাম্রাজ্য দিবস' উপলক্ষে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড লসিমাউথ হইতে এই বাণী প্রচার করিয়াছেন।—গবর্ণমেণ্ট ধীর ভাবে হইলেও দৃঢ়তার সহিত ভারতীয় অবস্থার প্রতিবিধান করিয়াছেন। আমরা যুক্তিতর্ক শুনিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু বিপ্লববাদের বিভীষিকায় ভীত হইতে প্রস্তুত নহি। শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষ উন্নতির পথে অগ্রসর হউক,—এই উপায়েই আমরা সমস্যার সমাধান করিতে চাই।

ভিয়েনা, ২৭শে মে—শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ক্রমেই আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার চিঠি-পত্র লেখা লেখির ফলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের উদ্যোগে ভারতে পি-ই-এন ক্লাবের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

পুনা, ২৯শে মে—সোমবার মধ্যাহ্ন ১২টা ২৫ মিনিটের সময় মহাত্মা গান্ধী অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন।

কলিকাতা, ৩০শে মে—সোমবার প্রাতঃকাল হইতে কলিকাতার ধাঙ্গড়গণ অকস্মাৎ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। বৈকালে ইটালী গোখানার সম্মুখে সমবেত হইয়া তাহারা কর্পোরেশানের লরীগুলি বাহির হইবার পথে বাধা দেয়। পুলিশ তাহাদিগকে স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ করিলে তাহাতে অসম্মত হওয়াতে

পুলিশ তিনটি গুলি চালাইয়াছিল। এতৎ সম্পর্কে প্রায় ১৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। হাঙ্গামায় অনেকে আহত হইয়াছে।

পুনা, ২৯শে মে—পণ্ডিত মালব্যজী মহাত্মার অনশনের পর এক তার প্রেরণ করিয়াছেন।—আপনি যাহাতে আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ সেবা শুধু হরিজন নহে, স্বদেশের এবং মানব জাতির উদ্দেশে অর্পণ করিতে পারেন, এই নিমিত্ত ভগবান আপনাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন।

পুনা, ৩০শে মে—মহাত্মার সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা নাইডু বলিতেছেন,—তাঁহার মুখখানি শিশুর মত ক্ষুদ্র এবং সুন্দর। পরম আনন্দের সহিত তিনি আঙ্গুর খাইতেছেন।

কলিকাতা, ৩১শে মে—নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর, তিমির বরণ ও কুমারী শিঙ্কি মঙ্গলবার প্রাতে হাওড়া ষ্টেশনে উপনীত হন। উদয়শঙ্করের বহু অনুরাগী ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে
আর ইনজেক্‌সান লইতে হইবে না
ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

শুভ বিবাহের এবং প্রিয়জনকে উপহার দিবার উপযোগী
বেনারসী, শাড়ী, জোড়, খদ্দর এবং মিলের ধুতি,
শাড়ী ও আধুনিকতম রুচির পোষাকের
বিচিত্র ও বিপুল আয়োজন

চন্দ্রকুমার বৈকুণ্ঠনাথ গুঁই

(১৮৭১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত)

৩৬ নং খোঙ্গরা পটি, —কলিকাতা— (ফোন, বড়বাজার ৩৪৭)

—শাখা—

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, (ফোন, বড়বাজার ১৯৭৫)
পি ২৩৩, লেক রোড, কালিঘাট (ফোন, সাউথ ১০৫৪)

কার এণ্ড মহলানবিশ

প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত গ্রামোফোন বিক্রেতা

৩ নং চৌরঙ্গী কলিকাতা

বাঙ্গালীর শিল্পনিদর্শন

ঘোষ ব্রাদার্সের

জুতা

সুলভ ও শ্রেষ্ঠ

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

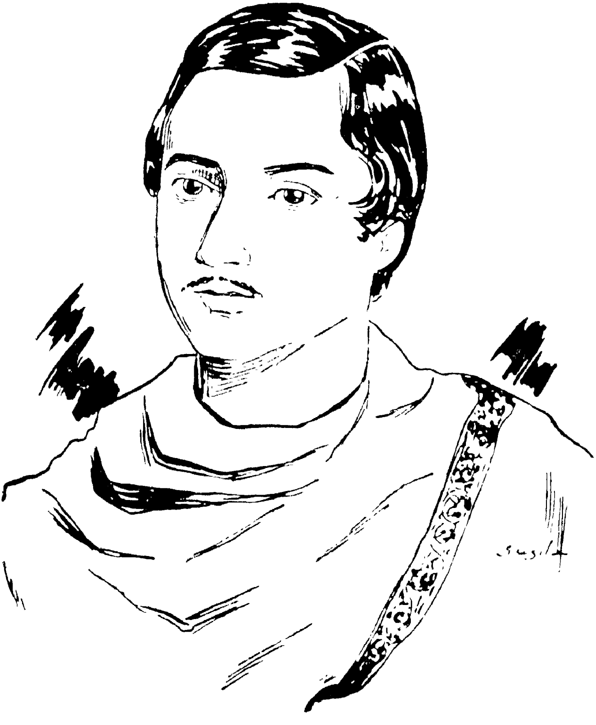

কালীপ্রসন্ন সিংহ

কেশরঞ্জন কাদের বিরক্তিকর?
যারা চুল বেঁধে দেয় তাদের।
"সত্যি বলচি ভাই—তোর চুল বাঁধতে বসলে. আমি যেন এই চুলের কাঁড়ি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠি।"

[redacted]

—কবিরাজ—

নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

১৮।১ ও ১৯, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

জবাকুসুম

স্কলারসিপ

ছাত্র ছাত্রীদের জন্য মাসিক ৫৲ হিসাবে

এক বছর।

আগামী ১৯শে চৈত্র হইতে বিস্তারিত বিবরণ সহ কুপন

প্রত্যেক জবাকুসুম শিশির সঙ্গে থাকবে।

জবাকুসুম

কিনে শিশির কুপনখানা পূরণ করে পাঠাতে হবে।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,

২৯, কলুটোলা, কলিকাতা।

বাঙ্গালীর জুতার দোকান!

পছন্দসই জুতো এখানে সস্তা

ইউনাইটেড ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং —

১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মেছুয়াবাজারের মোড়, কলিকাতা -

ছোট গল্প

১ম বর্ষ]   ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০   [৪৮শ সংখ্যা

বেঙ্গলী ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র গুপ্ত

চামারপুরের বেঙ্গলী ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়নের বাৎসরিক অধিবেশন প্রতিবৎসর শারদীয় পূজার পরেই হইয়া থাকে। এবারেও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু এবারকার অধিবেশনের ফলে, গত দুই বৎসর যাবৎ যে কার্য্যকরী সমিতি অপ্রতিহত প্রভাবে কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল, তাহা নব-সঞ্চিতশক্তি প্রতিপক্ষের প্রবল আক্রমণ এবার আর কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিল না। প্রকাশ্যসভাস্থলে বিপক্ষ দলপতি লোকনাথবাবু যখন অতি তীব্রকণ্ঠে অথচ বিনীতভাবে প্রবীন এবং প্রাচীন সভাপতি মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া এবং কার্য্যকরী সমিতিকে লক্ষ্য করিয়া কথা

পাড়িলেন, "শোনা যাচ্ছে নাকি যে গেল বারের পূজো বাবদ যা খরচ হয়েছিল, এবারে তার দ্বিগুণ খরচ হয়েছে? এ গোলমাল রাখা ঠিক নয়, অতএব আমার মতে পূজোর খরচপত্রের হিসেব-নিকেশ আজই যেন সভায় দাখিল করা হয়।"—তখন চারিদিক হইতেই তাঁহার এই সৎসাহসের জন্য ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। কারণ, চামারপুরের একমাত্র বাঙ্গালী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন সেন মহাশয়, যিনি গত দুই বৎসর ধরিয়া ইউনিয়নের সম্পাদকত্ব করিয়া আসিতেছেন, যিনি চামারপুরের প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের মাথার মণি অথবা পর্ব্বত-চূড়া বিশেষ, তাঁহার কাছ হইতে কিনা তুচ্ছ আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ দাবী করা? এত বড় দুঃসাহস? কাজেই মহাবীর লোকনাথবাবু অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং দু'একজন তাহার প্রস্তাবের পক্ষ সমর্থন করিতেও উঠিলেন। সভাপতির অনুমতি লইয়া এবং পদোচিত গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ সারদাবাবু তখন জলদ্ নির্ঘোষে ঘোষণা করিলেন, "যদিও হিসাব-নিকাশ আমাদের সব প্রস্তুতই রয়েছে, কিন্তু কথা হচ্ছে, আজকের সভায় আয়-ব্যয়ের কোন কথাই উঠতে পারে না। আজ আমাদের আলোচ্য কার্য্যতালিকায় যা আছে, তা এই—

১।—আগামী বৎসরের জন্য কার্য্যকরী সমিতি গঠন এবং

২।—আগামী সরস্বতী পূজা কেমনভাবে অনুষ্ঠিত হবে সে সম্বন্ধে উপায় নির্দ্ধারণ।—

কাজে কাজেই, খরচপত্রের আলোচনা আজকের মতন মূলতুবী রাখতে হবে। আর তা ছাড়া খরচপত্রের হিসেব কি আপনারা প্রতি বছরে না চাইতেই পাচ্ছেন না ?"

"সে পাওয়া না পাওয়া দুইই সমান"—কে একজন বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অমনি সারদাবাবুর পক্ষস্থ জনৈক ভদ্রলোক মোটাগলায় মুরুব্বিয়ানা-চালে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "অর্থা-ৎ ?"—যেন এই 'অর্থাৎ' শুনিয়াই সকলে হতভম্ব হইয়া যাইবে। ছোকরা নবেন্দুকুমার সদ্য কলেজ ছাড়িয়া আফিসে ঢুকিয়াছেন। তিনি তখন ঐ 'অর্থাৎ'এর জবাব দিলেন, "অর্থাৎ পাব্লিক্ মণি নিয়ে ছেলেখেলা নয়। আজকের মিটিংএ যদি একাউণ্ট সব্‌মিট করা না হয়, তবে এখনই এ মিটিং ডিজল্‌ভ্‌ড্ করা হোক্। দুর্গা পূজোর হিসেব ক্লিয়ার হতে না হতে আপনারা যে আর-একটার ফাঁদ পেতে বসবেন তা হচ্ছে না।"

'তরুণ' সদস্য দুই পক্ষেই থাকিতে পারেন। সারদাবাবু প্রবীন হইলেও, তাঁহার পক্ষ লইয়া নবীন উকীল শ্রীমান্ অশ্বিনীবাবু তখন কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চসমার ভিতর হইতে ভাসা-ভাসা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ভাবগদ্‌গদকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "আজ যে এতগুলি বাঙ্গালী আমরা এক জায়গায় জড় হতে পেরেছি, এই দূর দেশে থেকেও আমরা যে প্রতি বছরেই পূজা-পার্ব্বণে আমোদ-আহ্লাদ করতে পাচ্ছি, আপনারা বলবেন কি এসব

কার প্রাণপাত উদ্যম চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল ?” লোকনাথ বাবু কাজের লোক মানি, নবেন্দুর spirit আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাঁরা যদি একটু মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভেবে দেখেন, দেখবেন কতবড় একটা দায়িত্ব এই বুড়ো সারদাবাবুর ঘাড়ে চেপে রয়েছে। অথচ একটু বিরক্তি নেই, একটু আলস্য নেই। এমন যে শিবতুল্য মানুষ, তাঁর কাছ থেকে আপনাদের ঐ সামান্য কটা টাকার হিসেব অমন রূঢ়ভাবে চাইতে একটু সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে না ?”……

অশ্বিনী বাবুর উচ্ছ্বাস এইখানে আসিয়া একটু বিরাম লাভ করিল। তাঁহার এই ভাবে-ভেজা কথাগুলিতে বোধ হয় অনেকেরই মন নরম হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু নবেন্দু অত হাল্‌কা-প্রকৃতির লোকই নহেন। Sentimentএর শাক দিয়া logicএর মাছ ঢাকা পড়িতে দিবেন, এমন পাত্রই তিনি নহেন। স্বভাবত-কর্কশ কণ্ঠকে যতদূর সম্ভব রূক্ষ করা যায় তাহাই করিয়া তিনি কহিলেন, “শুনুন ম’শয় অশ্বিনীবাবু—আমরা এখানে আজ সারদা বাবুর কীর্ত্তি-কাহিনী শোনবার জন্যে ঠিক প্রস্তুত হয়ে আসিনি তিনি যা করেছেন, তার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলছি যে, আজ যদি আমরা পূজোর খরচপত্রের কোন রকম একটা সন্তোষজনক হিসেব তাঁর কাছ থেকে না পাই, তবে এর পর থেকে তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখা অনেকের পক্ষে অসম্ভব হতে পারে।”

এইবার সারদাবাবুর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। টেবিলের উপর ঘুসি মারিয়া বৃদ্ধ একেবারে বোমার মতন ফাটিয়া উঠিলেন, "কি—কি বলছেন—কি বলছেন—তুমি কি বলছ হে ছোকরা? শুনেছেন আশুবাবু (সভাপতি)—শুনেছেন, নবেন্দু কি বললে শুনেছেন?" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই প্রচণ্ড ক্রোধাবেগে বৃদ্ধের আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না, শুধু থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। ক্ষণকালের জন্য সভাস্থল স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। এবং তারপর একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন ক্রমশ অতিস্পষ্ট হট্টগোলে পরিণত হইয়া পড়িল। অশ্বিনীবাবু চীৎকার করিতে লাগিলেন, "Withdraw! Withdraw!" পাল্টা জবাব আসিল, "Certainly not! Certainly not!" পককেশ শ্বেতশ্মশ্রু সভাপতি আশুবাবু তখন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া নিতান্ত অসহায়ের মতন উঠিয়া দাঁড়াইয়া একবার এধার একবার-ওধার ফিরিয়া চাহিলেন। তারপর খোট্টাই বাংলায় ধীর এবং নিম্নকণ্ঠে কহিলেন, "এ আপ্‌নারা এতো শোর্ বকাচ্ছেন কেন? খাম্‌খা গুল্ করলে কি-ই ফায়দা হবে? এটা সভা হোচ্ছে, এখানে খামোষ থাকতে হয়।" সভার সমস্ত রৌদ্ররস আশুবাবুর এই কথায় এক মুহূর্ত্তে হাস্যরসে রূপান্তরিত হইয়া গেল। এ-ধরণের বিদ্রূপের হাসি তাঁহার একরকম গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। বেশ সপ্রতিভ ভাবেই সহাস্যমুখে তিনি কহিলেন, "সারদাবাবু, আপনি অতো গরম হবেন না। টাকা পয়সার মাম্‌লা হি খরাব্!

অনেক শিকায়ৎ শুনতে হয়।"—কোন রকমে কথা কয়টা বলিয়া ভদ্রলোক বসিয়া পড়িলেন। এই অবসরে লোকনাথ বাবু আবার উঠিলেন, "বেশ তো, হিসেব যদি complete না হয়ে থাকে, আমরা এক হপ্তা 'টাইম' দিতে রাজি আছি। কিন্তু সরস্বতী পূজোর বাজেট-টা আজ মুলতুবী রাখতে হবেই।" এ-কথায় উভয় পক্ষই সম্মত হইলেন। কাজেই লোকনাথ বাবু তাঁহার পূর্ব্ব প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইলেন।

সে দিনকার নব-নির্ব্বাচনের ফলে, এক সভাপতি ছাড়া আর সমস্ত পদগুলিতে নূতন নূতন কর্ম্মী নির্ব্বাচিত হইলেন। একচল্লিশ জন সদস্য লইয়া যে সমিতির অস্তিত্ব কোন ক্রমে কেবল টিকিয়া আছে মাত্র তাহার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠন করা হইল—পনের জন সদস্য লইয়া। অমুক লোক অফিসের বড় সাহেব, সুতরাং তাঁহাকে একটা উচ্চ পদ দিতেই হইবে। অমুক ডাক্তারকে তুষ্ট না রাখিলে বিনা পয়সায় চিকিৎসাও চলে না, ছুটির সার্টিফিকেটও পাওয়া যায় না। অতএব সভাপতি না হোন অন্ততঃ উপ-সভাপতি হইবার পক্ষে তিনিই যোগ্যতম পাত্র। ইহা ছাড়া সমিতির কার্য্যক্ষেত্রও বড় সামান্য নহে। সাহিত্য বিভাগ, ললিতকলা বিভাগ, শরীরচর্চ্চা বিভাগ, জনসেবা বিভাগ এবং আমোদপ্রমোদ বিভাগ—এই এতগুলি বড় বড় বিভাগ বেঙ্গলী ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়নের অস্থিকঙ্কালসার ধড়ের উপর বিরাজ করিতেছে। সভাপতি, উপসভাপতি এবং সম্পাদক

ছাড়া, এই পাঁচটি বিভাগের জন্যও পাঁচজন সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। ইহার উপর আরও অতিরিক্ত সাতজন সদস্যকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইল। মনে করুন, কোন একজন সদস্য হয়ত খুব ভাল অভিনয় করিতে পারেন, তাঁহাকে হাতে রাখিতে হইবে; কেহ হয়তো বাড়ীর বৈঠকখানাটা বিনা ভাড়ায় ইউনিয়নকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে খুসী করিতে হইবে; কোন ছেলেটার দ্বারা মাসিক চাঁদা আদায়ের কাজটা চলিয়া যায়, তাহাকে বশে রাখা দরকার; কাহারও বা মুখের তেমন আঁট-সাট নাই, সেই মুখফোড়টার মুখবন্ধ করা প্রয়োজন; এমনি ধারা সাত-পাঁচ ভাবিয়া-চিন্তিয়া উল্লিখিত গুণ-সম্পন্ন লোক বাছিয়া অবশিষ্ট সাতটি স্থানের পাদপূরণ করা হইল।

শ্রীযুক্ত লোকনাথ পাল মহাশয়ই সেদিন অধিকাংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে ইউনিয়নের সম্পাদক পদে নির্ব্বাচিত হইলেন। সারদাবাবুর নাম প্রস্তাবিত ও রীতিমত সমর্থিত হইয়া থাকিলেও ভোটগ্রহণের পূর্ব্বেই তিনি নিজের অস্বীকৃতি ঘোষণা করিয়া দিলেন। সারদাবাবুকে পিছু হটিতে দেখিয়া তাঁহার পক্ষের সকলেই একে একে তাঁহার পতকাতলে সমবেত হইলেন। ফলে, দলপতি লোকনাথবাবু অতি নির্ব্বিঘ্নে একেবারে সদলবলে 'চামারপুর বেঙ্গলী ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়নে'র শাসনকর্ত্তৃত্বের বল্গা সগৌরবে অধিকার করিয়া লইলেন।

নির্ব্বাচন-পর্ব্ব শেষ হইবার পর সারদাবাবু দলের মুখপত্ররূপে কহিলেন, "আমরা আজকের ইলেকসনে খুবই আনন্দিত হয়েছি।......আশা করি লোকনাথবাবুর মতন পাব্লিক স্পিরিটেড লোকের হাতে পড়ে এবং নবেন্দুকুমারের মত উৎসাহী যুবকের পরিশ্রমে আমাদের ইউনিয়নের উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকবে।" (করতালি)

বিপক্ষ দলপতি লোকনাথ বাবু এইবার বিজয়সাফল্যজনিত বিনয়ের ভারে অবনত হইয়া সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাইয়া কহিলেন, "আর একথা মানতেই হবে, যে-গৌরবের উত্তরাধিকারী আজ আমরা হয়েছি তার স্রষ্টা হলেন সারদাবাবু। আমরা অতঃপর কেবল তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে যাব।" (করতালি)

উপ-সভাপতি যিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন স্বজাতির সভাকক্ষে তাঁহাকে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখিতে পাওয়া যায় 'ইডেন এসোসিয়েশনে'র সান্ধ্য-মজলিসে অথবা তথাকার বিলিয়ার্ড-রুমে। তথাপি, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, তাঁহার নামটি 'বেঙ্গল ইউনিয়নে'র নিয়মাবলীর মলাটে জলজল করিতে থাকিবে, Vice President—Rev. Dr. G. N. Chatterjee, M.A. (Oxon), Principal, Chamarpur Mission College.

সর্ব্বশেষে সভাপতি আশুবাবু উঠিলেন। আশুবাবু লোকটা প্রচুর অর্থশালী এবং বাঙ্গালী, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও

তাঁহার স্বভাবটা কেমন যেন খোট্টাই ধাঁচের হইয়া গিয়াছে। তাই তাঁহার পোষাকে পরিচ্ছেদে তেমন জৌলুস নাই, কথাবার্ত্তা অথবা চালচলনেও তেমন জাঁকজমক নাই। ভদ্রলোক কিছু বলিতে যাইবার পূর্ব্বেই খানিকটা চাপা হাসির বাতাস ঘরময় খেলিয়া গেল। সে সব গায়ে মাখিয়া লইয়া আশুবাবু সহাস্যমুখে কহিলেন,

"উর্দ্দুতে একটা কথা আছে,—হরকেয়ামদ্ ইমারতে নওসাখ্‌ৎ—অর্থাৎ কিনা—অর্থাৎ কিনা"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, একেবারে নিতান্ত অসহায়ের মত উকীল অশ্বিনীবাবুর পানে চাহিলেন। অশ্বিনীবাবু এমন সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নহেন—ভাবে বুঝিয়া লইয়া কহিলেন, "অর্থাৎ idea টা হচ্ছে, The old order changeth yielding place to new'." আশুবাবু যেন অকূলে কূল পাইয়া আবার আরম্ভ করিলেন, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ-ঐ। আর একটা কথা হচ্ছে, বিদেশে আমরা বাংগালীরা—আফ্‌সের মধ্যে যাতে মোহব্বত বাড়াতে পারি, আপনারা সক্‌কোলে মিলে তেমনি চেষ্টা, তেমনি কোশিস্ করুন। বেফয়দা ঝগড়া ঠন্‌ঠা করে কোনো নফা হবে না।"—এই কয়টি কথা বলিয়া আশুবাবু সেদিনকার মত সভাভঙ্গ করিয়া দিলেন।

সভাভঙ্গের পর পাঁচ ছয় জনে মিলিয়া এক একটি দল করিয়া, ফিস্‌ফিস্ গুজ্‌গুজ্ হৈ-হৈ করিতে রাত্রি সাড়ে এগারটার সময়ে চামারপুরের নিঃশব্দ ও নির্জ্জন পল্লীপথ মুখরিত

করিয়া 'বেঙ্গলী ইউনিয়নে'র সদস্যবৃন্দ আপন আপন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যেন কত বড় একটা দেশের ও দশের ঘোরতর সমস্যা সমাধান করিয়া দিগ্বিজয়ী বীরের দল আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিতে করিতে ঘরে ফিরিতেছেন। পথে সারদাবাবু যে দলের নেতা, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা এইভাবে চলিতেছিল।—

সারদা। তা যা বলেছ। লোকনাথ চালাবে ক্লব?—তা হলেই হয়েছে। অবশ্য তোমাদের কিছু বলতে চাইনে, আমি মনে করেছি, কালই রেজিগনেশন-লেটার পাঠাব। ও ক্লাবে আমার থাকা আর পোষাবে না।...আরে দুত্তোর হিসেব—হিসেব নিয়ে নিকুচি করেছে। (কিছুক্ষণ চিন্তান্বিতভাবে চলিতে চলিতে) আর কিছু নয়, ঐ নবাটাকে লোকনাথই ক্ষেপিয়েছে, বুঝেছ অশ্বিনী?—

তারাপদ হরিহর, নকুলেশ্বর প্রভৃতি।—তবে, তবে আমরাই বা আর থাকি কেন?

অশ্বিনী।—আহা অত ব্যস্ত হলে কি চলে? দেখই না কত ধানে কত চাল।

এই রকম কথোপকথন করিতে করিতে সারদা বাবুর দল চলিয়া গেলেন।

পথের বিপরীত দিক দিয়া বিজয়ী অধিনায়ক লোকনাথ বাবু তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া অট্টহাস্যে দিগ্‌দিগন্ত

আলোড়িত করিতে করিতে চলিতেছিলেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তার ধারা কি রকম দেখুন।

যামিনী। একে বাঙাল তাতে বদ্দি, ব্যাটা সারদা কম ঘুঘু।

অঘোর। না হে, ও লোকটা হাঁদা, অশ্বিনীটাই শয়তান, ওই তো ওকে চালায়।

নবেন্দু। ঠিক ধরেছেন। আর ঐ তারাপদ, হ'রে, নকুড়—ও ব্যাটারা সব চোর। ঘিটা, ময়দাটা, আলুটা, বেগুনটা—এই পূজোর কটাদিন ব্যাটারা দু'হাতে লুটে নেয়।

লোকনাথ বিজয় গর্ব্বে মশগুল। এ সব তুচ্ছ কথায় তিনি যোগ না দিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, "হাঃ—হাঃ—হাঃ। তা যাক, তা যাক—এবার সরস্বতী পূজোটা কি ভাবে করা যায় বল ত? সারদাটাকে হাতে রাখবার চেষ্টা করতে হবে। ওকে বুঝিয়ে দিতে চাই, তুই যদি আমাদের দলে থাকিস, চাই কি তোকে একদিন প্রেসিডেণ্ট করে দিতেও পারি।"

যামিনী। আবার সেই সারদা!

নবেন্দু। আপনার সারদা-ফোবিয়া হল না কি?

সকলে। হোঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ,
হেঃ—হেঃ—হেঃ—হেঃ!

লোকনাথ। নবেন্দু যা কথা বলে! আচ্ছা নবেন্দু এবার সরস্বতী পূজোয় তোমার সেই ফার্স টা নাবাতে হবে। কি বই হে—নামটা কি?

অঘোর। (সুর করিয়া) 'যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা'—ওর বইয়ের নাম হচ্ছে গে—পিয়াসী।

২

সরস্বতী পূজার দিনের কথা পরে বলিব। কিন্তু ইতিমধ্যে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়া যায়, তাহার কথা বর্ণনা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

সারদাবাবুর দল 'ইউনিয়নে'র সংস্রব ছাড়িয়া দিয়া, চামারপুরে একটি 'হরিসভা' স্থাপন করিলেন। পদত্যাগ পত্রে তাঁহারা লিখিলেন,—

"যেহেতু বেঙ্গলী ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়নে ধর্ম্মচর্চ্চার কোনরূপ ব্যবস্থা নাই এবং ধর্ম্মচর্চ্চার প্রবর্ত্তন করাও উপস্থিত তথায় সম্ভবপর নহে, এবং যেহেতু চামারপুরের বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের ভিতর ধর্ম্মভাবের প্রচার করা স্থানীয় আবালবৃদ্ধ বনিতার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, সেই-হেতু আমরা এই নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তিগণ জনহিতকর একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্মসভাস্থাপনেচ্ছু হইয়া আন্তরিক দুঃখের সহিত আপনাদিগের 'ইউনিয়নে'র সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে চাহি। আশা করি, আমাদের এই শুভসংকল্প আপনাদিগের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হইবে না।"

ইউনিয়নের পক্ষ হইতে যে জবাব আসিল তাহা এই,—

"অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ইউনিয়নের কার্য্য-

নির্ব্বাহক সমিতি কর্তৃক আপনাদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হইয়াছে। আপনাদের নাম ইউনিয়নের সভ্য-তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া গেল। এই সঙ্গে পূজার হিসাব-নিকাশের নথিপত্রের কথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে।”

সারদাবাবুর ডিস্‌পেন্সরিতে এই চিঠিখানা যখন আসিয়া পৌছিল, তখন সেখানে বসিয়াছিলেন উকীল অশ্বিনী বাবু। সারদাবাবু চিঠিখানার পড়িয়া লইয়া অশ্বিনীবাবুর সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিলেন। অশ্বিনীবাবু চিঠিখানার উপর একবার তাচ্ছিল্যভরে চোখ বুলাইয়া লইয়া কহিলেন,

“তা বেশ তো—হিসেব একটা তৈরী করে ফেলতে কতক্ষণ? আপনার কাছে রসিদ-ফসিদ ভাউচার-টাউচারগুলো আছে?”

সারদা। সে সবই তো তোমার কাছে—আমার কাছে কিস্‌সুই নেই ভাই!

অশ্বিনী। আমি কি সেগুলো আপনাকে দিই নি?

সারদা। দিয়েছিলে? তবে দেখি। কাজের ভীড়ে ওসব কি আর মনে থাকে? ওরে ও রামগোপাল (কম্পাউণ্ডার), পূজা-কমিটির ফাইলটা ইধার লে আওতো রে—

এই সময়ে একজন রোগী আসিয়া পড়িল। সারদাবাবু অশ্বিনীবাবুর দিকে একটু ব্যস্তসমস্ত-ভাবে চাহিয়া কহিলেন, “আচ্ছা—এ বিষয়ে ওবেলা ‘হরিসভা’য় আমাদের আলোচনা হবে।”

অশ্বিনীবাবু একটু রহস্যের সুরে তখন কহিলেন, "তবে তাই হবে, হরিসভাতেই এ সব আলোচনা জমবে ভাল!" এই বলিয়া একটু হাসিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন এবং সারদাবাবুও একটু হাসিয়া নমস্কারের প্রতিদান দিয়া আগন্তুক রোগীটির দিকে মনঃসন্নিবেশ করিলেন।

ওবেলা 'হরিসভা'য় কি আলোচনা হইয়াছিল জানিনা, কিন্তু পরদিবস সন্ধ্যাবেলা নাটক-নির্ব্বাচন-উপলক্ষে 'বেঙ্গলী ইউনিয়নে'র কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির যে বৈঠক বসিয়াছিল, তথায় কেমন-ভাবে এই হিসাব-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার বিবরণটুকু বোধ করি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইউনিয়নের বড় হল-ঘরটার ফরাসের উপর এক কোণে 'ক্যারোম' খেলা চলিতেছে, আর দুইটা কোণে 'ব্রিজ' এবং দাবাখেলা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। প্রতি কোণ হইতেই মাঝে মাঝে হাসির হর্‌রা উঠিতেছে এবং প্রতি খেলার শেষে এমন সব জটিল তর্ক-বিতর্কের উৎপত্তি হইতেছে যে, সেগুলি সব মধ্যপথে অমীমাংসিত অবস্থায় চাপা পড়িতে না পড়িতেই আবার নূতন করিয়া নবপর্য্যায় খেলা আরম্ভ হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা এসব কোন খেলারই তেমন ভক্ত নহেন অথবা যাঁহারা বিলম্বে আগমন হেতু সুযোগ হারাইয়া ফেলিয়াছেন, এমন কয়েকজন ভদ্রলোক খানিক 'কি করি' 'কি করি' ভাবে এধার ওধার করিয়া, কখনও বা অর্গ্যানটা বাজাইয়া, কখন বা তবলায় চাঁটি মারিয়া, অবশেষে দুই-চারিটা ফষ্টিনষ্টি করিয়া, 'কাজ

আছে চললুম', 'রাত হয়েছে ওঠা যাক', এই ধরণের অযাচিত অজুহাত দেখাইয়া একে একে খসিয়া পড়িতে লাগিলেন। ইহা ছাড়া এক-আধজন ভদ্রলোক এমনও আছেন, যাঁহারা এই রীতিমত আড্ডাখানায় বসিয়া থাকিয়াও অখণ্ড মনোযোগের সহিত খবরের কাগজ অধ্যয়ন করিতে করিতে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিয়া—'আর শুনেছ হে, কংগ্রেস এবার তাহলে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ ডিক্লেয়ার করলে, লাহোরে তুজন বাঙ্গালী arrested হয়েছে'—এই-জাতীয় সংবাদ প্রচার করিয়া ক্রীড়ারতদিগের মধ্যে বিরক্তি উৎপাদন করিতেছেন।

ইউনিয়নের এই দৈনন্দিন লীলাখেলা যে ঘরে চলিতেছিল, ঠিক তাহারই পাশের একটি সঙ্কীর্ণ কক্ষে আট নয় জনে মিলিয়া একটি গোলটেবিলের চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া চাপা-গলায় গুলতুনি পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন।

"যদি নাবাতে হয় তো একটা ছোট-খাট farce নাবানোই ঠিক; ওসব প্রফুল্ল-টফুল্ল আজকাল আর চলে না।" ইহাই হইল সাহিত্য-শাখার সম্পাদক নবেন্দুকুমারের অভিমত। নবেন্দুর সাহিত্যিক বলিয়া বেশ একটু প্রতিপত্তি আছে, কাজেই অন্য কেহ তাহার কথার সহসা প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না, কিন্তু প্রবীণ অভিনেতা গঙ্গাধরবাবু, যিনি একবার বছর দশেক পূর্ব্বে 'যোগেশে'র অভিনয় করিয়া চামারপুরের এমেচার ষ্টেজ একেবারে ফাটাইয়া দিয়া নাকি

দ্বিতীয় 'দানিবাবু' আখ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কেবল তিনিই একটু ঝাঁঝাঁলো স্বরে মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"হ্যাঃ—হ্যাঃ, রেখে দাও তোমার আজকালকার কথা। এই সেদিন আমি কলকাতায় দেখে এলাম, খুব জোরসে 'প্রফুল্ল' প্লে হচ্ছে। আর তুমি বললেই হবে? কেউ না পারে আমি 'প্রফুল্ল' দাঁড় করাব। জান, আমি একবার যা যোগেশের পার্ট করেছিলাম, যারা দানির প্লে দেখেছে তারা বলেছে যে দানিও অমন পারে না।" এই বলিয়া তিনি, "ওহে ওহে একটা পয়সা দাও তো!" কথাটি দানিবাবু কেমন ভাবে দেখাইয়াছিলেন, এবং তিনিই বা কেমন ভাবে দেখান, তাহা বেশ দৃষ্টান্তের দ্বারা ভাবভঙ্গীর সহিত বুঝাইয়া দিলেন। গঙ্গাধর যতক্ষণ বুঝাইতেছিলেন, নবেন্দু ততক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে এমন একটা বিদ্রূপপূর্ণ হাসিমাখা চোখে চাহিয়া ছিলেন যাহার অর্থ হইতেছে, 'লোকটা কি নীরেট মূর্খ! সেকেলে মানুষগুলোর বুদ্ধি-সুদ্ধি ঐ রকমই হয়ে থাকে।' গঙ্গাধরের কথা থামিলে নবেন্দু একটু গম্ভীর হইয়া পণ্ডিতী চালে কহিলেন,

"আপনি বুঝবেন না, আমি প্লে-র কথা বলছি না, বইয়ের কথা বলছি।" তাহার পর প্রফেসর শরৎবাবুর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া, সাধারণের অবোধ্য যেন একটা কিছু কহিবেন এমনি ভাবে কহিলেন, "বুঝেছেন শরৎবাবু, শুনছেন স্যার, নাটক বলতে আজকাল আমরা যা বুঝি, বাংলায়

একখানাও তা হল না। ইব্‌সেন, মেটারলিঙ্ক, মাক্সিম গর্কি, বার্ণার্ড শ—এদের সব বই পড়ে, 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'হারানিধি' আর ভাল লাগে না।" প্রফেসর মুখ টিপিয়া হাসি চাপিয়া কহিলেন, "আপনার যদি 'ভীমনাগে'র সন্দেশের চেয়ে চকোলেট খেতে বেশী ভাল লাগে, তাতে কারুর কিছু অবিশ্যি বলবার নেই। কিন্তু পূজো-পার্ব্বণে সন্দেশের নৈবিছি না দিয়ে চকোলেটের নৈবিছি যদি দেওয়া যায়, আর সে পূজো যদি বারোয়ারি কিংবা সামাজিক পূজো হয়, তবে পাঁচজনের আপত্তি করবার তাতে নিশ্চয়ই সঙ্গত কারণ থাকতে পারে। কাজেই, বুঝেছেন কিনা নবেন্দুবাবু, আপনাদের ঐ বাংলা বই-ই প্লে করতে হবে।" নবেন্দু ধাক্কা খাইয়া যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ গঙ্গাধরের চোখ-মুখও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রথমটা একটু কিন্তু-মিন্তু করিয়া নবেন্দু হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "হ্যাঁ, ভাল কথা, আমার মনে ছিল না—কেন আপনারা তো 'ষোড়শী' নাবাতে পারেন। অমন first class বই বাংলায় আর হোলো না—আপনি কি বলেন? কলকাতায় ওটা নাইট্‌স্ আফ্‌টার নাইট্‌স্ প্লে হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও 'অডিয়েন্সে'র ভীড় কমে নি।" প্রফেসরকে এই ক'টি কথা বলিয়া তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া গঙ্গাধরবাবুর দিকে চাহিয়া নবেন্দু কহিলেন, "কি গঙ্গাধরবাবু, আপনি 'যোগেশে'র পার্টে খুব নাম কিনেছেন শুনছি 'জীবানন্দে'র পার্ট পারবেন?

শিশির ভাদুড়ির প্লে দেখেছেন? না দেখে থাকেন, আমি আপনাকে হেল্প করতে পারি। আমি নিজে কখনো ষ্টেজে নামিনি যদিও, কিন্তু ফাষ্ট ইয়ারে যখন পড়তাম, তখন ঐ Stage and Screenএর ওপর 'যুবশক্তি' কাগজে আমার লেখা বার করতুম। শুনেছি নাকি লেখাগুলো পড়ে রবিবাবু খুব সুখ্যাতি করেছেন। শরৎবাবু তো আমাকে personally বলেছেন, 'আহা, ভদ্দরলোক কি আমুদে!' আমাকে আদর আপ্যায়ন করে বসিয়ে বললেন, 'লিখে যাও দাদা, লিখে যাও, বেশ লিখছ—দেদার লিখে যাও।' নবেন্দুর কথাগুলি শুনিতে শুনিতে, কতকটা অবিশ্বাসের ভাবের উপরে কৃত্রিম হাসি ও কৃত্রিম বিস্ময়ের চুণকাম করিয়া গঙ্গাধর মাঝে মাঝে সায় দিয়া যাইতেছিলেন, 'বটে! বটে!' এবং নবেন্দুর বক্তব্য শেষ হইলে পর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "তোমরা তো আর অর্দ্ধেন্দু মুস্তফির প্লেও দেখলে না, গিরিশ ঘোষের প্লেও দেখলে না, কি আর বলব বল?" অধ্যাপক শরৎবাবু প্রশ্ন করিলেন, "যুবশক্তির কোন্ ইয়ারের কোন্ নম্বরে আপনার লেখাগুলো বেরিয়েছিল?" নবেন্দু স্মরণে আনিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পাঁচ মিনিট ধরিয়া দাড়িতে আঙুল রাখিয়া কড়িকাঠের পানে তাকাইয়া থাকিয়া এবং ঘন ঘন কপাল এবং মাথায় হাত বুলাইয়া অবশেষে যেন অনেকটা স্বগত ভাবে কহিলেন, 'আমি যেবার I.A. পড়ি—সেবার হল গে—year 1923, 'যুবশক্তি'

বেরোয় 1924এ। ও ঠিক হয়েছে, 'যুবশক্তি' নয়—যুবশক্তি নয়, তবে কি যেন একটা 'শক্তি'।"

কথার আঁচে ব্যাপারটা যেন ধরিতে পারিয়াই কতকটা সদয় হইয়া প্রফেসর কহিলেন, "থাক্, লেখাগুলো আছে তো আপনার কাছে? আমাকে মনে করে দেখাবেন এক সময়ে।" নবেন্দু মনে মনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেও মুখে কহিলেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই হবে—তাই হবে। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) কিন্তু খুঁজতে হবে অনেক—কোথায় যে কি রাখি আমার কিছুই হুঁস থাকে না।"—এই কথা কয়টা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের কোণে একটু হাসির প্রলেপ মাখাইয়া নবেন্দু হঠাৎ বিষম গম্ভীর এবং চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। কাজেই প্রফেসর এবং গঙ্গাধরবাবুকেও তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিতে হইল।

ইঁহাদের তিন জনের উপর নাটক-নির্ব্বাচনের ভার দিয়া সেই গোল-টেবিলটার আর এক ধারে মুখোমুখি ভাবে বসিয়া লোকনাথবাবু এতক্ষণ কি একটা কাগজ হাতে লইয়া অন্য চার পাঁচ জন ভদ্রলোকের সহিত বুঝি কোন গুরুতর আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ স্তব্ধতা অনুভব করিয়া কহিলেন, "কি হে তোমাদের কি হ'ল? চটপট্ সেরে নাও, আরও দরকারী অনেক কাজ আছে।"

সহসা যেন ধ্যানভঙ্গ হইল এমনি ভাবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গঙ্গাধরবাবুর দিকে ফিরিয়া নবেন্দু কহিলেন, "ভেবে দেখলাম, "ষোড়শী আপনাদের দ্বারা হতে পারে না!"

এ কথার জবাব দিলেন লোকনাথবাবু। উচ্চৈঃস্বরে, কহিলেন, "আবার 'ষোড়শী'—'ষোড়শী' কেন হে? কথা ছিল যে তোমার বইখানা এবার নাবানো যাবে। যাক্, যা হয় একটা করে ফেল। সারদার কাছ থেকে হিসেব পত্তর সব এসেছে, এর পর সে সম্বন্ধে discussion হবে।"—এই বলিয়া তিনি আবার অসমাপ্ত কথোপকথনের খেই ধরিয়া আপোষের মধ্যে আলোচনা জুড়িয়া দিলেন।

এদিকে প্রফেসর ও গঙ্গাধরবাবু উভয়ের মনেই ভাবান্তর উপস্থিত হইল। নবেন্দু বই লিখিয়াছেন, এই ব্যাপারটাই নবেন্দুর প্রতি তাঁহাদের সমস্ত শ্রদ্ধাকে টানিয়া লইয়া গেল। প্রফেসর কহিলেন, "তবে আর আমাদের অন্য বই বাছবার দরকার কি? আপনার মতন এমন একজন গুণীলোক থাকতে আবার বইয়ের ভাবনা!" গঙ্গাধরবাবু কহিলেন, "বুঝলেন শরৎবাবু, ও ছোকরাটিকে বড় সামান্য কেউ-কেটা মনে করবেন না, একেবারে ছাইচাপা আগুন। কি বই লিখেছ হে নবেন্দু, সিরিয়াস না কমিক?"

প্রফেসর এই সময়ে রহস্যের সুরে বলিয়া ফেলিলেন, 'Farcial Tragi-Comedy de Pantomimic Operetta নয় তো? কি বলেন নবেন্দু বাবু?—বলিয়াই নিজের রসিকতায় নিজেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রসিকতাটা কেহ ধরিতে পারিল না, একেবারে ভস্মে ঘী ঢালা হইল। অগত্যা তাঁহাকে গম্ভীরভাবে অন্য কথা

পাড়িতে হইল, "আপনার বইয়ের এক কপি Manuscript সঙ্গে এনেছেন নবেন্দুবাবু ?"

যেন তাঁহার বই অভিনীত হইলেই বা কি, আর না হইলেই বা কি, মুখের এমনি একটা উদাসীন ভাব দেখাইয়া নবেন্দু তাঁহার পাঞ্জাবীর পকেট হইতে পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি বাহির করিতে করিতে কহিলেন, "আমার বইখানিরর কথা আমি নিজে একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম, লোকনাথবাবুই মনে পাড়িয়ে দিলেন। বইটার দিকে উনি দেখছি বেজায় বেশী রকম ঝুঁকে পড়েছেন। ওটা আসছে মাসের 'কেতকী'তে বেরুবে। বছর ছুয়ের আগের লেখা। কলেজে যখন প্লে করা হল, বুড়ো প্রফেসরগুলো তখন বেজায় খাপ্পা হয়ে পড়েছিল। কেবল প্রণবেশবাবু—ভদ্দরলোক—আমাকে খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন।"

প্রফেসর প্রশ্ন করিলেন, "কে প্রণবেশবাবু ?"

নবেন্দু।—"প্রণবেশ গুপ্ত। Modern Continental Drama সম্বন্ধে 'থিসিস' লিখে তিনি গেল-বার রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলারশিপ পান। বয়স বেশী নয়, আমাদের চেয়ে দু'তিন বছরের বড় হবেন। খাসা সুন্দর ছিপছিপে চেহারা। কি একটা কারণে কাজটা গেলে পর অর্থাৎ তিনি কাজটা ছেড়ে দিয়ে—সম্প্রতি ফরিদপুর থেকে 'কেতকী' কাগজখানা বার করছেন।" বরাবর বেশ ধীরভাবে বর্ণনা করিতে করিতে এইখানে আসিয়া নবেন্দু যেন তাঁহার সমস্ত ধৈর্য্যের বন্ধন

হারাইয়া ফেলিলেন, "আপনি প্রণবেশবাবুর নাম শোনেন নি? বলেন কি শরৎবাবু? 'কেতকী'র এডিটার প্রণবেশবাবু? বাংলা কাগজ তো আর পড়েন না!"

প্রফেসার হঠাৎ এ উচ্ছ্বাসের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া গেলেন, এবং ক্ষণিক স্তম্ভিত রহিয়া বিদ্রূপের সুরে কহিলেন, "কেতকী যে মাসিক পত্রিকার নাম হতে পারে আপনার মুখে শোনবার আগে এ-ধারণা আমার ছিল না মশায়! কেতকী, মালতী, যাতি, যূথি—এ নামগুলো কেমন যেন কাব্যি-কাব্যি গন্ধ বয়ে আনে না? আপনার প্রণবেশবাবু দেখছি তা হলে একজন পোয়েট।"

নবেন্দু বলিলেন, "Exactly so." বলিয়াই মুখখানাকে হঠাৎ গম্ভীর করিয়া ফেলিলেন। খানিকক্ষণ কেহ কোন কথা বলিলেন না। প্রফেসর অন্যমনস্ক ভাবে পাণ্ডুলিপিখানার পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে গঙ্গাধরবাবু আর থাকিতে না পারিয়া একটা সুদীর্ঘ হাঁফ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখি হে শরৎবাবু, বইখানা একবার দেখি।" এই বলিয়া শরৎবাবুর হাত হইতে খাতাটা টানিয়া লইয়া উহার মলাটের উপড় একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, পরে একমুখ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "এ কি হে নবেন্দু, নাম রেখেছ 'পিয়াসী'? কেমন-কেমন শোনাচ্ছে না?"

প্রফেসর কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই নবেন্দু বেশ একটু গরম হইয়াই কি জবাব দিলেন।

পরিণতিটা যাহাতে ক্রমশ নীরসতর না হইয়া উঠে এই ভয়ে প্রফেসর গঙ্গাধরবাবুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "বুঝলেন, গঙ্গাধরবাবু, নামে বড় একটা আসে যায় না। সেক্সপীয়র বলে গেছেন, গোলাপকে যে নামেই ডাকুন না কেন, গোলাপ গোলাপই থেকে যায়।"

"বটেই তো—বটেই তো, নামের আর দোষ কি বলুন না? 'পিয়াসী' কথাটার মানে তো হল গিয়ে তৃষ্ণার্ত্ত। তবে কিনা মোদ্দাৎ কথাটা হচ্ছে—মদের তেষ্টা না হলেই হল। কেন না সময়টা হচ্ছে সরস্বতী পূজো। পাব্লিক ষ্টেজেরও থিয়েটর নয়, মা বোন্ ভাই ছেলে মেয়ে স্ত্রীর সামনে প্লে করা। কাজে কাজেই—"

গঙ্গাধরবাবুর কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই নবেন্দু কহিলেন, "দেখুন মদ-ফদ্ আমার বইতে নেই। ওসব প্রফুল্ল-টফুল্লর মত সেকেলে বইয়েই থাকে। আমার এটা একটা ছোট্ট লভ্ ষ্টোরি। নিতান্ত পিউরিটান না হলে দেখতে পাবেন, এর ভেতরে একটা মস্ত বড় প্রব্লেম চাপা আছে। মাঝে মাঝে বেশ উঁচুদরের হিউমারও ঢুকিয়ে দিয়েছি, যাতে মনোটোনাস্ না লাগে। মোট কথা ইয়ংগার জেনারেশনের কাছে বইখানার একটা য়্যাপীল আছে। আর একটা কথা, ছেলেপিলের চরিত্রনষ্টের কথা যা বলছেন, ওটা আমি মানিনে। তাদের সাম্‌নে সব-কিছুই

এখন খুলে ধরতে হবে—ব্রহ্মচর্য্যের সেই conventional ideas এখন আর চলছে না।”

প্রফেসার এইবার বেশ যেন ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, “তবে বই সিলেক্‌শন্ এখন থাক্। আগে বইটা একবার পড়ে দেখতে হচ্ছে। যখন কথাই উঠেছে তখন একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার, রাগ করবেন না নবেন্দুবাবু!’

গঙ্গাধরবাবু ভ্রূযুগলকে উৰ্দ্ধে প্রসারিত করিয়া প্রবীণ বিবেচকের মত গম্ভীরভাবে কহিলেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল, সেই ভাল।”

নবেন্দু মুখ অন্ধকার করিয়া কহিলেন, “আজ আর কিছু হল না তাহলে—আপনারা লোকনাথবাবুকে জানিয়ে দিন।”

এদিকে লোকনাথ বাবুদের আসর তখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। সারদাবাবুর প্রেরিত সেই হিসাবের কাগজখানা হাতে লইয়া তাঁহারা যখন আদালতে নালিশ ঠুকিবার জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রোফেসরের আহ্বানে তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল।

লোকনাথ কহিলেন, “এঃ—মাষ্টর, তোমরা দেখছি কোন কম্মের নও, এতক্ষণে একটা বই ঠিক করতে পারলে না? নাঃ, আর কালকের জন্যে ফেলে রাখে না। ঐ নবেন্দুর বই খানাই হবে। কি বল হে তোমরা?” এই বলিয়া তিনি

তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদিগের দিকে চাহিলেন। ভাবখানা যেন এই যে, ইহারা যে কাজ দু'ঘণ্টায় শেষ করিতে পারিল না, দেখ আমি তাহা দু'মিনিটেই সারিয়া দিতেছি। তারপর প্রফেসারের হাত হইতে পাতাখানা লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিলেন, "এ বেশ হবে—এ বেশ হবে। নবেন্দু তোমাকে একটা পার্ট নিতে হবে, কিন্তু, এবার তোমারই বই প্লে হচ্ছে। বাঃ, এতে লোকেরও বেশী দরকার হবে না, দুটো male আর একটা female হলেই চলবে। সিন্-সিনারিরও দরকার নেই। আর দেখুন গানও অনেকগুলো রয়েছে। বাঃ—বাঃ, এ বেশ হবে— এ বেশ হবে!"

লোকনাথের কথায় সকলেই তখন সায় দিয়া উঠিলেন। প্রফেসরের আর গঙ্গাধরের কোন আপত্তিই তখন আর টিঁকিল না। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া প্রফেসর বলিয়া উঠিলেন, "ঐ বইখানা যখন আপনাদের ঠিক করাই ছিল, তখন এ মিটিংএর ফার্স করবার কি যে দরকার বুঝি নে! যাই হোক আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন, আমি আর এর মধ্যে থাকতে চাইনে।" এই বলিয়া প্রফেসর বেশ ক্ষুণ্ণ ভাবেই চলিয়া গেলেন।

তাঁহার কণ্ঠের গাম্ভীর্য্য এবং মুখভঙ্গীর দৃঢ়ত্ব ক্ষণিকের জন্য শ্রোতাদের এমনই মুহ্যমান করিয়া ফেলিল যে, তাঁহারা আর তাঁহাকে একটু বসিবার অনুরোধও করিতে পারিলেন না। চলিয়া যাইবার পর কে একজন বলিয়া উঠিলেন,

"শরৎ যে চটে গেল হে!" নবেন্দু গম্ভীরভাবে কহিলেন, "অতি পণ্ডিত কিনা!" গঙ্গাধরবাবু, লোকনাথকেও চটাইতে চাহেন না, নবেন্দুকেও ভাল লাগিতেছে না, কাজেই অন্যকথা পাড়িলেন, "কি হে লোকনাথ, তারপর তোমাদের হিসেব পত্তর কত দূর।"

হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষ যেমন করিয়া উঠে, তেমনিভাবে লোকনাথ কহিলেন, "হ্যাঁ—ভালকথা, ডাক্তার যা হিসেব পাঠিয়েছে, দেখা গেল সেগুলো বিল্‌কুল্ 'বোগাস্'। এখন কথা হচ্ছে, আমরা কোন রকম legal step নোব কি নোব না। আমার মত যদি ধরেন, না নেওয়াই উচিত। তবে আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন, আমার আপত্তি নেই।"

উকীল অম্বিকাবাবু কহিলেন, "বোগাস্ হলেও বোগাস্ প্রুফ্ করা তো শক্ত।" গঙ্গাধর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "আমার কথা যদি শোনো লোকনাথ, ওসব আইন আদালতের মধ্যে না যাওয়াই ভাল। বিদেশে বিভুঁয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়ে বাঙ্গালীর মুখে চূণকালি মাখিয়ে কি কোন লাভ আছে?"

নবেন্দু একটু রাগতভাবে কহিলেন, "বাঙ্গালী—তা হয়েছে কি? ওটা একটা sentiment বইতো নয়! আর ও সেন্টিমেন্টের আজকাল মূল্যই নেই। তবে হ্যাঁ, অম্বিকা বাবু যা বললেন, বোগাস্ প্রুফ করা শক্ত, সেটা একটা reasonable কথা বটে।" নবেন্দুর কথার গোড়ায় যে

ঝাঁঝ ছিল, তাহা শেষের দিকে মোলায়েম হইয়া অম্বিকাবাবুকে খানিকটা দেঁতো হাসি উপহার দিল।

লোকনাথ তখন কহিলেন, "এ ছাড়াও একটা কথা আছে সেটা আপনারা ভেবে দেখছেন না। ধরুন, প্রমাণ করাও সোজা হল, কিন্তু তা হলেও নালিশ যুক্তিযুক্ত নয়। মামলা-মোকদ্দমার গণ্ডগোলে গেলে আমাদের তো অনর্থক সময়নষ্ট অর্থনষ্ট আছেই, তাছাড়া আজ বাদে কাল এই যে একটা কাজের আয়োজন করা যাচ্ছে সেটাও অনেকখানি পণ্ড হয়ে যাবে। মনে রাখবেন আমরা সারদাকেও হাতে রাখতে চাই।" নবেন্দু সোৎসাহে সায় দিয়া উঠিলেন, "Of course, সারদাবাবুকে কি আমরা ছাড়তে পারি? বিশেষতঃ এ সময়ে। তাঁকে দিয়ে অনেক কাজ পাওয়া যাবে।" গঙ্গাধর সহাস্য মুখে বলিলেন, "তোমাদের মতলবটা হচ্ছে, কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি—এইতো?"

নবেন্দু কহিলেন, "এতে আর ঠাট্টার কি আছে, দুনিয়ার নিয়মই এই।"

গঙ্গাধর। দুনিয়ায় নেমকহারামিও আছে, নেমকহালালিও আছে।

নবেন্দু। আপনি যে sermon ঝাড়তে সুরু করলেন দেখছি। ও সব উপদেশে দুনিয়া চলে না।

গঙ্গাধর। তুমি যে দুনিয়া কিসে চলে তাও জান দেখছি।

নবেন্দু ও গঙ্গাধরের কথা-কাটাকাটি বেশ কৌতুকের সহিতই সকলে উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু লোকনাথ দেখিলেন, কথা ক্রমশই কলহের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কাজেই নবেন্দু কিছু বলিতে যাইবার মুখেই তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "থাম, বাজে কথায় কোন ফল হবে না। (সকলকে সম্বোধন করিয়া) তাহলে সারদাবাবুকে জানিয়ে দেওয়া যাক যে তাঁর হিসেব মেনে নেওয়া হয়েছে—কি বলেন ?"

নবেন্দু ছাড়া এ কথায় সকলেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মুখখানা ভারভার দেখিয়া লোকনাথ কহিলেন, "কিহে তুমি আবার বেঁকলে কেন ?" নবেন্দু অভিমানের সুরে কহিলেন, "আমার আবার বেঁকাবেঁকি কি, আমি যা বলব তাইতো বাজে কথা হবে।"

লোকনাথবাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আচ্ছা পাগল যা হোক—যত সব ছেলে মানুষ ! নাও আর রাগ করে না, কাল থেকেই 'রিহার্সাল' লাগিয়ে দেওয়া যাবে।" নবেন্দুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

এমন সময়ে টং টং করিয়া ঘড়িতে এগারটা বাজিয়া গেল। তখন সকলেই প্রায় একসঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন এবং সকলেই প্রায় সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,

"থ্রী চিয়ার্স ফর নবেন্দুকুমার রায়, থ্রী চিয়ার্স ফর 'পিয়াসী', হিপ হিপ হুররে।" তারপরে সকলে একে একে

বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময়ে যে প্রশ্নোত্তর চলিয়াছিল তাহা এই,

"তাহলে ঐ কথাই ঠিক রইল পাল মশায়।"

"তা রৈল বৈকি।"

"এখন শরৎবাবু যে চটে গেলেন তার কি হচ্ছে?"

"তার একটা উপায় করতে হবে।"

"থিয়েটারে সারদাবাবুদের পার্টিকে invite না করলে চলবে না।"

"নিশ্চয়ই!"

৩

'মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী, ছেলের হাতে খড়ি।'—আর কিছু না হোক, অন্তত এই হাতে-খড়ির অজুহাতেও প্রবাসের যেখানেই কয়েকঘর বাঙ্গালী আছেন, সেইখানেই এই সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠানটুকু প্রায়ই হইয়া থাকে। এমন-কি যেখানে দুর্গোৎসব হয় না, সেখানেও এই সরস্বতীপূজায় বেশ ঘটা হইয়া থাকে। বাঙ্গালী পরিচালিত স্কুল থাকিলে তো কথাই নাই, স্কুল না থাকিলে পাঁচজন ভদ্রলোক মিলিয়াই চাঁদা তুলিয়া বারোয়ারীপূজার আয়োজন করিয়া থাকেন।

কামারপুরে এতাবৎকাল একটি পূজাই চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সম্প্রতি সহসা একটা গুরুতর কারণে, রেলওয়ে আফিসের বাবুদের সহিত খাস সরকারী আফিসের বাবুদের

মতান্তর হওয়ায় দুইটা দল হইয়া পড়িয়াছে। বরাবর যে জায়গায় পূজা হইয়া আসিতেছিল, দৈবক্রমে একদা নজরে পড়িল যে, সে-জায়গাটা রেলওয়ে আফিসের বাবুদিগের দিকেই নাকি কয়েক পদ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আর যাবে কোথায়! একদল সাম্য ও সমানাধিকারের নিশান তুলিয়া ধরিলেন এবং আর একদল গতানুগতিকতার প্রাধান্য প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে, এ অবস্থায় যাহা হইবার তাহাই হইল, তেলে জলে মিশ খাইল না।

কিন্তু সূক্ষ্মমনস্তাত্ত্বিক কোন কোন নিরপেক্ষ লোক এ-বিরোধের যে মূল কারণ নির্ণয় করিয়া থাকেন, তাহা কেবল মতবৈষম্য নহে। সরকারী আফিসের ছোট সাহেব লোকনাথবাবু যে-দিন হইতে সদল বলে 'বেঙ্গলী ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন'টিকে কর-কবলিত করিয়া লইয়াছেন, সে-দিন হইতেই ইউনিয়নের মনোভাব—বিশেষ করিয়া রেলওয়ে আফিসের বাবুদিগের প্রতি—সাম্য ও সমানাধিকার সম্পর্কে ঠিক অনুকূল রহে নাই। একমাত্র গঙ্গাধরবাবু ছাড়া রেলওয়ে আফিসের আর কেহ ইউনিয়নের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে স্থান পান নাই। তাঁহাদের কোন প্রস্তাব ইউনিয়নের কোন মিটিংএ গ্রাহ্য হয় নাই; সরকারী আফিসের বাবুরা বরাবর এক জোট হইয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া আসিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, 'রেলের কেরাণী'দের সরকারী কেরাণীরা একটু নীচু নজরেই দেখিয়া আসিয়াছেন, এবং তাঁহাদের নাম

দিয়াছেন—'রেলের কুলী'। কাজেই আহত-সম্মান রেলের বাবুদিগের মনের মধ্যকার যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এতকাল কেবল ফিস্ ফিস্ গুজগুজেই পর্য্যবসিত হইয়া আসিতেছিল, ঐ সরস্বতী পূজাটিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহা বেশ উৎকট ভাবেই প্রকট হইয়া পড়িল। নবেন্দুর তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণশক্তিই সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্যে আনিয়াছিল যে পূজার ময়দানটা দূরত্বের অনুপাতে রেলওয়ে কোয়ার্টারের অনেকটা কাছে। অতএব রীতিমত প্রস্তাব উঠিল যে পূজায় স্থান-পরিবর্ত্তন অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রতিবাদ আসিল গঙ্গাধরবাবুর পক্ষ হইতে, কিন্তু তাহা টিঁকিল না। ফলে, তাঁহাকে ইউনিয়ন ছাড়িতে হইল, এবং সেই সঙ্গে রেলওয়ে আফিসের সকলেই তাঁহার পথ অনুসরণ করিলেন।

এদিকে এই সংবাদ সারদাবাবুর হরিসভায় আসিয়া যখন পৌঁছিল, তখন সভাস্থলে যে তুমুল হরিধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহার রেশ বোধ করি বেঙ্গলী ইউনিয়নের প্রধান কর্ম্ম-সচিবের কর্ণকুহর ভেদ করিয়া বক্ষতটে আসিয়াও নাড়া দিয়াছিল।

অশ্বিনীবাবু বলিলেন, "আমি তখনই বলেছিলাম, ও তাদের বাড়ি, আপনিই ভেঙ্গে পড়বে।" সারদাবাবু মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "তুমি আর কি বলবে, ওতো আমি আগেই জানতাম।—লোকনাথ চালাবে ক্লাব?"

একজন ভক্ত গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "আরে বাবা, ওপরে একজন তো আছে, সেখানে তো আর চালাকিটি চলবে না।"

আর একজন কহিলেন, "কাল না সরস্বতী পূজো? সারদাবাবু, ঠিক দেখবেন, কালই লোকনাথ আপনার কাছে ছুটে আসবে।"

সারদাবাবু একমুখ হাসিয়া কহিলেন, "আসতেই হবে। যাবে কোথায়? কিন্তু এটা ঠিক জেনে রেখো, এলে পরে আমি স্পষ্টই তাদের বলে দেবো, তোমাদের কালকের প্রোগ্রামের মধ্যে আমার হরিনামটাকে ফার্ষ্ট আইটেম রাখতে হবে, নইলে তোমাদের ইন্‌ভিটেশন অ্যাক্‌সেপ্ট করব না।"

অশ্বিনীবাবু কহিলেন, "আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম। যাক, আপনি যে এটা ভাবতে পেরেছেন—ভালই হল।"

এ কথায় সকলেই সম্মত হইলেন। তাহার পর পূর্ণ উৎসাহে আবার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। আগামীকল্য যে কীর্ত্তন গাওয়া হইবে, বোধ হয় তাহারই মহলা চলিতে লাগিল।

পরদিন সরস্বতী পূজা। প্রবাসী বাঙ্গালীর একঘেয়ে অসাড় জীবনে বেশ একটু জীবন-চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। এবার চামারপুরে দুই জায়গায় তাঁবু খাটানো হইয়াছে, এই দুই জায়গার কর্ম্মীগণের মধ্যেই কর্ম্মোৎসাহের আর অন্ত নাই। আড়ম্বরে বেঙ্গলী ইউনিয়নের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারিলেও রেলওয়ে আফিসের কর্ম্মীরা হাঁকাহাঁকি

ডাকাডাকির দ্বারা সে ত্রুটি পূরিয়া লইতেছিলেন। সারদা বাবুর দল দুই দিক হইতেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। স্থির হইয়াছে, পূজার দিন তাঁহারা রেলওয়ে আফিসের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন। তাই আজ সকাল হইতেই রেলওয়ে আফিসের পূজামণ্ডপে তাঁহাদের হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কাল বিসর্জ্জনের দিন, বেঙ্গলী ইউনিয়নের যে শোভাযাত্রা বাহির হইবে, কথা আছে তাহাতে তাঁহাদের হরিসভা মুখ্য স্থান অধিকার করিবে।

দোল-দুর্গোৎসব মহোৎসব হইলেও ছেলেমেয়েদের কাছে সরস্বতী পূজারই প্রাধান্য বেশী। তাই তাহাদের আজ আমোদ-আহ্লাদ দেখে কে! ৩৬৫ দিনের ৩৬০ দিন যাহার অনধ্যায় সেও যেন আজিকার অনধ্যায়ের ভিতর একটা বিশেষ রকম নিশ্চিন্ত স্বস্তি অনুভব করিতেছে। সারা বছরে একটা দিনের তরেও কখনও যাহাদের খেলার মাঠে টিকি দেখিতে পাওয়া যায় নাই, সেইসব ভাল ছেলের দলও আজ নানাবিধ খেলার প্রতিযোগিতায় মাঠে নামিয়া পড়িয়াছে। পাছে এক ঘটি দুধ এক ফোটা চোনা পড়িয়া সব মাটি হইয়া যায়, এই ভয়ে তাহারা অনেকেই আজ পুঁথিপত্রের ত্রিসীমায় যাইতেছে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাসন্তী রঙের কাপড় পরিয়া দলে দলে পূজামণ্ডপের দিকে চলিয়াছে। তাহারা সুর করিয়া ছড়া কাটিতেছে—

"গলায় গজমোতি মুক্তার হার,
দাও মা সরস্বতী বিদ্যের ভার।"

একটি ছোট ছেলে তাহার সমবয়সী আর একটি ছেলেকে প্রশ্ন করিল, "অঞ্জলি হতে আর কত দেরী ভাই ?" যাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে একটু উদাস সুরে কহিল, "অনেক দেরী, সে-ই বারোটার সময়ে।" আর একজন বলিল, "অঞ্জলির আগে কুল খেতে নেই—না ভাই ?"

খিল খিল করিয়া হাসিয়া একটি মেয়ে বলিল, "কুল খেতে নেই কিরে, কিছুই খেতে নেই।" কুলের কথা যে পাড়িয়াছিল, সে সবিস্ময়ে কহিল, "তবে যে বাবা আমাকে দুধ আর চকোলেট খেতে বললে ?"

মেয়েটি গালে হাত দিয়া কহিল, "ওমা, তোর মা রাগ করেন নি ?"

ছেলেটি হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, তারপর জিভ্‌ কাটিয়া চাপা গলায় কহিল, "এই যা, মা যে কাউকে বলতে মানা করে দিয়েছিল, কি হবে!" ছেলেমেয়েরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

যথাসময়ে অঞ্জলি শেষ হইয়া যাইবার পর, প্রসাদ বিতরণের সময় বেঙ্গলী ইউনিয়নের পূজামণ্ডপে সহসা একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। ঘটনাটা একটু মজার। যিনি প্রসাদ বিতরণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে একটি ছেলে আসিয়া অভিযোগ করিল, "ও কেন দুটো সন্দেশ পেয়েছে ? আমাকে আর একটা সন্দেশ দিন।" ছেলেটা যাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছিল, সেটি সেই দুধ-চকোলেট-খাওয়া ছেলে।

ভদ্রলোক প্রথমটা চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ অধৈর্য্য হইয়া অভিযোগকারী ছেলেটির কাণ ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও বেশ করেছে পেয়েছে, তোর কি? যা তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়।" দৈবক্রমে অভিযোগকারীর পিতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, ভদ্রলোক তাহা দেখিতে পান নাই। "খ্যাঁদা, পেসাদ রেখে শীগ্‌গির বাড়ী যা—যা বলছি।"—পিতা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন। তারপর সেই ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বলি নবেন্দু, তুমি না খুব স্পিরিটেড ছোকরা হে। পাব্লিক মণির জন্যে তোমার যে বড্ড দরদ উথ্‌লে উঠেছিল। বলি, তোমার বড় বাবুর ছেলের ভাগে সন্দেশ বেশী পড়লেই বুঝি পাব্লিক মণির ইউটিলিটি হয়?"

নবেন্দু মুখখানাকে হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর করিয়া ফেলিলেন। তারপর সেই ভদ্রলোকটির দিকে না চাহিয়াই, যেন কত কাযে ব্যস্ত আছেন এমনিধারা ভাব করিয়া কহিলেন, "না জেনে শুনে অমন sarcastic remark pass করবেন না, ওটা অভদ্রতা" "আর পরের ছেলে গরীব হলে তাকে বাপ তুলে ধমকালে সেটা হয় ভদ্রতা।" গম্ভীরভাবে গঙ্গাধরবাবু এই কয়টি কথা বলিতেই নবেন্দু তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে মারমুখো হইয়া চোখ পাকাইয়া রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কি বলতে চান আপনি স্পষ্ট কয়ে বলুন।" নবেন্দু ঘাড়ের উপর পড়ে আর কি

দেখিয়া প্রৌঢ় গঙ্গাধরের পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত রি-রি করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সপ্তমে গলা চড়াইয়া কহিলেন, "বলতে চাই, তুমি—ছোঠলোক।" কথা শেষ হইতে না হইতে নবেন্দু সেই বয়স্ক ভদ্রলেকের গালে সজোরে এক চড় বসাইয়া দিল এবং তাহার পরেই উভয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হইয়া গেল। ছোট ছেলেমেয়েরা কতকটা ভয়ে কতকটা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। বড়রা যে যেখানে ছিলেন, হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। "আরে নবেন্দু খেপলে নাকি, দেখছো না বাপের বয়সী বুড়োলোক।"—কে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ভদ্রলোক এই ভূমিকা করিয়া যাই নবেন্দুকে ধরিতে যাইবেন, নবেন্দু তাঁহাকে এক ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, রেখে দিন মশাই বাপের বয়সী—বলে বাপেরই বড় তোয়াক্কা রাখি তো বাপের বয়সী!" লোকে তখন জোর করিয়া নবেন্দু ও গঙ্গাধরকে পৃথক করিয়া দিল। যখন হাতাহাতির আর কোন উপায় রহিল না, তখন আরম্ভ হইল গালাগালি। ইতর লোকে যে গালাগালি দিলে আমরা সচরাচর 'অকথ্য' ও 'অশ্রাব্য' বলিয়া থাকি, এই দুই ভদ্র সন্তানের মুখে সেই সব গালি তখন আগ্নেয়স্রাবের মত অনর্গল নির্গত হইতে লাগিল। গোপাল ভাঁড়ের ধাক্কা খাইয়া উড়িষ্যাবাসীর আসল স্বরূপ যেমন সহসা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, এই উভয় ভদ্রলোকের ভদ্রতার আবরণও

তেমনি নিঃশেষে স্থানচ্যুত হইয়া ধূলায় লুটাপুটি খাইতে লাগিল। ছেলেমেয়েরা হতভম্ব হইয়া গেল। আশে পাশের বাড়ীগুলির জানালায় জানালায় মহিলাদের সকৌতূহল দৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য ফুটিয়া উঠিয়া দ্বারবন্ধের তাচ্ছিল্যপূর্ণ শব্দের সহিত অন্তর্হিত হইয়া গেল। চাকর-বাকরেরা হাঁ করিয়া বাবুদের রঙ্গ দেখিতে লাগিল।

বিবাদ থামিয়া গেল বটে, কিন্তু ইহার জের চলিল বহুক্ষণ। দেখিতে দেখিতে চামারপুরের গৃহে গৃহে এই ঘটনার বিবরণ নানা ভাবে ও নানা আকারে ছড়াইয়া পড়িল। মণ্ডপের স্থানে স্থানে একএকটি রসচক্র বসিল এবং বেশ সরসভাবে ঘটনার মূলহেতু-নির্ণয়ের গবেষণা চলিতে লাগিল।

এদিকে এতবড় একটা ব্যাপার লইয়া সমস্ত চামারপুর যখন টলমল, লোকনাথবাবু তখন অনন্যমনে নিমন্ত্রিত সাহেব সুবা ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের মর্য্যাদানুযায়ী আসনের তদারক কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। আজ রাত্রে থিয়েটার। কোথায় কাহার স্থান হইবে, কাহাকে কেমন চেয়ার দেওয়া উচিত, আফিসের দুইজন চাপরাশীকে লইয়া নিবিষ্টচিত্তে তিনি যখন এই সব গুরুতর সমাস্যার সমাধান করিতেছিলেন, তখন একটি ভদ্রলোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁহার কাছে আসিয়া নিবেদন করিলেন, "শুনেছেন পাল মশায়, ব্যাপারটা শুনেছেন একবার, গঙ্গাধরের দর্প চূর্ণ!" "আরে চুলোয় যাক তোমার গঙ্গাধর, ওসব শোনবার আমার অবসর

নেই”—এই বলিয়া লোকনাথবাবু একটা চাপরাশীকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে ছুটিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সেই ভদ্রলোকটি আবার তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন, “চললেন কোথায়, নবেন্দুর কীর্ত্তিখানা একবার শুনে যান।” নবেন্দূর নাম শুনিয়া লোকনাথ এইবার ফিরিলেন। বলিলেন, “বলে ফেল তোমার যা বলবার আছে—আমার বড় সময় অল্প।” ভদ্রলোক তখন এইভাবে আরম্ভ করিলেন, “গঙ্গাধরকে নবেন্দু আজ এমন দু'ঘা কষিয়েছে যে ব্যাটার কিছুদিন মনে থাকবে।” ভূমিকা শুনিয়াই লোকনাথ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। সন্ত্রস্তভাবে প্রশ্ন করিলেন, “অ্যাঁ, বল কি? এঃ, নবাটা দেখছি সব পণ্ড করবে। বুড়ো মানুষের সঙ্গে হাতাহাতি! ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি?” নবেন্দুর কীর্ত্তিকলাপ লোকনাথের বিশেষ উপভোগ্য হইল না দেখিয়া ভদ্রলোকটি সুর বদলাইয়া ফেলিলেন, “আমি তখনই মানা করলুম, বললুম, নবেন্দু এ তোমার হচ্ছে কি, হাজার হোক উনি বুড়োমানুষ। তা বললে কি জানেন, বললে, আমি বাপের বড় তোয়াক্কা রাখি তো বুড়োমানুষ! এর ওপর আমি আর কি বলি বলুন।” ভদ্রলোকটি এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, এমন সময় লোকনাথ দেখিলেন হৈ হৈ করিতে করিতে নবেন্দু সদলবলে তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। কাছে আসিয়া নবেন্দু চীৎকার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, “আমাকে শেখাতে এসেছে—পাব্লিক মণির ইউটিলিটি। তেজ

করে ক্লাব ছেড়ে দিয়ে ব্যাটা ছেলেকে পাঠিয়েছে পেসাদ চুরি করতে, আর বলে কিনা পাব্লিক মণির ইউটিলিটি! যে লোকটা ক্লাবের জন্যে আহারনিদ্রা ত্যাগ করেছে, (লোকনাথকে লক্ষ্য করিয়া) তার ছেলেকে যদি দুটো সন্দেশ বেশীই দিই, তাই বলে হাঘরে ব্যাটাচ্ছেলে আসবে লড়াই করতে? আমার কাছে বাবা স্পষ্ট কথা, ফেল কড়ি মাখ তেল।" নবেন্দু যাহা করিয়াছে তাহা ঠিক সমর্থনযোগ্য নহে, অথচ তাহার এই সতেজ খোসামোদেও মনটা স্বভাবতই নরম হইয়া পড়ে; কাজেই লোকনাথবাবু সস্নেহ তিরস্কারের সুরে নবেন্দুকে কহিলেন, "আরে থামো নবেন্দু থামো, পাব্লিকের কাজে অত মাথা গরম করলে কি চলে? পাব্লিকের কাজে যে একটা পয়সাও দেয় না তারও যত জোর, যে লাখ টাকা দেয় তারও সেই জোর। এ ছাড়া গঙ্গাধর ক্লাব ছেড়েছে বটে, পূজোর চাঁদাটা তো আর বন্ধ করে নি। এক্ষেত্রে তুমি যদি তার ছেলেকে কিম্বা তাকে অপমান করে থাক, কাজটা ভাল কর নি মানতে হবে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া লোকনাথ সমবেত জনমণ্ডলীর পানে চাহিয়া, "কি বলেন আপনারা, কথাটা ঠিক নয় কি?"—বলিয়া, যেন তাঁহাদের সমর্থন প্রার্থনা করলেন। জনতা ইতিমধ্যেই লোকনাথের ঔদার্য্যে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই সমবেতকণ্ঠে মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন, "বটেই তো, বটেই তো!" একজন আবার এই সুযোগে বিজ্ঞভাবে নবেন্দুর পক্ষ হইতে ক্ষমা

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার উপক্রম করিতেই নবেন্দুর ভাবভঙ্গীর আভাস পাইয়াই বিচক্ষণ লোকনাথবাবু সে কথাটা চাপা দিয়া দিলেন, "যাক, যা হয়ে গিয়েছে তা হয়ে গিয়েছে, ও কথা নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করলে বিশেষ ফল হবে না। কাজ অনেক পড়ে রয়েছে, সময় অল্প। নবেন্দু, শোন কথা আছে।" এই বলিয়া তিনি নবেন্দুকে নেপথ্যে ষ্টেজের ভিতর টানিয়া লইয়া গেলেন। জনতা মনঃক্ষুন্নভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় থিয়েটার আরম্ভ হইবার কথা আছে। সকলেই জানেন, বারোয়ারীর থিয়েটারে, কতিপয় বিশিষ্ট দর্শনার্থী ছাড়া আর কাহারো জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট বসিবার স্থানের ব্যবস্থা থাকে না। রেলগাড়ীর থার্ডক্লাশ কম্পার্টমেণ্টের মত এখানেও সকলকে নিজ নিজ পুরুষকারের দ্বারাই আসন দখল করিয়া লইতে হয়। কাজেই থিয়েটার আরম্ভ হইবার ঘণ্টা দুতিন পূর্ব্ব হইতে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ড্রপসিন না উঠে ততক্ষণ সেই সামিয়ানা-ঢাকা প্রেক্ষাগৃহটি নানাজাতীয় কলরবে মুখরিত হইতে থাকে। শুধু বসিবার জন্য মনোমত স্থান হইলেই চলে না, সকল রকম দুর্ভাবনা দূর হওয়া চাই, পান সিগারেট আদি সকল রকম প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কাছে থাকা চাই, মনের মত সমঝদার সহচর আশে

পাশে ঘিরিয়া থাকা চাই, তবেই না থিয়েটার দেখার আমোদ! অতএব হট্টগোল অনিবার্য্য।

থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের আজ কি শুভদিন। বিশেষতঃ লোকনাথ বাবুর আফিসের খাস ইংরেজ বড় সাহেব আসিয়াছেন—তাঁহার কন্যা ও সহধর্ম্মিণীকে লইয়া। এই সুযোগে তাঁহাদের সহিত হাসিমুখে করমর্দ্দন হইয়া গেল। ইহা ছাড়া জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, ডাক্তার, প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসর ইত্যাকার কতশত গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভ এ জীবনে হয়তো ঘটিয়া উঠিত না। ক্লাবের সেক্রেটারীরূপে অভ্যর্থনাচ্ছলে ইঁহাদের সকলের সঙ্গেই মিষ্ট-সম্ভাষণের আদান প্রদান করিতে হইতেছে। লোকনাথবাবু কেন, এ ক্ষেত্রে কে এমন আছে যে না ভাবিয়া থাকিতে পারে, "জীবন, তুমি ধন্য!"

সাড়ে আটটা বাজিয়া যাইবার মিনিট পনের পরেও যখন ড্রপসিন উঠিল না, তখন রসিক দর্শকেরা কেহ কেহ এই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, "এ বাবা বাঙ্গালীর সাড়ে আটটা, ঘড়ীর কাঁটার নিয়মে চলে না, মর্জ্জি-মাফিক নিজের চালেই চলেছে।" থিয়েটার-কর্ত্তৃপক্ষকে শ্লেষ করা হইল এই মনে করিয়া, 'ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়নে'র কোন সদস্য-দর্শক অমনি প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন, "পাব্লিক ষ্টেজেও এই কাণ্ড, এমেচারের দোষ দিলে চলবে কেন?" পূর্ব্ববর্ত্তী ভদ্রলোক সপ্রতিভভাবে হাসিয়া বলিলেন, "আহা, আমি তো 'এমেচার'

বা 'পাব্লিক' বলি নি, বলেছি বাঙ্গালী।" প্রতিবাদকারী লজ্জিত হইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন।

এ-দিকে সম্ভ্রান্ত দর্শকেরা ঘন ঘন ঘড়ীর দিকে তাকাইতেছেন দেখিয়া লোকনাথবাবু তাড়াতাড়ি তাঁহাদের কাছে ছুটিয়া গিয়া সবিনয়ে কি সব বুঝাইয়া দিয়া দ্রুতবেগে ষ্টেজের ভিতর ঢুকিয়া গেলেন। ইহার কয়েক মিনিট পরেই ড্রপসিন উঠিল।

প্রথমেই প্রস্তাবনা-সঙ্গীত। 'পিয়াসী'র নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের 'সুদূরের পিয়াসী' কবিতাটিকেই তাঁহার নাটকের প্রস্তাবনারূপে ব্যবহার করিয়াছেন। এজন্য তিনি কবির কোন অনুমতি লইয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু ষ্টেজের উপরে দিব্য তরুণী-বেশধারী নায়িকার তরুণ কণ্ঠের এই গানখানি শুনিয়া কোন শ্রোতার মনেই যে ঐ অনুমতি গ্রহণের প্রশ্ন উঠে নাই, সে কথা হলপ করিয়া বলিতে পারি।

প্রস্তাবনা-সঙ্গীতটি শেষ হইয়া গেলে পর, অবাঙ্গালী দর্শকেরা বাঙ্গালীর নাটক দেখিয়া বেশ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াই একে একে হাসিমুখে চলিয়া গেলেন। ইহার আধ ঘণ্টা পরে আরম্ভ হইল আসল নাটকের অভিনয়।

প্রথম দৃশ্য—যুবনাশ্বের ড্রয়িংরুম, ঘৃতাচী অর্গান বাজাইয়া গান গাইতেছে। প্রোগ্রামে লেখা আছে, সময় তখন সন্ধ্যা

সাতটা এবং ঘৃতাচী যুবনাশ্বের স্ত্রী। গান তখনো শেষ হয় নাই, এমন সময়ে অনঙ্গ আস্তে আস্তে পা টিপিয়া আসিয়া ঘৃতাচীর চোখ দুটা চাপিয়া ধরিল। প্রোগ্রামে আছে, অনঙ্গ যুবনাশ্বের বন্ধু। গান সহসা থামিয়া গেল এবং ঘৃতাচী চম্‌কাইয়া উঠিল। দর্শকও সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ হাস্য করিল।

ঘৃতাচী। কে তুমি? কে? কে?—রাম? হরি? যদু? মধু? তুমি কে গা? (দর্শকের হাস্য ধ্বনি)

অনঙ্গ। (চোখ ছাড়িয়া দিয়া) এই দেখ ঘৃতাচী, আমি কে। আমি রাম-হরি-যদু-মধু কিনা একবার চোখ চেয়ে দেখ। (এই বলিয়া অনঙ্গের সম্মুখবর্ত্তী চেয়ারে উপবেশন।)

ঘৃতাচী। (হাসিয়া) আ-হা-হা-হা, মরি মরি অনঙ্গ দেবতা! (মার্জ্জিত রুচি দর্শকের মুখে রুমাল চাপিয়া হাস্য।)

অনঙ্গ। তোমার কথা শুনে রবিবাবুর একটা কবিতা মনে পড়ল, 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী, দিয়েছ তারে বিশ্বমাঝে ছড়ায়ে।'

ঘৃতাচী। থামো—থামো, আমারও একটা গান মনে পড়েছে, 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—' (হাস্য)

অনঙ্গ। গানটা গাও না।

ঘৃতাচী। এখন থাক্, এসো দুটো গল্প করি।

অনঙ্গ। দেখ ঘৃতাচী, কিছুদিন ধরে তোমাকে একটা কথা বলব বলব মনে করছি—বলা হয়ে উঠছে না।

ঘৃতাচী। ওঃ, বুঝেছি তোমার কথা, 'আমাকে ভালবাস' এই তো বলতে চাও ?

অনঙ্গ। ভালবাসি, কিন্তু বন্ধুপত্নী-ভাবে নয়।

ঘৃতাচী। তা তোমার সেই চোখটেপাতেই বুঝেছি।

অনঙ্গ। তবে যে বাধা দিলে না ? একে পরপুরুষ—তোমার ভয় করে না ?

ঘৃতাচী। আমাকে তোমার ভয় করে না ?

অনঙ্গ। আগে করত, কিন্তু যুবনাশ্ব আমাকে ভরসা দিয়েছে। বলেছে, তোমাকে সে যাচাই করতে চায়। কারণ, শরৎবাবুর 'চরিত্রহীন' পড়েছ তো, তাতে কিরণময়ী এক জায়গায় বলেছে—

ঘৃতাচী। হ্যাঁ মনে আছে, 'বিয়ের মন্ত্র কর্ত্তব্যবুদ্ধি দিতে পারে, মাধুর্য্য দিতে পারে না।'—তা আমাকে তো উনি মন্ত্র পড়ে আনেন নি।

অনঙ্গ। সে যাই হোক, বিয়ে তো হয়েছে। আর বিয়ে জিনিষটার মধ্যেই মাধুর্য্যের লেশমাত্র নেই। মাধুর্য্য দিতে পারে ভালবাসা, আর সে ভালবাসা হচ্ছে অন্ধ।

ঘৃতাচী। তাই বুঝি আমার চোখ টিপে ধরেছিলে ?

অনঙ্গ। ঠিক তাই। ভালবাসা অন্ধ, তার সম্বন্ধজ্ঞান নেই। জান না—তোমরা যাঁদের দেবতা বল তাঁদের কীর্ত্তি কলাপ ? এই অন্ধ হয়েই না তোমাদের তেত্রিশ কোটি

দেবতার যিনি রাজা তিনি সহস্রচক্ষু হয়েছিলেন, তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি......"

সহসা অনঙ্গের মাথার উপরে একপাটি জুতা আসিয়া পড়ায় তাহার পরচুলা খসিয়া পড়িল। দেখা গেল সে অনঙ্গ নহে, সে নবেন্দু। জুতা ঘৃতাচী মারে নাই, আসিয়াছে দর্শকগণের তরফ হইতে। একসঙ্গে অনেকগুলি দর্শক চীৎকার করিতেছেন, 'পাল চাপা দাও,' 'পাল চাপা দাও!' অনেকে হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন, ব্যাপারটা আদবেই বুঝিতে পারেন নাই। চিকের বাহিরে যে কয়জন মহিলা ছিলেন, এই গণ্ডগোলে তাঁহারা মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেলেন। চিকের ভিতরে যাঁহারা এতক্ষণ নানাবিধ সাংসারিক সুখদুঃখের কথাতেই মগ্ন ছিলেন, এই গণ্ডগোলে তাঁহাদের সে ফিস্‌ফিস্ থামিয়া গেল। দু'একটা এমন চ্যাংড়া ছেলেও ছিল যাহারা বিকৃতকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল, 'চলুক্ না চলুক না—বেশ হচ্ছে তো!' এমন সময় 'ড্রপ' পড়িয়া গেল এবং লোকনাথবাবু আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন, 'আজ আর অভিনয় হইবে না।' চামারপুরের নৈশগগন তর্ক কোলাহলে আলোড়িত করিতে করিতে প্রেক্ষাগৃহ খালি করিয়া দর্শকেরা তখন দলে দলে ঘরে ফিরিয়া গেলেন। শুধু যাঁহার পূজাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই-সব উৎসব-অনুষ্ঠানের

আয়োজন, সেই অম্লানশুভ্র দেবীপ্রতিমা তাঁহার নির্জ্জন পূজা মণ্ডপ হইতে এইসব দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় লজ্জায় ঘৃণায় কালো হইয়া উঠিয়াছিলেন।

Chemical Association

55, Canning Street,
Calcutta

কান্তা সেন্ট ব্যবহার করে
সন্তোষ লাভ করেছি।
এর সৌরভ বিদেশী জাতির
চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।
ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩৩৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রসঙ্গ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের বাল্যঘটনার কথা

রবীন্দ্রনাথের বাল্যঘটনা জানিতে হইলে তাঁহার স্বরচিত 'জীবনস্মৃতি'ই আমাদের অবলম্বন। কিন্তু 'জীবনস্মৃতি' হইতে সকল ঘটনার সঠিক তারিখ পাইবার উপায় নাই। এ-বিষয়ে সমসাময়িক সংবাদপত্রই আমাদের প্রধান সম্বল। আমি সম্প্রতি পুরাতন সংবাদপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের দুইটি ঘটনার বিবরণ পাইয়াছি। 'জীবনস্মৃতি'র বিবরণের সহিত মিলাইয়া লইলে এ-দুটি কাহিনী আর একটু সম্পূর্ণ মনে হইবে।

হিন্দুমেলায় কবিতা-পাঠ

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে (পৃঃ ১০০) লিখিয়াছেন,—

"আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্ম্মকর্ত্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত "মিলে সবে

ভারতসন্তান” রচনা করিয়াছিলেন।* এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্পব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।”

এই হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি ‘জীবনস্মৃতি’তে উপরিউদ্ধৃত অংশের পরই লিখিতেছেন,—

“লর্ড কর্জ্জনের সময় দিল্লীদরবার সম্বন্ধে একটা গদ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছি—লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে। তখনকার ইংরেজ গভর্মেণ্ট রুশিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চোদ্দ পনের বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এই জন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূতপরিমাণে থাকাসত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই।...সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড় বয়সে তিনি একদিন একথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।”

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার যে অধিবেশনে কবিতাটি পাঠ করেন তাহা ১৮৭৫ সনে রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে “পার্সীর

---

* এই গানটি হিন্দুমেলার তৃতীয় অধিবেশনে (৩০ চৈত্র ১৭৯০ শক) গীত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাগান নামক বিখ্যাত উদ্যানে” অনুষ্ঠিত হয়।* তবে তাহা “লর্ড লিটনের সময়” নহে,—লর্ড নর্থব্রুকের সময়। এই কবিতাটির সন্ধান এতদিন কাহারও জানা ছিল না। ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’র পুরাতন সংখ্যাগুলি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি সর্ব্বপ্রথম আমার নজরে পড়ে।† ইহা ১৮৭৫ সনের ২৫এ ফেব্রুয়ারি তারিখের ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’য় (তৎকালে দ্বিভাষিক—বাংলা ও ইংরেজী) ‘হিন্দুমেলায় উপহার’ নামে মুদ্রিত হইয়াছে। বাল্যরচনাটির উপর হেমচন্দ্রের প্রভাব পড়িয়াছে দেখা যায়। এ-পর্য্যন্ত যতটা জানা গিয়াছে তাহাতে এই কবিতাটিকেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা বলিতে হইবে। ১৩৩৮ সালের মাঘ মাসের ‘প্রবাসী’তে আমি কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি। †

---

* রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২১৫।

† এই কবিতাটি সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্তকুমার মহলানবিশ লিখিয়াছেন,—

“ব্রজেন্দ্রবাবু সম্প্রতি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে এই কবিতাটি উদ্ধার করেছেন।... এই কবিতাটির কথা Golden Book of Tagoreএর মধ্যে Chronicle অংশে উল্লেখ করেছি। কিন্তু তার সন্ধান পেয়েছিলাম ব্রজেন্দ্রবাবুর কাছে। প্রবাসী প্রকাশিত হওয়ার আগে তিনি আমাকে এই কবিতাটি দিয়েছিলেন। স্থানাভাববশতঃ Chronicleএ কোনো নজীর দিতে পারা যায়নি, তাই সেখানে ব্রজেন্দ্রবাবুর নাম উল্লেখ করতে পারিনি।” (‘বিচিত্রা,’ মাঘ ১৩৩৯, পৃঃ ৪৪৪, ২য় পাটি)

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আলাপের সূত্রপাত

সংবাদপত্রের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের আরও একটি বাল্য-ঘটনার সঠিক তারিখ জানিতে পারিয়াছি। সেটি সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার আলাপের সূত্রপাত।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে (পৃঃ ১৭৭-৭৮) লিখিয়াছেন,—

"তাঁহাকে [বঙ্কিমচন্দ্রকে] প্রথম যখন দেখি সে অনেক দিনের কথা। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা মিলিয়া একটি বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। বোধকরি তিনি আশা করিয়াছিলেন কোনো এক দূর ভবিষ্যতে আমিও তাঁহাদের এই সম্মিলনীতে অধিকার লাভ করিতে পারিব—সেই ভরসায় আমাকেও মিলনস্থানে কি একটা কবিতা পড়িবার ভার দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার যুবা বয়স ছিল। মনে আছে, কোনো জর্ম্মান যোদ্ধকবির যুদ্ধকবিতার ইংরেজি তর্জ্জমা তিনি সেখানে স্বয়ং পড়িবেন এইরূপ সংকল্প করিয়া খুব উৎসাহের সহিত আমাদের বাড়িতে সেগুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন।...

সেই সম্মিলনসভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র—যাঁহাকে অন্য পাঁচ জনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায়

পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র, তিনি কে, ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যখন উত্তরে শুনিলাম তিনিই বঙ্কিমবাবু, তখন বড় বিস্ময় জন্মিল।”...

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রদের যে বার্ষিক সম্মিলনের কথা বলিয়াছেন, তাহা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭৬ সনের ৩১এ জানুয়ারি তারিখে বসন্ত পঞ্চমী দিনে সিঁতির মরকত কুঞ্জে। এটি কলেজ রি-ইউনিয়নের দ্বিতীয় অধিবেশন।* এই অধিবেশনের একটি বিস্তৃত বিবরণ ১৮৭৬ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের ‘ইণ্ডিয়ান মিরার’ পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠের উল্লেখও পাওয়া যাইবে। বিবরণটি উদ্ধৃত করিতেছি,—

---

* ‘রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত’ পুস্তকের গোড়াতেই আছে,—

“......আমার জীবনে সম্পাদিত কাজের ফর্দ্দ।

....

(৬) College Reunion.

(৭) বিদ্বজ্জন সমাগম।”

কলেজ রি-ইউনিয়ান সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা ‘রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিতে’ পাওয়া যাইবে।

College Re-union [Communicated.]

The Second College Re-union was held on Monday, the 31st January, at the "Emerald Bower"—the well-known suburban villa of Rajah Jotindra Mohun Tagore Bahadur. The day was in keeping with the movement. A Re-union of educated Bengal could be held on no better day than the Saraswati Pujah day, ... The gathering was large and highly respectable, being composed of the ELITE and educated of Bengal . . . . . Amongst others, we noticed Babus Rajendralala Mittra, Prasanna Kumar Surbadhicari, Bunkim Chunder Chatterji B.A., Protap Chunder Ghose B.A., The Hon'ble Kristo Doss Paul, Rajah Jotindra Mohun Tagore Bahadur, Rajah Harendra Krishna Bahadur, Dr. Mohendro Lal Sircar M.D., Pundit Mohesh Chunder Nyrutna, Mr. Anund Mohun Bose, Mr. T. Palit, Babus Hem Chunder Banerji, Ram Sanker Sen, ... Ram Das Sen, Dijendro Nath Togore, Jotirindro Nath Tagore, Preonath Ghose, Akshya Churun Sircar B.L., and Raj Narain Bose, ... Sarada Charan Mittra M.A., . . .

The garden was tastefully decorated with garlands of flowers, and the national NAHABUT played occasionally. At about 12 o'clock there was a sufficient gathering, and the Re-union was held to be open. Pundit Hari Charan Sarma read several Bengali and Sanskrit poems. He was followed by Babu Rajkisto Roy who also read several Bengali poems. Mr. Anund Mohun Bose, at the instance of the Assistant Secretary, Babu Khagendronath Roy, introduced Mr. Srinath Dutta (lately returned from England) to the assembly and asked him to read his paper on "Agriculture". Mr. Dutt was heard with great attention, as he passed 4 years in England, Scotland and several other places in the continent of Europe to initiate himself into the different methods of agriculture as actually practised in Europe..... The Joint-Secretary, Babu Chundernath Bose, M.A., then read with emphasis and intonation the martial lyrics of the celebrated German poet, Koernus. Babu Rabindro Nath Tagore, son of the venerable Babu Debendronath Tagore, a boy of 13 or 14 years of age, read with a sweet voice and great shew of feeling certain Bengali poems. Babu Dijendronath Tagore also read, with an eye to artistic effect, several pieces from his new poem the "Supna Pryano." Babu Hem Chunder Banerji, the well-known Bengali poet, had composed and printed an elegant poem* expressly for the College Re-union. The printed poem as well as the published report of the first Re-union by the Assistant Secretary, Babu Khagendronath Roy, were distributed to the audience. Babu Akshya Chunder Sircar B.L., the editor of the SADHARANI, circulated copies of his paper [30th January] in which an able and thoughtful article on the Re-union was written. Babu Raj Narain Bose made a speech in MEMORIAM of the late lamented Babu Peari Charan Sircar..... At the request of some of the audience, Babu Kali Prosunno Banerji played the celebrated NASTARANG with the accompaniments of a Piano, played by Babu Baikunta Nath Bose..... After candle-light the whole garden was brilliantly illuminated. The TABLEUX VIVANTS of RAGS and RAGINIS, and of scenes from the "Mognadbad Kabya" of the late Mr. Michael M. S. Datta, formed the centre of of attraction..... The Secretaries, Rajah Sourendra Mohun Tagore, Babu Chunder Nath Bose, Babu Khagendro Nath Roy and several members of the Committee, such as Rajah Jotindro Mohun Tagore Bahadur, the Hon'ble Ram Sunker Sen and Babu Raj Narain Bose made every effort to make the visitors, subscribers, and others feel quite at home. .

---

* এই কবিতাটির নাম 'সুহৃৎ-সঙ্গম'। কলেজ রি-ইউনিয়ানের দ্বিতীয় অধিবেশনের বিবরণের সহিত এই কবিতাটি ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ (২৪এ মাঘ ১২৮২) তারিখের 'সাধারণী' পত্রে প্রথমে প্রকাশিত হয়।

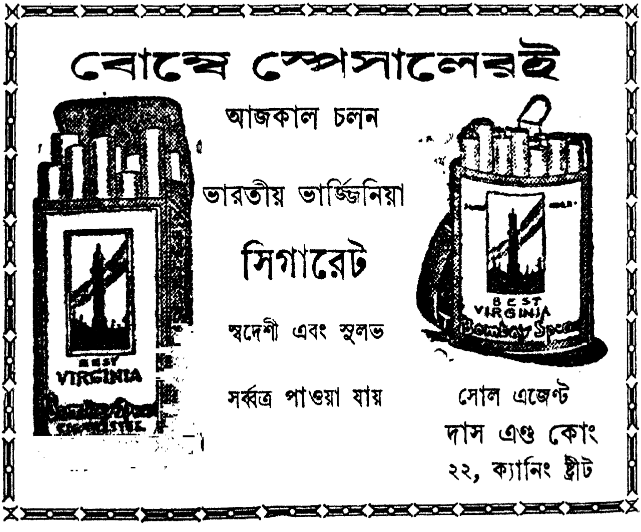
বোম্বে স্পেসালেরই
আজকাল চলন
ভারতীয় ভার্জ্জিনিয়া
সিগারেট
স্বদেশী এবং সুলভ
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়
সোল এজেন্ট
দাস এণ্ড কোং
২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট

চিত্র ও চরিত্র

কালীপ্রসন্ন সিংহ

পরমায়ুতে কি জীবনের পরিমাপ করা যায় ? কালীপ্রসন্ন-চরিত আলোচনা করিলে একান্ত বিস্ময়ে শুধু এই কথাই মনে জাগে, মাত্র ত্রিশ বৎসরব্যাপী জীবনের মধ্যে ঐশ্বর্য্য-লালিত এই যুবা এত কাজ, এমন-সব কাজ করিল কি করিয়া ? অনেক বড়লোকের স্মৃতি লুপ্ত হইয়া গেছে, কালী সিংহের নাম লোকে এখনও ভোলে নাই।

১৮৪০ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক।

তাঁহার যৌবনশক্তি নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য কেবলই নব নব প্রণালীর সন্ধান করিয়াছে। পরোপকারে, দানে, দেশহিতৈষণায়, সাহিত্যে, নূতন সৃষ্টির আনন্দে, রসিকতায়, রসজ্ঞতায়, গুণগ্রহণে, নব নব অনুষ্ঠানে, বিলাসে, বৈচিত্র্যে, প্রাণের প্রাচুর্য্যে এই শক্তিমান্ পুরুষ আপনাকে অভিব্যক্ত করিতে করিতে চলিয়াছে দেখিতে পাই।

তিনি নাটক রচনা করিয়াছেন, নাট্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, বঙ্গদর্শনের পূর্ব্বে বাংলা মাসিক সম্পাদন করিয়াছেন, প্রকাশ করিয়াছেন, নানা রচনায় বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করিবার অপরাধে অপরাধী লং সাহেবের দণ্ডের অর্থ তৎক্ষণাৎ আদালতে জমা দিয়াছেন, দুঃস্থজনকে অকাতরে সাহায্যদান করিয়াছেন, প্রতিভাবান্‌কে মর্য্যাদা দান করিয়াছেন, অসংখ্য অনুষ্ঠানকে প্রাণবান্ করিয়াছেন। এ সব তাঁহার কীর্ত্তির ভগ্নাংশ মাত্র।

১৬০৬ পৃষ্ঠা (পরপৃষ্ঠার নিম্নে) দ্রষ্টব্য

সাময়িকী ও অসাময়িকী

অন্য দেশের কথা জানি না, আমাদের বিশ্বাস, বাঙালী পাঠক রসজ্ঞ। 'ছোট গল্প' অল্পদিনের মধ্যে তাঁহাদের প্রিয় হইয়াছে, ইহাতে আমাদের আনন্দিত হইবারই কথা। নববর্ষের বিচিত্রতর আয়োজনে পাঠকপাঠিকা সন্তুষ্ট হইবেন, ইহা আশা করিতে পারি। আগামী ৩রা আষাঢ় 'ছোট গল্পে'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা বাহির হইবে।

* * *

'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' রচিত হইয়াছে। রচয়িতা শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নাট্যশালার এই পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসখানি প্রকাশ করিয়া অনুসন্ধিৎসু জনের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ব্রজেন্দ্রবাবু ১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। ইহাই নাট্যশালার প্রথম পর্ব্ব।

* * *

'ছোট গল্পে'র চমৎকার চিত্রগুলি শিল্পী শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অঙ্কিত। তাঁহার চিত্রে মহাজনগণের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

১৬০৫ পৃষ্ঠার পরে

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' লিখিলেই সাহিত্যে তাঁহার নাম অক্ষয় হইত। প্রথম কয় লাইন অমিত্রাক্ষর তাঁহারই রচনা। বাংলায় মহাভারতের অনুবাদ করাইয়া তিনি অমর হইয়াছেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। জীবনের ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী, প্রতিভোজ্জ্বলবিশালনয়ন এই সুদর্শন যুবকের মুখশ্রী হইতে শক্তির ছটা স্ফুরিত হইতেছে।

দিন-পঞ্জী

জেনেভা, ১লা জুন—আগামী অক্টোবর মাসে প্যারিসে ভারতের জন্য যে আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের অধিবেশন হইবে, তাহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন মাদাম হোরাপা ও ডাঃ দেমার্কেং। এই সম্মেলনে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন—অধ্যাপক আইনষ্টাইন, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ বার্ট্রাণ্ড রাসেল এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু।

সিমলা, ২রা জুন—সম্রাটের জন্ম দিবস উপলক্ষে বাঙ্গালার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী অনারেবল মিঃ বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় ও কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ কেদারনাথ দাস নাইট (স্যার) উপাধি লাভ করিয়াছেন।

সিমলা, ৩১শে মে—প্রেস-প্রতিনিধির সহিত কথোপকথন কালে স্যার চিমনলাল শীতলবাদ বলেন সাম্প্রদায়িক মীমাংসা ১৯৩০ সালের প্রথম বৈঠকেই সম্ভব হইত, কিন্তু ডাঃ মুঞ্জের জন্যই ইহা হইতে পারে নাই।

নাগপুর, ২রা জুন—ডাঃ মুঞ্জে ইহার উত্তরে এক বিবৃতিতে বলেন, যদি জাতীয়তাকে অস্ত্রাঘাতেই মারিতে হয় তবে গান্ধীর মত পুণ্যাত্মার হাতেই মরুক, তবুও ক্লাইভ ও হেষ্টিংসের কূট রাজনীতিতে পরিপক্ক প্রধান মন্ত্রীর মীমাংসা আমরা চাহি না।

গত শনিবার, ৩রা জুন—ক্যালকাটা মাঠে ভারতবর্ষ বনাম গ্রেটব্রিটেন ফুটবল খেলা হয়। এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক খেলা এই

বৎসর প্রথম। ভারতীয় দল ৪-১ গোলে গ্রেটব্রিটেনকে পরাজিত করে।

রাঁচি, ৫ই জুন—ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত অন্তরীনের আদেশ অনুযায়ী রাজবন্দী শ্রীযুত জে-এম-সেন গুপ্তকে এখানে আনা হইয়াছে। কাঁকে রোডস্থ একখানা ভাড়াটে বাংলোতে তাঁহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পুনা, ৭ই জুন—মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্যের আশানুরূপ উন্নতি ঘটিতেছে না। দুই দিনে দুই পাউণ্ড ওজন হ্রাস পাইয়াছে। ডাঃ দেশমুখ অধিকতর বিশ্রামের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পুনা, ৭ই জুন—মহাত্মা-পুত্র দেবীদাস গান্ধীর সহিত কুমারী লক্ষ্মী রাজাগোপালাচারীর বিবাহ ১৬ই জুন 'পর্ণকুটীতে' মহাত্মার সমক্ষে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে নিষ্পন্ন হইবে। দেবীদাস গুজরাটী বৈশ্য ও কুমারী লক্ষ্মীবাঈ মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রথমে সিভিল ম্যারেজের আশ্রয় লইতে হইবে।

আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে
আর ইনজেক্‌সান লইতে হইবে না
ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা